হাসান আইউব

ইসলামের সামাজিক আচরণ

ইসলামের সামাজিক আচরণ

www.amarboi.org

www.amarboi.org

ইসলামের সামাজিক আচরণ

হাসান আইউব

অনুবাদ

এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

Ahsan Publication

পরিবেশনায়

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন ❖ বাংলাবাজার ❖ ১৯১ মগবাজার

www.amarboi.org

ইসলামের সামাজিক আচরণ
হাসান আইউব
অনুবাদ : এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম

প্রকাশনায়
বিশ্ব প্রকাশনী, ঢাকা

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
❖ ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন : ৭১২৫৬৬০, ০১৭২৮১১২২০০
❖ ১৯১ বড় মগবাজার, ঢাকা, ফোন : ৮৩৫৩১২৭, ০১৯৩৯৬০০৩০০
❖ কাটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, ঢাকা, ফোন : ৯৬৭০৬৮৬, ০১৯২২৭০৪২১০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN 984-32-0906-0

প্রথম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

তৃতীয় সংস্করণ
জুলাই, ২০১৪
আষাঢ়, ১৪২১
রমযান, ১৪৩৫

প্রচ্ছদ : মুবাশ্বির মজুমদার

কম্পোজ
আহসান কম্পিউটার, ঢাকা

মূল্য : তিনশত ষাট টাকা মাত্র

ISLAMER SAMAJIK ACHARAN written by **Hasan Aiub** Translated (into Bengali) by **A N M Sirajul Islam** Published by Bishaw Prokashoni Dhaka, distributed by Ahsan publication Dhaka. 3rd Edition. July 2014. Price: Tk.360.00 only ($ 8.00)

www.amarboi.org

অনুবাদকের কথা

'ইসলামের সামাজিক আচরণ' বইটি মিসরের প্রখ্যাত আলেম ও চিন্তাবিদ এবং ইখওয়ানুল মোসলেমুনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব হাসান আইউবের লেখা السُّلُوكُ الإجتِمَاعِى فِى الإسلام (আচ্ছুলুকুল ইজতিমাঈ ফিল ইসলাম) বই এর বাংলা অনুবাদ। তিনি এ বইতে ইসলামের সামাজিক আচরণ এবং সামাজিক অধিকার সম্পর্কে বিষদ মৌলিক আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ের উপর এটিই একটি পূর্ণাঙ্গ প্রয়াস। তাছাড়াও এটি একটি মৌলিক ইসলামী গ্রন্থ।

সমাজ হচ্ছে ইবাদতের ক্ষেত্র। মানুষের মধ্যে তওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত ভিত্তিক আকীদার পর সামাজিক আচরণের প্রশ্ন এসে যায়। তাই, কোরআন ও হাদীসের এক বিরাট অংশে ইসলামের সামাজিক ইবাদাতের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যে সকল উপাদান নিয়ে সমাজ গঠিত, সে সকল উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়াও সমাজকে ইসলামের আলোকে গড়ে তোলার জন্য রয়েছে বহুবিধ সামাজিক অধিকার।

সামাজিক আচরণ দু'প্রকার। ইতিবাচক ও নেতিবাচক। নেতিবাচক আচরণ দূর করে ইতিবাচক আচরণের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে সুস্থ ইসলামী সমাজ।

বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কোন বই না থাকায় এ বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। সাথে আমি যোগ করেছি 'স্ত্রীদের সাজ-গোজ' অধ্যায়টি। এর দ্বারা সামাজিক অধিকারের পূর্ণতা বিধানই আমার লক্ষ্য।

ইসলামের সামাজিক আচরণ ও অধিকারের যথার্থ বাস্তবায়ন এ বইয়ের স্বার্থকতা বয়ে আনবে। আল্লাহ্ সর্বোত্তম তৌফিকদাতা।

এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম
বাংলা বিভাগ, রেডিও জেদ্দা
সৌদি আরব
১২ই রজব, ১৪১৮ হিঃ; ১২ই নভেম্বর, ১৯৯৭ ঈসায়ী

www.amarboi.org

সূচীপত্র

ভূমিকা ১৩
ইসলামী সমাজের অধঃপতনের কারণ ১৭
সামাজিক বিষয়ের উপর ইসলামের গুরুত্ব ২১
একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ৩২
ইসলামের সামাজিক আচরণের উপর গুরুত্বের কারণ ৩২
সুস্থ সমাজ গঠনের মূলনীতি ৪০
প্রথম মূলনীতি : বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস ৪০
২য় মূলনীতি : আল্লাহর দীনের সুস্থ, গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান ৪৭
৩য় মূলনীতি : মানসিক ব্যাধি ও এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ ৫৪
শিক্ষার মর্যাদা ও সওয়াব ৫৪
৩য় মূলনীতির : ১ম অংশ ৫৫
১. গর্ব-অহংকার ৫৫
গর্ব অহংকারের মূল ৬১
অহংকারের প্রকারভেদ ৬৩
অংহকারী লোকের কাহিনী ৬৫
অহংকার থেকে বাঁচার উপায় ৬৬
বিনয়ের মর্যাদা ৭২
বিনয়ের ব্যাপারে গল্প ও উপদেশ ৭৪
২. সম্পদের গরিমা ৭৬
৩. রাগ ৭৬
ধৈর্যের মর্যাদা ও রাগের নিন্দা ৮০
রাগের প্রতিকার ৮২
৪. ঘৃণা-বিদ্বেষ ৮৪
৫. হিংসা ৮৭
প্রতিকার ৯২
৬. মুসলমানদের প্রতি অহেতুক খারাপ ধারণা পোষণ করা ৯৩
৭. কোন মুসলমানকে তুচ্ছ করা এবং তার অধিকারকে হালকা গণ্য করা ৯৫

www.amarboi.org

৩য় মূলনীতির : ২য় অংশ
বাহ্যিক সামাজি ব্যাধি ১০০
১. জুলুম ১০০
২. আল্লাহর আইনছাড়া অন্য আইনের শাসন জুলুম ১০৪
৩. ঘুষ ও পক্ষপাতিত্ব করা ১০৯
৪. গোয়েন্দাগিরি করা এবং শরয়ী কারণ ছাড়া কারোর দোষ-ত্রুটি তালাশ করা ১১৩
৫. ধোঁকাবাজী করা ১১৭
৬. মুসলমানের উপর নিষিদ্ধ কষ্ট ১২৪
নিন্দা ১২৭
নিন্দার সংজ্ঞা ১২৮
গীবতের কারণ ১৩০
গীবতের হুকুম ১৩০
গীবত শুনার হুকুম ১৩১
অমুসলমানের নিন্দার হুকুম ১৩৩
গীবত থেকে তওবা করা ১৩৪
নিন্দা একাধারে লাভ ও ক্ষতিকর ব্যবসা ১৩৬
কোন্ কোন্ বিষয়ের নিন্দা জায়েয ১৩৭
চোগলখুরী ১৪০
মুসলিম সমাজের বন্ধন ১৪১
চোগলখুরীর হুকুম ১৪৪
চোগলখুরীর কারণ ১৪৪
চোগলখুরী হারাম হওয়ার দলীল ১৪৫
চোগলখোরের সাথে আচরণের পদ্ধতি ১৪৭
চোগলখোরের বিরুদ্ধে আমাদের বুযুর্গ ব্যক্তিদের ভূমিকা ১৪৯
চোগলখোরের দুই রূপ ১৫১
চোগলখোরী থেকে বাঁচার উপায় ১৫২
৯. মিথ্যা বলা ১৫২
ওয়াজিব মিথ্যা ১৫৬
জায়েয মিথ্যা ১৫৬

www.amarboi.org

বাহিক্য অর্থ ত্যাগ করে চালাকী করে ভিন্ন অর্থ গ্রহণের হুকুম ১৫৯
১০. অন্যের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা ১৬০
১১. গালি ও অভিশাপ ১৬১
যাদেরকে অভিশাপ দেয়া যায় ১৬২
১২. যেনার অপবাদ ১৬৪
১৩. জিহ্বার বিপদ ১৬৫
৪র্থ মূলনীতি : সামাজিক অধিকার
সামাজিক কর্তব্য ও সামাজিক আচরণ পদ্ধতি ভালভাবে বুঝা ও অধ্যয়ন করা ১৬৯
সমাজ হচ্ছে ইবাদতের ক্ষেত্র ১৭২
সামাজিক অধিকারের প্রকারভেদ ১৭৫
স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার ১৭৮
১. স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করা ১৭৮
২. দেনমোহর ১৮৪
৩. স্ত্রীর ভরণ পোষণ ১৮৫
৪. বিয়ের ব্যাপারে স্ত্রীকে নিজ ইচ্ছামত স্বামী গ্রহণের স্বাধীনতা দিতে হবে ১৮৭
৫. স্বামী স্ত্রীকে দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শিক্ষা দেবে ১৮৭
৬. স্ত্রীকে সৎকাজের আদেশ এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা ১৮৮
৭. স্ত্রীকে কষ্ট না দেয়া এবং তার অনুভূতির প্রতি সদয় নজর দেয়া ১৮৯
৮. একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে ইনসাফপূর্ণ পালা বণ্টন ১৯১
৯. ভারসাম্যপূর্ণ আত্মমর্যাদাবোধ ১৯৩
১০. স্ত্রীকে নিজ আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে বেড়ানোর সুযোগ দিতে হবে ১৯৬
স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার ১৯৭
১. স্ত্রীল তুলনায় স্বামীর মর্যাদা ভালভাবে জানা ২০০
২. স্বামীর আনুগত্য ও উত্তম আচরণ করা ২০২
৩. স্বামীর জন্য সেজেগুজে চলা ২০৯
স্ত্রীদের সাজ-সজ্জা ২১৩
জায়েয ও নাজায়েয সাজসজ্জা ২১৩
ঘরে সাজতে স্ত্রীদের অনীহা ও তার কারণ ২১৩
স্বামীদের জন্য স্ত্রীদের কেন সাজা উচিত ২১৫

www.amarboi.org

নিষিদ্ধ ও নাজায়েয রূপচর্চা ২১৮
স্বামী-স্ত্রী মধ্যকার অশান্তি ও বিরোধ দূর করার উপায় ২২৩
দাম্পত্য জীবনকে সুখী ও মধুময় করার পদ্ধতি ২২৬
পিতামাতার উপর সন্তানের অধিকার ২৩৪
সন্তানের উপর মা-বাপের অধিকার ২৪৯
মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ২৫৯
মা-বাপের আনুগত্যের সাথে প্রাসঙ্গিক মাসআলা ২৬০
আত্মীয়তার সম্পর্ক ২৭১
আত্মীয়তার অধিকার রক্ষার হুকুম ২৭১
কোন্ আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রাখা ফরজঃ ২৭৩
আত্মীয়তার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা বা বিচ্ছিন্ন করার অর্থ ২৭৪
আত্মীয়তার সম্পর্কের সওয়াব ও মর্যাদা ২৭৫
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি ২৭৯
ইয়াতীমের যত্ন ২৮২
প্রতিবেশীর অধিকার ২৮৭
প্রতিবেশীকে কষ্টদানের সাজা ২৮৯
প্রতিবেশীর শ্রেণী বিভাগ ও সীমানা ২৯২
প্রতিবেশীকে সম্মানের পদ্ধতি ২৯৪
চাকরের অধিকার ২৯৬
ইসলামের সাধারণ অধিকার ৩০০
ভ্রাতৃত্ব ৩০০
ইসলামী ভ্রাতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রকারভেদসমূহ ৩০৩
সাধারণ ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অধিকার ৩০৪
সকল মুসলমানের কল্যাণের আকাংখা করা ৩০৫
দুর্বল ও মজলুমের সাহায্য করা ৩০৮
সুপারিশ করা ও প্রয়োজন পূরণ করা ৩১২
মুসলমানের দোষ গোপন রাখা ৩১৭
ওয়াদা-অঙ্গীকার ও চুক্তি পূরণ করা ৩২১
দুর্বলের প্রতি দয়া, ছোটদের প্রতি মায়া এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ৩২৫

www.amarboi.org

প্রবেশকারী ও আগন্তুকের সম্মানে দাঁড়ানো ৩৩১
নিষিদ্ধ দাঁড়ানো ৩৩১
বৈধ দাঁড়ানো ৩৩৩
মতবিরোধপূর্ণ দাঁড়ানো ৩৩৫
হাত, মাথা ও অন্যান্য অঙ্গে চুমু খাওয়া ৩৩৮
কোলাকুলি ৩৪০
মুহরাম স্ত্রীলোককে চুমু খাওয়া ৩৪১
ঝুঁকে প্রবেশ কিংবা সাক্ষাত করা ৩৪২
চলাচল, প্রবেশ করা ও বের হবার সময় বড়দের অগ্রাধিকার দান ৩৪৩
সালাম ও তার হুকুম ৩৪৪
সালামের ফযীলত ৩৪৬
সালামের পদ্ধতি ৩৪৬
সালাম ও জবাবের ব্যাপারে কিছু মাসআলা ৩৪৮
যে সকল অবস্থায় সালাম দেয়া মাকরূহ ৩৫১
নারী-পুরুষের সালাম বিনিময় ৩৫১
ইহুদী-খৃষ্টানকে সালাম দেয়া ৩৫৩
বেদআতী ও কবীরা গুনাহকারীর প্রতি সালাম ৩৫৪
শিশুদের প্রতি সালাম দান ৩৫৫
সালামের আদব ৩৫৫
সালামের ক্ষেত্রে বর্জনীয় বেদ'আত ৩৫৭
অনুমতি গ্রহণের হুকুম ৩৫৮
হাঁচির জবাব ৩৬৪
জাহেলিয়াতের দৃষ্টিভঙ্গী ৩৬৪
হাঁচিদাতার কি বলা মোস্তাহাব? ৩৬৫
হাঁচির জবাব কে পেতে পারে? ৩৬৬
সুন্নতের উপর আমলের বরকত ৩৬৭
কসমের বাস্তবায়ন ৩৬৮
মুসলমানের প্রতি নসীহত করা ৩৬৯
খাবার দাওয়াত গ্রহণ করা ৩৭২

www.amarboi.org

খাবার দাওয়াত কবুল করার হুকুম ৩৭৩
মন্দ দাওয়াত ৩৭৪
রোজাদারকে ওলীমার দাওয়াত দেয়ার হুকুম ৩৭৫
যে দাওয়াতে গুনাহর কাজ আছে তা গ্রহণের ব্যাপারে হুকুম ৩৭৫
খাওয়ার আদব ৩৭৭
কতিপয় জায়েয ও মাকরূহ বিষয় ৩৮৭
খাবারের সামষ্টিক আদব-শিষ্টাচার ৩৮৮
পানীয় পান করার নিয়ম ও সুন্নত ৩৯৫
রোগী দেখা ৪০৪
রোগী দেখার হুকুম ৪০৬
রোগী দেখার আদব ৪০৭
মৃত্যুর মুখোমুখি ব্যক্তির কাছে কি বলা উচিত? ৪১১
কাফের রোগী দেখতে যাওয়া ৪১৩
অসুস্থ মহিলাকে দেখতে যাওয়া ৪১৩
জানাযার নামায ও মৃতের দাফন ৪১৪
শোক প্রকাশ ৪১৬
শোক প্রকাশের হুকুম ৪১৭
জানাযার সাথে চলন্ত ব্যক্তির করণীয় ৪১৮
আতিথেয়তায় মুসলমানের অধিকার ৪১৯
মজলিশের আদব ৪২৩
রাস্তায় বসার আদব ৪৩৭
অন্যের সাথে আলোচনার আদব ৪৩৯
পথ চলার আদব ৪৫১
দেখা-সাক্ষাতের নিয়ম-কানুন ৪৫৭
নেক নিয়তে সাক্ষাত করা ৪৫৭
শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আদব ও অধিকার ৪৫৯
জ্ঞানের মর্যাদা ৪৫৯
জ্ঞানীর মর্যাদা ও সওয়াব ৪৬১
জ্ঞানের হুকুম ও সওয়াব ৪৬২

www.amarboi.org

শিক্ষার্থীর আদব ও আকাংখিত বিষয় ৪৬৩
ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের কর্তব্য ৪৭০
লোকদের মধ্যে সন্ধি-সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা ৪৭৫
কথা ও কাজে কৌতুক বা হাসি ঠাট্টা করা ৪৭৭
সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধের মর্যাদা ও গুরুত্ব ৪৭৯
সৎকাজের আদেশ দানকারী এবং অন্যায়ের প্রতিরোধকারীর শর্ত ৪৮৬
সৎকাজের আদেশ দানকারী ও অন্যায়ের প্রতিরোধকারীর পর্যায়ভিত্তিক করণীয় ৪৯২
সৎকাজের আদেশকারী এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধকারীর গুণ ৪৯৪
ফরজ প্রতিরোধের শর্তাবলী ৪৯৫
অন্যায়ের প্রতিরোধে ওলামায়ে কেরামের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা ৪৯৭
অন্যায়ের প্রতিরোধে ওলামায়ে কেরামের নম্রতা ও বিজ্ঞতা ৪৯৯
বিশেষ ভ্রাতৃত্ব ৫০২
বিশেষ ভ্রাতৃত্বের অধিকার ৫০৬
১. অর্থের অধিকার ৫০৭
২. জান দিয়ে সাহায্য করা ৫০৮
৩. জিহ্বার অধিকার ৫০৯
আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিদ্বেষ ৫১১
শরীয়ত সম্মত কারণ ছাড়া কাউকে ত্যাগ করার হুকুম ৫২০
মুসলিম দেশের অমুসলমানদের অন্যায় কাজের প্রতিরোধ ৫২২
আল্লাহর বাণী বুলন্দ করার স্বার্থে জেহাদী ভ্রাতৃত্ব ৫২৩
১. উদ্দেশ্য-লক্ষ্য নির্ধারণ ৫২৪
২. ব্যাপক ও গভীর উপলব্ধি ৫২৪
৩. ইসলামী অনুশাসনের সুক্ষাতিসুক্ষ্ম অনুসরণ ৫২৮
৪. নেতা নির্বাচন ৫২৯
৫. সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও মাধ্যম ৫৩২
৬. চোখ খুলে অনুসরণ করা ৫৩৫
৭. বাইআত ও আনুগত্য ৫৩৬

www.amarboi.org

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং রাসূলুল্লাহ (সা)সহ সকল সাহাবা ও সুন্নাহর অনুসারী লোকদের উপর দরুদ ও সালাম।

আমি সকল মুসলমান ভাই বোনের প্রতি 'ইসলামের সামাজিক আচরণ' বইটি নিবেদন করছি। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন এই প্রচেষ্টাকে উপকারী ও উপাদেয় করেন এবং এটাকে ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়ের গবেষণা হিসেবে কবুল করেন। পাঠকবর্গ দেখতে পাবেন বইটিতে আমি সর্বদা কোরআন ও হাদীসের উপর নির্ভর করার চেষ্টা করেছি এবং কখনও জ্ঞানের সূক্ষ্ম আমানত রক্ষার স্বার্থে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ সামান্য আলোকপাত করেছি। আমি প্রত্যেকটি আলোচ্য বিষয়ে ফিক্‌হ-এর বিধান বর্ণনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছি। যাতে করে পাঠক বুঝতে পারেন কোনটি ফরজ ও ওয়াজিব, কোনটি মোস্তাহাব, কোনটি হারাম এবং মাকরূহ। ফলে পাঠক দলীল প্রমাণের ভিত্তি খুঁজে পাবেন এবং নিজের ব্যক্তিগত আচরণ সম্পর্কে সচেতন হতে সক্ষম হবেন।

সামাজিক আচরণ কথাটি খুবই ব্যাপক এবং এর রয়েছে বহু শাখা প্রশাখা। একজন মুসলমানের সাথে যেমনি তার নিজ পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও চাকর-চাকরানীর সম্পর্ক রয়েছে তেমনি করে তার সাথে অন্যান্য মুসলমান, অমুসলমান, পাপী ও ভাল লোকসহ শান্তিকামী ও যুদ্ধবাজ লোকেরও সম্পর্ক রয়েছে। এর ভিত্তিতে আমি বইটিকে ৪টি মূলনীতিতে বিভক্ত করেছি।

১ম মূলনীতি : বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করা।

২য় মূলনীতি : আল্লাহর দীনকে বুঝার জন্য ইসলাম সম্পর্কে বুৎপত্তি অর্জন করা।

৩য় মূলনীতি : আত্মার পংকিলতা ও ব্যাধি পরিস্কার করা।

৪র্থ মূলনীতি : সমাজের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য উপলব্ধি ও সামাজিক আচরণের আদব-শিষ্টাচার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন।

এই মূলনীতি এ বই-এর তিন চতুর্থাংশের সমান। আমি ৪র্থ মূলনীতিটিকে দুইভাগে ভাগ করেছি।

এক. মুসলিম পরিবার-পরিজন, প্রতিবেশী, আত্মীয়, চাকর, অতিথি মুসাফির– এদের অধিকার।

www.amarboi.org

দুই. সাধারণ মুসলমান ও অমুসলমানদের সাথে সম্পর্ক।

মূলত, এই বইয়ের বিষয়গুলো সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য জরুরী। তাই প্রত্যেক ঘর, সমাজ ও ইসলামী সংগঠনের উচিত, এই জিনিসগুলো অধ্যয়ন করা তা এ বই থেকেই হউক কিংবা অন্য বই থেকে।

চতুর্থ মূলনীতিতে আমি এ বইতে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণালব্ধ আলোচনা পেশ করেছি। অধিকাংশ ইসলামী শিক্ষার্থীর মনে অনুপস্থিত বাস্তবতার বিশ্লেষণ এবং ইসলামের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতকারী সন্দেহ-সংশয়ের অপনোদনসহ সকল ধরনের ইসলামী আইন প্রণয়নের সাথে এগুলোর গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

এ বইয়ের উদ্দেশ্য হল, যেই মুসলমানের মনে কল্যাণ, দয়া এবং মানবিক ও তামাদ্দুনিক অনুভূতি রয়েছে, সেই মুসলমানের মনে অন্য মুসলমানের প্রতি ইসলামী ও মানবিক অনুভূতি জাগ্রত করা। মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হল, সে দয়ালু অন্তরের অধিকারী, অনুগ্রহকারী এবং সত্যের মশাল বহনকারী। সে না জানে বিশ্বাসঘাতকতা ও খেয়ানত করতে, আর না জানে কঠোরতা প্রদর্শন করতে। পোকা-মাকড়ের ক্ষেত্রেও তার এই গুণাবলী প্রযোজ্য। অপরদিকে সে হবে দয়ারসাগর ও ভালবাসার পাত্র। কারো দুঃখ-কষ্ট দেখলে সে বিনিদ্র রজনী কাটায়, অন্যায় দেখে সহ্য করতে পারে না এবং আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করে না।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন এর পাঠক, লেখক ও প্রচারকদের কল্যাণ করেন। তিনি অবশ্যই দো'আ কবুলকারী।

বিনীত

হাসান আইউব

www.amarboi.org

بسم الله الرحمن الرحيم

www.amarboi.org

ইসলামী সমাজের অধঃপতনের কারণ

কম লোকই নিজেদের ইসলামী জিন্দেগীর সামাজিক দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, খুব কম সংখ্যক লোকই তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বিষয়টিকে ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করার পর এর প্রতিফল নিয়ে ভাবে, তার দাবী অনুযায়ী চলে এবং তাকে সুক্ষ্ম ও সাব্বেবাস্তবায়নের চেষ্টা চালায়।

১. প্রথম কারণ এই হতে পারে যে, ঔপনিবেশিকতার প্রচণ্ড আঘাতে মুসলমানের জীবনের সকল দিক ও বিভাগে যে স্থবিরতা ও বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে তার কুফল ও দুর্ভোগ এখন পর্যন্ত তাদেরকে পোহাতে হচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, উপনিবেশবাদীদের স্বদেশী শিষ্যদের পক্ষ থেকেও তারা কঠোর দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। যদিও তারা তাদেরকে দীনি ভাই বলে মনে করে থাকে, আসলে তারা জাতীয়তাবাদী ভাই, দীনি ভাই নয়।

২. দ্বিতীয় কারণ এটা হতে পারে, ওলামায়ে কেরামের স্থবিরতা। তারা দুর্বলতা, অন্ধ প্রবণতা ও সংকীর্ণতার দোষে দুষ্ট। একদল আলেম কম ইলম ও জ্ঞানের অধিকারী, তাদের যোগ্যতা ও সামর্থ কম, শান্তির সময় তাদেরকে তৎপর দেখা যায়, দুঃখ-দৈন্যের সময় তারা গা ঢাকা দেয়। তাদের মজলিশে অজ্ঞতাপূর্ণ ফতোয়া দেয়া হয়, লোকদেরকে অজ্ঞতাবশতঃ কাফের ও ফাসেক বিবেচনা করে সমাজে বিরোধ ও মতপার্থক্যের বীজ ছড়ায়। তারা না বুঝে নিজেদের দুর্বলতা, আর তারা না লোকদেরকে মিথ্যা ও কুসংস্কার থেকে রক্ষা করতে পারে।

৩. এও কারণ হতে পারে, অধিকাংশ মুসলিম শাসক ও সরকারের অপচয় ও অশ্লীলতা, দীন ও দীনদারদের প্রতি তুচ্ছজ্ঞান, জুলুম নির্যাতনের প্রয়োগ এবং গোয়েন্দাগিরী ও ছিদ্রান্বেষণের মাধ্যমে উম্মাহর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন ও মায়া-মমতা দূর করার কারণে কোন কোন সময় একজন মুসলমান নিজ ভাই, সন্তান ও স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ পোষণ শুরু করে। ঐ সকল শাসকের চেষ্টার লক্ষ্য হল, সমাজের লোকদের সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি করা, ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ বন্ধুদের ঐক্য বিনষ্ট করা এবং সেই সকল দল ও সম্প্রদায়কে শাস্তি দেয়া, যারা দীনের শাসন কায়েম, ইসলামের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি ও আল্লাহর ঝাণ্ডা উঁচু করার মহান লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। যাতে করে ইসলামের সূর্য আলোকজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং অতিরিক্ত বিপদ মুসীবতের গ্লানি নিয়ে তা আবার ডুবে না যায়।

www.amarboi.org

৪. আরেকটি সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে, মুসলমানরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় শত্রুদের কৃপায় এক মারাত্মক আমদানী-রফতানীতে জড়িয়ে পড়েছে। তবে তা কোন অস্ত্র, পণ্যদ্রব্য, প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক কৌশলের আমদানী রফতানী নয়। বরং এর চাইতেও আরও ভয়ংকর জিনিস। সেটা হচ্ছে উন্নত নীতিমালা, মহান মানবতা এবং দীন। কোরআন ও রাসূলের কাছ থেকে প্রাপ্ত নেতৃত্বের অধিকারী মুসলমানদেরকে শত্রুদের স্কুল-কলেজে পাঠিয়ে মগজ ধোলাই সহ চরিত্র ও নীতি ধোলাইর কাজ শেষে তাদেরকে এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন পরে তারা নিজ উম্মাহ ও দীনকে ঘৃণা করতে শিখে এবং পূর্ব পুরুষের নীতিমালা ও তাদের অনুসরণ প্রত্যাখ্যান করে।

তারপর তাদেরকে এমনভাবে দ্রুত তৈরি করা হয় যেন তাদের পূর্ণ বিকৃতি ঘটে এবং ধ্বংসাত্মক কাজ ছাড়া তাদের কাছ থেকে আর কিছু আশা করা যায় না। তাদের অবস্থা হয় বাঁনরের যুক্তিহীন অনুকরণের মত। পরে সে না প্রাচ্যপন্থী, না পশ্চিমাবাসী, না মুসলিম, না কম্যুনিষ্ট, না সে নিজ বাপ-দাদার পরিচয় বহন করে, আর না সে নিজ উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্নতার স্বীকৃতি দেয়। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর বড় বড় দায়িত্ব লাভ করে এবং মুসলিম উম্মাহর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পদ ও সংস্থায় তাকে বসানো হয়। এখন তাদের অবস্থা দেখুন, তারা বাইরে গিয়েছিল মহান লক্ষ্যে, প্রত্যাবর্তন করেছে নিকৃষ্ট হয়ে; তারাই নৈতিক ও মূল্যবোধের শিক্ষক হিসেবে বেরিয়েছে, তারপর তারাই বেশ্যাবৃত্তি, চরিত্রহীনতা ও ধ্বংসের শাগরেদ হয়ে স্বদেশের ভূমিতে পা রেখেছে।

তাদের চাইতেও আরও ভয়াবহ বিপজ্জনক হচ্ছে তারা, যাদেরকে আমরা আমদানী করি কিংবা আমাদেরকে আমদানী করতে বাধ্য করা হয়। তারা আমাদের উম্মাহর উন্নয়ন ও সংস্কৃতিতে নাকি তথাকথিত সাহায্য করবে। তাদের কাছ থেকে বিজ্ঞানী, অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ, রাজনীতিক ও সামরিক অভিজ্ঞ লোক এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিকপালদেরকে আমরা স্বাগত জানাই। এমনকি আমরা এত নীচুতে চলে যাই যে, শেষ পর্যন্ত তাদের নর্তক-নর্তকী, অভিনেতা ও অভিনেত্রী, বেশ্যাবৃত্তির তারকা, মাতাল ও জুয়াড়ীদেরকে পর্যন্ত স্বাগত জানাই। এর ফলাফল কি হবে তা চিন্তা করে দেখা দরকার। তারা আমাদের সম্পদ নষ্ট করছে, অর্থনীতি ধ্বংস করছে, চরিত্র বরবাদ করছে, আমাদের জাতির মধ্যে তাদের নীতি ও আদর্শের ধারক একদল মানসপুত্র তৈরি করছে, তাদেরকে নিজেদের ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারা গলাধঃকরণ করিয়েছে এবং এমনভাবে

www.amarboi.org

বিশ্বাসঘাতকতা করছে যেমন করে বাদশাহর সম্পদের আমনতদার ব্যক্তি পুরো সম্পদ লুটেপুটে খেয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছে। ঐ সকল আমদানী করা বিশেষজ্ঞরা বহু মুসলমানের অধিকার, উন্নত নীতি ও ঈমানের পরিবর্তে তাদের কুফরী ও গোমরাহী অনুপ্রবেশের ব্যাপারে অত্যাধিক আগ্রহী।

আপনি হয়তো নেতা ও শাসকদেরকে ইসলাম ও মুসলমানের চরিত্রের উপর কাফেরদের প্রভাবের সত্যতা অস্বীকার করতে দেখবেন। কিন্তু বাস্তব সত্য হল, কোন মুসলিম দেশের শাসক এই সত্য বলার সাহস রাখেনা যে, অমুসলিম বিশেষজ্ঞদের আগমনের ফলে আমাদের উম্মাহর ওপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়েছে।

আমরা যদি আমাদের দীনকে ইজ্জত ও গৌরবের বিষয় মনে করি, আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ব্যাপারে আগ্রহী হই, আমাদের দায়িত্ব ও পয়গামের মহানুভবতা উপলব্ধি করি এবং আমাদের ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই, তাহলে আমরা নীতির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী হব, প্রভাবিত নয়; শিক্ষক হব, অনুসরণকারী ছাত্র হব না; পরিকল্পনাকারী প্রধান ব্যক্তি ও নেতা হব, লেজুড়বৃত্তি করবো না। আল্লাহ আমাদেরকে যে সম্মান ও ইজ্জতের পোষাকে ভূষিত করেছেন তা আমরা কখনও খুলে ফেলতে রাজী হব না এবং যে আদর্শ ও নীতিমালার ভিত্তিতে আল্লাহ আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ বানিয়েছেন সে ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবো না। তিনি আমাদেরকে এর বদৌলতে শিক্ষক ও নেতৃত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেছেন,

"আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উত্তম উম্মাহ হিসেবে সৃষ্টি করেছি যেন তোমরা লোকদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পার এবং রাসূলও (সা) তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবেন। (সূরা আল বাকারাহ : ১৪৩)

৫. আমদানীকৃত এবং দুর্বল, পরাজিত ও অন্ধ অনুসারীদের ষড়যন্ত্রের ফলে সৃষ্ট সামাজিক ভাংগনও এর অন্যতম কারণ হতে পারে। তারা সবাই জীবন থেকে দীনকে, কাজ ও আচরণ থেকে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসকে, পিতা থেকে সন্তানকে এবং বর্তমান বংশধরকে পূর্বপুরুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে কাজ করছে। আপনি এই বিচ্ছিন্নতার বিষফল দেখতে পাবেন পিতার প্রতি সন্তানের খারাপ মনোভাব, মায়ের প্রতি মেয়ের গাল-মন্দ থেকে। প্রত্যেক পরিবারে সন্তানররা মাতাপিতার জন্য কিছু শব্দকে পবিত্র বলে বিবেচনা করে। সেগুলো হচ্ছে, প্রতিক্রিয়াশীলতা, গোঁড়ামী, স্থবিরতা ইত্যাদি। এর দ্বারা প্রমাণ মিলে যে,

www.amarboi.org

দুশমনরা আমাদের পবিত্র জিনিস ও মূল্যবোধকে আমাদের নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও ছেলে-মেয়েদের অন্তর থেকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে।

আপনি এর আরও প্রমাণ পাবেন। দেখা যাবে মা সমস্ত শরীর ঢেকে পোষাক পরেছে। তারই পাশাপাশি তার মেয়ে দুই উরু, বুক ও হাত উলঙ্গ রেখে আঁটসাট পোষাক পরছে। এতে তার কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও লজ্জা-শরম কিংবা দীনদারীর পরোয়া নেই। এই পরিস্থিতির পেছনে রয়েছে এক নির্মম বাস্তবতা। বাহ্যিক দৃশ্য আভ্যন্তরীণ ধ্বংসের ইঙ্গিত দেয়। অবশিষ্ট বিষয়গুলোও একইভাবে বিবেচনা করতে হবে।

আমি বলেছি, উপরে বর্ণিত কারণগুলোর যে কোন একটা কারণ আমাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় ভ্রাতৃত্ব-ভালবাসা, সহযোগিতা, বন্ধন, আত্মীয়তা, প্রতিবেশীর সম্মান, অনাথ-ইয়াতীমের দায়িত্ব পালন এবং অসহায় বিধবাদের সেবা-যত্নকে নিঃশেষ করে দিয়েছে কিংবা সবগুলো কারণ সামষ্টিকভাবে মুসলিম সমাজকে অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করেছে এবং সেগুলোর বিষফল সমাজকে বিষাক্ত করে তুলেছে। অথবা, এগুলো সহ অন্য কোন কারণ বা আংশিক কারণের ফলে সমাজে ঐ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কিংবা কোন দেশের জন্য উল্লেখিত বিশেষ কোন কারণ এবং অন্য দেশের সকল কারণ কম-বেশী প্রভাব বিস্তার করে থাকবে।

আমাদের সামাজিক সমস্যা ও সংকট সম্পর্কে এটা হচ্ছে আমার চিন্তা-ভাবনা। এর ওপর ভিত্তি করে আমাদের দুশমনরা গর্ব সহকারে বলে থাকে; 'ইসলাম যদি উদ্ধারকারী হয়, তাহলে মুসলমানদেরকেই প্রথমে উদ্ধার করুক।'

তারা কি জানে যে, আজ ইসলাম ইয়াতীম? ইসলামের অনুসারীরা কারাগারে জিঞ্জিরাবদ্ধ। সকল দেশে তাদের ওপর আমদানী-রফতানীকারকদের জবর-দখলকারী তরবারী ঝুলছে। তারা আজ আপনজনদের কাছেও নবাগত এবং সুবিধাভোগীদের হাতে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) কতইনা উত্তম বলেছেন!

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبٰى لِلْغُرَبَاءِ مِنْ أُمَّتِيْ

অর্থ : ইসলাম নুতন আগন্তুকের মত আবির্ভূত হয়েছে এবং একইভাবে বিদায়ও নেবে। আমার উম্মাহর নুতন আগন্তুকদের জন্য রয়েছে শুভ সংবাদ। (মুসলিম)

www.amarboi.org

সামাজিক বিষয়ের উপর ইসলামের গুরুত্ব

আমরা যদি কোরআন ও হাদীসের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো, আকীদা-বিশ্বাসের পর সরাসরি বহু আয়াত ও হাদীসে এবং ইসলামী আইনের ইতিহাসে, সামাজিক বিষয়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা স্বীকৃত। আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতে বলেন,

"তুমি কি দেখনা যে ব্যক্তি দীনকে অস্বীকার করে? সেই ব্যক্তিই ইয়াতীমকে গলা ধাক্কা দেয় এবং ইয়াতীমের খাবারের বিষয়ে উৎসাহিত করে না। সেই নামাজীদের জন্য ধ্বংস, যারা নিজেদের নামাজের ব্যাপারে উদাসীন, যারা লোক দেখানো কাজ করে এবং মামুলী প্রয়োজনীয় জিনিস দানে বিরত থাকে।' (সূরা মাউন)

এটি মক্কী সূরা, মতান্তরে মাদানী সূরা। কারোর মতে, প্রথম তিন আয়াত মক্কী এবং অবশিষ্ট আয়াতগুলো মাদানী। প্রথম আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অনাথ-ইয়াতীমকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করে এবং অভাবের তাড়নায় আগত সাহায্যপ্রার্থীকে উপেক্ষা করে সেই ব্যক্তি কাফের এবং আল্লাহর হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার ও তাঁর সাথে সাক্ষাতকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। যদি সে আল্লাহর ওপর ঈমান রাখত এবং তাঁর পুরস্কার ও কিতাবকে বিশ্বাস করত তাহলে তার মন দয়ার সাগরে পরিণত হত এবং আল্লাহর শাস্তি ও ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য আগ্রহী হত। ফলে সে অনাথ ইয়াতীমের সম্মান করত এবং আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত থেকে অভাবী লোককে দান করত।

সূরার পরবর্তী আয়াতগুলোতে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ভালকাজ করলে চিরস্থায়ী ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

তাদের নামাজ ছিল লোক প্রদর্শনের জন্য। তারা অন্যদেরকে বুঝাতে চায় যে, তারা দীনের প্রধান নিদর্শন নামাজ আদায় করে। কেউ না দেখলে নামাজের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ে।

এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের আত্মিক মন্দ ও আভ্যন্তরীণ অন্ধকার প্রকাশ করে বলেছেন, তুমি তাদের সামাজিক জীবনে নামাজের কোন প্রভাব দেখতে পাবে না। বরং তাদের মধ্যে মন্দ আত্মার নির্দশনই দেখতে পাবে। কেননা, তারা অভাবী লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বিরত থাকে এবং

www.amarboi.org

ইসলামী আদর্শের দাবী অনুযায়ী তারা নিজেদের দীনি ভাইদের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতা ও সমবেদনার দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে না।

বিশুদ্ধ দীনি আকীদা-বিশ্বাস এবং বৈধ সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্যের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী সম্পর্ক আর কি হতে পারে? পৃথিবীতে মানুষের তৈরি কোন্ মতবাদে সামাজিক দয়া, মানবিক সহযোগিতা এবং পরোপকারকে মানুষের মূল্যায়ন ও প্রতিদানের ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে? তা একমাত্র ইসলাম। ইসলাম ছাড়া আর কোন জীবনাদর্শ মানুষের প্রতি সম্মান ও ইনসাফ প্রদর্শন করেনি এবং মানুষের সমাজে রহমতের বারিধারা বর্ষণ করেনি।

আল্লাহ তা'আলা হাশরের দিন বামহাতে আমলনামা লাভকারীদের দুর্ভাগ্য সম্পর্কে বলেন,– "তাকে ধর এবং বেড়ী পরাও, তারপর জাহান্নামে নিক্ষেপ কর, তারপর তাকে সত্তর গজ লম্বা শিকল পরাও, নিশ্চয়ই সে মহান আল্লাহর ওপর ঈমান আনেনি এবং মিসকীনের খাবারের জন্য উৎসাহিত করেনি।" (সূরা আল হাক্কাহ : ৩০-৩৪)

যাকে বিরাট ও ভারী শিকলে বেঁধে দোজখে নেয়া হয়েছে, তার উপর লজ্জা ও অপমানের সকল উপায়-উপকরণ প্রয়োগ করা হয়েছে? তার অপমানের ২টি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

১. সে আল্লাহর ওপর ঈমান-বিশ্বাস রাখেনি।

২. মিসকীন ও অভাবী লোকের খাবারের ব্যাপারে উৎসাহিত করেনি।

আল্লাহর ওপর ঈমান না আনা সবচাইতে বড় গুণাহ। যদি এর সাথে অন্য গুনাহ এসে যোগ হয়, তাহলে এর অবস্থাও কুফরী এবং ঈমান না আনার পর্যায়ে পড়ে। এখানে কুফরীর সাথে যে গুণাহটি যোগ হয়েছে সেটি হচ্ছে অভাবী-মিসকীনের খাবারের ব্যাপারে উৎসাহ না দেয়া। আল্লাহর শপথ, এটি বিরাট গুণাহ। কেননা, একদিকে উম্মাহর ধনী অংশ পেটপুরে খাচ্ছে এবং রকমারি সুস্বাদু জিনিসের মজা লুটছে, অপরদিকে মাত্র কয়েক কদম দূরেই অভাবী-মিসকীনের পেট অভাবের জ্বালায় জ্বলছে, তদারককারীর অভাবে ইয়াতিম-অনাথ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে, ফকির ছেঁড়া কাপড় দিয়ে নিজের সতর ঢাকার কসরত করছে। বিধবা নারী স্বামী হারিয়ে চোখের পানিতে বুক ভাসাচ্ছে, দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীর সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং নিজ মানবতার হেফাজতের জন্য আড় চোখে কোন সুহৃদ ব্যক্তির অপেক্ষায় আছে। আর ঠিক তখনই কোন নেকড়ে তাকে ধ্বংস করার জন্য হিংস্র থাবা বিস্তার করছে।

www.amarboi.org

আমলের বিনিময়ে কি প্রতিদানের কথা বলা হয়নি? যারা প্রাচুর্যের কারণে ভুঁড়িভোজ ও অপচয় করে নিজেদের পাশবিক প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করল, তাদেরই পাশাপাশি আরেক দল লোক ভূখা-নাঙ্গা ও দুঃখ-মসীবতের মধ্যে ডুবে রইল, তারা কি তাদের দীনি ও জাতীয় ভাই নয়? তারা কি আল্লাহর পক্ষ থেকে এই ন্যায্য বিচার ও শাস্তি পাওয়ার যোগ্য নয়? তারা মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে। তাই আল্লাহও তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবেন। আল্লাহ তাদের ওপর বিন্দুমাত্রও জুলুম করেননি, তারাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে। যে যে রকম চাষ করবে সে সে রকম ফসল পাবে।

আপনি কি এই আয়াতের বাচনভঙ্গীও বর্ণনাশৈলী দেখে সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে কোরআনের সৌন্দর্য উপলব্ধি করবেন না? কোরআন সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্যকে ঈমানের মর্যাদার স্তরে উন্নীত করেছে। অনুরূপভাবে ঈমান না আনাকে মানব সমাজের দুর্ভাগ্য হিসেবে চিহি ত করেছে। এই বিষয়টি সচেতন মোমিনের নিন্দায় গোমরাহ ও মিথ্যাবাদীদের সকল দাবী নস্যাত করে দিয়েছে, যারা দীনকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, সমাজে নিজেদেরকে দয়া ও করুণার দূত এবং সংস্কারবাদী বলে দাবী করছে, তাদের ব্যর্থতার কারণ বুঝতে সাহায্য করেছে। মূলতঃ তাদের সকল শ্লোগান ঝরে পড়েছে এবং তারা নিজ জাতির দুর্ভাগ্যের জন্য শয়তানের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত। বাস্তব অবস্থাই এর উত্তম সাক্ষী। আপনি জাতিকে জিজ্ঞেস করুন, তারা নিজ কষ্টের কথা খুলে বলবে, আপনি তাদের অবস্থা ও দাবীর অসারতা সম্পর্কে গভীরভাবে খতিয়ে দেখলে দেখতে পাবেন ব্যাংকসমূহে শোষক, সুবিধাভোগী ও ব্যবসায়ীরা জাতির দুঃখ কষ্টের ওপর নিজেদের পুঁজির স্তূপ গড়ে তুলেছে। এই সব কিছুই সামাজিক দুর্ভাগ্য। কেননা, ঈমান তাদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে এবং তাদেরকে সংস্কারের রাস্তা থেকে ঠেলে দিয়েছে।

আল্লাহ বলেন,– "অতঃপর সে দীনের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। আপনি জানেন, সে ঘাঁটিটি কি? আর তা হচ্ছে, দাসমুক্ত করা, অভাবের সময় খাবার দান করা ইয়াতীম আত্মীয়কে কিংবা ধূলা ধুসরিত মিসকীনকে। তারপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে সবর ও দয়ার উপদেশ দেয়। তারাই সৌভাগ্যশালী।" (সূরা আল বালাদ : ১১-১৮)

আমরা এ আয়াতে দেখতে পাই, কোরআন মজীদ মানুষকে রাস্তার সর্বাধিক বিপজ্জনক বাধা সম্পর্কে সতর্ক করেছে। যা তার জন্য নেয়ামত, ক্ষমা ও দয়ার পথে অন্তরায়। সেই সর্বাধিক বিপজ্জনক বাধাটি হচ্ছে কুফরী। যুক্তিসঙ্গত

www.amarboi.org

কারণেই কোরআন মুক্তির পথ ও সেই বাধা অতিক্রম করার কথাটিও বলেছে। তবে কোরআন এখানে ঈমান সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেনি। কেননা, এটা জানা বিষয় যে আল্লাহ ঈমান ছাড়া কারুর কিছু কবুল করবেন না। ঈমানের আগে অন্য বিষয়ের আলোচনা এ অনুভূতি সৃষ্টি করে যে, মুক্তির উপায় হিসেবে অন্য যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা লাভ করার জন্য চেষ্টা করা জরুরী, যেমন করে আমরা ঈমানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করি।

উল্লেখ করা হয়েছে, মুক্তির কারণ ও উপায় হচ্ছে, গোলাম মুক্তি বা মানুষের মালিকানা থেকে মানুষকে মুক্ত করা অথবা 'ক্ষুধার্ত দিনে' ভূখা-নাঙ্গা ইয়াতীম এবং ধুলায় ধুসরিত অভাবী মানুষকে খাবার দান করা।

কোরআনের আয়াতে পাঠকের জন্য রয়েছে আইনের সর্বোত্তম বর্ণনা। আর তা হচ্ছে,

১. 'তীব্র ক্ষুধা ও জঠর জ্বালার কঠোর দিন' বলা হয়েছে। সাধারণতঃ দিনকে ক্ষুধার্ত বলা হয় না। দিনে যে ব্যক্তি ক্ষুধার কষ্ট পায় সে লোককেই ক্ষুধার্ত বলা হয়। কিন্তু কোরআনের বর্ণনা আপনাকে বলছে, যে দিবসে ক্ষুধার্তকে পাওয়া যাবে সেটিই ক্ষুধার্ত দিবস। যেন ঐ দিবসের মধ্যে ক্ষুধা ও বুভুক্ষার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নেই। মনে হয়, ব্যাংকে স্তূপীকৃত অর্থের কোন অস্তিত্ব নেই। খাবার ও পানপাত্র যেন আজ খাবার ও পানীয় শূন্য। মনে হয়, সূর্য উদিত হয়েছে, জীবন যাত্রার প্রবাহ চলছে, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ, আসমান ও জমীনসহ সময়ের আবর্তে ঘূর্ণায়মান সকল কিছুই যেন ক্ষুধার্ত এবং হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম। সবই মানুষের অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। কেননা জমীনে ক্ষুধার্ত ইয়াতীম ও অভাবী গরীব রয়েছে। আপনি কি এ উপলব্ধির সাথে একমত?

২. এ আয়াতসহ অন্যান্য আয়াতে কোরআন মানুষকে মানুষের দাসত্বের শৃংখল ও মালিকানা থেকে মুক্ত করাকে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য ঘোষণা করেছে এবং যারা মানুষকে দাস বানায় আল্লাহ তাদের ওপর অত্যন্ত রাগান্বিত।

৩. মালিকানাধীন গোলামের বিষয়ে উল্লেখ করার পর ইয়াতীম মিসকীনের প্রসঙ্গ আলোচনা করায় ২টি বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়েছে। কোরআন ছাড়া আর কোথাও এমন বর্ণনাভঙ্গী পাওয়া যাবে না। এটা কোরআনের অলৌকিকত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়! কেননা, ইয়াতীমত্ব বা পিতৃহীনতা জালেম অভিভাবকদের শোষনের কারণে এক ধরনের দুর্বলতা হিসেবে পরিগণিত। তারা নিজেদের অধীন ইয়াতীমকে কম কষ্ট দেয় না। অনুরূপ আরেক দল হচ্ছে,

www.amarboi.org

মিসকীন ও অভাবী মানুষের মিছিল। তাদের জীবন সংকীর্ণ। ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন মহিলার অবস্থাও করুণ। অপরদিকে রয়েছে সেই সকল দুর্বল ও অসহায় শিশু যারা হেমন্তের পাতার মত গাছ থেকে ঝরে পড়ছে। চেহারা হলুদ হয়ে গেছে এবং রোগ-শোকে জীর্ণশীর্ণ। তাদের চারপাশে ধন-সম্পদ ও অর্থের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। গোটা দুনিয়া সবটাই যেন সেই অভাবী মিসকীন ও তার পরিবারের জন্য বন্দীশালা।

৪. এরপরই আসে ঈমানের প্রসঙ্গ, যাতে করে আমল ও সামাজিক সাহায্যের দরজা খোলা যায় এবং সেই সকল আমল ও সাহায্য আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন, দুর্বল, গোলাম ও বঞ্চিত লোকের মুক্তির উপায় হচ্ছে ঈমান। সেজন্য কোরআন মোমেনদেরকে আকাংখিত সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য পরিশ্রমের উদ্দেশ্যে সবর ও ধৈর্যের আহ্বান জানিয়েছে। যাতে করে সমাজের এক শ্রেণী আরেক শ্রেণীর ওপর জুলুম না করে এবং যার ভিত্তিতে সঠিক ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

৫. যারা ঈমান আনে এবং ধৈর্য ও দয়ার উপদেশ দান করে তারাই সৌভাগ্যশালী। কোরআন এই আয়াতে- وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.

'পরস্পর পরস্পরকে ধৈর্য ও দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয়।' (সূরা আল-বালাদ : ১৭) বলেছে কিন্তু... وَرَحِمُوْا صَبَرُوْا বলেনি। কেননা, কোরআনের উদ্দেশ্য হল, ধৈর্য ও দয়া যেন মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক সামাজিক চরিত্রের রূপ নেয়। এমন যেন না হয় যে, صَبَرُوْا وَرَحِمُوْا (ধৈর্য ধারণ করে ও দয়া করে) কিছু লোক শুধু ধৈর্য ও দয়া প্রদর্শন করবে, আর অন্যরা তা করবে না। বরং সবাই সবাই ধৈর্য ধারণ ও দয়ার উপদেশের ফরজ দায়িত্ব পালন করবে। যার ফলে সকল লেন-দেন, নীতি ও আচরণে ইসলামী পরিবেশ কানায় কানায় ভরে উঠবে।

আল্লাহ মানুষকে ঈমান দ্বারা সুসজ্জিত করা এবং তাঁর সাথে পরিচয় ও সম্পর্ক বর্ণনার আগে তাদের যে বিশেষ চরিত্র এবং ঈমান থেকে উপকৃত হওয়া এবং ঈমানের আলো ও কল্যাণ থেকে ফায়দা লাভ করার পর আল্লাহর সাথে সৃষ্ট বিশুদ্ধ সম্পর্কের বিষয়ে নিম্নোক্ত চিত্র তুলে ধরেছেন,

'মানুষকে ভীরু হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। ক্ষতি ও অনিষ্টের সম্মুখীন হলে সে হায়-হুতাশ করে, আর ভাল ও কল্যাণ লাভ করলে সে কৃপণ হয়ে যায়। তবে ঐ সকল নামাজী স্বতন্ত্র যারা নামাজ পড়ে ও স্থায়ীভাবে এর উপর অটল থাকে; যাদের ধন-সম্পদে প্রার্থনাকারী ভিক্ষুক ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার রয়েছে, যারা

www.amarboi.org

কেয়ামতের প্রতিফল দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং যারা নিজ পরোয়ারদেগারের আজাবের ভয়ে ভীত-প্রকম্পিত থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহর আজাব থেকে আশংকামুক্ত থাকা যায় না। যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে হেফাজত করে, তবে তারা যৌন আচরণের বেলায় নিজ স্ত্রী ও দাসীর ক্ষেত্রে তিরস্কৃত হবে না। যারা এদেরকে ছাড়া অন্যদের ব্যাপারে যৌনকামনা চরিতার্থ করে তারাই সীমালংঘনকারী; যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, যারা নিজেদের সাক্ষ্যদানে সরল-নিষ্ঠাবান এবং যারা নিজেদের নামাজের ব্যাপারে যত্নবান তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে।' (সূরা আল-মাআরিজ ১৯-৩৫)

আপনি দেখতে পেয়েছেন কি, মানুষকে পরিশুদ্ধ করার আগে ও পরের অবস্থাটা কি ধরনের?

মানুষকে পরিশুদ্ধ করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান ও উত্তম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আগে তারা ছিল ভীরু। এ ভীরুতার ব্যাখ্যা দিয়ে আল্লাহ বলেছেন, বিপদ ও অনিষ্ট আসলে তারা পেরেশান ও রাগান্বিত হয়ে পড়ে। যখন ভাল ও কল্যাণ লাভ করে তখন তারা কার্পণ্য করে এবং সমাজের অভাবী ও বঞ্চিত মানুষকে দান করা থেকে বিরত থাকে। কোন মানব সমাজ এ অবস্থা থেকে কখনও মুক্ত নয়। পক্ষান্তরে, ঈমানের কারণে তার অনুভূতি যখন চাঙ্গা হয় এবং সে যখন মোমেনের সারিতে দণ্ডায়মান হয় তখন সমাজে তার অবস্থা হয় ভিন্নধর্মী। সে হয় দাতা, অভাবী প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতদের প্রতি রহমদিল। কোন কর্তব্যে ত্রুটি করলে সে আল্লাহর আজাবের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। সে নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, হাত ও মুখের পবিত্রতা রক্ষা করে এবং সমাজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে। সে আমানতের খেয়ানত করে না, কোন চুক্তি ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করে না এবং সাক্ষ্যদানের সময় মিথ্যা বলে না ও সত্যকে গোপন রাখে না।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, উপরোক্ত আয়াতে কেয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান-বিশ্বাস ও নামাজ ছাড়া অবশিষ্ট সকল কাজ হচ্ছে সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট, অন্যের উপকারার্থে ত্যাগ স্বীকার এবং তাদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ও একনিষ্ঠ থাকার কথাই সেগুলোর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

কোরআনের মক্কী সূরাগুলোতে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বলিত আরও বহু আয়াত আছে। সূরা আনআমের ১৫১-১৫৩ আয়াতে রয়েছে। 'আপনি বলুন, এসো, আমি তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক যে সব জিনিস হারাম করেছেন সেগুলো পাঠ করে শুনাই। সেগুলো হচ্ছে, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার

www.amarboi.org

করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, নিজ সন্তানদের অভাবের কারণে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে এবং তাদেকে রিজক দেই, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা ও নির্লজ্যতার কাছেও যেয়ো না, যাকে হত্যা করা আল্লাহ্ হারাম করেছেন তাকে হত্যা করো না, তবে ন্যায়সঙ্গতভাবে হত্যা করতে পারবে। তোমাদেরকে এই নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যেন তোমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পার। ইয়াতীমের ধন-সম্পদের কাছেও যেয়ো না, কিন্তু তারা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তম পন্থায় (তাদের সম্পদ হেফাজত কর) ন্যায় ও ইনসাফ সহকারে ওজন ও মাপ পূর্ণ কর। আমি কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেই না। তোমরা যখন কথা বল, তখন সুবিচার কর, যদি সে আত্মীয়ও হয়। আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর। তোমাদেরকে আল্লাহ্ এ নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।'

সূরা আরাফের ১৯৯ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, 'আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ জাহেলদের থেকে দূরে সরে থাক।'

সূরা আল ফোরক্কানের ৬৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, '(আল্লাহ্) রহমানের বান্দাহ তারাই যারা পৃথিবীতে নরমভাবে চলাফেরা করে...' (সূরার শেষ পর্যন্ত)।

সূরা ইসরায় (বনী ইসরাঈল) আল্লাহ ২২-৩৮ নং আয়াতে সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অনেক আদেশ দিয়েছেন। ১৭টি আয়াতের মধ্যে ১৫টিই হচ্ছে সামাজিক উপদেশ। অন্য দুটি উপদেশ হল, আল্লাহর সাথে শিরক না করা এবং কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই ইবাদত করা। এই দুটি উপদেশ অন্যান্য সকল উপদেশের ভিত্তি।

লক্ষণীয় বিষয় হল, অধিকাংশ উপদেশই মক্কী জীবনে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন মোমেনের মনে ইসলামী আকীদাকে মজবুত করে দেয়ার পর্যায় অতিবাহিত হচ্ছিল। মক্কী জীবন হচ্ছে ইসলামী ইমারতের সূচনা যার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে মাদানী জিন্দেগীতে অবশিষ্ট আইন-কানুন অবতীর্ণ হয়েছে। এটা দ্বারা একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মক্কায় অবতীর্ণ ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, তাওহীদ, অদৃশ্যের ঈমান, হাশর ও প্রতিদানের বিষয়ে ঈমানের সাথে ইসলামের সামাজিক আইন এবং সামাজিক দয়ার ভিত্তির ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। যে কোন পাঠক হাদীস এবং ফেকাহর কিতাব উল্টালেই দেখতে পাবেন সেগুলোর বিরাট অংশ সামাজিক বিষয়াদি, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছে।

www.amarboi.org

অনুরূপভাবে তিনি সেগুলোতে ইসলামের সামাজিক আইনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবেন। যারা ইসলাম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে না তাদের কথা ভিন্ন। এই বইতে আমি ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক জীবনের বিস্তারিত একটি চিত্র ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করবো। এখন আমি নমুনা হিসেবে কিছু হাদীস উল্লেখ করবো।

আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরশাদ করেন,

اَلْـمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ـ

'এক মোমেন আরেক মোমেনের জন্য ইমারতস্বরূপ, যার একাংশ অন্য অংশকে সুদৃঢ় করে।' (বোখারী ও মুসলিম)

জারীর বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَنْ لاَ يَرْحَمِ النَّاسَ لاَ يَرْحَمْهُ اللهُ ـ

'যে ব্যক্তি মানুষের ওপর দয়া করে না আল্লাহও তার ওপর দয়া করেন না।' (বোখারী ও মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لاَتَحَاسَدُوْا وَلاَتَنَاجَشُوْا وَلاَتَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُوْنُوْاعِبَادَ اللهِ اِخْوَانًا اَلْمُسْلِمُ اَخُوا الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَيَحْقِرُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ التَّقْوٰى هٰهُنَا وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهٖ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الـمُسلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حِرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ـ

'তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের দামের উপর মূল্যবৃদ্ধি করো না, ঘৃণা ও বৈরীভাব পোষণ করো না, শত্রুতা করো না, একজন আরেকজনের বিক্রির ওপর বিক্রি করো না, তোমরা আল্লাহর বান্দাহরা ভাই হয়ে যাও। মুসলমান মুসলমানের ভাই। এক মুসলিম ভাই আরেক ভাই এর উপর জুলুম করবে না এবং অন্য ভাইকে ঘৃণা ও লাঞ্চিত করবে না। তাকওয়া হচ্ছে এখানে। একথা বলে তিনি নিজের বুকের দিকে তিনবার ইঙ্গিত করেন। কোন মুসলমানের খারাপ হওয়ার জন্য অন্য মুসলিম ভাইকে ঘৃণা করাই যথেষ্ট। সকল

www.amarboi.org

মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জান-মাল ও ইজ্জত-সম্মানকে হারাম করা হয়েছে।' (মুসলিম)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبُّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

'তোমাদের কেউ সেই পর্যন্ত মোমেন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না নিজের জন্য যা পছন্দ কর, তা নিজ ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করবে।' (বোখারী ও মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَن نَفَّسَ عَنْ مُؤمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ-

'যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন মোমেন-মুসলমানের একটি বিপদ দূর করে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটি বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন দুঃখীর দুঃখ-কষ্ট দূর করে আল্লাহ দুনিয়া ও পরকালে তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করে আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আল্লাহ বান্দাহকে সেই পর্যন্ত সাহায্য করতে থাকেন, যে পর্যন্ত বান্দাহ নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে।' (মুসলিম)

আমরা এই বইতে সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য ও শিষ্টাচার সম্পর্কিত আলোচনার মাধ্যমে দেখতে পাবো, ইসলামের সামাজিক দিকটিও নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ্জ, কোরআন পাঠ, জিক্‌র এবং তাহাজ্জুদের নামাজের মতই অন্যতম ইবাদত। বরং এর কোন কোনটা স্বাভাবিক ইবাদতের চাইতেও বেশী সওয়াবের যোগ্য।

আশা করি আমার সাথে একমত হবেন যে, সালাম দেয়া ইবাদত, রোগীর সেবা ইবাদত, মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য যাওয়া ইবাদত, মুসলিম ভাইয়ের প্রতি হাঁসিমুখ প্রদর্শন সদকাহ, ভাল কথা সদকাহ, ভাইয়ের সাথে হাত মিলানো সদকাহ, ইয়াতীমের মাথা স্পর্শ করা ইবাদত, আত্মীয়তার অধিকার

www.amarboi.org

রক্ষা করা ইবাদত, মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার এবাদত, বিপদগ্রস্ত লোকের সাহায্য করা ইবাদত, পেশাব-পায়খানা করা ইবাদত, অভাবী লোকের সাহায্য করা ইবাদত কিংবা তার পক্ষে যা বহন করা কষ্টকর তার অংশ বিশেষ বহন করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

সারকথা হল, শরীয়তের সমর্থিত যে কোন কাজ যা মানুষ ও প্রাণীর জন্য উপকারী, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তা করার নামই ইবাদত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সকালে আপনি ফজরের সময় ঘর থেকে বের হওয়ার পর বিকেলে আসরের সময় ঘরে ফেরা পর্যন্ত পুরো সময়টাই ইবাদতের মধ্যে গণ্য হতে পারে। অথচ এসময় আপনি জোহর ছাড়া আর কোন নামাজ পড়েননি, হয়তো কোরআন তেলাওয়াত কিংবা জিহবা দ্বারা আল্লাহর জিকিরও করেননি। এটা সৌভাগ্যের বিষয় এবং আল্লাহর সাথে ব্যবসা। আর এই মহান জিনিস থেকেই বহু লোক উদাসীন এবং এর কল্যাণ ও উপকারিতা থেকে রয়েছে বঞ্চিত।

আপনি যদি ইসলামের প্রধান ৪টি খুটি অর্থাৎ নামাজ, যাকাত, রোজা ও হজ্জ সম্পর্কে গবেষণা করেন তাহলে আপনি এর কল্যাণ ও উপকারিতা দু'ভাগে বিভক্ত দেখতে পাবেন। এক ভাগ হচ্ছে, ব্যক্তিগত উপকারিতা। আর ২য় ভাগ হচ্ছে, সামষ্টিক উপকারিতা। যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত হাদীসটি পাঠ করবে সে মুসলমানের সামাজিক জীবনের গুরুত্ব সম্পর্কে ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারবে।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اَتَدْرُوْنَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟ قَالُوْا: اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ يَّاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَاْتِىْ وَقَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَاَكَلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطٰى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُّقْضٰى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ -

'তোমরা জান গরীব কে? সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি গরীব যার কোন অর্থ-সম্পদ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে সেই ব্যক্তি গরীব যে হাশরের দিন নামাজ, রোজা ও যাকাত সহকারে উপস্থিত হবে সত্য, কিন্তু সে একে গালি দিয়েছে, ওকে যেনার অপবাদ দিয়েছে, এর অর্থ-

www.amarboi.org

সম্পদ খেয়েছে, ওর রক্ত প্রবাহিত করেছে, ওকে মেরেছে। ফলে ঐ সমস্ত লোকদেরকে তার নেকী দিয়ে দেয়া হবে। দায় শোধের আগে তার নেকী শেষ হয়ে গেলে তার উপর তাদের গুনাহ্ চাপিয়ে দেয়া হবে। তারপর তাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।' (মুসলিম)

আপনি কি ঐ আবেদকে দেখতে পাচ্ছেন না, যে নামাজ, রোযা, সাদকাহ ইত্যাদির গর্বে গর্বিত এবং যে অজ্ঞতার কারণে বুঝে বসে আছে যে, ইবাদতের মাত্র দিক একটি এবং তা হচ্ছে, আল্লাহর গুণ-কীর্তন ও পবিত্রতা বর্ণনা করা? ফলে সে আল্লাহর বান্দাহর অধিকারের প্রতি যত্নবান হয়নি। ছোটদেরকে স্নেহ করেনি এবং বড়দেরকে সম্মান করেনি। তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। সে নিজ অজ্ঞতা, ধোঁকা ও গর্ব-অহংকারের কারণে দোজখে প্রবেশ করবে। তার এ বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া দরকার যে, একজন মহিলা শুধু এই কারণে দোজখে গেছে যে, সে একটি বিড়ালকে আটকে রেখেছিল এবং তাকে কোন খাবার দেয়নি কিংবা খাবার খুঁজে খাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রেখেছিল। অপরদিকে আরেক বেশ্যা মহিলা শুধু এই কারণে জান্নাতবাসিনী হয়েছে যে, সে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পিপাসায় কাতর দেখে দয়াবশত: পানি পান করিয়েছে। ফলে আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দিয়েছেন। তাহলে, সৃষ্টির সেরা মানুষ কি সর্বাধিক দয়া পাওয়ার যোগ্য নয়?

অস্থির চিত্তের অধিকারী লোকেরা যদি কোন পাপী লোককে দেখে গালি-গালাজ না করে কিংবা কুফরীর ফতোয়া না দিয়ে অথবা না জেনে না শুনে বান্দাহদের মধ্যে বেহেশত-দোজখ বন্টন না করে বরং নিজেদের মধ্যে দয়ার অভাব অনুভব করত এবং আত্মপ্রবঞ্চনা ও অজ্ঞতা বুঝতে পারত তাহলে সেটাই ভাল হত। কেননা, এগুলো নিজের জন্যই সর্বাধিক ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক জিনিস। সে অন্যদের খারাপ পরিণতির ব্যাপারে যে ধারণা করছে তা তার নিজের জন্য আরও বেশী ক্ষতিকর পরিণাম বয়ে আনবে। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) কতই না সত্য বলে গেছেন!

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ -

'আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের বুঝ-জ্ঞান দান করেন।'

এখানে يُفَقِّهْهُ বলতে বুঝানো হয়েছে ইসলামী শরীয়াহ সম্পর্কে সূক্ষ্ম ও দক্ষভাবে জ্ঞান অর্জন করা। تَفَقُّهٌ শব্দটি تَعَلُّمٌ শব্দ থেকে ভিন্ন অর্থবোধক।

www.amarboi.org

تَعَلُّمٌ মানে 'শিখা'। অনেক শিক্ষার্থীর تَفَقُّهٌ ফেকাহর অভাব বিদ্যমান। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা তিনি যেন আমাদেরকে সঠিক পথ দেখান।

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

বিভিন্ন ইসলামী দল পূর্ণ কর্মসূচী নিয়ে কাজ করা সত্ত্বেও এবং কোন সত্যিকার ও সাহসী আলেমের ডাকে বহু লোক জড় হওয়া সত্ত্বেও দেখা যায় প্রাচ্য-প্রাতীচ্যের সেনাবাহিনী, আভ্যন্তরীণ ও বাইরের শক্তিসহ বিভিন্ন শাসক ও নেতৃবৃন্দ এবং বহু ব্যক্তি ও সম্প্রদায় এর বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করে। তারা নিজেদের সকল শক্তি-সামর্থ্য, অস্ত্রশস্ত্র, প্রচারণা ও সন্ত্রাস ইসলামকে নির্মূল করার লক্ষ্যে নিয়োজিত করে এবং আল্লাহর রহমত ও দয়াকে জমীন থেকে মিটিয়ে দিতে চায়। ইসলামের দুশমনরা কেন তা করে?

উত্তর : ইসলাম তার আগের আসল চেহারায় বিজয়ী হলে সকল মূর্তি–প্রতিমাকে মানুষের মন থেকে উচ্ছেদ করবে, মানবীয় সকল কুসংস্কারের অবসান ঘটাবে, জমীনের সকল আইন এবং মাতাল ও বিদ্বেষী মগজ প্রসূত সকল কৃত্রিম মতবাদের ইতি টানবে, জাতির রক্ত শোষক জালেম শাসক শ্রেণীর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে এবং তাদেরকে প্রজাদের সামনে সকল মর্যাদা থেকে মুক্ত করে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে, ইনশাআল্লাহ।

ইসলামের সামাজিক আচরণের উপর গুরুত্বের কারণ

১. প্রতিটি মানুষ স্থিতিশীল জীবনের কারণ অনুসন্ধান করে, যাতে খুশী ও আনন্দ, নিরাপত্তা ও আত্মনির্ভরশীলতা,বিশুদ্ধ ও সুন্দর পরিবেশ এবং উত্তম অবস্থার নিশ্চয়তা রয়েছে। আল্লাহ এটাকে তাদের ঈমান ও নেক আমলের লক্ষ্যের বিনিময় হিসেবে দান করেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

www.amarboi.org

'মোমেন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে নেক আমল করবে আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করবো এবং তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের বিনিময়ে পুরস্কার দেব।' (সূরা নাহল : ৯৭)

উম্মাহর মধ্যে এই পরিবেশ কখনও সৃষ্টি হতে পারে না যদি না প্রত্যেকেই নিজ ভাইয়ের প্রতি এবং নিজ দল, জাতি ও মানবতার প্রতি নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। যে জুলুম-অত্যাচার করে তার কাছে বিচার-ইনসাফ পাওয়া যাবে না, সন্ত্রাসী ও ভীতি রপ্তানীকারীর কাছে নিরাপত্তা পাওয়া যাবে না, অধিকার পূরণে অস্বীকারকারীর কাছে স্থিতিশীলতা ও সন্তুষ্টির অনুভূতি পাওয়া যাবে না। বরং নির্যাতিত ও বঞ্চিত অভাবী মানুষের করুন অবস্থা দেখে কেবল আফসুসই করতে হবে।

যদি ইসলামী জিন্দেগীর ভিত্তি হয় আল্লাহর প্রতি ভালবাসা, দয়া ও রহমত, মানবিক লেন-দেনের খুঁটি এবং যদি সকল প্রাণী ও কীট পতঙ্গ সহ সবাই ইনসাফের ছায়াতলে বাস করে, তাহলে সেটি হবে কতইনা উত্তম এবং তাই হচ্ছে ইসলাম।

২. মুসলিম উম্মাহ হচ্ছে সুস্থ্য আকীদা বিশ্বাসের অধিকারী, নিয়মিত কাজ ও বিশুদ্ধ আচরণকারী। তারা এই বিশ্বের দেহে শোভাবর্ধনকারী, অন্ধকারের নিমজ্জিত বিশ্বে উজ্জ্বল আলো এবং অনুর্বর মরুভূমিতে সবুজ বৃক্ষস্বরূপ। তাই এই উম্মাহর জন্য এমন কাঠামো প্রয়োজন যা তার ঐক্যের হেফাজত করবে, ভিত্তি মজবুত করবে, একে শক্তিশালী করবে এবং সৌভাগ্য ও প্রশান্তির উপায় সরবরাহ করবে। অনুরূপভাবে এই উম্মাহর এমন আভ্যন্তরীণ শক্তি দরকার যা তাকে দুশমন থেকে রক্ষা করবে, চারপাশের হিংস্র বাঘ থেকে হেফাজত করবে, নিজ সামর্থ ও ব্যক্তিত্বের নিশ্চয়তা দেবে এবং তাদেরকে খতম করতে আগ্রহী শক্তিকে দুর্বল করবে। এই উম্মাহ অভ্যন্তরীন দিক থেকে সুসংহত ও শক্তিশালী না হলে শত্রুর সামনে শৌর্যবীর্য ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে পরিগণিত হতে পারবে না।

তাই ইসলামী সমাজের ইমারতই কেবলমাত্র এই উম্মাহকে অভ্যন্তরীণ দিক থেকে সৌভাগ্যশালী এবং শত্রুর কাছে আতংকের বিষয়ে পরিগণিত করতে পারে। আমরা যদি সঠিক আকীদা-বিশ্বাস এবং বিশুদ্ধ ইবাদতের উপর ভিত্তিশীল সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনে অবহেলা করি তাহলে, আমরা অন্তরে প্রাচুর্য অনুভব করবো না এবং না আল্লাহর কাছে কোন সাহায্যকারী পাবো। আল্লাহ যথার্থ বলেছেন,

www.amarboi.org

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ -

'আল্লাহ কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না জাতি নিজের ভাগ্য নিজে পরিবর্তন করে।' (সূরা রা'দ : ১১)

আপনি নিজ চোখে এই উম্মাহর অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ ও শাসকবর্গের একের পর এক পরাজয় দেখে আশ্চর্য হবেন। তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নষ্ট দলের হাতে সংঘটিত নিজের এবং উম্মাহর সম্মান বিধ্বংসী ঘটনায় হীনমন্যতা বোধ করে। অথচ তারা জানে যে, ইসলামই একমাত্র বিজয়ের পথ। কেননা, ব্যক্তি ও জাতির উপর ইসলামী নীতিমালার কার্যকর প্রভাব রয়েছে। তা সত্ত্বেও তারা বিরোধিতা ও অহংকার করে এবং মুসলিম উম্মাহকে উম্মাদ-মাতালের মত গভীর জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে।

আল্লাহ তাদের কল্যাণ চাইলে তারা আল্লাহর কিতাব এবং নবীর হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে, পারে জাতিকে আল্লাহ ও ভ্রাতৃত্বের উপর ঐক্যবদ্ধ করতে। আল্লাহর ঝান্ডাকে বুলন্দ করার কাজে সহযোগিতা করতে এবং নিজ উম্মাহকে অপমান ও হীনমন্যতা থেকে উদ্ধার করতে। ধরুন, যদি ধনীরা যাকাত সংগ্রহ ও গরীবের সেবার জন্য কমিটি গঠন করে, বিচার প্রতিষ্ঠা ও মজলুমের সাহায্যের জন্য যদি অন্য একটি কমিটি গঠন করে এবং যদি দুর্বল ও অসহায় মানুষের সেবার লক্ষ্যে অপর আরেকটি কমিটি গঠন করে তাহলে আল্লাহর কাছে তাদের অবস্থা ও মর্যাদা কি দাঁড়াবে? এ ছাড়াও তারা অন্যান্য অনেক শাসকের তুলনায় অধিকমাত্রায় জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

৩. প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তিত্ব উন্নত মানসিক গুণে পরিপূর্ণ সংবেদনশীল এবং বিবেকের এমন মাপকাঠির অধিকারী যা অন্য কোন জাতির মধ্যে নেই। কেননা, তা যে আল্লাহর কোরআন ও তাঁর রাসূল (সা) থেকে গৃহীত হয়েছে। মুসলমান ছাড়া কেউ কোরআনকে পবিত্র মনে করে না এবং মুহাম্মদ (সা) কে নবী মানে না। আমি এখানে মুসলমান বলতে বুঝাচ্ছি, বিশেষ ধরণের মুসলমান যারা মনতুষ্টি সহকারে ঈমান এনেছে, ভালভাবে নিজ দায়িত্ব উপলব্ধি করেছে এবং সন্তুষ্টি ও প্রশস্ত বক্ষ থেকে আমানতের বোঝা বহন করেছে। তারাই আল্লাহর বাণী ও দীনে হকের পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয় এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করে।

আল্লাহ বলেন,

www.amarboi.org

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ـ

'তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দেবে ও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।' (সূরা আলে ইমরান-১১০)

আল্লাহ পাক আরও বলেন,

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা সৎকাজের আহ্বান জানাবে, ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে, আর তারাই হবে সফলকাম।' (সূরা আলে ইমরান : ১০৪)

কোন জিনিসের প্রতি আহবানকারী সেই জিনিসের সৌন্দর্য ও প্রভাব, সেই কাজের মূল্য এবং তা ত্যাগ করার ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে পরিস্কার বর্ণনা করবে। ইসলামের দাওয়াতদানকারী অবশ্যই ইসলামের সামাজিক সুবিচার, দয়া, করুণা, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য সম্পর্কে আলোচনা করবেন। পক্ষান্তরে, দাওয়াতদানকারী নিজে যদি সেই জিনিষের ভাল আদর্শ ও মূর্ত প্রতীক না হন, নিজে ইসলামের সামাজিক কর্তব্য পালন এবং লোকজনের সাথে ইসলামী আচরণ না করেন তাহলে, লোকেরা তাঁকে এবং তাঁর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করবে। হ্যাঁ যদি তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা সমাজের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য, সুবিচার ও দয়ার বাস্তব নমুনা পেশ করেন তাহলে তাঁদের কাজ হবে সত্যের সাক্ষ্য, যার দিকে মানুষ আকৃষ্ট হবে। তবে কোন জালেম শাসকের অত্যাচার-নিপীড়ন, মোনাফিকের বিভ্রান্তি এবং সুযোগ সন্ধানীর পথভ্রষ্টতা মানুষকে এই দিকে আকৃষ্ট হতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

মক্কার সকল লোক নবুওয়তের পূর্বে মুহাম্মদ (সা) কে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী হিসেবে দেখেছে। তারা আরও দেখেছে যে, তিনি ছিলেন লোকদের প্রতি দয়ালু, দুঃস্থ মানুষের সহযোগী, অতিথিপরায়ণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় লোকদের সাহায্যকারী।

www.amarboi.org

শোআইব (আ) নিজ জাতিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'আর আমি চাইনা যে আমি তোমাদেরকে যে সব কাজ থেকে নিষেধ করি পরে নিজেই সে কাজে জড়িত হয়ে পড়ি। আমি তো যথাসাধ্য সংশোধন করতে চাই। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন কিছু করার তৌফিক আমার নেই।' (সূরা হূদ : ৮৮)

এখানে ২টি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

(১) লোকদেরকে লক্ষ্য করে কথা বলা। (২) মানুষের সাথে খারাপ আচরণ না করা। খারাপ আচরণ করলে ব্যক্তি ও তার আমলের ব্যাপারে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন না। অনুরূপভাবে, মানুষও সন্তুষ্ট হবে না।

আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ ـ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالاَ تَفْعَلُوْنَ ـ

'হে মোমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।' (সূরা আস সফ : ২, ৩)

৪. সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালন ও নিয়ম-নীতি রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের দাবী। কোন বুদ্ধিমান ও ভাল চরিত্রের অধিকারী মুসলমান অন্য কোন দীনি ভাইয়ের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে না, যদিও সে অপরাধী কিংবা পাপী হোক না কেন। এ কথাই আল্লাহ নিম্নের আয়াতে বলেছেন,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوابَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ـ

'মোমেনরা একে অপরের ভাই, তোমাদের ভাইদের মধ্যে সমঝোতা করে দাও, আল্লাহকে ভয় কর। তাহলে তোমাদের ওপর রহম করা হবে।' (সূরা হুজুরাত-১০)

অনুরূপ কোন মুসলামান অপর কোন মুসলমানের ওপর জুলুম করবে, কিংবা তার অধিকার পূরণে ত্রুটি করবে অথবা তার ভাগ্য বিপর্যস্ত করবে এবং অপর ভাইয়ের ক্ষতি করা সত্ত্বেও বিনা পেরেশানীতে রাত্রি যাপন করবে– একথা চিন্তাও করা যায় না। যারা ইয়াতীমের মাল-সম্পদ খায়, প্রতিবেশী, নিকটাত্মীয়, স্ত্রী ও মেয়ের সাথে সম্পর্ক খারাপ করে,যারা বেচা-কেনায় মিথ্যার আশ্রয় নেয়,লেন-দেনে

www.amarboi.org

ধোঁকাবাজী করে, যারা পেট পুরে খায় ও ঘুমায় এবং তার প্রতিবেশী উপুষ করে, যারা প্রাচুর্যের কারণে অসুস্থ্য এবং অন্যরা না খেয়ে কিংবা স্বল্প খাওয়ার কারণে অসুস্থ্য হয়, তাদের সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসের ভাষ্য পড়লে দেখা যায় যে, তারা ইসলামের গণ্ডি থেকে খারিজ, তাদের অপমান ও শাস্তির ফয়সালা জারী করা হয়েছে। হ্যাঁ, তওবাহ করলে মুক্তি পেতে পারে। এ ব্যাপারে কিছু প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে।

৫. আপনি বক্তৃতা, প্রবন্ধ, সন্ত্রাস, গ্রেফতার, জেল-জুলুম, নির্যাতন ও বিতাড়নের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের লাল আগ্রাসনকে থামাতে পারবেন না। বরং এগুলোর মাধ্যমে মুসলিম সমাজের বর্তমান ব্যবস্থা ও মতবাদের ব্যর্থতা অধিকতর প্রমাণিত হবে এবং লাল আগ্রাসনের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। যুব সমাজ এই বিধ্বংসী মারাত্মক মতবাদ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবে। এর জন্য দায়ী কে? দায়ী আমরা। পানি দিয়েই আগুন নিভানো উচিত, আমরা তা করিনি, বরং ফুঁ দিয়ে আগুন নিভানোর চেষ্টা করেছি। আমরা যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে নয় বরং চিৎকার ও বিকৃতি সাধনের মাধ্যমে প্রতিরক্ষার চেষ্টা করেছি।

আমাদের কর্তব্য হল, সুবিচার প্রতিষ্ঠা, দুর্বল ও অবহেলিত মানুষের যত্নের ব্যাপারে ইসলামের কর্মসূচী ও প্রচেষ্টা এবং সম্পদ, রাজনীতি ও সমাজে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামই যে যথেষ্ট তার প্রমাণ দেয়া। এটা যথেষ্ট নয় যে, আমরা কেবল চোখে ধূলা দেব, না দেখার মত ভান করে মাথা মাটিতে পুঁতে রাখব কিংবা না শুনার ভান করে কানে আংগুল দিয়ে রাখবো। সকল ভূখণ্ডে ও সকল মুসলিম দেশে বিপদের ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠেছে। আমাদের কি করা দরকার? বক্তৃতা, বিবৃতি এবং মুখের দীনদারীর অতিরিক্ত কিছু কি দরকার নয়? আমরা কাকে আহবান জানাবো এবং কার কানের কাছে চিৎকার করবো? আমরা কি বলতে থাকবো- হে জাতি! এই আমার উম্মাহ্ ও তোমাদের উম্মাহ! উম্মাহ্ আজ চীৎকার করে সাহায্য প্রার্থনা করছে। উম্মাহ্ মাটির নীচে তলিয়ে যাচ্ছে, শত্রুর পায়ের নীচে পিষ্ট হচ্ছে, শক্তিধরদের বেতের নীচে অবস্থান করছে। আমাদের কি কোন আশা-ভরসা আছে? কোন মুসলিম নেতা কি আমাদেরকে নেতৃত্ব দেবে? হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এমন এক ব্যক্তি পাঠাও যে আমাদেরকে হাত ধরে টেনে উদ্ধার করবে। জাতির যুবকরা ক্ষত-বিক্ষত, যুবতীরা পথভ্রষ্ট, শিশুদের ব্যাপারে কোন আশা-ভরসা নেই, তাদের কোন চরিত্র নেই। কেউ নেই, কিছু নেই। অথচ আল্লাহ বলেন,

www.amarboi.org

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ـ

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও রাসূলের আহবানে সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে সে কাজের প্রতি আহবান করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে তোমাদের জীবন।' (সূরা আনফাল : ২৪)

৬. সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করলে, অন্যের অধিকারের প্রতি গুরুত্ব না দিলে, মনকে আল্লাহর কাছে ভদ্র ও সুন্দরভাবে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে প্রস্তুত না করলে, যে নিষেধ করে তাকে দান করা, যে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা, যে দয়া করে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং যে ক্ষতি করে তাকে ক্ষমা করার জন্য আত্মাকে বিনীত ও নরম করে গড়ে না তুললে অর্থাৎ মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অধিকার ও দায়িত্ব পালন না করলে এবং মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির আগ্রহ না থাকলে তা সম্পর্ক ধ্বংস, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কাটা, শত্রুতার আগুন বিস্তার এবং সমাজকে বিস্ফোরিত করে ছাড়বে। যারা অন্যদের অধিকার পূরণে অবহেলা করে তারা মুসলিম সমাজের ধ্বংস, পতন ও দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। শুধু তাই নয়, এর ফলশ্রুতি স্বরূপ সমাজে সুবিচার, দয়া, অনুগ্রহ এবং ক্ষমার অভাবের দায় দায়িত্বও তাদেরকে বহন করতে হবে।

মুসলিম সমাজ ধ্বংস হলে, সমাজের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বিদায় নেবে এবং ইজ্জত-সম্মান বিলুপ্ত হবে। তারপর সমাজের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির বিদায়ের পর সম্পদ, ভূমি, দীন ও মানুষ সব কিছুই শেষ হবে। এ ক্ষেত্রে কোরআন এবং হাদীসের দলীল-প্রমাণ রয়েছে।

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহর রশিকে মজবুত করে আঁকড়ে ধর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। তারপর তিনি তা থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শন সমূহ প্রকাশ করেন– যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পার।' (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ ـ

www.amarboi.org

' তোমরা ঝগড়া-বিবাদ করো না, তাহলে ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি শেষ হয়ে যাবে।' (সূরা আনফাল-৪৬)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدْقَـةِ؟ قَـالُوْا بَلـى، قَالَ اِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَاِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ ـ

'আমি কি তোমাদেরকে নামাজ, রোযা এবং দান-সদকার মর্যাদার চাইতেও উত্তম মর্যাদার বিষয় অবহিত করবো? তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম) বললেন, 'হ্যাঁ। তিনি বললেন, সেটা হচ্ছে, নিজেদের মধ্যে সংশোধন প্রচেষ্টা। কেননা, নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ধ্বংসকারী।' (আবু দাউদ, তিরমিজী এটাকে বিশুদ্ধ হাদীস বলেছেন)

আমাদের বাস্তব জীবন একথার উত্তম সাক্ষী।

www.amarboi.org

সুস্থ সমাজ গঠনের মূলনীতি

আমার মতে, নিম্নোক্ত মূলনীতিসমূহকে গ্রহণ করলে সুস্থ্য ও শক্তিশালী সমাজ গঠন সম্ভব এবং তা অব্যাহতভাবে সচলই থাকবে। এমনকি মুসলমানরা সে সকল মূলনীতির সবগুলো কিংবা অংশ বিশেষের ব্যাপারে উদাসীন থাকলেও সমাজ শক্তিশালী থাকবে। তবে এ বিষয়ে যতটুকু ঘাটতি থাকবে মুসলিম সমাজেও ততটুকুই ঘাটতি হবে। মূলনীতিগুলো হচ্ছে,

১. দুর্বলতা ও ত্রুটিমুক্ত বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস।
২. আল্লাহর দীনের গভীর ও সঠিক বুঝ-জ্ঞান।
৩. আত্মা ও মনকে কলুষ মুক্ত করা এবং আভ্যন্তরীণ ব্যধির চিকিৎসা করা।
৪. সমাজের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য এবং সামাজিক আচরণ পদ্ধতি সঠিকভাবে জানা ও বুঝা, আর সে অনুযায়ী চলা ও কাজ করা।

আমরা এই চারটি মূলনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

প্রথম মূলনীতি : বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস

মানুষ প্রকৃতিগতভাবে ভাল হোক বা মন্দ হোক, ইনসাফকারী গবেষকের কাছে কোন সন্দেহ নেই যে, মানুষের কাছে সত্য দীন অনুপস্থিত থাকলে তার জীবন বিশৃংখল ও বিপর্যস্ত হতে বাধ্য এবং তার কাছে সত্যের মাপকাঠিও ভিন্ন ধরনের হবে যা শেষ পর্যন্ত স্ববিরোধিতার স্তরে পৌঁছে যায়। ভিন্ন ঐতিহ্য-প্রথা ও পরিবেশের কারণে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি ও ফয়সালা ভিন্নমুখী হয়ে যায়। সে এমন পর্যায়েও পৌছে যেতে পারে যে, তার বিরোধী লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিজের প্রিয় দৃষ্টিভঙ্গির ওপর টিকে থাকবে যদিও তার প্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি (?) বিরাট ভুল হোক না কেন। এই ব্যাপারে কোরআন শরীফ হচ্ছে সর্বাধিক বড় সত্যের উৎস যার উপর আমরা নির্ভর করি।

আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন, কোরআন রাসূলুল্লাহর (সা) তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াতের বিষয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে কি কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছে! মক্কার কোরাইশগণ ৩৬০টির বেশী মূর্তির পূজা করত এবং সেগুলোকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় মনে করত। কিভাবে কোরআন ঐ সকল উপাস্য থেকে বিরত থেকে আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছে!

www.amarboi.org

আল্লাহ বলেন, 'তারা আশ্চর্য হয়েছে যে, তাদের কাছে নিজেদের এক লোক ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে এসেছে। কাফেররা বলেছে, এতো যাদুকর ও মিথ্যাবাদী। তিনি কি সকল মাবুদকে এক মাবুদ করেছেন? এটা নি:সন্দেহে আশ্চর্য বৈকি! (সূরা আস সোয়াদ: ৪-৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, 'তারা যখন আপনাকে দেখে, তখন আপনাকে কেবল বিদ্রুপের পাত্র হিসেবে গ্রহণ করে বলে, এই কি সে, যাকে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন? সে তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণের কাছ থেকে সরিয়ে দিত। যদি আমরা তাদেরকে আঁকড়ে ধরে না থাকতাম। তারা যখন শাস্তি দেখবে তখন জানতে পারবে কে অধিক পথভ্রষ্ট।' (সূরা ফোরকান ঃ ৪১-৪২)

আল্লাহ আরো বলেন,

وَيَقُوْلُوْنَ أَئِنَّا لَتَارِكُوْا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ -

'তারা বলে, আমরা কি একজন পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে ছেড়ে দেবো?' (সূরা আস সাফফাত : ৩৬)

আরবদের মধ্যে একদল লোক জীবন্ত মেয়ে শিশুকে মাটিতে কবর দিত। এটাকে কেউ নিন্দা করত না। বেশ্যা মহিলা ঘরের ওপর পতাকা তুলে দিত। এর মাধ্যমে সে অন্যদেরকে জানিয়ে দিত যে, সে যে কোন লোকের সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে প্রস্তুত। কেউ তার ঐ কাজের নিন্দা করত না। আপনি আমাদের এই যুগেও মহিলাদেরকে যৌনাঙ্গ প্রকাশ করতে দেখবেন। তারা বেপরোয়াভাবে অর্ধোলঙ্গ অবস্থায় চলা-ফেরা করছে। কারো কারো সাথে হয়তো বাপ, ভাই কিংবা স্বামীও আছে। এ ব্যাপারে বাপ, ভাই ও স্বামীর মনেও কোন দ্বিধা-সংকোচ কিংবা লজ্জা-শরম নেই। অনেক সমাজে মহিলারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। শুধু লজ্জাস্থানের ওপর সামান্য কিছু (হালকা-পাতলা) আবরণ ছাড়া আর কিছুই নেই। অনুরূপভাবে পুরুষরাও উলঙ্গ। তাদের দৃষ্টিতে এটা স্বাভাবিক।

উত্তর ইউরোপের কয়েকটি দেশে নারী-পুরুষ ঘরের ভেতর নবজাত ভূমিষ্ট শিশুর মত উলঙ্গ থাকে। আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন দীনদ্বার যদি তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ না করে, তাদের আবেগকে বিন্যাস্ত না করা হয় এবং তাদের সমাজকে সংগঠিত না করা হয় তাহলে, মানব প্রকৃতি এই রকমই হবে। এই কথাই পবিত্র কোরআন মজীদ থেকেও বুঝা যায়। কোরআন বে-দীন মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছে,

www.amarboi.org

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ-

'নিশ্চয়ই মানুষ অত্যাধিক জালেম ও অকৃতজ্ঞ।' (সূরা ইবরাহীম : ৩৪)

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ-

'নিশ্চয়ই মানুষ তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ।' (সূরা আদীয়াত : ৬)

আল্লাহ আরো বলেন, اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى-اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى -

'সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে, এ কারণে যে সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে।' (সূরা আল্ আলাক : ৬-৭)

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا–اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا -

'মানুষকে ভীরু হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন মন্দও খারাপ জিনিস তাকে স্পর্শ করে তখন সে ঘাবড়িয়ে যায় এবং যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয় তখন সে কৃপণ হয়ে যায়।' (সূরা আল্ মাআরিজ : ১৯-২১)

যিনি সমাজ সংস্কার করতে চান তার কর্তব্য হল এমন এক কেন্দ্র তালাশ করা যার ওপর ভিত্তি করে গোটা সমাজ চলতে পারে, সেই কেন্দ্র সমাজকে সাহায্যে করতে সক্ষম, যাতে করে সমাজ দুর্বল না হয়, কেন্দ্র আস্থা নির্ভর হয়, সবাই যেন তার গুণ-বৈশিষ্টের স্বাক্ষ্য দেয় এবং তাঁর যেন কোন অংশীদার না থাকে। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ অনুরূপ হতে পারে না।

আল্লাহর উপর ঈমান আনা, নির্ভর করা এবং তাঁর সাথে মজবুত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাই উঁচু পর্যায়ের সমাজ সংস্কারের সূচনা করতে সক্ষম। এর ফলেই কেবলমাত্র সৌভাগ্যশালী, শক্তিশালী ও নিরাপদ সমাজ কায়েম হতে পারে, যেখানে থাকবে না কোন ভয়-ভীতির আশংকা। আমরা যাত্রা শুরুর জন্য যে ঈমানের ওকালতি করছি। তা আজকের সংখ্যাধিক্য মানুষ যে ঈমান পোষণ করছে তা নয়, বরং সেই ঈমান হবে আমাদের সুযোগ্য নেক উত্তরসূরী এবং উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ঈমানের মত বলিষ্ঠ। এই হচ্ছে সেই ঈমান, মানুষের মনের গভীরে যা বিরাজ করে, উর্ধ্বাকাশে যার আলোচনা হয়, অনুভূতিকে যা নাড়া দেয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যার অনুগত হয়, এবং এর ফলে আল্লাহর রাস্তায় জান মিটিয়ে দেয়ার স্বাদ গ্রহণ করে। সেই ঈমান হচ্ছে, চালিকা শক্তি এবং শক্তির যোগানদানকারী।

www.amarboi.org

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কোরআন মজীদে বলেছেন, 'মোমেনদের কাছে আল্লাহর স্মরণ করা হলে তাদের অন্তর প্রকম্পিত হয়ে উঠে, তাদের কাছে কোরআন পাঠ করা হলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা আল্লাহর উপরই নির্ভর করে। তারাই নামাজ কায়েম করে এবং আমাদের প্রদত্ত রিজিক থেকে খরচ করে। তারাই সত্যিকার অর্থে মোমেন, আল্লাহর কাছে তাদের রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানিত রিজিক।' (সূরা আনফাল : ২-৪)

এই ঈমান ভাল জিনিস গড়ে ও বুলন্দ করে এবং খারাপ জিনিসকে ধ্বংস করে। আল্লাহ কোরআনে আরো বলেন, 'সেই মোমেনগণ সফল হয়েছে, যারা নামাজে বিনয়ী, যারা বেহুদা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাতের পন্থায় কর্মতৎপর হয়, যারা নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, স্ত্রী ও দাসীর ব্যাপারে ছাড়া, এজন্য তাদেরকে অভিযুক্ত করা হবে না; যারা এর বাইরে যৌনাচার করে তারা সীমালংঘনকারী; যারা আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে এবং যারা নামাজে নিয়মিত, তারাই উত্তরাধিকারী-তারা জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে এবং সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।' (সূরা আল মোমেনুন : ১-১১)

এই হচ্ছে সেই ঈমান যা মোমেনের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং আল্লাহর কিতাব ও নবীর হাদীসের দিকে তার চেহারাকে ঘুরিয়ে দেয়। ফলে সে কোরআন ও হাদীসের নির্দেশ ছাড়া কোন কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, কোন কিছুর পরিকল্পনা গ্রহণ, মানুষের সাথে লেন-দেন এবং আল্লাহর ইবাদত করে না।

আল্লাহ আরো বলেন, 'তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে করে। তারপর তোমার ফয়সালার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে কবুল করে নেয়।' (সূরা নিসা : ৬৫)

ঐ ঈমান যে কালেমায় রয়েছে, সে কালেমা হচ্ছে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য ইবাদতের যোগ্য নয়...। আল্লাহ ছাড়া কেউ দীন, শরীয়ত ও তার বিধানের প্রতি বিনয় পাওয়ার যোগ্য নয়। আল্লাহ ছাড়া কেউ সীমাহীন শক্তির অধিকারী নয়। তাঁর রহমত সকল জিনিসের ওপর ব্যাপৃত। তাঁর শাসন এবং পাকড়াও-এর প্রতিরোধ কেউ করতে পারে না। তাহলে, এই সত্তার কাছ থেকেই সমাজ সংস্কারের কাজ শুরু করতে হবে। আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, নবী-রাসূল, আল্লাহর সাথে সাক্ষাত এবং বেহেশত ও দোজখের ওপর ঈমান-বিশ্বাস থেকেই সমাজ সংস্কারের যাত্রা করতে হবে।

www.amarboi.org

মন যদি রবের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং তাঁর হুকুমের আনুগত্য করে, তাঁকে প্রতিপালক, ইসলামকে দীন ও শরীয়ত এবং মোহাম্মদ (সা) কে নবী, নেতা ও হেদায়াতকারী হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে, তাহলে সেই মন আল্লাহর আদেশ-নিষেধ বিনয় সহকারে মানবে, তাঁর রহমত প্রত্যাশা করবে, তাঁর আজাবকে ভয় করবে, তাঁর সন্তুষ্টিকে ভালবাসবে, অসন্তোষকে ভয় করবে এবং এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না যাতে আল্লাহর রাগ ও অসন্তুষ্টি বিদ্যমান রয়েছে। গভীর ঈমান-বিশ্বাস থাকলে সমাজের কষ্টদায়ক সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধান সম্ভব হবে। সামাজিক সমস্যা দূর করার পেছনে ঈমান কার্যকর না থাকলে ঐ সকল সমস্যা মানুষের জন্য দুঃখ-কষ্টের কারণ হবে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা বুঝতে পারি, কেন ঈমানের বিষয়টি মুসলমানদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন ১৩টি বছর মক্কায় অব্যাহতভাবে ঈমান সম্পর্কে কোরআন নাজিল হয়েছিল। আমরা আরো বুঝতে পারি, মদীনায় অবতীর্ণ সকল আইন-কানুন ঈমানের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। কোরআন যখন তাদেরকে মদীনায় কোন বিষয়ে উৎসাহিত করে তখন বলে ঃ তোমরা এরূপ কর, ঐ রূপ কর, যদি তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাক।

উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ বলেছেন, 'আল্লাহর বিধান কার্যকর করার ব্যাপারে যেনাকারী দুইজনের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক।' (সূরা নূর : ২)

'আল্লাহকেই তোমাদের সর্বাধিক ভয় করা উচিত যদি তোমরা মোমিন হও।' (সূরা তাওবা : ১৩)

মদীনায় মোমিনদেরকে ঈমানের সাথে সম্বোধন করে আল্লাহ বহু আয়াত নাজিল করেছেন। আল্লাহ তাদেরকে বুঝাতে চান যে, বিশেষভাবে তাদের লক্ষ্য করেই আয়াতে কথা বলা হচ্ছে। কেননা, তারা ভেতর ও বাইরে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তারা রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি 'শুনা ও আনুগত্যে'র শপথ নিয়েছে। তাই তাদেরকে ঐ ভাবেই সম্বোধন করা উত্তম। আল্লাহ কোরআনে তাদেরকে লক্ষ্য করে প্রায়ই বলেন, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا 'হে ঈমানদারগণ!

অনুরূপভাবে, রাসূলুল্লাহও (সা) তাঁদেরকে ঈমানের দৃষ্টিকোণ থেকেই উপকারী কাজের দিকে ধাবিত করা এবং ক্ষতিকর কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য বলতেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ -

www.amarboi.org

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন নিজ প্রতিবেশীর সম্মান করে।'

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ-

'যে আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান রাখে সে যেন মেহমানের সম্মান করে।'

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ -

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভাল কথা বলে কিংবা চুপ করে থাকে।'

এ জাতীয় আরও অনেক সহীহ হাদীস আছে।

আমরা যদি রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে ইসলাম গ্রহণকারীদের ইসলাম পূর্ব অবস্থার দিকে তাকাই তাহলে, দেখতে পাবো যে তাদের জীবন ছিল শতধা বিচ্ছিন্ন, বেলেল্লা ও বেহায়াপনার শিকার, ক্ষতিগ্রস্ত, অপমান ও অসম্মানিত। তাদের মধ্যে না ছিল ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম, না ছিল উন্নত ধরনের সুনির্দিষ্ট কোন চরিত্র ও সম্মানিত কোন জাতি সত্তা। বরং তারা ছিল রক্ত পিপাসু, দুর্বলের উপর জুলুমকারী, অনাথ-ইয়াতীমের সম্পদ লুণ্ঠনকারী, নারী নির্যাতনকারী এবং মূল্যবোধ ও নিষিদ্ধ বিষয়কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যকারী। আর এটাই ছিল তাদের জীবন ও চরিত্র।

কিন্তু তাঁরা যখন মুসলমান হয়ে গেলেন, তখন তাদের অন্তর ঈমানের জন্য উন্মুক্ত ও কোরআনের জন্য প্রশস্ত হয়ে গেল। ফলে, অতীতের সাথে তাদের বর্তমানের কোন সম্পর্ক নেই। তারা রুকু' এবং সাজদা দানকারী হয়ে গেল, রাতের ঘন অন্ধকারে তাদের কোরআন পাঠ শুনা যায় এবং আসমান ও জমীন আল্লাহর কিতাবের সুমধুর সূর শুনার জন্য কান পেতে থাকে, তাদের অন্তর থেকে নূর বা জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে থাকে, ঐ আওয়াজ শুনে ফেরেশতা জমীনে অবতরন করতে থাকে, আল্লাহর নাম মোবারক বহন করে ঊর্ধ্বাকাশে ফিরে যায় এবং মহান আল্লাহর দরবারে তাদের কথা উল্লেখ করে। দিনের আলো ছড়িয়ে পড়লে তারা ঈমানের জ্যোতি ও আলোতে চলতে থাকে, লোক সমাজে তারা নূতন কালের শপথ ঘোষণা করে, এমন নূতন বিপ্লবের ঘোষণা দেয়, যাতে কোন নির্যাতন ও জবরদস্তি নেই, সে জন্য কোন কারাগার ও জেলখানা খুলতে হয় না,

www.amarboi.org

আর না সে জন্য কোন হত্যাকান্ড ও ফাঁসী কাষ্ঠ প্রস্তুত করতে হয়। বরং তা হচ্ছে, জ্ঞান, যুক্তি ও প্রমাণের বিপ্লব; এমন বিপ্লব যা মানবতা ও তার জ্ঞানকে সম্মান করে; এমন শান্ত বিপ্লব যার কাঠামো হচ্ছে, ভ্রাতৃত্ব, ভিত্তি হচ্ছে দয়া ও আল্লাহর ওপর ঈমান। তাদের জীবন মদ-জুয়া, গালি-গালাজ ও অশ্লীলতা বিবর্জিত। যাতে কোন প্রতিশোধ ও অহংকার নেই, নেই কোন সম্পর্কচ্ছেদ ও অবরুদ্ধতা; তারা কারুর ইজ্জত-সম্মান নষ্ট করে না এবং কোন দূর্বলের ওপর জুলুম করে না। এটা হচ্ছে মুক্তি, উদ্ধার ও পুনরুজ্জীবনের বিপ্লব, মানুষের সম্মান ও তা বৃদ্ধির পদ্ধতি। তারা ছিল সর্বাধিক দরিদ্র এবং সংখ্যাধিক্যতার দাপটে গর্বিত। কিন্তু ঈমান তাদেরকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। তাদেরকে দিয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে নিয়েছে। তাদের অন্তরকে জাহিলিয়াতের আবর্জনা থেকে পরিস্কার করেছে এবং ইনসাফ, দয়া ও মহানুভবতার নীতি বদ্ধমূল করে দিয়েছে। তারা ফেরেশতাদের মতই পাক-পবিত্র হয়েছে এবং আলো ও হেদায়েত লাভ করেছে।

এই ঈমান থেকেই শুরু করতে হবে এবং তা ছাড়া কোন আশা নেই। সংস্কারকদের উচিত, এখান থেকেই শুরু করা, এর সকল দিকের ওপর গুরুত্বারোপ করা এবং নিজেদের জীবনের সকল দিকে একে ফয়সালাদানকারী হিসেবে গ্রহণ করা।

যখন মোমেনগণ একে অপরের সাথে সাক্ষাত করবে তখন বিনা কষ্ট ও পরিশ্রমে একে অপরের ভাই হয়ে যাবে যদি তারা ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হয়। আর সংখ্যার স্বল্পতা সত্ত্বেও কোন সমাজে মোমিনগণের মাঝে ভালবাসা, দয়া, সহযোগিতা ও আন্তরিক অংশ গ্রহণ সুনিশ্চিত হবে।

যদি কোন দল ঈমানের সত্যদাবী সহকারে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' এই শ্লোগানের ভিত্তিতে মিলিত হয় তাহলে, একথা বলার দরকার হবে না, ' তোমার ভাইয়ের প্রতি ইনসাফ কর।' কেননা, তখন আপনি দেখবেন যে, মোমেন ব্যক্তি অপর মোমেনকে নিজের ওপর অগ্রাধিকার দেবে। আপনি এ জাতীয় উদাহরণ দেখতে চাইলে ইসলামের ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থসমূহ পাঠ করুন। তবে এই বইতেও অনুরূপ অনেক উদাহরণ উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় মূলনীতি : আল্লাহর দীনের সুস্থ, গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান

ইসলাম এমন কোন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক মতাদর্শ নয় যা কোন একজন মানুষ কিংবা এক দল মানুষের জ্ঞান ও যুক্তির সমষ্টি, অথবা এমন কোন নৈতিক দর্শন কিংবা ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক তাহজীব তমুদ্দুন নয়, যা যুগ যুগ ধরে অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত হয়েছে। আর না তা কোন নেতা কিংবা সংস্কারকের উদ্ভাবিত চিন্তাধারা-যার দিকে মানুষকে ডাকা হয় এবং তা ভাল হোক বা মন্দ হোক তার তোয়াক্কা না করে জাতিকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়।

বরং ইসলাম জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সংস্কার ও সংশোধন করে। ইসলাম মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বৈষয়িক, চারিত্রিক এবং ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যাপক সংস্কার সাধন করে। ইসলাম মানুষে মানুষে রহমপূর্ণ সম্পর্ক, মানুষের সাথে পশুর সম্পর্ক, মানুষের সাথে রোগ জীবাণুসহ সকল প্রাণী, এমনকি আসমান-জমীন, মেঘ, বাতাস, পানি, জিন, ফেরেশতা ও রূহসহ সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য সত্তার সম্পর্ক নির্ধারণ করে। ইসলামের ব্যাপকতা এত বেশী যে তা কোন মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বাইরে। ইসলাম এমন এক প্রজ্ঞা, যা কোন সৃষ্টিজগতের চিন্তার অনেক ঊর্ধ্বে। মূলতঃ ইসলাম হচ্ছে, এক বিরাট ও ব্যাপক বিষয়। অপর দিকে, তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, গভীর ও সুদূরপ্রসারী।

আপনি মানুষের তৈরি কোন বিশেষণ দিয়ে এর মূলতত্ত্বের বর্ণনা দিতে পারবেন না। তবে পরোক্ষভাবে এর গ্রহণযোগ্য প্রকাশ সম্ভব। তাই ইসলাম সম্পর্কে একথা বলা যাবে না যে এটা কোন মতবাদ, নীতিমালা, দর্শন, চিন্তাধারা বা আইন অথবা অবাধ স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তা, পুঁজিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, গণতন্ত্র, একনায়কত্ব, বুর্জোয়া, স্বৈরাচার, শাহানশাহ ইত্যাদি। বরং এর একটি মাত্র প্রকাশ হচ্ছে এটি ইসলাম। ইসলাম কোন চিন্তাধারা, দর্শন ও অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত নয়। বরং তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন, 'এই কিতাব বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ থেকে।' (সূরা আল হাক্কাহ : ৪৩)

www.amarboi.org

আল্লাহ আরো বলেন,

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ
تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ -

'নিশ্চয়ই এই কিতাব সম্মানিত, তাতে বাতিল সামনে ও পেছন কোন দিক থেকেই আসতে পারে না। এটা হচ্ছে, সর্বাধিক বিজ্ঞ ও প্রশংসাকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।' (সূরা হা-মীম সাজদা : ৪১-৪২)

উৎসের দিক থেকে কোন মানুষের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহই এর নামকরণ করেছেন ইসলাম। আর আল্লাহ হচ্ছেন, তাঁর সত্তার উপযোগী সকল পূর্ণতার আধার এবং তিনি ব্যতীত ঐ গুণ আর কারুর জন্য প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ অত্যন্ত বিজ্ঞ। তাঁর জ্ঞান ও বিজ্ঞতার সাথে কোন মানুষের তুলনা হয় না। আল্লাহ্ অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান। সকল মানুষ তাঁর দয়ার সামান্য কিছুই জানতে পারে। আল্লাহ এমন বড় জ্ঞানী, সৃষ্টি জগতের কেউ তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে কিছু বলতে পারে না। তিনি এমন শক্তির অধিকারী, বিশ্বের কোন শক্তি তাঁকে পরাস্ত করতে পারে না। আল্লাহর রয়েছে সুন্দর ও উত্তম নাম এবং গুণাবলী, এগুলোতে কেউ তাঁর শরীক ও সমকক্ষ নেই। এখানেই আমাদেরকে গোটা মানবতার কাছে সত্যতা সহকারে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে হয়, 'আল্লাহু আকবার।' আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনিই এই দীনকে কেয়ামত পর্যন্ত সকল অঞ্চলের মানুষের জন্য আইন হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন।

আপনি কি আল্লাহর আইনকে সেই মানুষের তৈরি আইনের মত সমান মনে করতে পারেন যে মানুষ সীমিত, দুর্বল, কুপ্রবৃত্তির অনুসারী, পরিবেশ ও ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ এবং যাদের জীবন খারাপ আমদানীকৃত এবং পূঁতিগন্ধময় ধ্যান-ধারণায় মিশ্রিত? আল্লাহ্ এগুলোর উর্ধ্বে এবং তা থেকে পাক-পবিত্র।

কোরআন হচ্ছে, দীনের মূল উৎস ও সূত্র। তাতে ১১৪টি সূরা ও ৬ হাজার আয়াত রয়েছে। কোন কোন আলেম আরও ২ শ কিংবা অধিক আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। (মতান্তরে ৬,৬৬৬টি) কোরআনের শব্দ সংখ্যা হচ্ছে ৭৭ হাজার ৪৩৯। প্রত্যেক শব্দ থেকে বিধান নির্গত হওয়ার যোগ্য। আল্লাহকে ভয় করে এমন বিশ্বস্ত আলেম ও জ্ঞান-সাগরের ফকীহর পক্ষেই কেবল তা বের করা সম্ভব। সে কারণে ওলামায়ে কেরাম জ্ঞানের শাখা ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন এবং বলেছেন, যারা ইজতিহাদ ও গবেষণা করতে চায় তাদের জন্য তা জানা একান্ত জরুরী। কেননা, ইজতিহাদের মাধ্যমে যে হুকুম ও বিধান বের হবে

www.amarboi.org

লোকেরা সে অনুযায়ী আমল ও ইবাদত করবে কিংবা সে অনুযায়ী লেন-দেন করবে এবং এর ভিত্তিতেই বলবে, এটা হালাল, ঐটা হারাম। তাদেরকে রহিতকারী ও রহিত আয়াত সম্পর্কেও জানতে হবে। আরও জানতে হবে, শর্তমুক্ত ও শর্তযুক্ত বিষয়, সাধারণ ও বিশেষ বিষয়, আগের ও পেছনের বিষয়, ওয়াজিবকারী নির্দেশ, বিশেষ কারণের প্রেক্ষিতে যে নির্দেশ ওয়াজিব হয় না, নিষেধের ভিত্তিতে হারাম সহ বিশেষ কারণের প্রেক্ষিতে যে নিষেধ হারাম হয় না ইত্যাদি বিষয়। এগুলো একমাত্র ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য যা অন্য কোন ধর্মে নেই। ইসলাম একজন যোগ্য মুসলমান আলেমের বিবেককে কোরআনের আয়াত থেকে গবেষণার মাধ্যমে বিধান ও হুকুম এবং শর্ত সাপেক্ষে মাসআলা বের করার অধিকার দিয়েছে।

কোরআন সম্পর্কে যে কথা প্রযোজ্য, হাদীস সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে হাজার হাজার। কোন বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের ঐক্যমত্য এবং কোন বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশিত হয়েছে। তাই যে ব্যক্তি ইসলামের সম্মান রক্ষার চেষ্টা চালাবেন তার উচিত, আল্লাহকে ভয় করা এবং লোকদেরকে বিভ্রান্তি থেকে উদ্ধার করার জন্য রহম করা। অনেকেই একটিমাত্র হাদীসের কিংবা তাফসীর ও ফিকাহর কিতাব পড়ে ধারণা করে যে তিনি সব কিছু ওয়াকিফহাল। তারাই এই অল্প বিদ্যার বহর থেকে লোকদেরকে ফাসেক-কাফের ফতোয়া দেয়া শুরু করে। আসলে ঐ ব্যক্তি সংকীর্ণ এবং নিজে আলেম না হয়ে শিক্ষাদানকারী লোকদেরকে বিভ্রান্ত করতে উদ্যত। যদি তারা আল্লাহর এই বাণীটুকু বুঝত!

وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَـلاَلٌ وَهٰـذَا حَـرَامٌ لِّتَفْـتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ، اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُوْنَ ـ

'তোমাদের মুখ থেকে সাধারণত: যে সব মিথ্যা বেরিয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে তাদের কল্যাণ হবে না।' (সূরা নাহল : ১১৬)

কোন ব্যক্তি যেন দলীল-প্রমাণ এবং ফকীহদের বক্তব্য জানা ছাড়া কোন বিষয়ে ফতোয়া না দেয়। জ্ঞান সহকারেই ফতোয়া দেয়া উচিত। কেউ ফেকাহর কিতাব পাঠ করলে দেখতে পাবেন যে সেগুলোতে দলীল-প্রমাণ এবং ফকীহগণের

www.amarboi.org

মতামত তুলে ধরা হয়েছে। দেখা যায় যে, এক মাসআলায় ২০টি মতামত রয়েছে এবং প্রত্যেক মতের পেছনে রয়েছে দলীল-প্রমাণ। তবে যে মতের পেছনে দলীল-প্রমাণ বেশী সেই মতটিই বেশী বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী।

আপনি কোন একটি মাসআলায় অনেক বক্তব্য দেখতে পাবেন যার সূচনা ওয়াজিবকারী এবং সমাপ্তি হচ্ছে হারাম ঘোষণাকারী। প্রত্যেকের কথার সমর্থনে রয়েছে দলীল-প্রমাণ ও ভিত্তি। আমরা যদি একযোগে সকল বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করি তাহলে, এর অর্থ দাঁড়ায়, আমরা সেই নীতি ও ভিত্তিকে অস্বীকার করছি যার ওপর এটি দাঁড়িয়ে আছে। অথচ এটি প্রায় সর্বজন স্বীকৃত নীতি ও ভিত্তি। এর অপর অর্থ দাঁড়ায় যে, আমরা এই উম্মাহর সকল ফকীহ ও আলেমকে অস্বীকার করছি যাদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামও অন্তর্ভুক্ত। আমরা তাদের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও যেন সেই অস্তিত্বকে অস্বীকার করছি। ওলামায়ে কেরামের পদ্ধতির ব্যাপারে অজ্ঞ এবং দীনের সাথে সম্পর্কহীন কিছু ব্যক্তি এরকম করতে পারে। সে ব্যক্তি আত্মপ্রবঞ্চিত। সে নিজের জ্ঞানের শীর্ষে অবস্থান করে আমল করে এবং ইচ্ছামত বেহেশত-দোজখ, পাপ ও কুফর এবং হালাল-হারাম বণ্টন করে।

আপনি ইবনে তাইমিয়ার 'মাজমু' আল-ফাতওয়া' সহ তাঁর সকল গ্রন্থ, ইবনুল কাইয়্যেম এবং ইবনু কাসীরসহ বহু মুক্ত চিন্তার অধিকারী লোকের বই-পুস্তক পড়লে দেখতে পাবেন, তারা অন্ধ অনুসরণ থেকে মুক্তির ডাক দিয়েছেন। আপনি তাদেরকে দেখবেন, তারা কোন একটি মাসআলা আলোচনা করতে গিয়ে অন্যান্য ফকীহর মতামত ও দলীল তুলে ধরেন। তারপর নিজের যোগ্যতা ও জ্ঞান অনুযায়ী এটাকে অন্যটার ওপর প্রাধান্য দিচ্ছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ইজতিহাদ করার যোগ্য। আপনি তাদেরকে কোন ইমামের সমালোচনা কিংবা কোন ফকীহর বক্তব্য বাদ দিতে দেখবেন না।

আপনি বর্তমান যুগের কোন শিক্ষার্থীর কাছে বসলে শুনতে পাবেন, আমি শাফেঈ অথবা হানাফী কিংবা হাম্বলী মাজহাবের কথায় বিশ্বাস করি না। আমি সরাসরি কোরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা গ্রহণ করি। আমি কারুর কথায় কান দেই না এবং কারুর মাজহাব ও দলীলের দিকে তাকাই না।

এটা হচ্ছে, প্রকাশ্য অজ্ঞতা ও ধ্বংসাত্মক ধোঁকাবাজী। তিনি যেন বলছেন, ঐ সকল ইমামগণ কোরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা গ্রহণ করেননি। তাই আমি তাদের মতামতের তোয়াক্কা করি না। তিনি যেন বুঝাতে চান, ঐ ইমামগণ সতর্ক

www.amarboi.org

ও পরহেযগার এবং আলেম ছিলেন না। তাই তাদের কথা গ্রহণ করা ও বুঝা ঠিক নয়। কিংবা তিনি বলতে চান, আমি ইজতিহাদের সকল শর্ত পূরণ করেছি, তারা অনুরূপ করতে পারেননি। এ জাতীয় লোক উম্মাহর একটি বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত অংশ। তারা উম্মাহর সঠিক পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত এবং সলফে সালেহীনের গৃহীত পথ থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে।

আমরা আল্লাহর কাছে তাদের হেদায়াত ও সংশোধন প্রার্থনা করি এবং সাধ্যমত তাদের সংশোধনের চেষ্টা করি। আমি এই কথার সাথে একমত 'আধা জ্ঞান কখনও অজ্ঞতার চাইতেও অধিক ক্ষতিকর' হতে পারে। কেননা, অজ্ঞ-মুর্খ লোক নিজের অজ্ঞতার ব্যাপারে বিশ্বাসী বলে বিভিন্নজনকে জিজ্ঞেস করে। পক্ষান্তরে আধা পণ্ডিত অল্প বিদ্যা ভয়ংকর ক্ষতি দ্বারা নিজে এবং অপরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

আপনি কোন সম্প্রদায়কে দেখবেন তারা না ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে, না কোন ওস্তাদের কাছে শিখেছে, না কোন আলেমের সাথে মিশেছে। তা সত্ত্বেও তারা আমলকারী ওলামায়ে কেরামের চাইতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেন এবং তাদের প্রতি এমন অপবাদ দেন যা কেবল কোন আহমকের পক্ষেই শোভা পায়। এই ক্ষেত্রে তাদের কিছু অনুসারীও রয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টিজগতে রয়েছে কত বৈচিত্র!

তাই ইসলামের সংস্কারকদের উচিত, ইসলামকে বা এর অংশ বিশেষকে কিংবা বিশেষ কোন মাসআলার ব্যাপারে গভীর ও ব্যাপক উপলব্ধি এবং বুঝ-জ্ঞান দরকার। তবে শর্ত হল, জানার বেশী দাবী করা চলবে না। জানা বিষয়ের চাইতে বেশী দাবী করাকে হাদীসে 'মিথ্যা পোষাক পরা'র শামিল বলা হয়েছে।

সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, প্রিয়, সৎ ও তাকওয়ার কাজে সহযোগী এবং নিজের ও মানবতার কল্যাণমুখী সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এই ব্যাপক ও সুস্থ উপলব্ধি দরকার।

আপনি যদি ইসলামের দাওয়াতী কাজে জড়িত ব্যক্তিকে মতবিরোধের কারণ সম্পর্কে জানতে চান তাহলে দেখতে পাবেন যে, তারা প্রকৃত ইসলাম, এর বিধান, দাওয়াতের কৌশল এবং সমঝোতা, মুসলিম ঐক্য ও ভালবাসার মূলনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ। তাদের অপকার উপকারের চাইতে বেশী এবং মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির ব্যাপারে তারা বেপরোয়া। "একনিষ্ঠ মোখলেস লোক এবং ওলামায়ে কেরাম যতটুকু ভাল কাজ করছেন, এই সম্প্রদায় তা ধ্বংস করছে এবং বাস্তব সত্যের ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। ফলে বিষয়গুলো ঘোলাটে হয়ে যায় এবং লোকেরা বড় ধরনের পেরেশানীর মধ্যে হাবুডুবু খায়। ইসলাম পন্থীরা যদি

www.amarboi.org

ইনসাফ করত তাহলে, প্রত্যেকেই তার ভাইয়ের প্রতি সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করত, নিজের পক্ষ থেকে সাহায্য ও শক্তি যোগান দিত, তার পেছনে মজবুতভাবে লেগে থাকত, একনিষ্ঠ বন্ধুত্ব করত, ঐক্যের বিষয়ে সহযোগিতা করত এবং অনৈক্যের বিষয়ে দূরে থাকত।" ইমাম হাসানুল বান্না (র) এই বিখ্যাত মন্তব্য করেছেন।

সকলের জন্য যে জিনিস সহায়ক তা হল, ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক ও সতর্ক জ্ঞান এবং উপলব্ধি অর্জন করা। সকল মুসলমানের উচিত, বিশ্বের অন্য স্থানের যে কোন মুসলমানের অস্তিত্বের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। কেননা সেই মুসলমান ইসলামের যে কোন একটি ঘাঁটিতে পাহারার দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছে, নিজ কর্ম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলামের শত্রুর বুকে আঘাত হানছে এবং লোকদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিচ্ছে। আমি মতবিরোধকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি না। বরং আমি মুসলমানের কল্যাণের লক্ষ্যে ঐক্য কামনা করি। আমার বক্তব্যের মাধ্যমে আমি মোকাবিলার কোন ফ্রন্ট খুলতে চাই না, বরং আমি ফেতনা দূর করতে চাই।

যে মুসলিম ভাই কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লায় বিশ্বাসী, তার বিজয়ে আপনার সাহায্য সর্বাধিক প্রয়োজন। এমতাবস্থায় আপনার ও আপনার ভাইয়ের মধ্যে কোন মতেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি জায়েয নেই।

মুসলিম সমাজ ইসলামের সংস্কার ও দাওয়াত দানকারীদের মনস্তাত্বিক উত্তেজনা ও আচরণের কারণে বহু কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। অনুরূপভাবে, সমাজ ইসলামের মূল সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ উচ্চারণকারীর সাথে দয়া, সহানুভূতি, আচার-আচরণ ও মানসিক অংশ গ্রহণের দাওয়াতের ব্যাপারেও অসন্তোষজনক পরিস্থিতির শিকার। যে কারণে আমার মন শোক-দুঃখে ফেটে যাচ্ছে তাহলো, অনেক বছর নয়, বরং শত শত বছর ধরে আমাদের সমাজে জুলুম-নির্যাতন, রক্ত প্রবাহ স্বাধীনতার গলা টিপে ধরা, সম্পদ লুটপাট এবং মুক্ত চিন্তার লোকদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। তাদের এ ছাড়া আর কোন অপরাধ নেই যে, তারা বীর সাহসী, স্বাধীন, সত্যের পতাকাবাহী এবং কল্যাণ ও আলোর পতাকা বহনকারী। আমাদের সমাজ আজও এই দূরবস্থার শিকার।

তথাকথিত আলেমদের কতইনা ফতোয়া বেরিয়েছে। পয়সার কেনা গোলামদের হাতে, ঠকবাজ ও বিভ্রান্ত লোকদের কলমের কালিতে সংবাদপত্রের পাতার পর পাতা কাল হয়েছে! নিরাপরাধ মুসলিম সমাজের চেহারা বিকৃতির লক্ষ্যে রেডিও, টেলিভিশন ও তথ্য মাধ্যমে কি পরিমাণ অর্থই না ব্যয়িত হয়েছে।

www.amarboi.org

হায়! যারা জুলুম-নির্যাতন করেছে এবং মর্যাদা ও সম্মান ভূলুণ্ঠিত করেছে! আফসুস! যারা কল্যাণ ও মঙ্গল এবং ইসলামের সামাজিক ভ্রাতৃত্বের নিশান বরদারদেরকে হত্যা করেছে! আহা! যদি ঐ রকম না হত! যা হয়েছে তা হচ্ছে, দারিদ্র্যের ওপর দারিদ্র সওয়ার হয়েছে, একের পর এক বিপদ এসেছে, একের পর এক দুর্ভাগ্য এসেছে এবং এমন অন্ধকার নেমে এসেছে যে সোবহে সাদেক আসন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে গেছে।

জমীন গেছে, ইজ্জত নষ্ট হয়েছে, উম্মাহ বিভক্ত হয়েছে, দেশগুলো ছিন্নভিন্ন হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদীরা এসে দেশ জবরদখল করেছে! তা সত্ত্বেও শাসক নেতৃবৃন্দের দাবী হল, তারাই জাতির কল্যাণকামী এবং তাদের হাতেই উম্মাহর নুতন শৌর্য-বীর্য ফিরে আসবে। শৌর্য-বীর্যতো আসেইনি, না তাদের মাধ্যমে তা আসার অপেক্ষা করা যায়। জনগণের ওপর তাদের জুলুম বন্ধ হলেই যথেষ্ট।

ঐ দুর্ভাগ্যের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, ইসলামকে না বুঝা, এই দীনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি না করা এবং দীন সম্পর্কে জাতির পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকা। তা থাকলে, জাতির মধ্যে প্রতিশোধকারী শক্তি থাকত, জাতিকে মুক্ত ও সাহায্য করতে পারত এবং শত্রুর মোকাবিলায় সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মজবুতভাবে দাঁড়াতে পারত।

www.amarboi.org

তৃতীয় মূলনীতি : মানসিক ব্যাধি ও এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ

এই নীতি সম্পর্কিত আলোচনাই এই পুস্তকের মূল বিষয় যা আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এর আগে বর্ণিত বিষয়গুলো হচ্ছে ভূমিকাস্বরূপ, যা লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য জরুরী।

এই মূলনীতিটিকে ব্যক্তির তামাদ্দুনিক পরিশুদ্ধি ও ইসলামের সামাজিক শিক্ষা হিসেবে অভিহিত করা যায়। যে কোন ইতিবাচক তৎপরতার জন্য এটাই হচ্ছে সুস্থ ও শক্তিশালী পদ্ধতি। সংহতি ও ভালবাসার উপর ভিত্তিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এটা হচ্ছে প্রাথমিক পদক্ষেপ।

এই মূলনীতি যদি ব্যক্তি ও সমাজ বিধ্বংসী ব্যাধি থেকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধির দিশারী হয়, এর পরবর্তী ৪র্থ মূলনীতি যদি মুসলিম সমাজের ঐক্য আনয়নকারী কর্তব্য হয়, তদুপরি তা যদি মুসলিম সমাজের শক্তি বৃদ্ধি, শত্রুর বিরুদ্ধে দৃঢ় মজবুতী এবং ব্যক্তিদের মধ্যে ভালবাসা ও সহযোগিতার রূহ সৃষ্টিকারী হয়, তাহলে ৩য় মূলনীতির সকল শাখা-প্রশাখাসমূহকে বিবেচনা করতে হবে আত্মার পরিশুদ্ধকারী হিসেবে। আর ৪র্থ মূলনীতির সকল শাখা-প্রশাখাসমূহকে বিবেচনা করতে হবে আত্মার সৌন্দর্যবর্ধনকারী হিসেবে।

পরিশুদ্ধি ও সৌন্দর্যকরণ হচ্ছে, সফল সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মৌলিক দু'টো লক্ষ্য। এই মূলনীতি দু'টো আল্লাহর সন্তুষ্টি, রহমত ও ক্ষমা লাভ করার জন্যও অত্যন্ত জরুরী।

৩য় মূলনীতি হচ্ছে, মানবিক আত্মা থেকে জাহেলিয়াতের ব্যর্থতাকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা। আর ৪র্থ মূলনীতি হচ্ছে, ইসলামের পোষাকে সজ্জিতকরণ এবং সুন্দর গয়না দ্বারা অলংকৃত করা।

শিক্ষার মর্যাদা ও সওয়াব

মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

'মোমিনদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে তারা দীনের

www.amarboi.org

জ্ঞান লাভ করে এবং ভয় প্রদর্শন করে নিজ জাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে যেন তারা বাঁচতে পারে? (সূরা আত তাওবাহ : ১২২)

আল্লাহ পাক আরও বলেন, فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ.

'তোমরা যদি না জান, তবে যারা স্মরণ রাখে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর।' (সূরা আম্বিয়া : ৭)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জ্ঞান শিক্ষার জন্য রাস্তায় চলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের রাস্তায় চালান।' (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেছেন, 'ফেরেশতারা জ্ঞান অন্বেষণকারী ছাত্রের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে নিজেদের পাখা বিছিয়ে দেন।'

আবু দারদা (রা) বলেন, 'আমি পুরো রাত নামায পড়ার চাইতে একটি মাসআলা শিক্ষা করাকে প্রিয়তম মনে করি।'

তিনি আরও বলেছেন, 'হয় আলেম, নচেৎ ছাত্র কিংবা শ্রোতা হও, ৪র্থ কিছু হয়ো না, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে।'

ইমাম শাফেঈ (র) বলেছেন, 'জ্ঞান অর্জন নফল ইবাদতের চাইতে উত্তম।

৩য় মূলনীতির প্রথম অংশ

যে সকল আভ্যন্তরীণ ব্যাধি থেকে পরিশুদ্ধি জরুরী সেগুলো হচ্ছে,

১. গর্ব-অহংকার (الكبر و التكبر)
২. সম্পদের গরিমা (العجب)
৩. রাগ (الغضب)
৪. ঘৃণা-বিদ্বেষ (الحقد)
৫. হিংসা (الحسد)
৬. মুসলমানের প্রতি অহেতুক খারাপ ধারণা পোষণ (سوء الظن)
৭. কোন মুসলমানকে তুচ্ছ জ্ঞান করা এবং তার অধিকারকে হালকা গণ্য করা (احتقار الناس والاستخفاف بحقوقهم)

১. গর্ব-অহংকার

কোরআন ও হাদীসের অনেক জায়গায় গর্ব-অহংকারকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। জ্যান্ত আত্মা, সত্য ঈমান ও সতর্ক মনের অধিকারী মোমিন মহান

www.amarboi.org

আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদার সামনে হীন ও নীচু হয়ে দাঁড়াবে, সকল গর্ব-অহংকারের বেলায় নিজেকে বিনয়ী ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করবে, আল্লাহর কাছে তওবা ও প্রত্যাবর্তনের নিয়তে কান্নাকাটি করবে, নিজ দুর্বলতার জন্য তাঁর দয়া, আত্মাকে গর্ব-অহংকারের ব্যাধি থেকে রক্ষা, সত্যের জন্য বিনয়, সৃষ্টির জন্য প্রশান্তি, নিজের জন্য হেদায়েতের পথ এবং ধ্বংস ও বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্য আশা ও প্রার্থনা করবে। গর্ব-অহংকারের বিরুদ্ধে বহু দলীল-প্রমাণ রয়েছে।

কোরআনের আয়াত :

(১) 'আমি আমার নিদর্শনসমূহ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখি যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গর্ব-অহংকার করে।' (সূরা আ'রাফ : ১৪৬)

(২) তোমাদের মা'বুদ, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্য বিমুখ এবং তারা অহংকার প্রদর্শন করছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় বিষয়ে অবগত। নিশ্চয়ই তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না।' (সূরা নাহল : ২২)

(৩) 'অহংকার বশতঃ তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং যমীনে গর্বসহকারে পদচারণা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক-অহংকারীকে পছন্দ করেন না। চাল-চলনে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিঃসন্দেহে গাধার আওয়াজই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।' (সূরা লোকমান : ১৮-১৯)

(৪) 'এই পরকাল আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং গোলযোগ সৃষ্টি করতে চায় না। মোত্তাকীদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।' (সূরা কাসাস : ৮৩)

(৫) 'অনুরূপভাবে, আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী শক্তিধরের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেন।' (সূরা আল-মোমেন : ৩৫)

(৬) 'যারা আমার ইবাদত থেকে গর্ব-ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (সূরা আল-মোমেন : ৬০)

(৭) 'পৃথিবীতে দাম্ভিকতা সহকারে চলো না। নিশ্চয়ই তুমি ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না। এ সবের মধ্যে যেগুলো মন্দ কাজ, সেগুলো তোমার রবের কাছে অপছন্দনীয়।' (সূরা বনি ইসরাঈল : ৩৭-৩৮)

www.amarboi.org

১ম আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, অহংকারীর অন্তর ও দৃষ্টিশক্তিকে আল্লাহ অন্ধ করে দেন। ফলে, তারা কখনও হেদায়াত লাভ করতে পারে না।

পরের দুই আয়াতে অহংকারের প্রতি আল্লাহর অসন্তোষ ঘোষণা করা হয়েছে। ৪র্থ আয়াতে বলা হয়েছে যারা অহংকারী আল্লাহ তাদেরকে পরকালে নিজ রহমত ও বেহেশত থেকে বঞ্চিত করবেন। ৫ম আয়াতে বলা হয়েছে, অহংকারীর অন্তর আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি হিসেবে সত্য ও আলো গ্রহণে অক্ষম। ৬ষ্ঠ আয়াতে অহংকারীর জন্য জাহান্নামে লজ্জা ও অপমানের আযাব দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীস

(১) আবু সালামাহ বিন আবদুর রহমান বিন আওফ থেকে বর্ণিত। মারওয়া পাহাড়ে আবদুল্লাহ বিন ওমার (রা) আবদুল্লাহ বিন আমরের সাক্ষাত পান। উভয়ে আলোচনা করেন। পরে আবদুল্লাহ বিন আমর চলে যান এবং আবদুল্লাহ বিন ওমার কাঁদতে থাকেন। তখন একজন লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, হে আবু আবদুর রহমান! আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি উত্তরে বলেন, আবদুল্লাহ বিন আমর বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছেন, যার অন্তরে সরিষার একটি অংশ (সামান্য) পরিমাণ অহংকারও থাকবে আল্লাহ তাকে মুখের উপর উপুড় করে দোযখে প্রবেশ করাবেন। (আহমদ)

(২) আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকারও আছে সে বেহেশতে যেতে পারবে না। তখন এক লোক জিজ্ঞেস করেন, মানুষ সুন্দর কাপড় ও জুতা পরা পসন্দ করে। (এটাও কি অহংকারের অন্তর্ভুক্ত?) রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তর দেন। আল্লাহ নিজে সুন্দর, তিনি সুন্দরকে পসন্দ করেন। কিন্তু অহংকার হচ্ছে, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা ও দূরে ঠেলে দেয়া এবং মানুষকে ঘৃণা করা। (মুসলিম, তিরমিযী)

(৩) সালামাহ বিন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, লোকেরা অহংকার করতে থাকলে তাদেরকে অত্যাচারী শক্তিধরদের দলে লেখা হয় এবং পরে উভয়ের একই পরিণতি হবে। (তিরমিযী এটাকে হাসান হাদীস বলেছেন।)

(৪) আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظْمَةُ اِزَارِىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ وَاحِدًا مِّنْهُمَا اَلْقَيْتُهُ فِىْ جَهَنَّمَ وَلاَ اُبَالِىْ.

www.amarboi.org

'গর্ব-অহংকার আমার চাদর ও মহত্ব আমার ইজার। যে কেউ আমার সাথে এই দু'টোর যে কোন একটা নিয়ে ঝগড়া করে আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবো এবং এ ব্যাপারে কোন পরোয়া করবো না।'

(৫) আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, দোযখ থেকে এমন এক ঘাড় বের হবে যার দুই কান, দুই চোখ এবং কথা বলার মত একটি জিহবা থাকবে। সে বলবে, আমাকে তিন জনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, ক) অহংকারী-বিদ্বেষী, (খ) যে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করেছে এবং (গ) যে ছবি তুলেছে। (তিরমিযী এটাকে ভাল, বিশুদ্ধ ও গরীব হাদীস বলেছেন)

(৬) হোযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে এক জানাযায় ছিলাম। তখন তিনি বলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর নিকৃষ্ট বান্দাহ কে তা বলবো না? সে হচ্ছে, অহংকারী-অসচ্চরিত্র। তিনি আবারও বলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর উত্তম বান্দাহ কে তা বলবো না? সে হচ্ছে, দুর্বল, অক্ষম এবং দুই পুরাতন কাপড় ওয়ালা যার প্রতি কেউ নজর দেয় না, কিন্তু সে কোন বিষয়ে শপথ করলে তার মর্যাদার কারণে আল্লাহ তার শপথে সাড়া দেন। (আহমদ)

(৭) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, বেহেশত ও দোযখ যুক্তি প্রদর্শন করেছে। দোযখ বলেছে, আমার মধ্যে থাকবে অত্যাচারী শক্তিধর এবং অহংকারী ব্যক্তিবর্গ। আর বেহেশত বলেছে, আমার মধ্যে থাকবে গরীব ও নিঃস্ব মুসলিম। তখন আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা দেবেন এবং বলবেন, তুমি হয়েছ আমার রহমত-জান্নাত। আমি যাকে ইচ্ছা তাকে তোমার মধ্যে রেখে মেহেরবানী করবো। আর তুমি হয়েছ আমার শাস্তি-জাহান্নাম। আমি যাকে ইচ্ছা তাকে তোমার মধ্যে রেখে শাস্তি দেবো।' আমার দায়িত্ব হল তোমাদের উভয়কে পূর্ণ করা।' (মুসলিম)

(৮) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে না কথা বলবেন, না তাদেরকে পবিত্র করবেন, আর না তাদের প্রতি নজর দেবেন; তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। তারা হল : ১. বৃদ্ধ যেনাকারী. ২. মিথ্যুক বাদশাহ এবং ৩. অহংকারী ফকীর-গরীব। (মুসলিম-নাসাঈ)

www.amarboi.org

সাহাবা ও তাবেঈনদের বক্তব্য

আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলেছেন, কোন মুসলমান যেন অন্য কোন মুসলমানকে ঘৃণা না করে। কেননা, ছোট মুসলমান আল্লাহর কাছে বড়।

মোহাম্মদ বিন হোসাইন বিন আলী বলেছেন, কোন মোমিনের অন্তরে সামান্য পরিমাণ অহংকার প্রবেশ করলে তার সেই পরিমাণ জ্ঞান লোপ পায়। কম প্রবেশ করলে কম এবং বেশী প্রবেশ করলে বেশী লোপ পায়। নোমান বিন বশীর মিম্বারের উপর থেকে বলেন, শয়তানের হামলার কিছু কৌশল ও উপায় আছে। আর তা হল, আল্লাহর নেয়ামতের ব্যাপারে গর্ব-দর্প করা, আল্লাহর দান সম্পর্কে অহংকার করা, আল্লাহর বান্দাদের উপর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা এবং আল্লাহর সত্তা বহির্ভূত ক্ষেত্রে নিজ প্রবৃত্তি ও নফসানিয়াতের অনুসরণ করা।

সোলায়মানকে প্রশ্ন করা হয়েছিল কোন্ গুণাহ করলে নেক কাজ দ্বারা ফায়দা হয় না? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'অহংকার।'

লোক দেখানোর মনোভাব মিশ্রিত অহংকারের বিরুদ্ধেও কোরআন এবং হাদীসে বহু নিষেধাজ্ঞা আছে। এই ব্যাধি থেকে বাঁচার জন্য এ সম্পর্কিত দলীল-প্রমাণগুলো আমাদের জানা দরকার। অহংকার সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াতসমূহ ছাড়াও নিম্নোক্ত আয়াতগুলো রয়েছে।

'আল্লাহ কোন লোক দেখানো মনোভাব মিশ্রিত অহংকারী ও ঔদ্ধত্য প্রকাশকারীকে ভালোবাসেন না।' (সূরা নিসা : ৩৬)

'আল্লাহ প্রত্যেক লোক দেখানোর মনোভাব মিশ্রিত অহংকারী লোককে ভালোবাসেন না। (সূরা হাদীদ : ২৩)

এ প্রসঙ্গে কারুনের ঘটনা সবার কাছে প্রসিদ্ধ।

হাদীস

(১) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সুন্দর-সুশ্রী কাপড় পরে আনন্দ ও গর্ব সহকারে চলাফেরা করে, আল্লাহ তাকে যমীনের নীচে চাপা দেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত সে যেন চরম পেরেশানী সহকারে নড়াচড়া করে।' (বোখারী, মুসলিম)

(২) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'কোন ব্যক্তি চাদর ও ইজার অর্থাৎ পূর্ণ পোষাক পরিহিত অবস্থায় খুশীতে মাথায় সিঁথি করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে চললে আল্লাহ তাকে মাটি চাপা দেন এবং

www.amarboi.org

কেয়ামত পর্যন্ত সে যেন মাটির নীচে চরম পেরেশানী সহকারে নড়াচড়া করতে থাকে।'

(৩) ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে গর্ব সহকারে পায়ের নীচে কাপড় টেঁচিয়ে হাটে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে নজর করবেন না। তখন আবু বকর (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ইজার ঢিলা হয়ে নীচে নেমে যায় এবং আমি তা ধরে রাখি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যারা গর্ব ও লোক দেখানের উদ্দেশ্যে অনুরূপ করে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও।' (মুওয়াত্তা, বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)

(৪) ইবনে ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, 'যে নিজেকে বড় মনে করে এবং নিজে অহংকারের মনোভাব প্রকাশ করে, সে আল্লাহর সাথে যখন মিলিত হবে তখন আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট থাকবেন।' (তিবরানী, হাকেম)

সাহাবা ও তাবেঈ কেরামের বক্তব্য

ইবনে ওমার (রা) এক ব্যক্তিকে গর্ব সহকারে ইজার মাটিতে টেঁচিয়ে হাঁটতে দেখে বলেন, 'শয়তানের রয়েছে ভাই' একথা তিনি ২/৩ বার বলেন। মোতরেফ বিন আবদুল্লাহ বিন আশশিখ্খির বাদশাহ মাহলাবকে সিল্কের জুব্বা পরা অবস্থায় অহংকার প্রকাশ করতে দেখে মন্তব্য করেন ঃ হে আল্লাহর বান্দাহ! এই চাল-চলন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অসন্তুষ্ট করে। মাহলাব তাঁকে বলেন, তুমি কি আমাকে চিন? মোতরেফ বলেন, হাঁ, আমি তোমাকে চিনি। তোমার সূচনা হচ্ছে নোংরা ধাতু (মনি), সমাপ্তি হচ্ছে দুর্গন্ধযুক্ত লাশ, আর এই দুই অবস্থার মাঝখানে তুমি ময়লার আধার-নাড়ি-ভুঁড়ি বহন করে চলেছ।' এরপর মাহলাব চলে যান এবং ঐ চাল-চলন ত্যাগ করেন।

হাসান বসরীর কাছ দিয়ে সুন্দর পোশাক পরিহিত এক যুবক অতিক্রম করার সময় তিনি যুবকটিকে ডেকে বলেন, 'আদম সন্তান যৌবনের গর্বে গর্বিত হয়, নিজের গুণ ও চরিত্র প্রিয় হয়। অথচ কবর যেন তোমার শরীরকে ঢেকে ফেলেছে এবং তুমি যেন তোমার আমলনামা পেয়ে গেছ। আফসুস! নিজ অন্তরের চিকিৎসা কর, আল্লাহ বান্দাহর অন্তরের সংশোধন চান, আর লোক দেখানো মিশ্রিত গর্ব-অহংকার অন্তরকে নষ্ট করে দেয়।

www.amarboi.org

গর্ব-অহংকারের মূল

গর্ব-অহংকার দুই প্রকার। গোপন ও প্রকাশ্য। গোপন অহংকার মানুষের মনে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর প্রকাশ্য অহংকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রকাশ পায়। প্রকাশ্য অহংকার মনের গোপন অহংকারের ফল। গোপনটা হচ্ছে মূল আর প্রকাশ্যটা হচ্ছে শাখা।

গোপন অহংকারের অর্থ হচ্ছে, অহংকারী নিজেকে অন্য অহংকারীর চাইতে বড় মনে করে। এটা যেন তার ধারণা- বিশ্বাসে পরিণত হয়ে যায়। ফলে সে এই কারণে খুশী হয়, ঐ দিকে ঝুঁকে পড়ে ও নিজেকে সম্মানিত মনে করে। এটাই হচ্ছে, অহংকারের চরিত্র।

অহংকারের উপাদান তিনটি। ১. অন্যের মর্যাদার প্রতি নজর ২. নিজের মর্যাদার প্রতি নজর এবং ৩. অন্যের উপর নিজের মর্যাদা বেশী বলে ধারণা করা।

কোরআন ও হাদীসে কোন সময় অহংকারকে একটি মানবিক অবস্থা, কোন সময় আত্মার উপর অহংকারের প্রভাব হিসেবে এবং কোন সময় দু'টি বিষয়কে একই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথমটির উদাহরণ হচ্ছে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত :

'তাদের অন্তরে অহংকার ছাড়া কিছুই নেই, তারা সেই অহংকার পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।' (সূরা আল-মোমেন : ৫৬)

দ্বিতীয়টির উদাহরণ, 'তোমরা তাঁর আয়াতের মোকাবিলায় অহংকার করছ।' (সূরা আন'আম : ৯৩)

তৃতীয়টির উদাহরণ, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'যে নিজেকে বড় মনে করে এবং নিজ চাল-চলনে অহংকার প্রকাশ করে, সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট।'

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, কাফেরের অন্তরে এমন বড়াই ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, যে পর্যন্ত তারা পৌঁছতে পারেনি এবং এর যোগ্যাতাও অর্জন করতে পারেনি। ২য় আয়াতে বলা হয়েছে, কাফেররা আল্লাহর আয়াত থেকে বিরত রয়েছে এবং তা গ্রহণ করার ব্যাপারে অহংকার প্রকাশ করেছে।

হাদীসে বলা হয়েছে, অহংকারের কারণে যে ব্যক্তি ফুলে-ফেঁপে যায় এবং চাল-চলনে এর প্রভাব দেখা যায়, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হন। অহংকার, এর প্রকাশ এবং লোকজনের উপর এর প্রভাব বহু ও বিবিধ। এক ব্যক্তি থেকে

www.amarboi.org

আরেক ব্যক্তি, এক পরিবেশ থেকে আরেক পরিবেশ এবং এক যুগ থেকে আরেক যুগে এর পার্থক্য সূচিত হয়।

সন্তান কোন সময় বাপের কথা শুনতে চায় না। বাপের চাইতে অধিক শিক্ষা লাভ করায় গর্বের কারণে সে মাতা-পিতার অবাধ্য। তার ঠিকানা হচ্ছে দোযখ, যদি পিতা মাফ করে দেয় তাহলে রক্ষা। স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করতে চায় না। কেননা সে চাকুরীজীবি, কিংবা সে ধনী ও সুন্দরী হওয়ার কারণে স্বামীর অবাধ্য। তার স্বামী তাকে মাফ না করলে তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। যে ছাত্র ধন কিংবা বড় পদের কারণে ওস্তাদের উপর অহংকার করে সেও খুবই হীন। যে বিভাগীয় মন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপ্রধান তার অধীনস্থ লোকজনকে ঘৃণা করে এবং তাদের সাথে দাস সুলভ ব্যবহার করে, সে অহংকারী এবং আল্লাহর কাছে তার কোন মূল্য নেই। যে আলেম চায় যে জনগণ তার প্রতি বিনয়ী হোক কিংবা তার হাতে চুমু খাক এবং তার জুতা বহন করুক, সেও অহংকারী এবং তার চাইতে মূর্খ ব্যক্তি উত্তম।

অফিসের পরিচালক যদি উম্মাহর জন্য ক্ষতিকর কাজে ব্যাপৃত থাকেন এবং উপদেশ দিলে যদি রাগ করেন তাহলে গর্ব তার কল্যাণের দিককে ধ্বংস করে দেয়। ফলে কাগজে সই করার যোগ্যতাও সে হারিয়ে ফেলে। যে ওয়ায়েজ সম্মান চায়, মানুষের কাছ দিয়ে অতিক্রম করার সময় যদি লোকেরা তার সম্মানে না দাঁড়ায়, সাধারণ মানুষ তার মত নয়-এই অজুহাতে তাদের কাছে না যায়, কিংবা তার হুকুম দ্রুত বাস্তবায়ন না করায় তাদেরকে গাল-মন্দ করে, তারা সবাই অহংকারী এবং মোমিনদের জন্য বর্ণিত 'বিনয়' গুণ থেকে তারা বহু দূরে অবস্থান করে।

আমরা এখানে রাসূলুল্লাহর (সা) নিম্নোক্ত হাদীসের গুরুত্ব বুঝতে পারি। তিনি বলেছেন, হাশরের দিন অহংকারীদেরকে পুরুষের বেশে ছোট পিঁপড়ার আকারে উপস্থিত করা হবে। সকল দিক থেকে লজ্জা ও অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। তাদেরকে জাহান্নামে 'বুলাস' নামক কারাগারে টেনে নেয়া হবে। সেখানে কঠোরতম আগুন জ্বলতে থাকবে এবং তাদেরকে দোযখীদের 'তীনাতুল খাবাল' নামক পুঁজ ও ঘামযুক্ত ময়লা পানি পান করানো হবে।' (তিরমিযী, নাসাঈ)

অহংকার মনের মধ্যে স্থায়ী হয়ে গেলে তা ব্যক্তির অনুভূতি ও চিন্তার মালিকানা কেড়ে নেয়। এটাই হচ্ছে ব্যক্তির মনের সর্ববৃহৎ ব্যাধি। যে কোন অসচ্চরিত্র লোকের মধ্যে অহংকার বিদ্যমান আছে।

www.amarboi.org

অহংকার মোমিনকে আরেক ভাই-এর জন্য তা পসন্দ করতে দেয় না, যা নিজের জন্য পসন্দ করে এবং তাকে বিনয়ী হতেও দেয় না। অহংকারী হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত হতে পারে না এবং রাগ-গোস্বার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। সে নিজে হিংসাকে হজম করতে পারে না, কোন উপদেশদানকারীর উপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না, কোন শিক্ষিত ব্যক্তির শিক্ষা কবুল করে না, মানুষের সাথে রাগ-ক্ষোভ ও হিংসা-বিদ্বেষ সহকারে কথা বলে, চলা ও বলার সময় গর্ব প্রকাশ করে, উপদেশ দিলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। কথা বলার সময় জটিল কথা বলে, মানুষের সাথে বসলে নেতৃত্ব ও প্রথমে কথা বলার সুযোগ কিংবা অধিক সম্মান ও মর্যাদা না পেলে অসন্তুষ্ট হয়। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকারও আছে, সে বেহেশ্‌তে যাবে না। অহংকার তার সকল নেক চরিত্র ও গুণাবলীকে খেয়ে ফেলেছে। আল্লাহ আমাদেরকে অহংকার ও এর পরিণতি থেকে রক্ষা করুন।

অহংকারের প্রকারভেদ

অহংকার তিন প্রকার-

(১) আল্লাহর উপর অহংকার করা। এটা হচ্ছে সর্বনিকৃষ্ট অহংকার।

(২) রাসূলুল্লাহ (সা) উপর অহংকার। এটাও নিকৃষ্ট তবে প্রথমটার চাইতে অপেক্ষাকৃত কম নিকৃষ্ট।

(৩) নবী-রাসূল ছাড়া অন্য মানুষের উপর অহংকার করা। এটাও খারাপ। তবে ২য়টার চাইতে অপেক্ষাকৃত কম খারাপ।

আল্লাহর উপর গর্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা সর্বনিকৃষ্ট অহংকার। নাফরমানীর চরম পর্যায়ে পৌঁছলেই কেউ অজ্ঞতার কারণে অনুরূপ নাফরমানী করতে পারে। এ জাতীয় অহংকার সাধারণতঃ বড় বড় শাসক, বড় পদের অধিকারী এবং ধনীদের মধ্যে পাওয়া যায়।

আল্লাহর উপর গর্ব প্রকাশের উদাহরণ হচ্ছে, ফেরআউনের এই বক্তব্য ঃ 'আমিই তোমাদের সর্বাধিক বড় পালনকর্তা।' (সূরা নাযিআত : ৩৪) 'আমিই জীবন ও মৃত্যু দেই।' (সূরা বাকারাহ : ২৫৯)

কোরাইশদেরকে যখন আল্লাহ রাহমানের উদ্দেশ্যে সাজদার আহ্বান জানানো হল, তারা উত্তরে বলল, রাহমান কে? তুমি যাকে সাজদাহ করতে বল, আমরা কি তাকে সাজদাহ করবো?' (সূরা ফোরকান ঃ ৬০)

www.amarboi.org

আরবের কাফেরগণ মোহাম্মদ (সা) সম্পর্কে বলেন, 'এই কোরআন কেন দুই জনপদের কোন মহান ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হল না?' (সূরা যোখরুফ : ৩১)

ইবলিশ আদম (আ) সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমি তার থেকে উত্তম, আপনি আমাকে আগুন থেকে এবং তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা আরাফ : ১২)

বহু লোক অহংকারীদের গর্বের শিকার, লাঞ্ছিত ও অবহেলিত। গরীবরা ধনীদের অহংকারের শিকার, দুর্বলরা শাসক ও সরকারের গর্ব-অহংকারের শিকার, বহু লোক অহংকারী আলেমদের শিকার, ইয়াতীমগণ অভিভাবকের শিকার এবং মহিলারা শক্তিধর পুরুষদের শিকার। আল্লাহ সকল প্রতাপশালী শক্তিধরদের বিরুদ্ধে বান্দাহর সহায়ক। ধনীদের উচিত, কারুনের মত ধনীদের সাথে আল্লাহর নাযিলকৃত শাস্তি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। আল্লাহ কারুনকে বিপুল ধন সম্পদ দান করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'আমি তাকে সহ তার ঘর-বাড়ী মাটির নীচে চাপা দিয়ে দিয়েছি। আল্লাহর মোকাবিলায় তাকে সাহায্য করার জন্য আর কেউ এগিয়ে আসেনি এবং সে বিজয়ীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (সূরা আল কাসাস : ৮১)

অহংকারী শাসকদের উচিত, প্রজাদের উপর নির্যাতনের মোকাবিলায় কোরআনে বর্ণিত অহংকারী জালেম শাসকদের পরিণতি সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করা। ফেরআউন এক্ষেত্রে নাফরমানী ও বড়াইর শীর্ষে অবস্থান করত। সে নিজ জাতিকে এই ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছে, সকল কল্যাণ, অনুগ্রহ ও মর্যাদা তারই দান। সে জনগণকে লক্ষ্য করে বলেছিল, 'মিশরে কি আমার রাজত্ব নেই এবং আমার পায়ের নীচ দিয়ে কি এই নদী-নালাগুলো প্রবাহিত হচ্ছে না? তোমরা কি তা দেখতে পাও না?' (সূরা যোখরুফ : ৫১) সে মূসা (আ) সম্পর্কে বলেছে, 'আমি কি সেই নিকৃষ্ট লোকটি থেকে উত্তম নই যে নিজের কথা ভালভাবে প্রকাশ করতে পারে না?' (সূরা যোখরুফ : ৫২)

আলেমদের উচিত, তাদের মত অহংকারীদের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, এরপর মোমিনদের সাথে বিনীত ব্যবহার করা, নবীদের চরিত্র গ্রহণ করা, আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা, যা অন্যদেরকে দেয়া হয়নি এবং বনী ইসরাঈলের বালআম বাউর সহ অন্যান্য আলেমদের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন,

'যাদেরকে তাওরাত দেয়া হয়েছিল, পরে তারা তার অনুসরণ করেনি, তাদের উদাহরণ হচ্ছে সেই গাধার মত যে বই বহন করে।' (সূরা জুম'আ : ৫)

www.amarboi.org

যারা ইবাদত, সৌন্দর্য, শক্তি, বংশ মর্যাদা এবং অনুসারীর আধিক্যের কারণে গর্ব করে তাদের বোকামী সুস্পষ্ট, অজ্ঞতা পরিস্ফুট, তাদের প্রতি লোকজনের ক্ষোভ যথেষ্ট এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি অনেক বেশী।

অহংকারী লোকের কাহিনী

১. উবাই বিন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গর্ব করে। একজন আরেকজনকে বলে, আমি অমুকের পুত্র অমুক। এইভাবে সে তার ৯ জন পূর্ব পুরুষের গৌরব করে। তারপর বলে, তুমি কে? তোমার মা বেঁচে না থাকুক! তখন রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন, দুই ব্যক্তি মূসা (আ)-এর কাছে গর্ব করে। তখন আল্লাহ মূসার (আ) কাছে ওহী পাঠান এবং আদেশ দেন, অহংকারী ব্যক্তিকে বল, ৯ জনই দোযখী এবং তুমি তাদের ১০ম ব্যক্তি।' (যাওয়ায়েদ আল-মুসনাদ)

২. বর্ণিত আছে, 'এক ব্যক্তি বনি ইসরাঈলের এক 'আবেদের কাছে আসল এবং সাজদারত আবেদের ঘাড়ের উপর পা রাখল। আবেদটি বলল, পা তুলে নাও : আল্লাহর শপথ, আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না, আল্লাহ তার (নবীর মাধ্যমে) অহী পাঠিয়ে বলেন, আমার ব্যাপারে রায় দানের বিষয়ে হে বেপরোয়া! বরং আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না।' (আবু দাউদ, আল্লামা ইরাকী বলেছেন, হাদীসের সনদ ভাল)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এক ব্যক্তিকে ভাল বলে উল্লেখ করা হল। একদিন ঐ ব্যক্তিটি আসল। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার কাছে এই ব্যক্তিটি সম্পর্কেই উল্লেখ করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি তার চেহারায় শয়তানের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। ঐ ব্যক্তিটি রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে দাঁড়িয়ে সালাম করে। রাসূলুল্লাহ (সা) লোকটিকে লক্ষ্য করে বলেন, 'আমি তোমাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমার মনে কি এরূপ কথা জাগেনি যে, তোমার সম্প্রদায়ে তুমি ছাড়া আর কোন উত্তম লোক নেই? সে জওয়াবে বলল, হাঁ, অবশ্যই।' (আহমদ, বাজ্জার, দারে কুতনী, আল্লামা ইরাকী এটাকে দুর্বল হাদীস হিসেবে আখ্যায়িত করেননি, এই ঘটনায় দেখা যায় যে, অহংকার অস্থায়ীভাবে এসেছিল পরে ঈমান তাকে দূর করে দিয়েছে।)

হযরত হোযায়ফা (রা) নামাযে ইমামতি শেষে মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আপনারা আমাকে বাদ দিয়ে আরেকজন ইমাম তালাশ করুন কিংবা একাকী

www.amarboi.org

নামায পড়ুন। কেননা, আমার মনে অহংকার জেগেছে যে, আমার সম্প্রদায়ে আমি ছাড়া কোন উত্তম লোক নেই।'

সচেতন আত্মা ঈমানের আলোকে উজ্জীবিত হয় এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা বুঝতে পারে।

অনুরূপ আরেক ঘটনা তিবরানী উত্তম সনদ সহকারে আবদুল্লাহ বিন সালাম থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ কাঠের বোঝা মাথায় করে বাজারে চলার সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি তো ধনী লোক, আপনি কেন এই বোঝা মাথায় নিয়েছেন? তিনি জওয়াব দেন, আমার উদ্দেশ্য হল, অন্তর থেকে গর্ব দূর করা।

অহংকার থেকে বাঁচার উপায়

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের উপর অহংকার থেকে বাঁচার উপায় হল, আল্লাহ ও রাসূলের উপর দৃঢ় ও মজবুত ঈমান আনা। রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক আনীত বিষয়ের প্রতি ভালবাসা, তাঁর আনুগত্য করা, আল্লাহর কাছে বিনয়ী হওয়া এবং রাসূলুল্লাহর (সা) আনীত জিনিসের ব্যাপারে বিনয় প্রদর্শন করা, আল্লাহর উপর ঈমান আনার পর যদি বিনয় প্রদর্শন, আনুগত্য ও হুকুম পালন করা না হয় এবং তাঁর আদেশ নিষেধ ও উপদেশ না মানা হয়, তাহলে, সেটা হচ্ছে কুফরী এবং ঈমানের ব্যাপারে মিথ্যা দাবী।

অনুরূপভাবে, রাসূলের উপর ঈমান আনার পর যদি আত্মসমর্পণ, বিনয় ও হুকুম মানা না হয় এবং আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করা না হয়, তাহলে সেটাও ঈমানের মিথ্যা দাবী।

লোকজনের ব্যাপারে অহংকারের প্রতিকার হচ্ছে, অহংকার আল্লাহর দীনের দাওয়াত ও দীনের ব্যাপারে হলে তা থেকে বাঁচার উপায় হল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং দীনের ব্যাপারে ঈমান আনা এবং ঐ ব্যাপারে পুরো আনুগত্য করা ও হুকুম মানা।

আর অহংকার সংস্কৃতি, পদমর্যাদা, ধন, বংশ ইত্যাদি কারণে হলে নিম্নোক্ত উপায়ে প্রতিকার করা যেতে পারে–

(১) ব্যক্তিকে কোরআন ও হাদীসের সেই সকল আয়াত ও বিষয় পড়তে হবে যা অহংকার বিরোধী এবং যাতে দুনিয়া ও আখেরাতে অহংকারীদের শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। অহংকারীদের ক্ষতি ও লোকসান সম্পর্কে ভালভাবে বুঝতে হবে এবং তাদের প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করতে হবে। যে ব্যক্তি বুঝতে পারে, এক মুহূর্তের অহংকার তার জন্য চিরস্থায়ী দুঃখের কারণ হবে। যেমন, পায়ের ছোট

www.amarboi.org

গিরার নীচে অহংকারবশতঃ কাপড় পরা। যে ব্যক্তি অনুভব করে যে, অহংকারীদেরকে হাশরের দিন অপমান করে উঠানো হবে; যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার আছে সে বেহেশতে যেতে পারবে না; অহংকারীরা কেয়ামতের দিন জাহান্নামী হবে এবং অহংকারীরা আল্লাহর অসন্তোষের শিকার হবে, তাহলে সে আল্লাহর কাছে বিনয়ী হবে এবং সঠিক পথে ফিরে আসবে।

(২) অহংকারীর উচিত, তার জীবনের শুরু ও শেষ এবং জীবন ও মৃত্যুর দৃষ্টিকোণ থেকে আসল বিষয়টি বুঝা। যদি সে যথার্থ চিন্তা করতে পারে তাহলে সে গর্ব-অহংকারের কোন কারণ খুঁজে পাবে না। এর আগে সে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে। আল্লাহ বলেন,

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا.

অর্থ : 'মানুষের উপর কি এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়নি যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না?' (সূরা দাহর : ১)

তারপর আল্লাহ তাকে ঐ মাটি দিয়ে তৈরি করলেন যা পদদলিত করা হয়। আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ.

'আল্লাহর বহু নিদর্শনের মধ্যে একটি নিদর্শন হচ্ছে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা রূম : ২০)

তারপর সৃষ্টির ক্রমধারা মোতাবেক তাদেরকে নাপাক বীর্য থেকে তৈরি করেছেন। আল্লাহ বলেন,

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى.

' সে কি স্খলিত বীর্য ছিল না? (সূরা কিয়ামাহ্ : ৩৭)

তারপর আল্লাহ তাকে পরবর্তী উন্নত পর্যায়ে রূপান্তরিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ـ ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ.

www.amarboi.org

'এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, তারপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে হাড় সৃষ্টি করেছি, তারপর হাড়কে গোশত দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে এক নূতন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়! এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে, তারপর কেয়ামতের দিন তোমরা পুনরায় উঠবে।' (সূরা মোমিনুন : ১৪-১৬)

তারপর আর কি? তারপর সে আল্লাহর দেশ-দুনিয়ায় গর্ব অহংকার সহকারে চলা-ফেরা করে, নিজের কোন উপকার বা অপকার কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না। হাঁ, ততটুকুই পারে যতটুকু আল্লাহ চাইবেন, সে প্রতিনিয়ত ক্ষুধা-পিপাসা, রোগ-শোক, ঠাণ্ডা-গরম, ভুল-ভ্রান্তি, অলসতা-উদাসীনতা, দুশ্চিন্তা-পেরেশানী এবং উৎকণ্ঠা-উদ্বেগের সম্মুখীন হয়, ধ্বংসাত্মক খাবার গ্রহণ করে, চিকিৎসার অনুকূল ঔষধ অপসন্দ করে, নিজের সমস্যাদির ব্যাপারে লোকজনের কাছে অভিযোগ ও কান্নাকাটি করে যেন লোকেরা তার উপর দয়া প্রদর্শন করে সাহায্য করে। কখনও সে পেরেশানীর মুহূর্তে শান্ত্বনাদানকারীর অন্বেষণ, রোগের মুহূর্তে চিকিৎসকের তালাশ, আর অন্য আরেক অভাবী ব্যক্তি খাদ্য ও পানীয় দানকারীর পেছনে হন্যে হয়ে ছুটে।

তার জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সমস্যা ও সংকট আর তার প্রত্যেক সন্তানের রয়েছে প্রয়োজন। এই যার জীবন ও সংকট, তার উচিত আল্লাহর অনুগত হওয়া, আল্লাহর রাসূলের অনুগত হওয়া এবং আল্লাহর বান্দাহদের অনুগত হওয়া।

(৩) লোকজনের বুঝা উচিত, একমাত্র আল্লাহর হাতেই তাদের নিয়ন্ত্রণ। তারা সর্বদাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী, আল্লাহর সন্তোষ, রহমত ও ক্ষমা তাদের দরকার। মৃত্যুর দিন হচ্ছে, আল্লাহর কাছে রওনা হওয়ার সূচনা। প্রথম যে মুহূর্তে তাকে দুনিয়ার আমলের বিনিময়ের জন্য ডাকা হবে তখন তার প্রতিটি কাজ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। অথচ সে নিজের মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই জানে না যে তার কাছে রহমতের ফেরেশতা আসবে, না কি আজাবের ফেরেশতা আসবে এবং কবরে দুই ফেরেশতার প্রশ্নের জওয়াব দিতে পারবে কিনা, না কি বিভ্রান্ত হবে। তার কবর কি বেহেশতের বাগান হবে কিংবা দোযখের গর্ত হবে? হাশরের দিন কি তাকে নেক লোকদের সাথে উঠানো হবে না সে পাপীদের কাতারে স্থান পাবে? সে কি শক্তিধর আল্লাহর কাছ থেকে সন্তুষ্টি না অসন্তুষ্টির কথা শুনবে? সে কি মোত্তাকী লোকদের সাথে হাশরে উঠবে না অপরাধীদের সাথে দোযখে যাবে?

www.amarboi.org

সে কি নিজ পরিবার-পরিজনকে নেয়ামতের মধ্যে দেখবে, না অপমান ও লজ্জার সাগরে হাবুডুবু খেতে দেখবে?

এ সকল প্রশ্নকে সামনে রাখলে কোন অহংকারী কি অহংকারের কোন কারণ খুঁজে পেতে পারে? আল্লাহ্ তা'য়ালা যথার্থই বলেছেন,

فَاِنَّهَا لاَتَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ.

'চোখ অন্ধ নয় বরং বুকের ভেতর যে অন্তর রয়েছে সেটাই অন্ধ।' (সূরা হজ্জ : ৪৬)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوْرًا فَمَالَهُ مِّنْ نُّوْرٍ.

'আল্লাহ যে ব্যক্তির জন্য আলো (নূর) রাখেননি, তার জন্য আর কোন আলো (নূর) নেই।' (সূরা নূর : ৪০)

(৪) অহংকারীর দেখা উচিত সে কোন্ বিষয়ের উপর অহংকার করছে। যদি তা ইলম বা জ্ঞান হয়, তাহলে জ্ঞান যত বেশীই হোক না কেন তাতে জ্ঞানের তুলনায় অজ্ঞতার পরিমাণই বেশী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন,

وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً.

'তোমাদেরকে খুব সামান্যই জ্ঞান দান করা হয়েছে।' (সূরা বনি ইসরাঈল : ৮৫)

হযরত মূসা (আ) নবী ও রাসূল ছিলেন এবং সরাসরি আল্লাহ্র কাছ থেকে জ্ঞান পেয়েছিলেন। তাঁর কাওমের কোন লোক জ্ঞানের দিক থেকে তাঁর সমকক্ষ ছিল না। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁকে খিজর (আ)-এর কাছে জ্ঞান শিক্ষার আদেশ দেন যাতে করে কেউ একথা বলতে না পারে 'আমি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী।'

অনুরূপভাবে, হযরত সোলাইয়ামান (আ) নবী ছিলেন এবং স্বয়ং আল্লাহ্র কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করেন। এ ব্যাপারে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। তা সত্ত্বেও হুদহুদ পাখী তাঁকে বলল,

اَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَقِيْنٍ.

'আমি যা জানি আপনি তা জানেন না। আমি সাবা সম্প্রদায় সম্পর্কে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।' (সূরা নামল : ২২)

মানুষের বুঝা দরকার, পাখী কীট-পতঙ্গ এবং প্রাণীর তৎপরতায় তারা পরস্পর পরস্পরের স্বভাব-প্রকৃতি বুঝতে পারে। এ ব্যাপারে চিন্তা করে মানুষের হয়রান-পেরেশান হওয়া ছাড়া উপায় নেই। অজ্ঞতার সামনে তাকে মাথা ঝাঁকি দিতে হয়। তারপরও তার জানা নেই, কেয়ামতের ভয়াবহ দিনে জ্ঞান তার পক্ষে না

www.amarboi.org

বিপক্ষে দাঁড়াবে। এ একটি মাত্র চিন্তাই মানুষের পিঠ কুঁজো করার জন্য যথেষ্ট।

(৫) যদি বংশ-মর্যাদার কারণে অহংকার করেন, তাহলে, তার নির্যাস হল কাদা ও পানি। তারপর এক ফোঁটা বীর্য ও রক্তের টুকরা। তার বাপ-দাদারা নিজেদের গুণাবলী, চরিত্র ও নেক আমল দ্বারাই কেবলমাত্র সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছে। সেও যদি তাদের অনুরূপ কাজ করে তাহলে, সে রকম মর্যাদা পাবে তা তাদের বংশের কারণে নয়। নিজের খারাপ গুণাবলী থাকলে বাপ-দাদার শৌর্য-বীর্য ও বংশ মর্যাদার কারণে তার মর্যাদা বাড়বে না। এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন,

তুমি যদি বাপ-দাদার শৌর্য-বীর্যের গর্ব কর

তাতে তুমি সত্যবাদী;

তবে তারা কতইনা মন্দ সন্তান জন্ম দিয়েছে।

(৬) সৌন্দর্যের কারণে গর্ব করলে জেনে রাখ, এটা বোকা মহিলাদের অভ্যাস। নিজের প্রতি চিন্তাশীল জ্ঞানীদের দৃষ্টি দান করলে নিজের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হতে বাধ্য এবং গর্ব-অহংকার থেকে সরে এসে নিজের বাসের জন্য একটি কবর খুঁড়তে সক্ষম হবে। জ্ঞানী ব্যক্তি গর্ব-অহংকারের উপকরণের দিকে তাকানোর আগে বিনয়ের উপকরণের দিকে তাকায়। অন্যথায় তাকে অহংকারী ময়ূর বলা শ্রেয়, কোন চিন্তাশীল মানুষ বলা ঠিক নয়।

ইমাম গাজালী 'এহইয়াউল উলূম' গ্রন্থে লিখেছেন, সে যখন চলে, তখন তার পাকস্থলীতে পায়খানা, পেশাবের থলিতে পেশাব, নাকে শ্লেষ্মা, কানে ময়লা, বগলের নীচে দুর্গন্ধ, ময়লা থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, পেটের মধ্যে ময়লা স্থায়ীভাবে স্থান করে নিয়েছে এবং মৃত্যুর পরে দুর্গন্ধযুক্ত লাশে পরিণত হবে। তাহলে, কিসের অহংকার?

এরপরও যদি অসুস্থ হয় তাহলে সৌন্দর্য বিদায় নেয় এবং দুশ্চরিত্রের অধিকারী হলে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়।

(৭) ধন-সম্পদের ঐশ্বর্যের কারণে অহংকার হলে জেনে রাখা উচিত, দুর্বল চিত্তের অধিকারী মানুষই কেবল নিজের হাতে যা আছে তা দিয়ে লোকদের কাছে গর্ব করে। কিন্তু যদি তার হাতের সম্পদ চুরি হয়ে যায় তাহলে সে অপমানিত হবে, পুড়ে গেলে কিংবা পানিতে ডুবে গেলে পেরেশান হবে, গুদামে গুদামজাত করে রাখলে সারা জীবন দুর্ভাগ্যের শিকার হবে। কেননা, সে কেবলমাত্র অপরের জন্য তাকে পাহারা দিয়ে রেখেছে। নিজের জন্য কিংবা আগামীকালকের জন্য অথবা মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাত দিবসের জন্য তা থেকে কিছু ব্যয় করেনি। আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন বঞ্চিতের উপর তার গর্ব প্রকাশ পেলে নেয়ামতের

www.amarboi.org

প্রতি তা কৃতজ্ঞতা নয়। বিবেকের দৃষ্টিতে এটা ইনসাফ নয় যে, সম্পদশালী ব্যক্তি মূলত অন্যের জন্য সম্পদ বৃদ্ধি করবে এবং পাহারা দিয়ে তার উপর আবার গর্বও করবে। ধনীরা সমাজে এরূপই করে। অহংকারী ব্যক্তি আল্লাহর দানের শুকরিয়া আদায় করে না এবং যে সকল লোকেরা তার সম্পদ বাড়াল ও সংরক্ষণ করল, তাদের শুকরিয়া আদায় করে না। আল্লাহ্ তাদের ন্যায় অহংকারীদের সাথে কি ধরনের আচরণ করেছেন, তা যদি তারা জানত, তাহলে আল্লাহর বান্দাহদের কাছে বিনীত হত এবং তাদের কাছেও প্রশংসার বাণী পেশ করত।

(৮) যদি ক্ষমতা, পদ ও শক্তির কারণে অহংকার হয়, তাহ্লে তাকে বলা দরকার, তোমার পকেটে যে অর্থ আছে তুমি যাদের উপর গর্ব করছ তাদের ঘামের বিনিময়ে তা এসেছে, তোমার সিংহাসন, চেয়ার, গাড়ী ও সুন্দর পোষাকের পেছনে রয়েছে সেই জাতির ঘাম ও পরিশ্রম, যাদের উপর তুমি অহংকার করছ। গর্বের কারণে তুমি উম্মাহর দেহে বিষফোঁড়া এবং তাদের পেটের জন্য মহামারী।

হে অহংকারী! যাদের উপর অহংকার করছ তোমার এ পদ তাদের দেয়া পারিশ্রমিকের বিনিময় এবং তুমি জাতির সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার আমানতদার। তুমি যদি অহংকার দ্বারা তোমার জাতির আমানতের খেয়ানত করছ বলে বুঝতে না পার এবং জাতির কাছে অপরাধী বলে উপলব্ধি করতে না পার, তাহলে এ পদ অন্যের জন্য ছেড়ে দাও, লোকদেরকে তোমার জুল্ম, জবরদস্তি ও গর্ব থেকে বাঁচতে দাও। এরপর চিন্তা করে দেখ, তোমাকে কি কেউ সম্মান ও মর্যাদা দেখানোর মত অবশিষ্ট থাকছে? তোমার পদ জনগণের কাছে মর্যাদার প্রতীক, তাই তুমি সে পদে বসে দয়া প্রদর্শন কর। আজ তোমার এ পদ থেকে সম্মানসূচক প্রস্তাবের কাগজ বের হয়। হুঁশিয়ার থাক, আগামীকাল হয়তো একই অফিস থেকে অপমান ও দৈন্যের প্রস্তাবের কাগজও বের হতে পারে। আজ যে অফিসের চাকচিক্যে তুমি ফুলে-ফেঁপে আছ, সাবধান! হয়তো আগামীকাল একই অফিসের ঝাড়ুদারের ঝাড়ু দ্বারা তুমি বিতাড়িত হতে পার। তুমি গর্বের দ্বারা তোমার সম্প্রদায়ের কাছে চতুর্দিক থেকে অভিশাপের দরজা উন্মুক্ত করছ এবং তোমার সন্তানদের জন্য সকলের ঘৃণা ও লাঞ্ছনা টেনে আনছ। কেননা, লোকেরা বলাবলি করবে, এ ছেলের পিতাকে পরিচালক বানিয়ে জাতি যেন নিজের জন্য মারাত্মক রোগ ডেকে এনেছে।

(৯) যদি অন্যের তুলনায় বেশী ইবাদতের কারণে গর্ব সৃষ্টি হয়, তাহলে, জেনে রাখা দরকার, শেষ পরিণতি আল্লাহর হাতে। কেউ নিজ মৃত্যুর পরিণামসমূহকে

www.amarboi.org

জানে না। কেউ জানে না মৃত্যুর দিন আল্লাহ তাকে খাঁটি ইবাদাতের উপর টিকিয়ে রাখবেন না, তাকে অপমান করবেন। ফলে সে আল্লাহ ও বান্দার হক পালনের বেলায় দোষী-অপরাধী পরিগণিত হবে। কেউ লম্বা দাঁড়ি রাখল, যার দাঁড়ি নেই তাকে ঘৃণাও করল। কিন্তু দাঁড়ি রেখে অহংকার করার ফলে যে গুনাহ হল, শত দাঁড়ি দ্বারাও এর ক্ষতি পূরণ হবে না। অনুরূপভাবে, আল্লাহর দীনের কোন দাঈ' যদি দাওয়াতের কারণে গর্ব করে তাহলে, তাদের অপরাধের দাবী হচ্ছে সবাইকে ডেকে বলা, আমি তোমার জন্য ক্ষমা ও মার্জনা কামনা করি। আমি তোমার ব্যাপারে অপরাধী। আমাকে দয়া করে মাফ কর। আল্লাহও যেন আমাকে মাফ করেন। নতুবা আমি ধ্বংস হয়ে যাব। ঘৃণা ও গর্বের কারণে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে বহু 'আবেদের অন্তর রোগাক্রান্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে, আল্লাহর কাছে বিনয়ের কারণে বহু পাপীর জন্য হেদায়েতের দরজা খুলে গেছে।

(১০) খারাপ লোকের সংস্পর্শ এবং দুর্বল চিত্তের অধিকারীদের সাহচর্যের কারণে যদি গর্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে জেনে নিতে হবে যে, তারা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মোনাফেকী করে, মন্দ পাত্রের বিষাক্ত পানীয় উজাড় করে ঢালে, ধনী, নেতা, প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রসিদ্ধ লোকদের প্রশংসা করে তাদের কান ভারী করে, নিজেদের মন্দ কাজকে সুন্দর করে পেশ করে, অন্যায় ও বাতিলকে সঠিক বলে প্রমাণ করার চেষ্টা চালায় এবং প্রত্যেক গোমরাহীর মরীচিকার পেছনে ধাবিত হয়। তারা উল্লিখিত লোকদের চারপাশে অবস্থান করে, যে পর্যন্ত না তাদেরকে শেষ করে। তারপর তাদেরকে অর্থহীন ও অকল্যাণকর স্তূপে পরিণত করে ছাড়ে।

আমরা গর্ব-অহংকারের কারণগুলো বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছি যে, এগুলোর বিপদ কত মারাত্মক, যার ফলে ব্যক্তি ও সমাজের বিরাট ক্ষতি হয়।

প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও বান্দাহদের সামনে বিনয়ী হওয়া এবং কোন মানুষের উপর নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে না করা।

বিনয়ের মর্যাদা

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا.

www.amarboi.org

'আল্লাহ-রাহমানের বান্দাহ তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে সালাম।' (সূরা ফোরকান : ৬৩)

'নম্রভাবে চলা'র অর্থ হচ্ছে, ধীরে-সুস্থে ও বিনয়ের সাথে চলা। আল্লাহ আরও বলেন, وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ 'মোমিনদের জন্য তোমার বাহু বিনীত কর।' (সূরা হিজর : ৮৮)
আল্লাহ বলেন, 'আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে।' (সূরা কাহাফ : ২৮)
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰى اِلَىَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لاَ يَفْخَرَ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ وَلاَ يَبْغِىْ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ.

'আল্লাহ তোমাদেরকে বিনয় অবলম্বনের জন্য আদেশ পাঠিয়েছেন যাতে করে তোমরা একে অপরের উপর গর্ব না কর এবং একে অপরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না কর।' (মুসলিম, আবু দাউদ)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ.

'দান-সদকাহ দ্বারা সম্পদ কমে না, ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ বান্দাহর ইজ্জত-সম্মান বাড়ান এবং কেউ আল্লাহর কাছে বিনয়ী হলে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।' (মুসলিম, তিরমিযী)

ওমার বিন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে এভাবে বিনয়ী হয়, (এই বলে তিনি হাত মাটিতে রাখেন) আমি এভাবে তার মর্যাদা বাড়াই। (এ বলে তিনি হাতকে উর্ধ্বাকাশের দিকে তুলে দেখান) (আহমদ ও বাজ্জার। বর্ণনাকারীগণ বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনায় গ্রহণযোগ্য)

www.amarboi.org

বিনয়ের ব্যাপারে গল্প ও উপদেশ

(১) তারেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওমার (রা) আবু ওবায়দাহ (রা) সহকারে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তারা একটা পানি পান কেন্দ্রে উপস্থিত হন। ওমার (রা) একটি উষ্ট্রীর উপর ছিলেন। তিনি নেমে পড়েন এবং পায়ের মোজা খুলে নিজ কাঁধের উপর রেখে উষ্ট্রীর লাগাম ধরে চলতে শুরু করেন। আবু ওবায়দাহ (রা) বলেন, হে আমীরুল মোমিনীন! আপনি এরূপ করবেন? শহরবাসীরা আপনাকে এমতাবস্থায় দেখলে আমার কাছে তা ভাল লাগবে না। তিনি 'উহ' উচ্চারণ করেন এবং বলেন, 'হে আবু ওবায়দাহ! তুমি ছাড়া অন্য কেউ এরূপ বললে আমি তাকে উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য (শিক্ষামূলক) উপযুক্ত শাস্তি দিতাম। আমরা ছিলাম অসম্মানিত সম্প্রদায়, আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারুর কাছ থেকে সম্মান লাভ করার চেষ্টা করলে আল্লাহ আমাদেরকে বেইজ্জত করবেন।'

(২) দাইনূরী হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদিন ওমার (রা) গরমের মওসূমে চাদর মাথায় দিয়ে বের হন। তাঁর পাশ দিয়ে গাধার উপর আরোহণ করে একটি বালক অতিক্রম করছিল। তিনি বলেন, হে বালক! আমাকে তোমার সাথে তুলে নাও। বালকটি গাধার উপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে এবং ওমার (রা) কে বলে, হে আমীরুল মোমিনীন! সওয়ার হোন। খলিফা বলেন, 'না'। তুমি আগে সওয়ার হও, আমি তোমার পেছনে আরোহণ করব। তুমি কি চাও যে, আমি নরম জায়গায় আরোহণ করি আর তুমি শক্ত জায়গায় আরোহণ করবে? তিনি বালকের পেছনে সওয়ার হলেন এবং শহরে প্রবেশ করলেন। লোকেরা তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। (মোন্তাখাবের ৪র্থ খণ্ডের ৪১৭ পৃষ্ঠায়ও এ ঘটনা বর্ণিত আছে)

(৩) ইবনে সা'দ, আহমদ এবং অন্যরা আবদুল্লাহ রুমী থেকে বর্ণনা করেছেন। ৩য় খলীফা ওসমান (রা) রাতে নিজেই অজুর পানি তুলতেন। তাঁকে বলা হল, আপনি কোন চাকরকে পানি সংগ্রহ করে দিতে বললেই যথেষ্ট হত। তিনি উত্তরে বললেন, না, রাত তাদের জন্য এবং তারা বিশ্রাম নেবে। (আল-কাঞ্জ- ৫ম খণ্ড, ৪৮ পৃঃ)

ইবনে সা'দ আবু বকর সিদ্দিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, খেলাফতের আগে আবু বকর (রা) ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি মহল্লার লোকদের পশুর দুধ দোহন করতেন। খলীফা হিসেবে বাইয়াত গ্রহণের পর মহল্লার একটি মেয়ে বলল, এখন

www.amarboi.org

আর আমাদের দুগ্ধবতী পশু দোহন করা হবে না। আবু বকর (রা) তা শুনে বলেন, শপথ করে বলছি, আমি তোমাদের দুধ দোহন করবো। আমি আশা করি যে, আগে আমি মানুষের যে সেবা করেছি, বর্তমানে খলীফা হওয়ার পর তাতে কোন পরিবর্তন হবে না। তিনি পরবর্তীতেও তাদের পশুর দুধ দোহন অব্যাহত রেখেছেন।

(৪) বোখারী তাঁর 'আদব' গ্রন্থে কাপড় বিক্রেতা সালেহ থেকে এবং তিনি নিজ দাদী থেকে বর্ণনা করেছেন। আমি আলী (রা) কে এক দেরহাম মূল্যের খেজুর কিনে তা বহন করে নিতে দেখেছি। আমি তাঁকে বললাম কিংবা অন্য কোন পুরুষ তাঁকে বলল, হে আমিরুল মোমিনিন, আমাকে বহন করতে দিন।' তিনি উত্তরে বলেন, না; ভরণ-পোষণকারী ব্যক্তিই বোঝার সর্বাধিক যোগ্য।

(৫) ইবনে সা'দ সাবেত থেকে বর্ণনা করেছেন। সালমান ফারেসী (রা) মাদায়েনের গভর্ণর ছিলেন। সিরিয়ার বনি তাইমিল্লাহ গোত্রের এক ব্যক্তির কাছে ছিল ডুমুরের বোঝা। সালমান ফারেসীর (রা) পরনে ছিল একটি অনারব পায়জামা ও আল-খেল্লা। লোকটি সালমান ফারেসীকে চিনতে পারেনি। বরং তাঁকে সাধারণ শ্রমিক মনে করে ডুমুরের বোঝা বহনের আহ্বান জানায়। সালমান ফারেসী (রা) বোঝা তুলে নেন। কিন্তু লোকেরা তা দেখে বলল, তিনি তো গভর্ণর। লোকটি বলল, আমি তো আপনাকে চিনতে পারিনি। সালমান ফারেসী (রা) বলেন, আমি তোমার ঘর পর্যন্ত পৌঁছার আগে ক্ষান্ত হবো না। আমি কাজটি করার নিয়ত করেছি। সুতরাং তোমার ঘরে পৌঁছার আগে তা রাখব না।

(৬) ইবনুল মোবারক বিনয়ের ব্যাপারে বলেছেন, তোমার অপেক্ষা কম অর্থশালী লোকের কাছে বিনয়ী হওয়াই হচ্ছে আসল বিনয়। যাতে করে তুমি অনুভব করতে পার যে, তার উপর তোমার দুনিয়াদারীর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। পক্ষান্তরে, তোমার চাইতে ধনী ব্যক্তির কাছে তুমি উন্নত শির হও, যাতে করে তুমি অনুভব করতে পার যে, তোমার উপর তার দুনিয়াদারীর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

(৭) কাতাদাহ (রা) বলেছেন, যাকে অর্থ-সম্পদ, সৌন্দর্য, পোষাক কিংবা জ্ঞান দান করা হয়েছে, সে যদি বিনয়ী না হয়, তাহলে এগুলো কেয়ামতের দিন তার জন্য বিপদ হবে।

(৮) ইউনুস বিন ওবায়েদ আরাফাত থেকে ফিরে এসে বলেছেন, আমি তাদের সাথে থাকায় রহমতের বিষয়ে সন্দেহ করি না। তবে আমার আশংকা হয়, আমার কারণে তারা বঞ্চিত হল কি না।

www.amarboi.org

(৯) মালেক বিন দীনার বলেন, মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে কেউ যদি আহ্বান করে যে, তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম কে সে যেন বেরিয়ে আসে, তাহলে আল্লাহর কসম, আমার আগে কেউ বের হতে পারবে না। তবে সে ব্যক্তি ব্যতিক্রম যার শক্তি ও দৌড়ের গতি অধিকতর।

গর্ব অংহকারের সকল লক্ষণ মানুষের আচরণ থেকে বিদায় নেয়া উচিত এবং তার স্থলে বিনয় স্থান পাওয়া জরুরী। বিনয় হচ্ছে, গর্ব-অহংকারের একমাত্র চিকিৎসা।

২. সম্পদের গরিমা

ইমাম গাযালী (রহ) তাঁর 'ইহয়াউল উলূম' গ্রন্থে লিখেছেন, সম্পদের গরিমার কারণে মানুষ নেয়ামতদানকারী মহান আল্লাহকে ভুলে যায় এবং নিজেই সম্পদ সংগ্রহের আত্মম্ভরিতা করে। সম্পদ, সৌন্দর্য, জ্ঞান ও বীরত্বের ব্যাপারেই সাধারণতঃ এরূপ আত্মগরিমা সৃষ্টি হয়। তারা মনে করে যে এ পূর্ণতা তাদের ব্যক্তিগত কারণে হয়েছে, এর পেছনে আল্লাহর কোন অবদান বা দয়া নেই এবং তা তাদের কাছ থেকে কোন দিন বিদায় নেবে না।

এ আত্মম্ভরিতার ফলে, মানুষ গুনাহর প্রতি উদাসীন হয়ে যায় এবং একে ছোট বিবেচনা করে। এটাই ধ্বংসের কারণ। অন্যদিকে, এ মনোভাব অল্প ইবাদত ও নেক কাজকে বড় বিবেচনা করতে বাধ্য করে। আত্মম্ভর লোক নিজ আত্মা ও বিবেক দ্বারা প্রতারিত হয়। অন্যের উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করে না। এর মাধ্যমে সে বিজ্ঞতার সকল দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয় এবং নিজেকে এক ঘরে করে ফেলে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও আশ্রয় চাই। তিনি যেন আমাদের সবাইকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

মূলত সম্পদের গরিমা ও আত্মরম্ভরিতা হচ্ছে, অহংকারের সূচনা। তাই অহংকার থেকে বাঁচার একই পদ্ধতি এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সম্পদ, জ্ঞান, সৌন্দর্য ও বীরত্বের গরিমা থেকে সৃষ্ট ছোট গুনাহ শেষ পর্যন্ত অহংকারের বড় গুনাহ পর্যন্ত নিয়ে ছাড়ে। প্রথম পর্যায়ের এ গুনাহর প্রতিকার অহংকারের চাইতে সহজতর।

৩. রাগ

ইমাম গাযালী (র) তাঁর 'ইহইয়াউল উলূম' গ্রন্থে রাগের সাথে হিংসা ও ঈর্ষার কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা, রাগ বা গোস্বাই হিংসা ও ঈর্ষার জন্ম দেয়। এ দুটো রোগ ব্যক্তি ও সমাজকে ধ্বংস করে দেয়। এছাড়া রাগ থেকে অন্যান্য

www.amarboi.org

ফেতনাও সৃষ্টি হয়। তবে হিংসা ও ঈর্ষার ক্ষতি অধিক। মূলতঃ রাগ হচ্ছে এমন জিনিস যাকে না তাকওয়া প্রতিহত করতে পারে, আর না পারে মানুষের আঁকড়ে থাকা উপকারী অন্য কোন নীতি। রাগ এক মারাত্মক ব্যাধি যার ক্ষতি ও খারাপ পরিণতির কোন সীমা নেই। বিশেষ করে রাগের সাথে ক্ষমতা যোগ হলে রাগ, ক্ষমতা ও পদবীর সাথে পৃথকভাবে কিংবা যৌথভাবে অসীম ক্ষতি করে। তখন তাকে অপরাধ ও জুলুম থেকে বিরত রাখার কেউ থাকে না। ফলে, সে ক্ষমতার দাপটে মানুষের ঘাড় মটকায় ও তাদের মানবতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়।

বিংশ শতাব্দী অন্যায়ের জন্য রাগে ভর্তি ছিল। এ শতাব্দীতে জনগণের জন্য নির্বাসন ও কারাগার তৈরি করা হয়েছে। যারা শাসকদের সাথে সখ্যতা রাখে না তাদেরকে আটক করা হচ্ছে, সকল পরিবারে দুঃখ-কষ্ট ও বেদনা প্রবেশ করানো হচ্ছে এবং প্রত্যেক পরিবারের উপর জুল্‌ম-নির্যাতন চালানো হচ্ছে।

যদি কোন মানুষকে বিমানে করে উপরে পাঠানো হয়, তারপর সে যদি দূর্বীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখে, তাহলে দেখতে পাবে, প্রতিদিন যমীনে জবেহকৃত পশু-পাখীর রক্তের সমান মানুষের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। এটা শুধু রাগের ফসল এবং হিংসা ও প্রতিহিংসার পরিণতি।

ধনী ও অপচয়কারী এবং ক্ষমতাসীন শাসক গোষ্ঠী ছাড়া বেশী রাগ আর কারও নেই। তারা লোহা ও আগুনের শাসন চালায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বত্র শাসনের যে ডাণ্ডা দেখা যায় সর্বত্র জনগণের সাথে তারা তা দিয়ে খেলা করে।

ইমাম গাযালী বলেছেন,[১] রাগ হচ্ছে, অন্তরে সুপ্ত আগুনের ফুলকি এবং ছাই এর নীচে জ্বলন্ত কয়লা, দাপট প্রদর্শনকারীদের অন্তরে সুপ্ত অহংকার সহ অন্যান্য কারণ একে প্রকাশ করে থাকে।

মানুষ কেন, প্রতিটি প্রাণীর মধ্যেও রাগ হচ্ছে সহজাত প্রবৃত্তি। কোন কোন সময় রাগ করা জরুরী হয়ে পড়ে। তবে অধিকাংশ সময় রাগ করা নিকৃষ্ট ও মন্দ কাজ। কোন মানুষ যদি নিজ সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির উপর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রাগ করে, সে রাগ প্রশংসিত। শুধু তাই নয়, ঐ আগ্রাসনের প্রতিরোধের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। কোন কোন সময় এ জাতীয় রাগ ওয়াজিব। একজন মুসলমান এতটুকুন রাগ করতে পারে যতটুকুন ইসলাম অনুমতি দেয় কিংবা যাতে দীনের পূর্ণতা বিধান হয়।

---

১. ইহইয়াউল উলূম।

www.amarboi.org

যে ব্যক্তি তার সম্মানে কেউ না দাঁড়ালে, অথবা অন্যের উপর তাকে অগ্রাধিকার না দেয়ার কারণে রাগ করে কিংবা কারুর উপর জুল্ম করার আগ্রহ বাস্তবায়ন না করতে পেরে রাগ করে, অথবা সে জাতির অভিভাবক হতে চায়, কিন্তু জাতি এর বিরোধিতা করায় সে রাগ করে, তার এই রাগ-ক্রোধ হচ্ছে জাহিলিয়াত, শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। লোকেরা তার কোন অধিকার কেড়ে নেয়নি। মানুষ তো আর এমন উন্মুক্ত পশু নয় যারা তার লোভ-লালসা পূরণের জন্য নিজেদের জান-মাল অকাতরে বিলিয়ে দেবে। বর্ণিত কারণসমূহের প্রেক্ষিতেই মানুষ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রাগ করে থাকে।

কোন সুস্থ মানুষের রাগের সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন করা সম্ভব নয়। তবে প্রতিকার সম্ভব। রাগের প্রতিকার হচ্ছে, আল্লাহর হুকুমের গণ্ডির কাছে রাগ বন্ধ করা, রাগের ফলে এর ক্ষতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া, মনকে ভয় ও আশার বাণীর আলোকে প্রস্তুত করা, বিজ্ঞ ও পণ্ডিত লোকের মজলিশে বসা, ভাল ও নেক সাথী বৃদ্ধি করা, নামায, রোযা, যিকর ও কোরআন পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর অধিকতর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা, চিকিৎসার জন্য মনের গভীরে রাগের কারণ ও উৎস খুঁজে বের করা ইত্যাদি। কোন কোন সময় অহংকার, আত্মম্ভরিতা, সম্মান-সম্ভ্রম, ধন-সম্পদ, ইল্ম-জ্ঞান এবং ইবাদত রাগের উৎস হতে পারে। কোন কোন সময় এসবগুলো একজনের মধ্যেই পাওয়া যায়, যাকে শয়তান মানুষের আকৃতিতে বিকৃত করে দিয়েছে।

কোরআনের এ আয়াতে প্রশংসিত রাগের উল্লেখ করা হয়েছে।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ.

'মোহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল। তিনি এবং তাঁর সাথীরা কাফেরদের ব্যাপারে বজ্র কঠোর এবং নিজেরা পরস্পর রহম দিল। (সূরা আল ফাতাহ : ২৯)

নিম্নোক্ত আয়াতে খারাপ রাগের বর্ণনা করা হয়েছে,

اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ.

'কেননা, কাফেররা তাদের অন্তরে মূর্খতা যুগের রাগ পোষণ করত।' (সূরা আল ফাতাহ : ২৬)

আমরা রাগ সম্পর্কিত কোরআন ও হাদীস পড়ে দেখতে পাই যে, এগুলো

www.amarboi.org

আমাদেরকে রাগ প্রশমন এবং এর পেছনে না দৌড়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করে। রাগ মানুষের বুদ্ধি-বিবেক লোপ করে দেয়। তখনই ভুল হয় এবং জুলুমের উৎপত্তি হয়। এ ক্রোধ মানুষের জন্য মন্দ ডেকে আনে।

তবে, রাগ যদি প্রশংসিত পর্যায়ের হয়, তখন ধীরে-সুস্থে কাজ করলে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ থাকে। সে জন্য রাগের সময় ধীরে-সুস্থে কাজ করি। কাজের পরিণাম চিন্তাকারীকে 'হালিম' বা সবরকারী বলা হয়। আল্লাহর কাছে তার এই ধৈর্যের সওয়াব রয়েছে। অপরদিকে, রাগের পেছনে দৌড়ানো ব্যক্তি সমস্যার শিকার হয় বরং বোকা হিসেবে পরিচিত হবে।

আমরা রাগের ক্ষমতা ও শক্তি সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দিতে পারবো না। এটা সম্ভব নয়। এটা মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে স্বাভাবিক ও সহজাত। কোন কোন সময় অভ্যাস ও ঐতিহ্য রাগ সৃষ্টির কারণ হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন হিজড়া যুবক যদি যুবতীর পোষাক পরে এবং যুবতীর বেশে চলে, তারপর যুবতীদের পরিবেশে আনা-গোনা করে, তাতে সে কোন লজ্জা-শরম অনুভব করে না। কিন্তু তাকে এ বিষয়ে কিছু বললে, সে রাগ করে। তাই দেখা যায়, পরিবেশ ও যুগের পরিবর্তনে রাগের কারণ বিভিন্ন হতে পারে। এছাড়া ঐতিহ্যগত পার্থক্য, শিক্ষাগত পার্থক্য, আকীদাগত পার্থক্যের কারণেও রাগের পার্থক্য সূচিত হয়।

মোমিন শরীয়ত মানে বিধায় শরীয়ত মোতাবেক তার রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তখন তাকে দয়ালু বিজ্ঞ ও পূর্ণতা অর্জনকারী মানুষের মত মনে হয়। আর এর কারণ হচ্ছে, সে আল্লাহর কিতাবের মধ্যে নিজের জীবন খুঁজে পায়। একথাই কোরআন মাজীদে এভাবে বলা হয়েছে,

لَايَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ.

'বাতিল কোরআনের সামনে ও পেছনে কোন দিক থেকেই আসতে পারে না। এটা হচ্ছে, বিজ্ঞ ও প্রশংসিত আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব।' (সূরা হা-মীম-আস সাজদাহ : ৪২)

এছাড়াও মোমিন সৃষ্টির সেরা মোহাম্মদ (সা)-এর চরিত্র ও আমল-আখলাকের মধ্যে ডুবে থাকে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে যেমন, রাজনীতি, সমাজনীতি, পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসের অনুসরণ করে। রাসূলুল্লাহর (সা) সমকক্ষ আর কে আছে?

www.amarboi.org

ধৈর্যের মর্যাদা ও রাগের নিন্দা

রাগ যেহেতু মানুষের সহজাত তাই তার নিন্দা ও প্রশংসা করা যায় না। তবে এর বহিঃপ্রকাশকে লক্ষ্য করেই কেবলমাত্র প্রশংসা ও নিন্দা করা যায়। কেউ রাগ করার পর তাকে নিয়ন্ত্রণ করলে সে প্রশংসিত। আর কেউ রাগের কারণে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলে তা হবে নিন্দনীয়।

শরীয়ত কাউকে রাগ করতে নিষেধ করলে তার অর্থ হচ্ছে, রাগের প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী কাজ না করা এবং যুক্তিকে কাজে লাগানো। একথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও, যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরি করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্য। যারা স্বচ্ছলতা ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে, আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সেই নেককার লোকদেরকে ভালবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৩-১৩৪)

আল্লাহ আরও বলেছেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ.

'ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, সৎকাজের আদেশ দাও এবং মূর্খ-জাহেলদের থেকে দূরে থাক।' (সূরা আরাফ : ১৯৯)

আল্লাহ আরও বলেছেন,

وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ، اِدْفَعْ بِالَّتِى هِىَ اَحْسَنُ،فَاِذَ الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ.

অর্থ : 'ভাল ও মন্দ সমান নয়। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেছে।' (সূরা হা-মিম-আস-সাজদাহ : ৩৪)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِىْ عَلَى الرِّفْقِ مَالاَ يُعْطِىْ عَلٰى الْعُنْفِ اَوْ مَالاَ يُعْطِى عَلٰى مَا سِوَاهُ

www.amarboi.org

'আল্লাহ বিনম্র, তিনি বিনম্রতাকে ভালবাসেন। তিনি নম্রতাকে যা দান করেন সহিংসতা সহ অন্য কিছুকে তা দান করেন না।'

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলেন, 'আমাকে উপদেশ দিন।' তখন তিনি বলেন, 'রাগ করো না।' তিনি একথা কয়েকবার বলেন, 'রাগ করো না।' (বোখারী)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

'যে ব্যক্তি কুস্তিতে মানুষকে পরাজিত করে সে শক্তিশালী নয়, বরং সে ব্যক্তি শক্তিশালী যে রাগের সময় ধৈর্য ধারণ করতে পারে।' (বোখারী ও মুসলিম)

হোমাইদ বিন আবদুর রহমান রাসূলুল্লাহর (সা) একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা)-এর কাছে উপদেশ প্রার্থনা করল। তিনি উত্তরে বলেন, তুমি রাগ করো না। লোকটি বলল, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কথাটি চিন্তা করলাম। তারপর বুঝতে পারলাম, রাগ সকল মন্দের উৎস।' (আহমদ)

সোলাইমান বিন সোরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে পরস্পর গালমন্দ করেছে। একজন বেশী রাগ হওয়ায় তার মুখ লাল এবং রগ মোটা হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দিকে তাকান এবং বলেন, আমি এমন একটা বাক্য জানি যা সে বললে তার এ (রাগ) চলে যাবে। সে বাক্যটি হচ্ছে, আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম।' এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) এই বাণী শুনে লোকটির কাছে গিয়ে বলল, তুমি কি জান রাসূলুল্লাহ (সা) একটু আগে কি বলেছেন? লোকটি উত্তর দেয়, 'না।' সংবাদ বাহক বলে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি এমন একটি বাক্য জানি যদি সে তা বলে, তাহলে, তার রাগ চলে যাবে।' (বাক্যটি হচ্ছে) যদি সে বলে, আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। তখন লোকটি উত্তরে বলে, আমাকে কি তুমি পাগল মনে করেছ?' (বোখারী ও মুসলিম) লোকটি অতিরিক্ত রাগের কারণে স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (সা) উপদেশ পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারেনি। অনেক আলেমের মতে, লোকটি মুনাফিক ছিল কিংবা এক্ষেত্রে সে মুনাফেকী করেছে।

তিরমিযীর এক হাসান হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

www.amarboi.org

اَلاَ وَاِنَّ الْغَضَبَ جَمْـرَةٌ فِىْ قَلْبِ ابْـنِ اٰدَمَ، اَمَا رَاَيْتُـمْ اِلٰى حُمْـرَةِ عَيْنَيْـهِ وَانْتِفَاخِ اَوْدَاجِهِ؟ فَمَنْ اَحَسَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ فَلْيَلْتَصِقْ بِالاَرْضِ.

'হুঁশিয়ার! রাগ আদম সন্তানের অন্তরে জ্বলন্ত কয়লা স্বরূপ। তোমরা কি তার দুই চোখের লাল রং ও তার রগ ফুলে যেতে দেখনি? কেউ রাগান্বিত হলে সে যেন মাটিতে বসে পড়ে।'

হাসান বসরী রাগ সম্পর্কে বলেন, 'হে আদম সন্তান! যখনই তুমি রাগ করবে তখনই লাফ দেবে। হতে পারে, তুমি এমন এক লাফ দেবে যে জাহান্নামের আগুনের গিয়ে পড়বে।'

খায়সামা বলেছেন, শয়তান বলে, 'বনি আদম কি করে আমার উপর বিজয়ী হবে? সে যখন সন্তুষ্ট চিত্তে থাকে তখন আমি তার অন্তরে স্থান করে নেই। আর যখন রাগ করে তখন আমি তার মাথার উপর গিয়ে বসি।'

ওমার বিন আবদুল আযীয (রা) একজন গভর্ণরের কাছে চিঠি লিখেছেন যে, তোমার রাগের সময় কাউকে শাস্তি দেবে না। বরং তখন তাকে আটক রাখবে যতক্ষণ না তোমার রাগ প্রশমিত হয়। তুমি রাগমুক্ত হলে তাকে বের করে এনে অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দাও। তবে বেত্রাঘাত যেন ১৫টির বেশী না হয়।

আলী বিন যায়েদ বলেন, এক কোরেশী ওমার বিন আবদুল আযীয সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করেন। ওমার বিন আবদুল আযীয দীর্ঘদিন এ বিষয়ে চুপচাপ থাকেন। তারপর বলেন, তুমি চেয়েছিলে শয়তান আমাকে সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে উত্তেজিত করুক। ফলে আমি আজ তোমার প্রতি রাগ করি এবং কাল তুমি আমার প্রতি অনুরূপ রাগ করবে। (এহইয়া উলূমুদ্দিন)

এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) কে গালি দেয়। ইবনে আব্বাস বলেন, হে ইকরামা! ঐ ব্যক্তির কোন প্রয়োজন আছে কি যা আমরা পূরণ করতে পারি? এটা শুনে ঐ ব্যক্তি লজ্জাবোধ করে ও মাথা নীচু করে ফেলে।

এক ব্যক্তি ওমার বিন আবদুল আযীযকে (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ফাসেক। তখন ওমার (রা) বলেন, তোমার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

রাগের প্রতিকার

মর্যাদার দিক থেকে হাদীস থেকে কম নয়-এমন কথায় এসেছে, রাগ দূর করার উপায় হচ্ছে, অজু কিংবা গোসল করা। রাগের সময়ে অবস্থার পরিবর্তনের

www.amarboi.org

মাধ্যমেও রাগ দূর করা যায়। যেমন, দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি বসে কিংবা শুয়ে পড়বে। এছাড়াও আউজুবিল্লাহ্ পড়ে শয়তান থেকে পানাহ চাবে। বাস্তবে এ প্রতিকারের উপকারিতা পাওয়া গেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

اِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَاِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَاِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ.

'রাগ হচ্ছে শয়তানের ওয়াসওয়াসা। শয়তান আগুন থেকে সৃষ্টি। আগুন পানি দিয়ে নেভাতে হয়। তোমাদের কেউ রাগান্বিত হলে সে যেন অজু করে। (আবু দাউদ)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেছেন,

اِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَاِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَاِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ.

'তোমাদের কেউ রাগ করলে এবং দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলে সে যেন বসে পড়ে। যদি রাগ দূর হয়ে যায় ভাল। নচেৎ সে যেন শুয়ে পড়ে।' (আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান)

এর দ্বারা আমরা আজকাল রাগ ও ক্ষতিকর আবেগের প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে মনস্তত্ত্ববিদদের বক্তব্যের যথার্থতা বুঝতে পারি। আজ থেকে ১৪শত বছর পূর্বে মহানবী (সা) আমাদের জন্য এ জিনিসই নিয়ে এসেছেন। দীন সম্পর্কে বিভ্রান্ত লোকদের উচিত, দীনকে ভাল করে জানা। কেননা, এতে তারা নিজেদের সকল প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ - وَجَزَآؤُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ - اِنَّهُ لاَيُحِبُّ الظَّالِمِينَ - وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰئِكَ مَاعَلَيْهِم مِّنْ سَبِيْلٍ.

'যারা আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে ও আপোষ করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি অত্যাচারীদেরকে পসন্দ করেন না। নিশ্চয়ই যে অত্যাচারিত

www.amarboi.org

হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ নেই।' (সূরা শূরা : ৩৯-৪১)

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, সমান সমান প্রতিশোধ নেয়া জায়েয। তবে সীমালংঘন করা যাবে না। কোন সময় ক্ষমা করলে অত্যাচার বেড়ে যেতে পারে। তখন প্রতিশোধ গ্রহণ করা উত্তম।

ইবরাহীম নখয়ী বলেন, পূর্ববর্তী মনীষীগণ এটা পসন্দ করতেন না যে, মোমিনগণ পাপাচারী লোকদের সামনে নিজেদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করবেন, ফলে, তাদের ধৃষ্টতা আরও বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, সে ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেয়াই উত্তম। ক্ষমা করা তখন উত্তম, যখন অত্যাচারী ব্যক্তি অনুতপ্ত হয় এবং তার পক্ষ থেকে অত্যাচার বেড়ে যাওয়ার আশংকা না থাকে। কাজী আবু বকর ইবনে আরাবী এবং কোরতুবী এ নীতিই পছন্দ করেছেন।

৪. ঘৃণা-বিদ্বেষ (حِقْدٌ)

ক্রোধ ও রাগ থেকে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঘৃণা-বিদ্বেষ কখন ও কিভাবে সৃষ্টি হয়?

এর জবাব হচ্ছে, বিশেষ এক ধরনের রাগ থেকে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। আপনি হয়তো কারুর উপর রাগ করলেন। তারপর তাকে ক্ষমা করে দিলেন। তার প্রতি আপনার মনে কোন ঘৃণা-বিদ্বেষ নেই। কিংবা আপনি রাগ করে প্রতিশোধ নিলেন। মনের ঝাল মিটানোর পর তার প্রতি আপনার আর কোন ক্ষোভ অবশিষ্ট নেই।

কিন্তু এমন যদি হয় যে, আপনি কারুর উপর রাগ করেছেন, কিন্তু তাকে ক্ষমা করতে পারছেন না। কেননা, প্রতিশোধের ক্ষমতা থাকলেই ধৈর্য ও ক্ষমার প্রশ্ন আসে, সে ব্যক্তি অধিকতর শক্তিশালী। প্রতিশোধ নেয়ার শক্তি আপনার নেই। তখন আপনি মনে মনে তার প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করতে বাধ্য। মনের গভীরে বিদ্যমান রাগের আগুনে আপনি জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছেন। আপনি লোকটাকে দেখা বা তার নাম শুনামাত্রই ভেতরে ভেতরে জ্বলে উঠেন কিংবা তার রাগ সৃষ্টিকারী কথা-বার্তা ও কাজ-কর্মের কথা মনে করে আপনি কষ্ট পান। এটাই হচ্ছে, ঘৃণা-বিদ্বেষ বা 'হেক্কদ'। অন্তরে রাগ ও শত্রুতা পোষণ করা এবং প্রতিশোধের অপেক্ষায় থাকার নাম হচ্ছে ঘৃণা-বিদ্বেষ বা 'হেক্কদ'।

www.amarboi.org

এটা এমন এক রোগ যা ঘৃণা-বিদ্বেষসৃষ্টিকারীর জন্য ক্ষতিকর। কোন কোন সময় তাকে ওজরগ্রস্ত বিবেচনা করা যেতে পারে। এ রোগ তার মনকে সদা ব্যস্ত রাখে, শরীরকে দুর্বল করে। দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করে, এর কারণে ঘুম-নিদ্রা দূর হয়ে যায়।

কোন কোন সময় ঘৃণা-বিদ্বেষের গণ্ডি ব্যক্তি থেকে ভিন্ন লিঙ্গে রূপান্তরিত হয়। কোন সময় স্বামী স্ত্রীর উপর জুল্ম করে এবং তার স্বাধীনতা ও সম্মানের উপর আক্রমণ চালায়। কোন কোন সময় তাকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দেয়। ফলে স্ত্রী পুরুষ মাত্র সকলকে ঘৃণা করতে থাকে এবং তাদের প্রত্যেককে অবজ্ঞা করে। কোন সময় পিতা আরেক বিয়ে করে আগের স্ত্রীর ছেলে-মেয়ের উপর জুল্ম করে, কঠোরতা প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে আদর, স্নেহ ও উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখে। ফলে, সন্তান গোটা বাপের জাতিকে ঘৃণা করে। এভাবে ঘৃণার মাধ্যমে সামাজিক ক্ষতি সাধিত হয়।

কোন সময় বিদ্বেষকারী ব্যক্তি মহৎ, বড় পদ-মর্যাদা, বর্ণ, বংশ ও ধন-সম্পদের ঐশ্বর্যের ভালবাসার রোগী হতে পারে। তখন সে লোকদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলে, তাদেরকে ঘৃণা করে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ঘৃণিত ব্যক্তির উপর প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করে।

কোন সময় বিদ্বেষ পোষণকারী অভাব-অভিযোগের শিকার ও বঞ্চিত থাকে। তার চারপাশে রয়েছে ঐশ্বর্যশীল ধনী, যাদের ধন-সম্পদের অপচয় ও ব্যয় বাহুল্যের প্রতিকার দরকার। তখন তার বিদ্বেষ যথার্থ। যদিও বিদ্বেষ মানুষকে অন্ধ বানিয়ে দেয়। তখন কোন বিশেষ দল বা ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারার অধিকারী ব্যক্তি বা সমষ্টি তার বিদ্বেষের সদ্ব্যবহার করে এবং তাকে ধ্বংস ও খুন-খারাবীর দিকে ঠেলে দেয়। এর ফলে যে সামাজিক ক্ষতি হয় তা সবার কাছে পরিষ্কার।

ঘৃণা-বিদ্বেষ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি নয়। তাই এর প্রতিকার সম্ভব এবং এ থেকে মুক্তির পাওয়া সহজ। আর সে পথ হচ্ছে, অন্তরের সুস্থতা অর্জন করা এবং গভীর ঈমান ও নেক কাজে ব্যস্ত থাকা। মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা এবং মনকে ক্ষমা ও দয়ার গুণে গুণান্বিত করা।

ঘৃণা সর্বদা গুণাহর কাজ নয়। রাগের মতই এটা কোন সময় ভাল এবং কোন সময় মন্দ হয়। মন্দ পর্যায় কবীরাহ্ গুণাহ পর্যন্ত পৌঁছেনা, বরং তা হচ্ছে, সগীরাহ গুণাহ। কিন্তু ঘৃণার সামাজিক ক্ষতি ঘৃণাকারীর অভ্যন্তরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। লোকদের প্রতি বিদ্বেষ এবং তাদের থেকে দূরত্ব ও একাকীত্ব সৃষ্টি করে। এ অবস্থাকে ঘৃণা বলা হয় না, বরং ঘৃণার পরিণতি বলা হয়।

www.amarboi.org

এর বিপরীত অবস্থা হচ্ছে, আবেদ, আলেম ও আল্লাহ প্রেমিকদের। তারা যখন এক ঘন্টার জন্য কিংবা কয়েকদিনের জন্য একাকীত্ব গ্রহণ করে ও সম্পূর্ণ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে, তখন তারা আল্লাহর সাথে সময় কাটায়। তারা তাওবাহ করে, আত্মার পরিশুদ্ধি করে এবং আল্লাহর ভালবাসায় মগ্ন থাকে। কিন্তু ঘৃণা যখন কর্মে রূপ নেয় তখন কাজ অনুযায়ী হিসেব নেয়া হবে এবং শরীয়তের পাল্লায় তাকে ওজন করা হবে। চাই সেটা ঘৃণা, শত্রুতা, ঝগড়া, বিচ্ছেদ, কষ্টদান, মার দেয়া, নিন্দা, গালি ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ যাই হোকনা কেন।

মুসলমানের জন্য উত্তম হচ্ছে, সবার সাথে নরম আচরণ করা। যারা ভাল ব্যবহার করে তাদের সাথে আর যারা খারাপ ব্যবহার করে তাদের সাথেও। এতে করে আল্লাহর পক্ষ থেকে সওয়াব, রহমত ও ক্ষমা লাভ করা যাবে। এর ফলে নিজ আত্মা শান্তি ও স্থিতিশীল পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে।

এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আয়েশাকে (রা) বলেছেন,

اِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ - يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِىْ عَلَيْهِ مَالاَيُعْطِىْ عَلَى الْعُنْفِ.

'আল্লাহ্ নরম, তিনি নম্রতাকে ভালবাসেন। তিনি নম্রতার জন্য যা দান করেন, কঠোরতার জন্য অনুরূপ কখনও দান করেন না।' (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেছেন,

مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ كُلَّهُ.

'যে নম্রতা থেকে বঞ্চিত, সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।' (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেছেন,

يَاعَائِشَةَ : عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ فَاِنَّهُ لاَيَدْخُلُ شَيْئًا اِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ شَانَهُ.

'হে আয়েশা! তোমার নরম থাকা উচিত। বস্তুত, নম্রতা কোন জিনিসে প্রবেশ করলে তাকে সুন্দর করে এবং নম্রতাকে ছিনিয়ে নেয়া হলে সেই জিনিসটি মন্দে পরিণত হয়।' (মুসলিম)

কেউ নিজ মনে নম্রতার অনুভূতি পোষণ করলে অন্যের প্রতি ঘৃণা ও বৈরিতা

www.amarboi.org

পোষণ করতে পারে না। উল্লেখ্য যে, ঘৃণা বৈরিতার বিপরীত, কেননা, ঘৃণা হচ্ছে প্রতিশোধের অক্ষমতার কারণে মনের অব্যাহত নিন্দা ভাব। পক্ষান্তরে, বৈরিতা হচ্ছে, অন্যের প্রতি অসন্তোষ। এটাও একটি আবেগ, সহজাত প্রবৃত্তি নয়। বৈরিতা আল্লাহর জন্য হলে, তা উত্তম। কোন কোন বৈরিতা জায়েয এবং কোন কোন বৈরিতা খারাপ।

৫. হিংসা (الحَسَدُ)

হিংসা এক মারাত্মক মানসিক রোগ। এর কুফল হিংসুকের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে এবং তার সামজিক সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বিশেষ করে যাকে হিংসা করা হয় তার সাথে সম্পর্ক ও লেন-দেনে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। হিংসার কারণে হিংসুক হিংসাকৃত ব্যক্তিকে হত্যা কিংবা তার মারাত্মক ক্ষতি করে এবং এর কুফল হিংসাকৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়।

রাগ থেকে যে ঘৃণা সৃষ্টি হয় সে ঘৃণাই অনেক সময় হিংসার কারণ হয়। ফলে হিংসাকৃত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রতিশোধ কিংবা তাকে পূর্ণ ধ্বংস করার আগ পর্যন্ত অথবা যে নেয়ামতের কারণে হিংসা সৃষ্টি হল, তা ধ্বংসের আগ পর্যন্ত হিংসুকের মন ঠাণ্ডা হয় না। এর ফলে হিংসুক সমাজে ধ্বংসের উপকরণ এবং ক্ষতি ও বিচ্ছিন্নতার হাতিয়ারে পরিণত হয়। আমরা যদি আত্মীয়-স্বজন, একই অফিসের কর্মচারী, একই প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং প্রতিবেশীর মধ্যকার খারাপ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করি কিংবা ঝগড়া-বিবাদ, নিন্দা-অপবাদ, বিপদ কামনা এবং বিপদের সময় খুশী হওয়ার কারণ জানতে চাই, তাহলে দেখতে পাবো, এর পেছনে একমাত্র হিংসাই কার্যকর রয়েছে।

কোন মানুষের উপর আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের কারণেই হিংসা সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তি ঐ নেয়ামতকে অপছন্দ করে এবং তার ভাই থেকে এর অপসারন কামনা করে সেই হচ্ছে হিংসুক। হিংসার সংজ্ঞা হল ঃ কারুর উপর আল্লাহ প্রদত্ত নেয়মাতকে অপছন্দ করা, তার অপসারন কামনা করা এবং পারলে শক্তি প্রয়োগ করে সেই নেয়ামতকে দূর করে দেয়া।

হাঁ, যদি কেউ অন্যের নেয়ামতকে অপছন্দ এবং এর তিরোধান কামনা না করে নিজেও অনুরূপ নেয়ামত লাভ করতে চায় তাকে ঈর্ষা (غِبْطَةٌ) বলা হয়। কোন কোন সময় غِبْطَةٌ কে حَسَدٌ শব্দের স্থানে ব্যবহার করা হয়। যেমন হাদীসের

www.amarboi.org

মধ্যে এসেছে : لَاحَسَدَ إِلاَّ فِيْ اِثْنَتَيْنِ 'দু' জিনিস বা ব্যক্তি ছাড়া ঈর্ষা করা যায় না।' ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতা প্রশংসার দাবীদার। পক্ষান্তরে, হিংসা নিন্দাযোগ্য। তা সর্বাবস্থায় হারাম। তবে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে নেয়ামত দূর হওয়ার লক্ষ্যে হিংসা জায়েয : যদি কাফেরের হাতে কিংবা গুণাহগার লোকের হাতে নেয়ামত থাকে এবং সে এর মাধ্যমে মানুষকে কষ্ট দেয়, লোকদের সম্পর্ক নষ্ট করে ও তাদের ক্ষতি করে, ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে, উম্মাহর মধ্যে অশ্লীল কাজের প্রসার ঘটায়, প্রকাশ্যে গুণাহর কাজ করে এবং তার দেখাদেখি লোকেরাও গুণাহর কাজ করে। এসকল ক্ষেত্রে নেয়ামত দূর হওয়ার আকাঙ্খা ক্ষতির ফলাফলের কারণে, নেয়ামতের কারণে নয়। জালেম ও ফাসেক শাসকের ক্ষমতাচ্যুতির আকাঙ্খা করলে কোন ক্ষতি নেই। অনুরূপভাবে, মওজুদ্দার ধনী যে খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে লোকদের সাথে ধোঁকাবাজি করে এবং বাতিল পন্থায় তাদের অর্থ-সম্পদ আত্মসাত করে তার ধন বিলোপের আগ্রহ পোষণ করলে কোন গুণাহ হবে না।

কোরআন ও হাদীসে হিংসাকে হারাম করা হয়েছে। হিংসা হচ্ছে, কাফের, মোনাফেক ও দুর্বল ঈমানদারের গুণাবলী। তারা দীনি ভাইয়ের প্রতি কোন নেয়ামতকে সহ্য করতে পারে না। আল্লাহ বলেন, 'আহলে কিতাবের অনেকেই প্রতিহিংসা বশতঃ চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে কোন রকমে কাফের বানিয়ে দেয়। তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর (তারা এটা চায়)।' (সূরা আল বাকারা : ১০৯)

আল্লাহ মুনাফেকদের সম্পর্কে বলেছেন, 'তোমাদের কোন কল্যাণ হলে তাদের কাছে খারাপ লাগে এবং তোমাদের কোন মন্দ হলে তারা খুশী হয়। তোমরা ধৈর্য ধারণ ও তাকওয়া অবলম্বন করলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।' (সূরা আলে ইমরান : ১২০)

যারা ইউসুফ (আ) এর প্রতি তাঁর ভাইদের হিংসার ঘটনা জানেন, তারা বুঝতে পারেন, ভাইয়েরা তাঁর সাথে কি নির্দয় আচরণ করেছিল, কিভাবে তারা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের অন্তর পাষাণ হওয়ার পর আপন ভাইয়ের প্রতিশোধ নিল। পবিত্র কোরআনে তাদের ঘটনা উল্লেখ পূর্বক বলেছে, 'যখন তারা (ভাইয়েরা) বলল, ইউসুফ এবং তার (ছোট) ভাই আমাদের বাপের কাছে আমাদের চাইতে অধিকতর প্রিয়। অথচ, আমরা একটা সংহত শক্তি বিশেষ। নিশ্চয়ই আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছেন। ইউসুফকে হত্যা কর কিংবা অন্য কোন স্থানে

www.amarboi.org

তাকে ফেলে আস। এতে করে তোমাদের প্রতিই তোমাদের পিতার মনোযোগ আকৃষ্ট হবে এবং এরপর তোমরা যোগ্য বিবেচিত হবে।' (সূরা ইউসুফ ঃ ৯-১০)

আদম (আ) এর প্রথম সন্তান হিংসার কারণে আপন ভাইকে হত্যা করল। অথচ নিহত ভাইটি ছিল অত্যন্ত নেক লোক। এ ঘটনা প্রসঙ্গে আল্লাহ কোরআনে বলেন, 'তুমি আমাকে হত্যা করার লক্ষ্যে হাত বাড়ালে আমি কিন্তু তোমাকে হত্যা করার উদ্যেশ্যে হাত বাড়াবো না। নিশ্চয়ই আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।' (সূরা আল মায়িদা : ২৮)

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মোমেনদেরকে ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এর মধ্যে হিংসার ক্ষতির কথাও উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ 'আপনি বলুন, আমি ভোরের পালনকর্তার আশ্রয় প্রার্থনা করি।' (সূরা ফালাক-১) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ...'হিংসুকের ক্ষতি থেকে যখন সে হিংসা করে।' (সূরা ফালাক : ৫)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'তোমরা বেশী বেশী ধারণা করা থেকে বিরত থাক। কেননা, ধারণা সর্বাধিক মিথ্যা কথা।' এ পর্যন্ত বলেছেন, وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا 'তোমরা হিংসা ও ঘৃণা কর না।' (মুওয়াত্তা, মালেক, বোখারী, মুসলিম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে আরও বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'তোমরা হিংসা থেকে দূরে থাক। আগুন যেমন কাঠকে জ্বালিয়ে দেয় তেমনি হিংসা নেক ও সওয়াবকে জ্বালিয়ে দেয়।' (আবু দাউদ, বায়হাকী)

আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ লোক উত্তম? তিনি উত্তরে বলেন, 'অন্তরে মাখমুম এবং সত্যবাদী লোক।' সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করেন, সত্যবাদিতা তো আমরা বুঝতে পারলাম কিন্তু 'অন্তরে মাখমুম' বলতে কি বুঝায়? তিনি বলেন, তিনি হচ্ছেন পরহেযগার ও পবিত্র। তার মধ্যে কোন গুণাহ, বিদ্রোহ এবং হিংসা-বিদ্বেষ নেই।' (ইবনে মাজাহ)

সহীহ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'তিন দিনের মধ্যে তোমাদের কাছে একজন বেহেশতী লোক আসবে।' তিন দিনের মধ্যে একজন লোক এসেছেন। তার কাছে আবদুল্লাহ বিন আমর যান এবং তাঁর ঘরে তিন রাত যাপন করেন। তিনি তাকে রাত্রে জাগতে দেখেননি। যখন তিনি তাঁর আমলকে সামান্য

www.amarboi.org

মনে করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেয়ার ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহর (সা) বক্তব্যটি পেশ করেন। তিনি অন্যদের তুলনায় তাঁর এত কম আমল সত্ত্বেও ঐ মর্যাদা লাভ করার কারণে আশ্চর্য হন। তখন লোকটি তাঁকে বলেন, আপনি যা দেখেছেন তাই বাস্তব। তারপর আবদুল্লাহ রওনা হয়ে গেলে লোকটি তাঁকে ডেকে বলেন, 'আপনি যা দেখেছেন তাই, তবে আমার অন্তরে কোন মুসলমানকে ধোঁকা দেয়ার ইচ্ছা নেই কিংবা আল্লাহ কাউকে কোন কল্যাণ দান করলে এর বিরুদ্ধে হিংসা পোষণ করি না। তখন আবদুল্লাহ বলেন, এ কারণেই আপনি ঐ মর্যাদা লাভ করেছেন।' (আত তারগীব ওয়াত তারহীব ঃ ৩য় খণ্ড, ৫৪৫ পৃঃ)

হযরত মো'আবিয়া (রা) বলেছেন, আমি সকল লোককে সন্তুষ্ট করতে পারি, তবে হিংসুককে নয়। কেননা, সে নেয়ামত দূর হওয়ার আগ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয় না।

এক বেদুঈন বলেছেন, 'জালেম মজলুমের মত।' এ কথা হিংসুকের বেলায় প্রযোজ্য। কেননা, সে আপনার উপর প্রদত্ত নেয়ামতকে তার জন্য শাস্তি মনে করে।

হাসান বসরী বলেছেন, হে বনি আদম : তোমার ভাইকে হিংসা কর না। আল্লাহ যদি কারুর সম্মানে নেয়ামত দান করে তাহলে, আল্লাহ যাকে সম্মানিত করেছেন তুমি তাকে কেন হিংসা কর? আর যদি অন্য কিছু হয় তাহলে, যার ঠিকানা দোযখ, তুমি তার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ কর?

হিংসুক কাউকে কারুর উপর মর্যাদা দানের বিষয়ে আল্লাহর ফয়সালার উপর অসন্তুষ্ট বলে বিবেচিত। অপরদিকে সে নিজ ভাইয়ের আরাম বিরোধী। যে আরাম তার জন্য ক্ষতিকর নয়।

حَسَدٌ، غِبْطَةٌ، مُنَافَسَةٌ এর মধ্যে পার্থক্য

حَسَدٌ বা হিংসা হচ্ছে, শরীয়তসম্মত কোন কারণ ছাড়া নিজ ভাইয়ের কোন নেয়ামত দূরীভূত হওয়ার আকাঙ্খা করা, এটা হারাম। غِبْطَةٌ হচ্ছে, অন্যের মত অনুরূপ নেয়ামত লাভ করার আগ্রহ পোষণ করা এবং অন্যের নেয়ামত দুর হওয়ার আকাঙ্খা না করা। এটা হচ্ছে, প্রশংসিত কাজ। مُنَافَسَةٌ হচ্ছে, আরেক ভাই যা পেয়েছে অনুরূপ কিছু পাওয়ার চেষ্টা করা। কিংবা কোন নেয়ামত লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করা। প্রতিযোগিতা বান্দার শক্তি ও সামর্থ্যের ভেতর সীমাবদ্ধ থাকে। বিশেষ করে গুনাহ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা কিংবা ফরজ ও

www.amarboi.org

ওয়াজিব কাজে প্রতিযোগিতা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কোন কোন সময় অনুরূপ প্রতিযোগিতা করা সুন্নত। যেমন, মাকরূহ কাজ ত্যাগ করা ও সুন্নত কাজ করার বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা। কোন কোন সময় প্রতিযোগিতা মোবাহ্ বা জায়েয। যেমন, কৃষি, শিল্প, আবিষ্কার ও কাজের মান উন্নত করার মত মোবাহ্ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা।

নেক কাজে প্রতিযোগিতার বিষয়ে কোরআন-হাদীসে প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ 'এতে প্রতিযোগিদের উচিত, প্রতিযোগিতা করা।' (সূরা মোতাফফেফীন ঃ ২৬) আল্লাহ আরও বলেন,

سَابِقُوْا إِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ.

'তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা ও আসমান-জমীন সমান প্রশস্ত বেহেশতের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হও, যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাসীদের জন্য তৈরি করে রাখা হয়েছে।' (সূরা হাদীদ ঃ ২১)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'দুই জিনিস ছাড়া অন্য কিছুর ব্যাপারে প্রতিযোগিতা বা غِبْطَة করা জায়েয নেই। এর মধ্যে এক ব্যক্তি হচ্ছে, যাকে আল্লাহ অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন এবং তিনি তা সত্যের পথে ব্যয় করেছেন। আর ২য় ব্যক্তি হচ্ছে, যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন, তিনি সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমল করেছেন এবং লোকদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন।' (বোখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'এই উম্মতের উদাহরণ চার ব্যক্তির মত। এক ব্যক্তি হচ্ছে এমন, যাকে আল্লাহ্ সম্পদ ও জ্ঞান দান করেছেন। সে ব্যক্তি নিজ জ্ঞান অনুযায়ী তার সম্পদ খরচ করে। ২য় ব্যক্তিকে আল্লাহ্ জ্ঞান দিয়েছেন কিন্তু সম্পদ দেননি। সে বলে, হে রব! যদি অমুকের মত আমার সম্পদ থাকত, তাহলে আমি তার মত ব্যবহার করতাম। এ দু'জন সওয়াবের ব্যাপারে সমান। ৩য় ব্যক্তিকে আল্লাহ্ সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু জ্ঞান দেননি। সে ঐ সম্পদ আল্লাহ্র নাফরমানীতে ব্যয় করে। ৪র্থ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ জ্ঞান ও সম্পদ কিছুই দেননি। সে বলে, যদি অমুকের মত আমার সম্পদ থাকত তাহলে, আমি তার মত গুণাহ্র কাজে ব্যয় করতাম। তারা উভয়েই গুণাহ্র ক্ষেত্রে সমান।' (ইবনে মাজাহ্, তিরমিজী এটাকে হাসান ও সহীহ্ বলেছেন)

৪র্থ ব্যক্তি গুণাহ্র কাজে প্রতিযোগিতায় আগ্রহী। তাই তার আগ্রহ ও আকাঙ্খা

www.amarboi.org

অনুযায়ী গুণাহ হবে, যদি সে কিছু করে না-ও থাকে। এতে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে, তারা যেন গুণাহর কারণ থেকে বেঁচে থাকে, যদিও আমল ছাড়াই শুধু নিয়তই করে থাকে।

ইমাম গাযালী এক ধরনের হিংসার বিষয়ে বলেছেন, তা মাফ। মানুষের মন তা থেকে মুক্ত হতে চায় না। সেটা হল, কারুর নেয়ামত দূরীভূত হওয়ার আকাঙ্খা করা। কেননা, ব্যক্তি নিজে ঐ নেয়ামত লাভ করতে পারছে না। কিন্তু শক্তি থাকা সত্ত্বেও সে আল্লাহকে ভয় করার কারণে ঐ ব্যক্তির নেয়ামত দূর করার চেষ্টা করে না। তবে হিংসাকৃত ব্যক্তির কাছ থেকে নেয়ামত দূর হয়ে গেলে হিংসুকের মনে প্রশান্তি আসে। সে এ জাতীয় হিংসাকে দমন করতে সক্ষম নয়।

নেক কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মনোভাব যেমন করে দুনিয়াবী নেয়ামতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি তা পারলৌকিক ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন দুনিয়াবী বিষয়ের মধ্যে আছে, অর্থ-সম্পদ, সন্তান, স্বাস্থ্য, সম্মান ও পদমর্যাদা ইত্যাদি। পারলৌকিক বিষয়ের মধ্যে আছে, আল্লাহর পথে অর্থ-ব্যয়, জিহাদ, শিক্ষা এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ ইত্যাদি।

হিংসুকের উচিত, হিংসার মত রোগের চিকিৎসা করা। তা পুরো নিয়ন্ত্রন করতে না পারলেও মনে মনে ঘৃণা করা।

হিংসার প্রতিকার

হিংসা এক মানসিক রোগ। কোন কোন আলেম একে কবীরা গুণাহ বলেছেন। হিংসা খোদ হিংসুকের জন্যই দীনের ক্ষেত্রে এবং দুনিয়ায়ও ক্ষতিকর। পক্ষান্তরে, এর সামাজিক কুফলও রয়েছে। কেননা, হিংসা শত্রুতার আগুন জ্বালায়, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে বৈরিতার পতাকা উত্তোলন করে এবং হিংসুক হিংসাকৃত ব্যক্তির সাহায্য সহযোগিতা থেকে দূরে থাকে। হিংসা হিংসুকের অন্তরকে খেয়ে ফেলে। ফলে সে কঠোর হয়ে যায়। সে অন্যের অকল্যাণ কামনা করে ও তাদের জন্য ভাল কোন জিনিস পছন্দ করে না।

হিংসুক আল্লাহর ফয়সালার উপর অসন্তুষ্ট, আল্লাহ বান্দার জন্য যে নেয়ামত বন্টন করেছেন, তা অপছন্দকারী আল্লাহ নিজ সাম্রাজ্যে সূক্ষ্ম কৌশলের মাধ্যমে যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছেন তার প্রতি সে নারাজ এবং মোমিন বান্দাদের সাথে ধোঁকাবাজি করে। এভাবে সে নিজ ঈমান ও দীনের সাথে অপরাধ করে, শয়তান তার হিংসার এবং রবের নাফরমানীতে অংশ গ্রহণ করে। এই সবটুকুই দীনের বিপদ।

www.amarboi.org

এছাড়াও সে নিজেকেই নিজে শাস্তি দিচ্ছে এবং দুশ্চিন্তা, পেরেশানী মনের সংকীর্ণতার মধ্যে বাস করছে। সে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। এটা তার জন্য দুনিয়াবী মুসীবত।

এর প্রতিকার হচ্ছে, আল্লাহর তাকদীর ও ভাগ্য বিধানে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং মনকে ধিক্কার দিতে হবে। সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। এর ফলে অন্তরে হেদায়েতের আলো জ্বলে উঠবে এবং অন্তর প্রশস্ত হবে। ফলে সে হিংসার অন্ধকার থেকে কল্যাণের প্রতি, ভালবাসার আলোর প্রতি বেরিয়ে আসতে পারবে।

৬. মুসলমানের প্রতি অহেতুক খারাপ ধারণা পোষণ করা।

কোন মুসলমানের প্রতি বিনা কারণে খারাপ ধারণা পোষণ করা অত্যন্ত খারাপ আচরণ এবং মুসলিম সমাজের জন্য বড় ক্ষতিকর বিপদ। খারাপ ধারণা আত্মীয়ের সাথে সম্পর্কের রশি কেটে দেয়, সমাজের সদস্যদের মধ্যে সংশয়-সন্দেহের বীজ বপন করে, যার সম্পর্কে খারাপ ধারণা জন্মে তার সম্পর্কে গীবত ও নিন্দা করতে উদ্বুদ্ধ করে, কিংবা তার অধিকার পূরণে ত্রুটি করতে বাধ্য করে। ফলে, ব্যক্তি নিজ ভাইকে এমন কাজে অভিযুক্ত করে যার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই এবং তার সাথে এমন অনিষ্ট জুড়ে দেয়, যা থেকে সে মুক্ত। এসব কিছুই বেপরোয়া মনোভাব, ক্ষতি এবং বিরাট সামাজিক বিপর্যয়।

এই রোগে আক্রান্তদের অধিকাংশই বড় বড় পদমর্যাদার অধিকারী, ধনী এবং যৌথ কাজে অংশগ্রহণকারী আত্মীয়েরা যারা একে অপরের সাথে জড়িত। তাই তাকওয়া ও বিশুদ্ধ মন-মানসিকতা না থাকলে কুধারণা থেকে বাঁচা যায় না। মোমিনগণ সর্বদা নিজ ভাইয়ের প্রতি ভাল ও নেক ধারণা পোষণ করবে।

কুধারণার মধ্যে কয়েকটা বিষয় সংশ্লিষ্ট থাকে,

(১) যার সম্পর্কে কু-ধারণা করা হয় সে মুসলমান।

(২) কুধারণাটি মনে স্থায়ীভাবে বদ্ধমূল হয়ে যাওয়া এবং সে অনুযায়ী সে মুসলিম ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা।

(৩) যার সম্পর্কে কুধারণা করা হয় বাহ্যিকভাবে তিনি ভাল ও ন্যায়পরায়ণ। তিনি কবীরা গুণাহ করেন না এবং সগীরাহ গুণাহরও পুনরাবৃত্তি করেন না। তবে তার ও আল্লাহর মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে কারুর কোন হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই।

www.amarboi.org

যার সম্পর্কে কুধারণা করা হয় সে যদি কাফের হয় তাহলে,

-এবিষয়ে শর্ত হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ যেন অমূলক না হয়। মুসলমানদের অধীনে কোন কাফেররের উপর অন্যায়ভাবে জুল্‌ম করা হারাম। কেননা, যে কোন প্রাণীর উপরও জুল্‌ম হারাম।

কারুর সম্পর্কে যদি মনে হঠাৎ করে কোন কুধারণা সৃষ্টি হয় এবং তা স্থায়ী না হয় ও পরে তা দূর হয়ে যায় তাহলে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ এ জাতীয় কুধারাণা মাফ করে দেন যা হঠাৎ করে মনের মধ্যে আসে ও পরে চলে যায়। অর্থাৎ যা দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

বাহ্যিক খারাপ কাজ কিংবা শরীয়ত বিরোধী কাজের কারণে খারাপ ধারণা পোষণ করলে তাতে কোন দোষ নেই। আমরা জানি, বহু কুধারণা হারাম। তাই যে কুধারণা জায়েয, হারাম কুধারণায় পতিত হওয়ার আশংকায় তা থেকেও দুরে থাকা হচ্ছে সতর্কতার দাবী। আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর এটাই মর্মার্থ,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اْجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ، اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক কুধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, কিছু ধারণা গুণাহ।' (সূরা হুজুরাত : ১২)

ইবনে কাসীর এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, আল্লাহ মোমিনদেরকে অধিক কুধারণা থেকে দুরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কুধারণা হচ্ছে, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার ও লোকদের জন্য অন্যায় মিথ্যা অপবাদ, খেয়ানত। এর মধ্যে কিছু কুধারণা গুনাহ। তাই এ থেকে সবার বেঁচে থাকা দরকার। ওমার বিন খাত্তাব (রা) বলেছেন, তোমার ভাইয়ের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা শব্দ দ্বারা ভাল ছাড়া খারাপ ধারণা করো না। তোমার কাছে ঐ বাক্য দ্বারা ভাল অর্থ বুঝার অবকাশ রয়েছে।

কুধারণার উৎস হচ্ছে, মুখ থেকে বেরিয়ে আসা কোন শব্দের আন্দাজ-অনুমানভিত্তিক অর্থ। এর ফলে বহু ক্ষতি হয়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ.

'তোমরা ধারণা থেকে বিরত থাক, কেননা, ধারণা হচ্ছে সর্বাধিক মিথ্যা।' (বোখারী ও মুসলিম)

www.amarboi.org

খারাপ ধারণা শেষ পর্যন্ত অযথা গোয়েন্দাগিরী ও নিন্দার জন্ম দেয়।

ইবনুল জাওযী তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, কথার মাধ্যমে কুধারণা প্রকাশ করার আগ পর্যন্ত কোন গুণাহ্ হবে না। কিন্তু কুধারণাটি প্রকাশ করলেই গুনাহ্ হবে।

৭. কোন মুসলমানকে তুচ্ছ জ্ঞান করা এবং তার অধিকারকে হালকা গণ্য করা

কোন মুসলমানকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, হেয় প্রতিপন্ন করা এবং গুরুত্ব না দেয়ার কুফল মারাত্মক। এটা পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক বিরাট আঘাত। একই আকীদা-বিশ্বাসের অনুসারী লোকের মধ্যে এ জাতীয় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য শোভা পায় না। সে যে কোন লিঙ্গ, রং, জাতীয় ও অঞ্চলেরই হোক না কেন। কেননা, আকীদা-বিশ্বাসগত ভাই অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তিশালী, স্থায়ী ও সম্মানিত। কোন সংঘটিত গুণাহ্র কারণে তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা এজন্য ঠিক নয় যে, সে নিজেও জানে না তার নিজের বা অন্যের শেষ পরিণতি কি? ঈমানের উপর মারা গেলে আল্লাহ্ যে কারো কবীরা গুণাহ্ও মাফ করে দিতে পারেন এবং অন্য কাউকে নিছক সগীরা গুণাহ্র কারণেও দোজখে নিক্ষেপ করতে পারেন। এমর্মে আল্লাহ্র চিরন্তন ও শ্বাশ্বত সত্য বাণী হচ্ছে,

إِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ .

'আল্লাহ্ তাঁর সাথে শিরক ছাড়া অন্য যে কোন গুণাহ্ যাকে ইচ্ছা মাফ করেন।' (সূরা নিসা : ৪৮ এবং ১১৬)

পাপীর ব্যাপারে যা করণীয় তা হচ্ছে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য অসন্তুষ্ট হওয়া এবং পাপীকে গুণাহ্র কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা। কোন সময় তাকে ত্যাগ করার প্রয়োজনও দেখা দিতে পারে। তা সত্ত্বেও কোন পাপী মুসলমানের প্রতি মনে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব পোষণ করা যাবে না। কেননা, এটা এক প্রকার অহংকার।

কোরআন ও হাদীসে কাউকে তুচ্ছ জ্ঞান করার বিরুদ্ধে বেশ কিছু দলীল-প্রমাণ রয়েছে। যদি আচরণে তা প্রকাশ পায়, তাহলে সেটা হবে গর্ব-অহংকার।

আল্লাহ্ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর

www.amarboi.org

নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে।' (সূরা হুজুরাত : ১১)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'কোন মুসলমানের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে সে তার ভাইকে হেয় প্রতিপন্ন করে।' অর্থাৎ অপর ভাইকে ঘৃণা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের কারণে যে ক্ষতি হল তা শাস্তি লাভ, খারাপ বিশেষণে ভূষিত হওয়া কিংবা খারাপ চরিত্রের অধিকারী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

জুনদুব বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর শপথ, আল্লাহ অমুককে মাফ করবে না। তখন আল্লাহ বলেন, কে এমন যে আমি মাফ করবো না বলে সে আমার বিষয়ে শপথ করে? আমি অমুকের গুণাহ মাফ করে দিলাম এবং তোমার আমল বাতিল করলাম।' (মুসলিম)

ঐ ব্যক্তি বাহ্যিক বিষয়কে গ্রহণ করে আভ্যন্তরীণ বিষয়ে ফয়সালা করে বসে আছে। ফলে, গুণাহ মাফ করার ব্যাপারে আল্লাহর ক্ষমতার বিষয়ে সে কসম করায় আল্লাহ তার আমল বরবাদ করে দিয়েছেন এবং তার সাথীর গুণাহ মাফ করে দিয়েছেন। মূলত, সে ঐ ব্যক্তিকে তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করেছিল। যারা ইসলামকে ভাল করে বুঝেন না, তারাই এ জাতীয় কাজে জড়িয়ে পড়েন।

ইলম-জ্ঞান, আমল, পদমর্যাদা ও ধনের ধোঁকার কারণে অনেকেই এই অন্যায় গুণে ভূষিত হন। অনেক ইসলামী দলকে দাবী করতে দেখা গেছে, তারাই একমাত্র সত্যের উপর আছে এবং অন্যেরা রয়েছে বাতিলের উপর। অর্থাৎ অন্যান্য দলের প্রতি ঘৃণা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মনোভাব পোষণ করে। তারপর আমল ও অন্যান্য বীরত্বের গর্ব-অহংকারের প্রতিযোগিতা চলে। তারা কোন সময় অন্যরা যা জানেনা সে বিষয় জানা কিংবা অধিক জনবল ও ধনবল অথবা জেহাদে অতীত ত্যাগ-কুরবানীর কারণে অন্যদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এর ফলে তারা ঐ ইসলামী দলের প্রতিষ্ঠাতার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে সরে পড়ে। যুগের আবর্তনক্রমে তারা ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী হয়, কোন কিছু সংশোধন করে না এবং ক্ষতি করে, উপকার করে না। অন্যদেরকে ঘৃণা ও হেয় করার কারণে শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যেও তা ছড়িয়ে পড়ে এবং নিজেদের সম্পর্ক নষ্ট করে। শেষ পর্যন্ত একে অপরকে কাফের ও ফাসেক বলে অভিহিত করে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় হেদায়াত গ্রহণের জন্য কোরআন ও হাদীস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা জরুরী।

www.amarboi.org

আল্লাহ সকল লোকের জেহাদে অংশ গ্রহণকে নিষেধ করে বলেছেন, তলোয়ারের জেহাদের উপর কলমের জেহাদকে কম গুরুত্ব দিলে চলবে না। কলমী জিহাদ তথা শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে আলেম-ওলামা ও জ্ঞানী-গুণী তৈরি হতে হবে। আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً ، فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ - طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِيْ الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

'আর সমস্ত মোমিনদের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হল না, যারা দীনের জ্ঞান লাভ করে স্বজাতির কাছে ফিরে এসে তাদেরকে ভয় দেখায় যেন তারা (জাতি) বাঁচতে পারে।' (সূরা তাওবা : ১২২)

আমি আমার দীনি ভাই, সত্যান্বেষী এবং জমীনে আল্লাহর আইন কায়েমে আগ্রহীদের কাছে অনুরোধ জানাই, তারা যেন বিনয়ের সাথে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, ভালবাসা সহকারে একত্রিত হন এবং অপরাধী হলেও অন্যদেরকে যেন ক্ষমা করেন। তাদের মধ্যেই যদি শরীয়ত অনুপস্থিত থাকে, তাহলে, যারা দীন-শরীয়তের কোন ধার ধারে না তাদের অবস্থা কি হবে?

ধনী, বড় পদমর্যাদা, কিংবা প্রভাবশালী অথবা সমাজের লোক যাদেরকে ভয় করে, তারা যদি লোকদেরকে তুচ্ছ করে, তাহলে তাদের বুঝা উচিত, আল্লাহর দীনের মধ্যে তাদের কেবল মাত্র নিজের ও অন্যের জন্য উপকারী নেক আমলেরই ওজন হবে।

মুসলমানের অধিকারকে তুচ্ছজ্ঞান করা

মানুষকে তুচ্ছ করার মারাত্মক পরিণতি হচ্ছে, তার অধিকারকেও তুচ্ছ করা, তাদের প্রতি দায়িত্বহীন দৃষ্টি দেয়া এবং তাদেরকে মোটেই গুরুত্ব না দেয়া। ফলে তাদের কোন অধিকার আছে বলেও অনুভূত হয় না। তাই এ জাতীয় লোকেরা তুচ্ছকৃত লোকদের অসুস্থতায় সেবা করে না, তাদের কেউ বিপদগ্রস্ত হলে শোক প্রকাশ করে না এবং তাদের কোন শুভ জিনিসের প্রতি মুনাফেকীর দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া শুভেচ্ছা জানায় না। তাদের কোন প্রয়োজন পুরণ করে না, অন্যায়ভাবে তাদের ছিনিয়ে নেয়া অধিকারের বিষয়ে ইনসাফ করে না এবং তাদের কোন অধিকার পূরণ করে না।

www.amarboi.org

এটা এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি যা শুধু উপনিবেশবাদীদের মধ্যেই নিন্দনীয়ভাবে বিদ্যমান কিংবা বর্ণ ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যেই পাওয়া যায়। মুসলমানরা তাদের কাছ থেকে তা কতই না ভোগ করেছে। আজ উপনিবেশবাদের বিদায়ের পর মুসলমানদের কাছ থেকেও একই আচরণ পাওয়া যায়। কেননা, তুচ্ছ জ্ঞানকারীরা দীনের দুশমন উপনিবেশবাদীদের ছাত্র কিংবা তাদের অন্ধ অনুসারী। তারা নিজেদেরকে জমীনে আল্লাহর খলীফা বিবেচনা করে।

ক্ষুধার্ত ও ভুখা-নাঙ্গা থাকা সত্ত্বেও যদি যাকাত দেয়া না হয়, তাহলে তা অবশ্যই তাদের অধিকারকে অস্বীকার করা হয়। কোন ফকীরকে সামান্য দান করাও তুচ্ছতার অন্তর্ভুক্ত। সম্পদের প্রাচুর্য ও অনেক ধনী থাকা সত্ত্বেও মুসলমানের সন্তানদেরকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা তাদেরকে তুচ্ছারই নামান্তর। অভাবের তাড়নায় সম্মানিত লোকদেরকে দাতার নির্দেশক্রমে মসজিদ কিংবা ব্যবসা কেন্দ্রের সামনে দাঁড় করিয়ে দান-সদকা বিলি, মুসলমানদের প্রতি চরম অবজ্ঞা ও মারাত্মক সম্মানহানী। অনুরূপভাবে, উচ্চ শিক্ষিতদেরকে তাদের চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে লেখা-পড়া না জানা কর্মচারীর তুলনায় কম বেতনে কাজে যোগদানে বাধ্য করাও মুসলমানের অধিকারের প্রতি তুচ্ছতার নামান্তর। এছাড়াও কোন মুসলমানের অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করা, মুসলমানের অধিকারের প্রতি চরম উপেক্ষারই প্রকাশ। এ জাতীয় গোলামী, অন্যান্যদের প্রয়োজন মুহূর্তে তাদের ঘাম ও রক্তশোষণ করে দুনিয়াকে তাদের সামনে সংকীর্ণ করা ইসলামে জায়েয নেই। শুধু তাই নয়, ইসলাম এ জাতীয় শাস্তি অন্য কোন পশুর জন্যও অনুমোদন করে না।

গোলাম মুসলমান অমুসলমান যাই হোক না কেন, তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

هُمْ اِخْوَانُكُمْ وَخَوْلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهٖ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ تُكَلِّفُوْهُمْ مَايَغْلِبُهُمْ فَاِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَاَعِيْنُوْهُمْ.

'তারা তোমাদের ভাই এবং তোমাদের কাজের লোক। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। যদি কোন ভাই তার অধীন থাকে তাহলে সে যেন নিজে যা খায় ও পরে, তাকেও তা খাওয়ায় ও পরায়। তাদের শক্তির বাইরে তাদেরকে কাজে খাটানো উচিত নয়। আর যদি খাটায় তাহলে যেন তাদেরকে সাহায্য করে।' (বুখারী ও মুসলিম)

www.amarboi.org

ওলামায়ে কেরাম এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মালিক যা খায় ও পরে, তাদেরকেও হুবহু তাই খাওয়ানো ও পরানো উদ্দেশ্য নয়। বরং মালিক ধনী ও গরীব যে অবস্থায় আছে, অধীনস্থ চাকর ভৃত্যদেরকেও সে অবস্থা অনুপাতে খাওয়াতে ও পরাতে হবে। স্ত্রীদের জন্যও একই নীতি প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ

لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ مَا اٰتَاهَا.

'বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিযিক প্রাপ্ত, সে আল্লাহ যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না।' (সূরা তালাক : ৭)

যে সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কিংবা কোম্পানী কর্মচারীদেরকে পুরোদিন দু'বেলা কিংবা এক বেলা খাটায়, তারপর তারা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পরিবারের কাছে ফিরে আসে, অথচ তাদেরকে তাদের কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয়া হয় না, যা তাদের সন্তান ও পরিবারের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট নয়, এটাকি তাদের উপর জুল্‌ম নয়? তারা কি চিন্তা করেন না, তারা এদের মাধ্যমে বিপুল অর্থ-সম্পদ আয় করেন, যার হার দাঁড়ায় আকাশচুম্বি, তারপর তাদের প্রতি এত কঠোর হন যে তাদেরকে সামান্য পরিমাণ অর্থ দেন যাতে তাদের নাভিশ্বাস উঠে। এটা কি ইসলামের সেই ভ্রাতৃত্ব যাতে করে ব্যক্তি নিজের জন্য যা পছন্দ করে অন্য ভাইয়ের জন্যও তাই পছন্দ করবে? যারা শ্রমিক কর্মচারীর অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেন তারা কি আল্লাহর রহমত পাবেন? যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسُ لاَ يَرْحَمْهُ اللّٰهُ.

'যে ব্যক্তি লোকের উপর রহম করে না, আল্লাহও তাদের প্রতি রহম করেন না।' (বোখারী ও মুসলিম)

যারা শ্রমিক-কর্মচারীর উপর জুল্‌ম করে, তাদেরকে কোনঠাসা করে এবং তাদের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে, তারা নিঃসন্দেহে জালেম। তারাই ইসলামের ইনসাফের নীতিকে জলাঞ্জলী দিয়ে কুফরীর পথ প্রশস্ত করে দেয়।

www.amarboi.org

তৃতীয় মূলনীতির ২য় অংশ

বাহ্যিক সামাজিক ব্যাধি

১. জুলুম

জালেমের জুলুম অর্থ হচ্ছে, মজলুমের সত্তা, সম্পদ ও ইজ্জতের উপর আগ্রাসন ও আক্রমণ করা। কেউ কাউকে হত্যা করলে, মারলে, গালি দিলে, অভিশাপ কিংবা কষ্ট দিলে সে তার উপর জুলুম করল। কেউ কাউকে এসব কাজ করতে সাহায্য করলে সেও জালেম। কেউ কারোর সম্পদ কেড়ে নিলে, কিংবা অন্যায়ভাবে মাল কেড়ে নেয়ার কারণ হলে সেও জালেম হবে, চাই সম্পদ অল্প হোক বা বেশী হোক।

কেউ কারোর সম্মান হানি করলে, কাউকে অশ্লীল ও গুণাহর কাজে কিংবা যেনার বিষয়ে অভিযুক্ত করলে সেটাও জুলুম হবে।

কেউ প্রতিবেশী, বন্ধু অথবা কোন মুসিলম ভাইয়ের কন্যার সাথে অন্যায় প্রেম করলে এবং তাদের সাথে যেনা করলে সেটাও জুলুম এবং খেয়ানত হবে। কেউ কোন ভাইয়ের অধিকারে বাধা দিলে সেও জালেম হবে। তাতে ঘুষ দেয়া হোক বা না হোক এবং সেই বাধা প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষ হোক। কেউ নিজের পদমর্যাদাকে অন্য মানুষের অসম্মান ও কষ্টের জন্য ব্যবহার করলে সেও জালেম। কেউ কারোর অভাবের এবং কাজের প্রয়োজনীয়তার সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে সেও জালেম। কেউ কোন শ্রমিক-কর্মচারীর শক্তি শেষ করে দিয়ে তার উপযুক্ত প্রাপ্য না দিলে সেও জালেম। কেউ এক শ্রমিকের উপর অন্য শ্রমিককে সমান কাজে বেতন-ভাতায় অগ্রাধিকার দিলে সেটাও জুলুম হবে, যদি না, শ্রমিকদের কেউ স্বেচ্ছায় এবং বিনা চাপে অন্যের চাইতে কম বেতন-ভাতায় কাজ করতে রাজী হয়। কোরআন ও হাদীসে জুলুম হারাম হওয়ার পক্ষে বহু প্রমাণ রয়েছে। জালেমদের বহু শাস্তি ও অশুভ পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ বলেছেন,

فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ.

‘এইতো তাদের বাড়ীঘর তাদের জুলুমের কারণে জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন আছে। (সূরা নামল : ৫২)

www.amarboi.org

আল্লাহ্ আরও বলেন,

وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُوْنَ ـ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ.

'আপনি আল্লাহকে জালেমদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বেখবর মনে করবেন না। তিনি তো তাদেরকে ঐ দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যে দিন চক্ষুসমূহ বিস্ফোরিত হবে।' (সূরা ইবরাহীম : ৪২)

আল্লাহ বলেন, وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ.

'জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।' (সূরা হজ্জ : ৭১)

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

اِتَّقُوْا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'তোমরা জুলুম থেকে বাঁচ। কিয়ামতের দিন জুলুম হবে অন্ধকার।' (মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوْقُ اِلٰى اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ.

'কেয়ামতের দিন প্রত্যেককে তার অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হবে। এমনকি শিংবিহীন ভেড়া শিংবিশিষ্ট ভেড়ার কাছ থেকেও প্রতিশোধ নেবে।'

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْاَرْضِ طُوِّقَهُ مِنَ سَبْعِ اَرْضِيْنَ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

'যে এক বিঘত পরিমাণ জমিন অন্যায়ভাবে নেবে কেয়ামতের দিন সাত জমিন তার গলায় পেঁচানো হবে। (বোখারী, মুসলিম)

আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِيْ لِلظَّالِمِ حَتّٰى اِذَا اَخَذَهٗ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَوَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهٗ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ. (متفق عليه)

www.amarboi.org

'আল্লাহ জালেমদেরকে অবকাশ দেন। তিনি যখন তাদেরকে পাকড়াও করেন তখন তাদেরকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়েন না। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) এ আয়াতটি পড়েন : 'তোমার রবের পাকড়াও এভাবেই হয়, তিনি যখন কোন জালেম জনপদকে পাকড়াও করেন। তাঁর পাকড়াও খুবই কঠোর।' (বোখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) মোআ'জ (রা)কে ইয়েমেন পাঠানোর সময় এ উপদেশ দেন যে,

وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ.

'তুমি মজলুমের বদ্‌দো'আকে ভয় করবে। কেননা, তার ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই।' (বোখারী, মুসলিম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اَتَدْرُوْنَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟ قَالُوْا: اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ اَنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِيْ مَنْ يَّأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَّصِيَامٍ وَّزَكَاةٍ وَّيَأْتِيْ وَقَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَاَكَلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا ـ فَيُعْطٰى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُّقْضٰى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. (مسلم)

'তোমরা জান কি দরিদ্র কে? সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই দরিদ্র যার অর্থ-সম্পদ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে সে ব্যক্তিই দরিদ্র যে কেয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাত সহকারে হাজির হবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়ে থাকবে, কাউকে যেনার অপবাদ দিয়ে থাকবে, কারুর অর্থ-সম্পদ আত্মসাত করে থাকবে, কারুর রক্ত প্রবাহিত করে থাকবে এবং কাউকে মারধোর করে থাকবে। তখন বিভিন্ন ব্যক্তিকে তার নেকগুলো দিয়ে দেয়া হবে। তাদের দায় পরিশোধের আগে ব্যক্তিটির নেক শেষ হয়ে গেলে তার উপর তাদের গুণাহ চাপানো হবে এবং পরে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।' (মুসলিম)

আবদুল্লাহ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لَنْ يَّزَالَ الْمُؤْمِنُ فِيْ فُسْحَةٍ مِّنْ دِيْنِهِ مَالَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا.

www.amarboi.org

'মোমেন হারামভাবে রক্ত প্রবাহিত না করা পর্যন্ত মোমেন থাকে।' (বোখারী)

অর্থাৎ অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করেনা।

খাওলা বিনতে আনসারিয়া থেকে বর্ণিত। (তিনি হলেন হযরত হামজার স্ত্রী) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি, 'কিছু লোক অন্যায়ভাবে আল্লাহর সম্পদ ভোগ-ব্যবহার করে। কেয়ামতের দিন তাদের জন্য রয়েছে দোযখ।' (বোখারী)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

ثَلاَثَةٌ لاَتُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالاِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ يَرْفَعُهَا اللهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ وَيَقُوْلُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِيْ لاَنْصُرَنَّكَ وَلَوْبَعْدَ حِيْنٍ.

'তিন ব্যক্তির দো'আ ফেরত দেয়া হয় না, ১. ইফতারের আগ পর্যন্ত রোজাদারের দো'আ। ২. ন্যায়পরায়ণ বিচারক, ৩. মজলুমের বদ্‌দো'আ। আল্লাহ মজলুমের বদ্‌দো'আকে মেঘের উপর উঠান এবং এর প্রবেশের আসমানের দরজা খুলে দেন। তিনি বলেন, 'আমার ইজ্জত ও সম্মানের কসম, কিছু পরে হলেও আমি তোমাকে সাহায্য করবো।' (আহমদ; তিরমিযী একে হাসান বলেছেন, ইবনে খোযাইমা ও ইবনে হিব্বান)

ইবনে ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'তোমরা মজলুমের বদ্‌দো'আকে ভয় কর। কেননা, তা অগ্নিস্ফূলিঙ্গের মত আল্লাহর কাছে উঠে যায়।' (হাকেম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'মজলুম ফাসেক হলেও তার দো'আ কবুল হয়। তার ফাসেকী তার সত্তার জন্য।' (আহমদ)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهٗ وَعِرْضُهٗ وَمَالُهٗ.

'এক মুসলমানের উপর আরেক মুসলমানের রক্ত, ইজ্জত ও সম্পদ হারাম।' (মুসলিম)

আইয়ামে জাহেলিয়াতে 'হিলফুল ফুজুল' নামক সংস্থা মজলুমের সাথে ইনসাফ, তার অধিকার ফিরিয়ে দেয়া এবং দুর্বল ও নির্যাতিত মানুষের সাহায্যের জন্য

www.amarboi.org

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজও অনুরূপ সংস্থা কায়েম করে মজলুম ও নির্যাতিত মানুষের সাহায্য করা যায়।

জালেমের জুলুমকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে ইসলাম চোরের হাত কাটা, যেনার মিথ্যা অপবাদকারীকে ৮০টি বেত্রাঘাত করা এবং মানুষের জান-মালের উপর আক্রমণকারী সশস্ত্র ব্যক্তিকে হত্যা করার বিধানসহ বিভিন্ন নিরাপত্তামূলক আদেশ জারী করেছে।

ইসলাম মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা দানের মাধ্যমে একটি নিরাপদ সমাজ গঠন করতে চায়। সেই সমাজে দুর্বলের উপর সবলের কিংবা গরীবের উপর ধনীর কোন অন্যায়-অবিচার থাকবে না। বরং সেই সমাজে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য পূরণের ব্যবস্থা থাকবে। মোটকথা, ইসলাম জুলুম মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

২. আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য আইনের শাসন জুলুম

তথাকথিত বহু মুসলমানের ধারণা যে, মুসলমানদের শাসন কাজ পরিচালনার জন্য যে কোন ধরনের আইন-কানুন প্রয়োগের স্বাধীনতা আছে। অথচ এ সকল আইন-কানুন নির্দিষ্ট সংস্কৃতি ও দূষিত আচার-অনুষ্ঠানের কারণে সীমিত মানব দৃষ্টিভঙ্গির ফসল। এগুলোতে রয়েছে স্ববিরোধিতা ও সংঘর্ষমুখর মানবিক ক্রিয়া। এ ছাড়াও তাতে রয়েছে এক শ্রেণীর লোকের অপবিত্র ইচ্ছা, নোংরা মনোভাব ও শয়তানী উচ্চাভিলাষ পূরণের কদর্যতা। এরা গোটা জাতির স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের জন্য ঐ সকল আইন-কানুন তৈরি করেছে। পক্ষান্তরে, সমাজের অবশিষ্ট লোক চায় আলো, ইনসাফ, সাম্য, নিরাপত্তার কিরণ এবং সুন্দর ও পবিত্র উপায়ে আয়-রোজগারের সুযোগ।

ঐ সকল মুসলিম দাবীদাররা ভুলে গেছে, আল্লাহর আইন অনেক ব্যাপক এবং আল্লাহ স্বয়ং এর পূর্ণতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

'আজ আমি তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পন্ন করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পছন্দ করলাম।' (সূরা আল মায়িদাহ : ৩)

www.amarboi.org

মহান আল্লাহ দীন ও দুনিয়ার এমন কোন বিষয় বাকী রাখেননি যে বিষয়ে সংক্ষেপে কিংবা বিস্তারিতভাবে আইন প্রণয়ন করেননি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْئٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ.

'আমরা আপনার উপর এমন কিতাব পাঠিয়েছি যাতে প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়াত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে।" (সূরা নাহল : ৮৯)

তারা ভুলে গেছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমানের দাবী হচ্ছে, আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা, তাঁর আদেশ-নিষেধের প্রতি বিনীত হওয়া এবং রাজনৈতিক, সামাজিক, যুদ্ধ-শান্তি, ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক ও আত্মিক সকল বিষয়ে আল্লাহর আইন মেনে চলা। মুসলমানরা যদি অনুরূপ না করে তাহলে, তাদের ঈমানের কোন মূল্য নেই।

যারা ঈমানের দাবী করে এবং আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করতে অস্বীকার করে, তারা মোনাফেক। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَا اُولٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ. وَاِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ - وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوْا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ.

'তারা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আনুগত্য করি; তারপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা মোমেন নয়। তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। সত্য তাদের পক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের কাছে ছুটে আসে।' (সূরা নূর : ৪৭-৪৯)

আল্লাহ্ শপথ করে বলেছেন, কেউ কোন বিষয়ে কোরআন ও হাদীস মোতাবেক ফয়সালা না করলে সে মোমেন হতে পারে না এবং কোরআন-হাদীসের ফয়সালার মধ্যে যেন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অনুভূতিও না থাকে। আল্লাহ বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

www.amarboi.org

'আপনার রবের শপথ, তারা সে পর্যন্ত ঈমানদার হবে না, যে পর্যন্ত না আপনাকে নিজেদের মধ্যকার বিরোধের বিষয়ে ফয়সালাকারী মানে এবং আপনি যে ফয়সালা দিয়েছেন সে বিষয়ে তাদের অন্তরে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না থাকে এবং সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নেয়।' (সূরা আন নিসা : ৬৫)

তাহলে সে ব্যক্তির অবস্থা কিরূপ হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করেছে, নিজের জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে আল্লাহ্‌র আইনকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং আল্লাহর সাথে যুদ্ধাবস্থায় কি করে সে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করবে? সে কি করে পরকালে আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা পাবে? অথচ আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, ঐ লোক আল্লাহর শরীয়তের বিরোধী।

আল্লাহ্ বলেন,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ.

'এরপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরীয়তের উপর। অতএব, আপনি এর অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞানীদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। আল্লাহর সামনে তারা আপনার কোন উপকারে আসবে না। জালেমরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ্ পরহেযগারদের বন্ধু। (সূরা জাসিয়া : ১৮)

মোমেনদের উচিত, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফয়সালা গ্রহণ না করার বিরুদ্ধে আল্লাহর হুমকিগুলো সম্পর্কে জানা।

আল্লাহ্ বলেছেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا ـ

'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে। যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে। সে প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত হয়।' (সূরা আল আহযাব : ৩৬)

www.amarboi.org

সরকার যদি দেশকে আল্লাহর আইন বিরোধী ব্যবস্থা দিয়ে পরিচালনা করে তাহলে, সরকারের কর্তা ব্যক্তিদের দেশের সকল লোকের সমান গুনাহ্ হবে এবং কেয়ামতের দিন সকলের সমান বোঝা তাকে বহন করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন,

لِيَحْمِلُوْا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ الاَ سَاءَ مَايَزِرُوْنَ -

'ফলে কেয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপের বোঝা এবং যাদেরকে তারা অজ্ঞতাবশত বিপথগামী করে, তাদের পাপের বোঝাও বহন করবে। তারা কতইনা নিকৃষ্ট বোঝা বহন করে।' (সূরা নাহল : ২৫)

যে সকল লোককে তারা আল্লাহ্র আইন থেকে বঞ্চিত করে তাঁর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, তাদের ব্যাপারে তাকে জালেম গণ্য করা হবে। আল্লাহর রহমত ও সুবিচারের ঝর্নাধারা থেকে লোকদেরকে দূরে রাখার কারণে আজীবন জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মানবিক আইনে দ্রব্যমূল্যের অগ্নিমূল্য সংরক্ষিত। কিন্তু আল্লাহর সুবিচারপূর্ণ দয়ালু আইনে তা নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে, মানবিক আইনে মজুদ্দারী সুরক্ষিত। অপরদিকে, আল্লাহর আইন এই অমানবিক আইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা জুলুম। অপরদিকে মোমেনদেরকে রিজিক থেকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে আল্লাহর আইন মানবিক জুলুম-অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। আল্লাহর আইন অনুপস্থিত থাকার কারণে শাসক কর্তৃক রাষ্ট্রে জেল-জুলুম, কাটাকাটি, বহু লোক হত্যা, বিনা বিচারে লোক আটক রাখা, মানুষের ঘরবাড়ী ধ্বংস করা, শিশুদেরকে ইয়াতীম করা, নারীদেরকে বিধবা করা, বিভিন্ন ঘর ও পল্লীতে দুর্যোগ প্রবেশ করানো, নির্দোষ লোককে অভিযুক্ত করা, বিশ্বস্ত লোককে বিশ্বাসঘাতক বানানো ও দীনদার লোকদেরকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দেয়া ইত্যাকার ঘটনা ঘটেছে ও ঘটছে।

যে আল্লাহর দীনকে ও আল্লাহর আইনকে অস্বীকার করে মুসলমানদেরকে সে অনুযায়ী শাসন না করে, সর্বসম্মতিক্রমে তারা কাফের। এর অপর অর্থ হলো, সে কোন মুসলিম নারীকে বিয়ে করতে পারবে না। কোন মুসলমানের ওয়ারিশ হতে পারে না, মৃতদের উপর জানাযার নামাজ পড়তে পারে না এবং তাদেরকে মুসলমানের কবরস্থানে দাফন করা যেতে পারে না। তাদের সাথে কাফেরদের

www.amarboi.org

অনুরূপ ব্যবহার করতে হবে। যদিও সে নামায পড়ে, রোযা করে এবং হাজার বার হজ্জ করে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْغُوْنَ؟ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ.

'তারা কি জাহেলিয়াত যুগের শাসন ও ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহর চাইতে বিশ্ববাসীদের জন্য উত্তম ফয়সালাকারী কে?' (সূরা মায়িদাহ : ৫০)

সেই জাতির জন্য দুর্ভাগ্য যে জাতির পাগল, বোকা ও ধোঁকাবাজরা শক্তি-ক্ষমতা ও অস্ত্রের জোরে তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী হয়ে বসে। যে জাতি শুধু ধর্মীয় উৎসব ও বিশেষ অনুষ্ঠানে ধর্মের শ্লোগান শুনতে পায় এবং এক ধরনের লোক ওয়াজ-নসীহতের নামে জনগণের টাকা-পয়সা খায়, অথচ কোন জালেম শাসক ও শক্তিধরের বিরুদ্ধে জাতিকে পথনির্দেশ দেয় না, সে জাতিও খুবই হতভাগা।

হে জালেম শাসকরা! তোমরা জনগণের উপর থেকে তোমাদের হাত গুটিয়ে নাও, যে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমতা দিয়েছেন, তাঁকে ভয় কর এবং আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাসন করার জন্য আল্লাহর বান্দাহদেরকে সুযোগ দাও। তোমরা আল্লাহর এই বাণী শুনে নাও!

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُوْنَ ـ

'আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী শাসন করুন ও ফয়সালা দিন। তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন- যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখুন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গুণাহের কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান আছে।' (সূরা মায়িদাহ : ৪৯)

আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য শাসন সর্বাধিক বড় জুলুম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন,

www.amarboi.org

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ... فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ... فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ -

'যারা আল্লাহ্ কর্তৃক নাজিলকৃত আইন অনুযায়ী শাসন ও বিচার করে না তারা কাফের... তারা জালেম... তারা ফাসেক।' (সূরা মায়িদাহ : ৪৪, ৪৫, ৪৭)

এই কারণে সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে, জালেম শাসকের সামনে সত্য বলা। কেননা, জালেম শাসক জাতি ছোট হোক বা বড় হোক-সবার ভেতর জুলুমের অগ্নিশিখা প্রবেশ করায়। মুনাফেক ও সুবিধাবাদী ছাড়া কেউ তার জুলুম থেকে রক্ষা পায় না। সুবিধাবাদী ও মুনাফিকরা সকল স্বৈরাচারীর কাছে মাথা নত করে।

৩. ঘুষ ও পক্ষপাতিত্ব করা

কিছু সামাজিক ব্যাধি এমন যে তা যদি জাতির মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং সকল পর্যায়ে ও সকল পদমর্যাদার লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে পরবর্তীতে তা উম্মাহর মর্যাদা হানি করে, উন্নতির স্বাভাবিক ধারা ব্যাহত করে, জাতির ব্যক্তিসমূহের প্রতি আস্থা নষ্ট হয় এবং সম্মান ও সত্যবাদিতার নীতি ব্যাহত হয়। তারপর সেই জাতির সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে, ঐক্যে ফাটল ধরে এবং তাদের উপর আগ্রাসন, খেয়ানত ও অপবিত্রতার পাশবিক আত্মা সওয়ার হয়। ফলে, তাদের জীবন পশু ও কীট-পতঙ্গের জীবন থেকেও নিকৃষ্ট হয়। সে সমাজ থেকে সম্মান, মর্যাদা, বিচার-ইনসাফ, ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি ও সাম্য বিদায় নেয়।

ঘুষ ঐ জাতীয় সামাজিক ব্যাধি। ঘুষ হল, আপনি কাউকে এজন্য অর্থ দিলেন যেন, আপনি যা পাওয়ার যোগ্য নন তা পান কিংবা এর মাধ্যমে অন্যকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন।

পক্ষপাতিত্বও অনুরূপ ব্যাধি। আপনি যদি আত্মীয়তা, নিজের দাপট, কিংবা কারুর মর্যাদার কারণে তাকে এমন অর্থ দেন যা সে পাওয়ার যোগ্য নয়, চাই তা সরকারী কিংবা কোম্পানী অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের অর্থই হোকনা কেন অথবা যে যে পদ পাওয়ার যোগ্য নয় তাকে যদি সে পদ দেন, উত্তম প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও অন্য একজনকে চাকুরী দেন। অথবা নিলাম ডাকে অবৈধভাবে কাউকে নিলাম দেন, তাহলে এ সবই পক্ষপাতিত্ব।

ইসলাম এসব বিষয়কে হারাম করেছে। ঘুষ হারাম, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন,

www.amarboi.org

وَلاَ تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

'তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিছু অংশ জেনে-শুনে পাপের পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতের তুলে দিও না।' (সূরা বাকারা : ১৮৮)

আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ.

'রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘুষখোর ও ঘুষদাতার উপর অভিশাপ দিয়েছেন।' (আবু দাউদ, তিরমিযী একে হাসান বলেছেন)

অভিশাপের অর্থ হল, আল্লাহর রহমত থেকে দূর করা। যারা গুণাহ কবীরা করে তারাই এ শাস্তির যোগ্য হয়।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : 'রাসূলুল্লাহ্ (সা) শাসনের ক্ষেত্রে ঘুষখোর ও ঘুষদাতার উপর অভিশাপ দিয়েছেন।' (তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ। তিরমিযী একে হাসান এবং ইবনে হিববান একে সহীহ বলেছেন। আহমদ 'ঘুষের মধ্যস্থতাকারীদের উপর'ও অভিশাপের কথা বর্ণনা করেছেন।)

এখানে 'শাসনের ক্ষেত্রে' উল্লেখ করা হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাসকদেরকেই ঘুষ দেয়া হয়। ঘুষ পেয়ে তারা যারা সেটার যোগ্য নয় তাদেরকে সে জিনিস দান করে এবং তাদের উপর জুলুম করে।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন সমাজের শাসক ও বিচারক নিযুক্ত হয় এবং নিজেদের পছন্দনীয় কিংবা অপছন্দনীয় রায় দেয়, তাকে হাশরের দিন হাত বাঁধা অবস্থায় হাজির করা হবে। সে যদি ইনসাফ করে থাকে, ঘুষ না খেয়ে থাকে এবং জুলুম না করে থাকে, আল্লাহ তাকে মুক্ত করে দেবেন। আর যদি সে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিপরীত রায় দেয়, ঘুষ খায় ও জুলুম করে, তার বাম হাত ডান হাতের সাথে বেঁধে জাহান্নামের গভীর তলদেশে নিক্ষেপ করা হবে। ৫শ বছর সময়েও সে গভীর তলদেশে পৌঁছাতে পারবে না।' (হাকেম)

www.amarboi.org

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাসন ও বিচার কাজে ঘুষ হচ্ছে কুফরী এবং লোকদের জন্য তা হচ্ছে হারাম।

আল্লামা সানআলী বলেছেন,[১] ঘুষ সর্বসম্মতভাবে হারাম। এটা বিচারক কিংবা যাকাত সংগ্রহকারী কর্মচারী অথবা অন্য যে কেউ হোক না কেন।

বিচারকদের গৃহীত সম্পদ চার প্রকার। (১) ঘুষ (২) উপহার (৩) বিনিময় (৪) রিযক।

(১) বিচারক যদি ঘুষের কারণে অন্যায় রায় দেয় তাহলে তা দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের জন্যই হারাম। যদি ঘুষ ছাড়া দাতার নিজ অধিকার লাভ করার কোন সম্ভাবনা না থাকে এমতাবস্থায় বিচারকের জন্য তা গ্রহণ করা হারাম, কিন্তু দাতার কোন গুণাহ হবে না। আর ঘুষ ছাড়া অধিকার লাভ করার সম্ভাবনা থাকলে, ঘুষদাতা গুণাহগার হবে। কেননা, সে ঘুষের মত অপরাধ চালুতে সাহায্য করেছে।

(২) বিচারককে দায়িত্ব গ্রহণের আগে উপহার দিয়ে থাকলে পরে দিতেও দোষ নেই। আর যদি বিচারকের দায়িত্যগ্রহণের পর উপহার দেয়া হয় এবং বিচারকের আদালতে যদি উপহারদাতা ও তার বিবাদীর কোন মামলা থাকে, তাহলে তা বিচারকের জন্য গ্রহণ করা হারাম। কেননা, তা ঘুষ।

(৩) বিনিময় : কোন এলাকার লোক যদি বিচারের জন্য কোন বিচারক নিয়োগ করে ও তাকে বিনিময় দেয়, তাহলে তার পক্ষে সেই বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয। তবে এ জন্য দু'টো শর্ত আছে। (ক) রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে এজন্য সে কোন অর্থ পায় না। (খ) বিচারক হিসেবে নিযুক্তির পূর্বের চাইতে বিনিময় অধিকতর হতে পারবে না।

(৪) রাষ্ট্র থেকে কোন ভাতা দিলে তা গ্রহণ করা জায়েয। তবে সেটা কাজের বিনিময় হওয়া জরুরী নয়। (সংক্ষেপিত)

বিচারকের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য, রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োগকৃত সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে, কোন কোম্পানী ও সংস্থা কর্তৃক নিয়োজিত কর্মচারীর ক্ষেত্রেও একই জিনিস প্রযোজ্য।

রাসূলুল্লাহ (সা) শাসক ও বিচারকদেরকে উপহার দেয়ার বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তিনি এটাকেও এক ধরনের ঘুষ বিবেচনা করেছেন। কেননা, ঐ দায়িত্ব ও ক্ষমতা গ্রহণের আগে তাদেরকে উপহার দেয়া হত না।

---

১. সাবীল-আস সালাম, ৪র্থ খণ্ড, ১২৪ পৃঃ

www.amarboi.org

আবু হুমাইদ আবদুর রহমান বিন আস সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আয্দ গোত্রের ইবনুল লুতবিয়াকে যাকাত সংগ্রহের জন্য নিয়োগ করেন। ইবনুল লুতবিয়া যাকাত সংগ্রহ শেষে ফিরে এসে বলেন, এটা আপনাদের জন্য, আর ঐটা আমাকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। তখন রাসূলূল্লাহ (সা) মিম্বারের উপর আরোহণ করেন এবং আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠ করে বলেন :

اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ اَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِـى اللّٰهُ فَيَـأْتِىْ فَيَقُوْلُ : هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا هَدِيَّةٌ اُهْدِيَتْ اِلَىَّ! اَفَلاَ جَلَسَ فِىْ بَيْـتِ اَبِيْـهِ اَوْ اُمِّهِ حَتّٰى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُـهُ اِنْ كَـانَ صَادِقًـا؟ وَاللّٰهِ لاَيَـأْخُذُ اَحَـدٌ مِّنْكُـمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ اِلاَّ لَقِىَ اللّٰهَ تَعَالٰى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... اِلٰى اَنْ قَالَ : اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟

'আল্লাহ আমাকে যে ক্ষমতা অর্পণ করেছেন তার জন্য আমি তোমাদের কাউকে যখন কাজে নিয়োগ করি তখন সে এসে বলে, এটা তোমাদের জন্য, আর এটা আমাাকে প্রদত্ত উপঢৌকন। সে যদি সত্যবাদী হয়, তাহলে সে কেন নিজ মা-বাপের বাড়ীতে বসে উপহার আসে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখে না? আল্লাহর শপথ, তোমাদের কেউ যদি অন্যায়ভাবে কিছু গ্রহণ করে তাহলে, কেয়ামতের দিন তা বহন করা অবস্থায় সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।...তারপর তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি? (বোখারী ও মুসলিম)

সাঈদ বিন মনসুর, ইবনু আবি শায়বা এবং বায়হাকী ইবনে ওমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে ওমার (রা) বলেন, আমি একটি উট কিনেছি এবং তাকে মুসলমানদের সাধারণ চারণভূমিতে পাঠিয়েছি। উটটি মোটা-তাজা হওয়ার পর আমি এটাকে বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে গেলাম। হযরত ওমার ফারুক (রা) বাজারে ঢুকে ঐ মোটা-তাজা উটটি দেখে জিজ্ঞেস করেন, এটি কার? বলা হল, এটা আপনার ছেলে আবদুল্লাহ বিন ওমারের। তখন তিনি বলেন, হে আমীরুল মোমেনীনের ছেলে আবদুল্লাহ! আমি তখন দৌড়ে গিয়ে বললাম, হে আমীরুল মোমেনীন কি হয়েছে? তিনি বললেন, এ উটের ঘটনা কি? আমি জওয়াব দিলাম, আমি উটটি কিনে তা মুসলমানদের সাধারণ চারণগাহে পাঠিয়েছিলাম। অন্যান্যদের মত আমার উদ্দেশ্যও একই। তখন ওমার ফারুক বলেন, লোকেরা

www.amarboi.org

বলেছে, 'তোমরা আমীরুল মুমেনীনের ছেলের উটের প্রতি যত্ন নাও এবং তাকে পানি পান করাও। হে আবদুল্লাহ বিন ওমার! তুমি তোমার পুঁজি নাও এবং অতিরিক্ত অর্থ বায়তুলমালে জমা দিয়ে দাও।

এই ঘটনায় হযরত ওমার বিবেচনা করেছেন যে, লোকেরা খলীফার ছেলেকে পক্ষপাতিত্ব করেছে এবং বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে, সে জন্য তার উটের প্রতি বিশেষ সুবিধে দান করেছে। সেজন্য তিনি উটের কেনা দাম আবদুল্লাহকে দিয়ে অতিরিক্ত অর্থ বাইতুলমালে জমা দিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর প্রতি অত্যধিক ভয় ও ওমারের কঠোর সংবেদনশীলতাই এর পেছনে কাজ করেছে। নচেত, তিনি তো এতটুকুন করতে পারতেন যে অন্যান্য লোকদের লাভের হারে আবদুল্লাহকে লভ্যাংশ দিয়ে অতিরিক্ত অর্থ বায়তুলমালে জমা দিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাকওয়া ও ইনসাফের উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন।

আনুকূল্য ও পক্ষপাতিত্ব না করার জন্য ইয়াযিদ বিন আবি সুফিয়ানের প্রতি হযরত আবু বকর (রা)-এর আদেশও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইয়াযিদ বলেন, আবু বকর (রা) আমাকে সিরিয়া পাঠানোর সময় বলেন, হে ইয়াযিদ! তোমার আত্মীয় আছে। তারা যেন তোমার দায়িত্বের উপর প্রভাব বিস্তার না করে। আমি তোমার ব্যাপারে এ বিষয়ে বেশী আশংকা করি।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَامَّرَ عَلَيْهِمْ اَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ لاَيَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً حَتّٰى يُدْخِلَهُ جَهَنَّمَ -

'যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়, তারপর সে আনুকূল্যের ভিত্তিতে কাউকে গভর্ণর কিংবা কোন কাজে নিয়োগ করে, তার উপর আল্লাহর অভিশাপ। তাকে দোযখে প্রবেশ করানোর আগে আল্লাহ তার কোন ফরজ ও নফল ইবাদত কবুল করবেন না। (হাকেম, সনদ সহীহ)

৪. গোয়েন্দাগিরী করা এবং শরয়ী কারণ ছাড়া কারোর দোষ-ত্রুটি তালাশ করা।

কোন কিছু সম্পর্কে জানার আগ্রহ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সকল সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ মানুষ অজানাকে জানার চেষ্টা করে এবং কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের নির্দিষ্ট গণ্ডী পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায় না। তার ইচ্ছা যে, সে আরও বেশী জানবে। এই আগ্রহের ফলেই মানুষ বিশ্বের বহু অজানা রহস্য সম্পর্কে

www.amarboi.org

জানতে পেরেছে। বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত যত আবিষ্কার হয়েছে এ সবের মূলে রয়েছে মানুষের এই জ্ঞান স্পৃহা। তাই এটা আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামতের মধ্যে অন্যতম বিরাট নেয়ামত।

মানুষের অজানাকে জানার এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সাধারণ কল্যাণের মধ্যে সীমিত থাকা বাঞ্ছনীয়। মানুষের কল্যাণমুখী জ্ঞান সংগ্রহ আল্লাহর বিরাট নেয়ামত। কেননা, যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যে সে নেয়ামতকে ব্যবহার করেছে। যদি সে উক্ত নেয়ামতকে কোন ব্যক্তি বা সমষ্টির ক্ষতি সাধনে ব্যবহার করে তাহলে, সেটা হবে আল্লাহর নেয়মাতের সাথে কুফরী, যার ফলে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর গযব অনিবার্য হয়ে পড়ে। এরই ভিত্তিতে জাতির জন্য উপকারী ও কল্যাণকর জ্ঞান পিপাসা প্রশংসিত এবং জাতির জন্য ক্ষতিকর ও অনুপকারী জ্ঞান-পিপাসা শরীয়ত, জ্ঞান ও সমাজের আয়নায় নিন্দিত।

উপকারী জ্ঞান-পিপাসা ও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হল : প্রকৃতির রহস্য, বিশ্বের সাধারণ নিয়ম-কানুন, মানুষের শরীরের গোপন বিষয়, সাগর-মহাসাগরের গঠন-প্রকৃতি, তারা ও আকাশের বিষয়বস্তুসহ প্রাণীর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে জানা যাতে করে মানবতার উন্নতি সাধনে নূতন কিছু আবিষ্কার করা যায়, মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির অগ্রগতি হয় এবং আগ্রাসী জালেম ও লুটেরাদের অন্যায় থেকে তাদেরকে রক্ষা করা যায়।

অনুরূপভাবে, সকল ভদ্র ও বৈধ উপায়ে দুশমনের খবর সংগ্রহ করে আমাদেরকে ধ্বংস করার বিষয়ে তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করা এবং আমাদের পবিত্রস্থান ও সম্মান-মর্যাদার বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ বুঝার চেষ্টা করতে হবে। এ সকল কিছু নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ,

سَنُرِيْهِمْ اٰيَاتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ.

'আমি তাদেরকে পৃথিবীর দিগন্তে ও তাদের মধ্যে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করবো, ফলে তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে এ কোরআন সত্য।' (সূরা হা-মীম-আস সাজদাহ : ৫৩)

আল্লাহ্ বলেন,

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَـدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ.

www.amarboi.org

'আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন ভীতির সঞ্চার করতে পার আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন।' (সূরা আনফাল : ৬০)

আল্লাহ আরও বলেন, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ.

'হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়।' (সূরা নিসা : ৭১)

২য় ধরনের নিন্দিত জ্ঞান-চাহিদা হচ্ছে, ব্যক্তিগত বিষয় কিংবা কোন ব্যক্তি অথবা সমষ্টির দোষ-ত্রুটি আবিষ্কারের জন্য তাদের গোপন বিষয় জানার চেষ্টা করা। সুবিধেমত পরে সে সকল তথ্যের সদ্ব্যবহার করা কিংবা ঐ সকল তথ্য জনসাধারণ্যে প্রকাশ করে তাদেরকে হেয় করা। হলুদ সাংবাদিকতা ও বিভ্রান্ত লেখকরা ঐরূপ কাজ করে থাকে। অথবা সরকারের হাতে ঐ সব তথ্য থাকলে তারা তা মুসলমানদের ক্ষতির জন্য অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। এর ফলে তাদের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করা হয়।

আমরা জানি, অনেক জালেম ও স্বাধীনতা বিরোধী সরকার জাতির জনগণের পয়সাকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের তথ্য সংগ্রহের পেছনে খরচ করে। তারাই নিকৃষ্ট আত্মার অধিকারী ও মৃত মানসিকতার ধ্বজাধারী তাদের অনুসারী মোনাফেকদেরকে ঐ হীন গোয়েন্দাগিরীতে লাগিয়ে দেয়। তারাই অবাস্তব ও মিথ্যা তথ্যসহ বহু আজগুবী কাহিনী রচনা করে এবং বাস্তব সত্যকে বিকৃত করে পেশ করে।

পয়সার লোভে সত্য-মিথ্যার পরোয়া না করে মনগড়া তথ্য পেশ করে। ফলে সমাজে বিশৃংখলা দেখা দেয়। নিরপরাধ লোককে আটক করা হয় এবং অপরাধীকে ছেড়ে দেয়া হয়। মুনাফেকদের দৌরাত্ম বৃদ্ধি পায় এবং ভদ্র ও শালীন লোকদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে। তখন সমাজে জুলুম, বঞ্চনা, দুর্ভাগ্য ও জেল-জুলুম বৃদ্ধি পায়। সমাজকে এই ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন, وَلَا تَجَسَّسُوْا। 'তোমরা গোয়েন্দাগিরী করো না' (সূরা হুজুরাত : ১২)

ওলামায়ে কেরামের মতে, গোয়েন্দাগিরীর অর্থ হচ্ছে, মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ানো এবং তাদের গোপন বিষয়সমূহ ফাঁস করার চেষ্টা করা। আল্লামা

www.amarboi.org

আলূসী তাঁর তাফসীর রুহুল মাআনীতে বলেছেন, تَجَسُّسٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে অন্যের গোপন বিষয় সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা। যে সকল দোষ উল্লেখ করাকে মানুষ খারাপ মনে করে কিংবা অন্য কেউ তা জানুক সে তা পসন্দ করে না এমন সব বিষয় জানার চেষ্টা করা। সকল ওলামায়ে কেরাম এটাকে কবীরা গুণাহ বিবেচনা করেন।

আবু দাউদ, ইবনুল মোনজের এবং ইবনু মারদুইওয়াহ আবু বারযাহ আসলামী থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আমাদেরকে বক্তৃতার সময় বলেন, 'তোমাদের যাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি অথচ মুখে ঈমান এনেছ, তোমরা মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করো না। যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ-ত্রুটির পেছনে লেগে থাকে আল্লাহ তাকে তার ঘরের মধ্যেই অপমানিত করেন।' অর্থাৎ দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ানো সঠিক ঈমানের পরিচায়ক নয়। এতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

বায়হাকী বারা বিন আযেব থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এত জোরে বক্তৃতা করেছিলেন যে, ঘরের নারীরা পর্যন্ত তাঁর আওয়াজ শুনতে পেয়েছে।'

ঈমাম আওযাঈ (র) বলেছেন, تَجَسُّسٌ হচ্ছে, কোন সম্প্রদায়ের সেই কথা শুনার চেষ্টা করা যে কথা শুনাকে তারা অপছন্দ করে। এটা হারাম।

মুয়াবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'তুমি যদি মুসলমানদের গোপন বিষয় জানার চেষ্টা কর, তাহলে তুমি তাদেরকে বরবাদ করে দেবে কিংবা বরবাদের কাছাকাছি ক্ষতি করবে।' (আবু দাউদ-হাদীসটি বিশুদ্ধ)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'কেউ বিনা অনুমতিতে কারোর ঘরে উঁকি মেরে দেখলে তার চোখ ফুটা করে দেয়া জায়েয।' (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

وَمَنِ اسْتَمَعَ اِلٰى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ صُبَّ فِىْ اُذُنَيْهِ الاٰنُـكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা শুনার জন্য কান খাড়া করে অথচ তারা তা অপছন্দ করে, কেয়ামতের দিন তার দুই কানে গলিত শিশা ঢালা হবে।'

www.amarboi.org

এভাবে প্রত্যেক মুসলমানের জানা উচিত, অন্য মুসলমানের নিষিদ্ধ গোপনীয়তা রয়েছে। তার বাসস্থান, কথা, কাজ ও চিন্তা-ভাবনার গোপনীয়তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা দরকার। তাই দোষ বের করার উদ্দেশ্যে অন্যায়ভাবে কারোর ঘরে উঁকি মারলে তার চোখ নষ্ট করে দেয়া জায়েয এবং এ জন্য সে রক্তপণ ও ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না। যারা এ রকম করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের শাস্তি রয়েছে।

রেকর্ডার, কৃত্রিম উপগ্রহ এবং অন্য কোন সংবেদনশীল যন্ত্রের মাধ্যমে গোয়েন্দাগিরী করাও এর অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে। সেই স্বাধীনতা নষ্ট করা জায়েয নেই। প্রত্যেক মুসলমানের রয়েছে সম্মান ও মর্যাদা। সেই মর্যাদা রক্ষা করা দরকার। দোষ প্রকাশ করা আরেকটা গুণাহ। অর্থাৎ সেটা হচ্ছে গীবত বা অপবাদ।

৫. ধোঁকাবাজী করা

ধোঁকাবাজীর মাধ্যমে সত্যকে বিকৃত করা হয়। আর যা সত্য নয় সেটা হচ্ছে, বাতিল ও গোমরাহী। যে জাতির মধ্যে এই ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে সেই জাতির মর্যাদা শেষ হয়ে যায় এবং মন্দ ও নিকৃষ্ট জিনিসের প্রতি তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ পায়। সে জাতিকে দীন ও নৈতিকতার জাতির পরিবর্তে ধোঁকাবাজ পশু ও শিয়াল-নেকড়ের জাতি বলা যায়, সে জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ: لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ ولاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَتِهِمْ.

'দীন হচ্ছে, উপদেশ। আমরা প্রশ্ন করলাম, কার জন্য উপদেশ? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ, আল্লাহর কিতাব, রাসূল, মুসলিম ইমাম ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য। (মুসলিম)

আল্লাহর জন্য উপদেশ বলতে বুঝায়, বান্দাহ্ ইখলাসের সাথে আল্লাহর নির্ভেজাল ইবাদত করবে, রাসূলের জন্য উপদেশ বলতে বুঝায়, নবীর দাওয়াত গ্রহণের বিষয়ে মোমেনের মন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। মোমেন জনসাধারণের জন্য উপদেশ বলতে বুঝায়, নিজের জন্য যা পসন্দ করবে, অন্যের জন্য তা পসন্দ করবে। নিজের জন্য যা অপছন্দ করবে, অন্যের জন্যও তা অপছন্দ করবে।

www.amarboi.org

এটা হচ্ছে, ঈমানের সত্যতা। কেউ ধোঁকাবাজী ও শঠতার আশ্রয় নিলে সে বিশুদ্ধ মুসলিম নয়। সে জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّانَا فَلَيْسَ مِنَّا.

'যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং যে ব্যক্তি আমাদের সাথে ধোঁকাবাজী করে সেও আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।' (মুসলিম)

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধোঁকাবাজীর অর্থ হচ্ছে, অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভোগ করা, হারাম সম্পদ সংগ্রহ করা এবং মালিকানার অধিকার নেই এমন সম্পদের অধিকারী হওয়া। এগুলো সবই হারাম। আর হারাম খেয়ে গঠিত শরীরের উত্তম ঠিকানা হচ্ছে দোযখ।

'একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক খাদ্যস্তূপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় নিজ হাত এর ভেতরে ঢুকান। তাতে তাঁর আঙ্গুল ভিজে যায়। তিনি প্রশ্ন করেন, হে খাদ্যের মালিক! এটা কি? সে জওয়াব দিল, হে আল্লাহর রাসূল! বৃষ্টির পানি পড়ে তা ভিজে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তুমি এটাকে উপরে রাখলে না কেন যাতে লোকেরা তা দেখতে পায়? (জেনে রাখ) যে আমাদের সাথে ধোঁকাবাজী করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।' (মুসলিম)

কেনার নিয়ত ছাড়া শুধু দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কোন জিনিসের বেশী দাম বলাও ধোঁকাবাজীর অন্তর্ভুক্ত। বিক্রেতার দ্রব্যের দাম বাড়ানোই এ জাতীয় তৎপরতার লক্ষ্য। এটাকে নিষিদ্ধ করে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, وَلَاتَنَاجَشُوْا 'তোমরা কেনার নিয়ত ছাড়া শুধু দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে দামাদামি করবে না।' এর মাধ্যমে অর্জিত অর্থও হারাম।

সামাজিক জীবনে অনুরূপ ধোঁকাবাজিকে মুনাফেকী বলা হয়। সামাজিক নেফাকের ৫টি স্তম্ভ আছে। ১. আমানতের খেয়ানত ২. মিথ্যা কথা ৩. চুক্তিভঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ৪. পাপ ও শত্রুতা এবং ৫. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা।

হাদীসে এগুলো এভাবে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا : إِذَا أُئْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

www.amarboi.org

'যার মধ্যে ৪টি বিষয় পাওয়া যাবে সে নির্ভেজাল মুনাফিক। যার মধ্যে এর একটি অভ্যাস পাওয়া যাবে তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি লক্ষণ বিদ্যমান আছে যে পর্যন্ত না সে তা ত্যাগ করে। সেগুলো হচ্ছে, ১. আমানতের খেয়ানত ২. মিথ্যা বলা ৩. চুক্তি ভঙ্গের ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং ৪. শত্রুতা করলে গুনাহর কাজ করা।' (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

মুনাফিকের সকল গুণাবলী ধোঁকা, শঠতা, বিভ্রান্তি ও বিকৃতির অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর ফলাফল যত মারাত্মক, অপরাধও তত মারাত্মক হবে এবং আল্লাহর অসন্তোষ ও আখেরাতে প্রাপ্য আযাবের পরিধিও তেমনি বড় ও বিস্তৃত হবে। যে কারণে জাতির ও দেশের প্রতি দেশের সরকার প্রধান কিংবা শাসকের ধোঁকা ও প্রতারণা এবং সত্যের বিকৃতি সবচাইতে নিকৃষ্ট মিথ্যা হিসেবে গণ্য হবে। ফলে সে হবে সর্বশ্রেষ্ঠ মুনাফিক, গোমরাহকারী ও নিকৃষ্ট ঠিকানার অধিকারী। কেননা, সে লক্ষ-কোটি জনতার সাথে ধোঁকাবাজী ও প্রতারণা করে।

মুসলিম দেশগুলোতে কোন কোন শাসকের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে। তারা হত্যার মাধ্যমে নিষ্পাপ শিশুদেরকে ইয়াতীম করে, মহিলাদেরকে বিধবা করে, নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে, সম্মানিত মানুষদের কণ্ঠ রোধ করে এবং শত্রুর কাছে জাতিকে নিকৃষ্ট বেচাকেনার খেলায় মেতে উঠে। তা সত্ত্বেও জাতি তাদের জন্য হাততালি দেয়। তাদের প্রতিকৃতি বানায়, তাদেরকে লক্ষ্য করে প্রশংসামূলক গান গায় এবং তাদের উদ্দেশ্যে অনাহার করাকে সম্মান মনে করে। তারপর যখন সত্য প্রকাশিত হয় এবং সরকারের তোষামোদকারী পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশনকে থামিয়ে দেয়া হয় তখন জাতি মিথ্যা প্রচারণা ও জালিয়াতির ধুম্রজালের বহর দেখে হতাশ হয় এবং শোক-দুঃখে ফেটে পড়ে। তারপর তারা শাসকের উপর থেকে হাত গুটিয়ে নেয় এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে দোআ করে, তিনি যেন তাদেরকে যুগের ফেরআউনদের হাত থেকে রক্ষা করেন। কেননা, তারা জাতিকে দীন থেকে দূরে সরিয়েছে এবং তাদেরকে পাপ ও গুনাহর সাগরে ডুবিয়ে দিয়ে সভ্যতার দাবীদার হয়েছে। তারা জনগণের মধ্যে ধ্বংসাত্মক নীতিমালা ও আচরণ আমদানী করেছে। তারা হাজার হাজার মানুষকে কারাগারে নিক্ষেপ করে স্বাধীনতার দাবীদার সেজেছে। তারা হীন স্বার্থের কারণে স্বল্পমূল্যে জাতিকে বিক্রি করেছে এবং জাতির জন্য মিলিয়ন-বিলিয়ন ডলার ঋণ করেছে, অথচ জাতি এর খবরও রাখে না। এর নাম দিয়েছে তারা অগ্রগতি। তারা শত্রুকে জাতির যুদ্ধঘাঁটি দান করেছে এবং জাতির খাবারের বিনিময়ে সমাজতন্ত্র আমদানী করেছে। রাষ্ট্র প্রধানের দিকে তাকালেই বুঝা যায়

www.amarboi.org

যে দেশটি কেমন? কেননা, প্রজা চলে রাজার চালে। রাষ্ট্রপ্রধান ভাল হলে জনগণও ভাল হয় এবং সে খারাপ হলে প্রজাসাধারণও খারাপ হয়। প্রেসিডেন্ট বীর, ঈমানদার, আমানতদার, একনিষ্ঠ ও পরহেজগার হলে প্রজারাও সে রকম হবে। এ থেকেই আমরা সৎ পার্লামেন্ট সদস্য, মন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের গুরুত্ব বুঝতে পারি।

মূলকথা, ধোঁকাবাজ মানুষ এবং এর বিপরীত পক্ষে নেক মানুষকে চেনার নীতিমালা রয়েছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক ধোঁকাবাজী থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত ধোঁকাবাজী সবটুকুই পরিত্যাজ্য।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ اِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

'আল্লাহ যদি কাউকে প্রজা পরিচালনার দায়িত্ব দেন এবং সে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত প্রজাদের সাথে ধোঁকাবাজী করে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতকে হারাম করে দেবেন। (বোখারী ও মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি,

اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِم فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ.

'হে আল্লাহ! যে আমার উম্মতের সামান্যতম দায়িত্ব পেয়েও তাদের সাথে কঠোরতা করেছে, তুমি তার উপর কঠোর হও এবং যে সামান্য দায়িত্ব পেয়েও নরম আচরণ করেছে, তুমি তার প্রতি নরম হও।' (মুসলিম)

মা'কাল বিন ইয়াসার রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন,

مَا مِنْ اَمِيْرٍ يَلِىَ اُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ اِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ.

'যে ব্যক্তি মুসলমানের আমীর নিযুক্ত হওয়ার পর তাদের কল্যাণে কোন

www.amarboi.org

চেষ্টা করেনি এবং সদুপদেশ দেয়নি, সে তাদের সাথে বেহেশতে প্রবেশ করবে না।' (মুসলিম)

তাবারানী আরও একটু বাড়িয়ে বর্ণনা করেছে, 'সে নিজের জন্য যে রকম চেষ্টা করে ও উপদেশ গ্রহণ করে সে রকম করেনি, (সে তাদের সাথে বেহেশতে যাবে না।)

আবদুল্লাহ বিন মোগাফ্ফাল আল-মোযানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি,

مَامِنْ اِمَامٍ وَالٍ بَاتَ لَيْلَةً سَوْدَاءَ غَاشًّا لِرَعِيَّتِهِ اِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

'কেউ নিজ প্রজার সাথে প্রতারণা করে এক রাতও যদি অতিবাহিত করে আল্লাহ তার উপর বেহেশত হারাম করে দেবেন।' (তাবরানী)

যারাই মুসলমানদের কোন বিষয়ে দায়িত্ব লাভ করবে তাদের ব্যাপারেই উপরোক্ত হাদীসগুলো প্রযোজ্য হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইয়াতীমের অভিভাবক, অন্যের সম্পদের অসি, হাসপাতালের ডাক্তার, স্কুল-মাদরাসার শিক্ষক, কোন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলী, কোম্পানীর পরিচালক, বিভাগীয় প্রধান, কল-কারখানার দায়িত্বশীল কর্মকর্তা, পরিবার প্রধান প্রভৃতি সবাই পরিচালক ও দায়িত্বশীল। তারা রাষ্ট্রপ্রধানের মতই দায়িত্বশীল। শুধুমাত্র দায়িত্বের পরিধি ছোট, অন্য কিছু নয়, প্রত্যেককেই তার অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবে।

আমরা আরও দেখি, সরকারের পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ, গাড়ী-ঘোড়া, আদালত-বিচারক সবাই একজন অভাবী লোকের পেছনে উঠে পড়ে লাগে যে, খারাপ খাদ্যদ্রব্য বিক্রী করে, কিংবা সামান্য চুরি করে। পরিণতিতে হয়তো তার ঘর-বাড়ীও ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে, যারা লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি করে, উঁচু পর্যায়ে মাদকতার চোরাকারবারী করে, মূল্যবৃদ্ধি করে জনসাধারণের রক্ত চুষে খায়, জরুরী খাদ্যদ্রব্য মওজুদ্দারী করে, তাদের নিজ অনুপম প্রাসাদে উপহার ও সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে, তাদের কোন হিসাব-নিকাশ নেই, আর না আছে বিচার। গোটা জাতির সুখ-জলাঞ্জলি দিয়ে গুটিকতক লোক অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে টু শব্দ করা যায় না। হায় ধ্বংস!

ওজনে কম দেয়া মারাত্মক ধোঁকাবাজী। যারা ওজনে কম দেয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন,

www.amarboi.org

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ـ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ، وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ـ اَلاَ يَظُنُّ اُوْلٰئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ، لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ، يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

'যারা মাপে কম করে, তাদের জন্য দুর্ভোগ। যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয় তখন পূর্ণমাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে, সেই মহাদিবসে, যেদিন মানুষ বিশ্ব পালনকর্তার সামনে দাঁড়াবে।' (সূরা মোতাফফেফীন : ১-৬)

আল্লাহ মানুষের এক গ্রাস কিংবা এক দানা পরিমাণ জুলুমেরও হিসাব গ্রহণ করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে ঈমান ও ইসলামের বাইআত গ্রহণের সময় ধোঁকাবাজী ও প্রতারণা না করার ওয়াদা গ্রহণ করতেন।

যিয়াদ বিন আ'লাকা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জারীর বিন আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি; যেদিন হযরত মুগীরা বিন শো'বা ইন্তেকাল করেন, আমি সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে হাজির হই এবং প্রস্তাব করি যে, আমি আপনার হাতে ইসলামের বাইআত গ্রহণ করবো। তিনি সকল মুসলমানের প্রতি উপদেশ দানের শর্ত আরোপ করেন। আমি এর উপর বাইআত গ্রহণ করি। এই মসজিদের শপথ, আমি তোমাদের জন্য উপদেশদানকারী।' (বোখারী, মুসলিম)
হোজাইফা বিন ইয়ামান থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

مَنْ لاَ يَهْتَمُّ بِاَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُصْبِحْ وَيُمْسِ نَاصِحًا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِكِتَابِهٖ وَلِاِمَامِهٖ وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ.

'যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ, তাঁর রাসূল, কিতাব, নেতা ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য উপদেশে ব্যয় করে না সেও তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।' (তাবরানী)

এইভাবে আমাদের উচিত, ব্যবসায়ীসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে আল্লাহর শাস্তি ও গযবের বিষয়টি অনুধাবন করা। তারা যদি ধোঁকাবাজী, জরুরী পণ্যদ্রব্যের মওজুদদারী, অন্যায়ভাবে মূল্য বৃদ্ধিসহ হারাম উপায়ে সম্পদ বাড়ানোর লোভ

www.amarboi.org

করে তাহলে, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর গযব অনিবার্য। ব্যবসায়ী ছাড়া অন্যরাও এ জাতীয় অন্যায় করতে পারে। এ প্রসঙ্গে এখন আমরা কয়েকটি হাদীস আলোচনা করবো।

ইসমাঈল বিন ওবায়েদ বিন রেফাআহ তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহর্ (সা) সাথে ঈদগাহে গিয়েছেন এবং লোকদেরকে বেচা-কেনা করতে দেখেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হে, ব্যবসায়ীরা! তখন তারা ঘাড় ও চোখ উপরের দিকে তুলে রাসূলুল্লাহ্র (সা) ডাকে সাড়া দেন।

اِنَّ التُّجَّارِ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللّٰهُ وَبَرَّ وَصَدَقَ.

'নিশ্চয়ই কেয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদেরকে গুনাহগার হিসেবে উত্থিত করা হবে। তবে যারা আল্লাহকে ভয় করেছে, নেক কাজ করেছে ও সত্য কথা বলেছে, তাদের অবস্থা ভিন্ন হবে।' (তিরমিযী এটাকে হাসান ও সহীহ বলেছেন; ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান)

আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, হাশরের দিন আল্লাহ তিন ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না, তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনবার একথা বলেন। আমি ভাবলাম তারা হতাশ ও ধ্বংস হয়েছে। হে রাসূলুল্লাহ্! তারা কারা? তিনি বলেন, তারা হচ্ছে, অহংকারী, খোঁটাদানকারী দাতা এবং মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়কারী।' (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)কে বলতে শুনেছি, মিথ্যা শপথ করে দ্রব্য বিক্রি করলে তা কামাই-রোজগারকে নষ্ট করে দেয়।' (বোখারী, মুসলিম)

মো'আম্মার বিন আবি মা'মার থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا فَهُوَ خَاطِئٌ 'যে ব্যক্তি মূল্য বৃদ্ধির আশায় খাদ্যদ্রব্য মওজুদ্দারী করে সে গুনাহগার।' (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী। ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন, গুনাহগার ছাড়া কেউ খাদ্যদ্রব্য মওজুদ্দারী করে না।)

আবু সেবা' (রা) থেকে বর্ণিত। আমি ওয়াসেলা বিন আসকার ঘর থেকে একটি উষ্ট্রী খরিদ করেছি। আমি উষ্ট্রীটিকে নিয়ে বের হলে তিনি ইজার চেঁচানো অবস্থায় আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি এটা খরিদ করেছ? আমি জওয়াব দিলাম, হাঁ।

www.amarboi.org

তিনি বলেন, আমি কি এর ক্রটি সম্পর্কে তোমাকে বলবো? আমি উত্তর দিলাম, কি ক্রটি? তিনি বলেন, উষ্ট্রীটি বাহ্যিকভাবে মোটা। তিনি প্রশ্ন করেন, তুমি কি তার পিঠে সওয়ার হয়ে সফর করবে, না এর গোশত খাবে? আমি উত্তর দিলাম, আমি এর পিঠে আরোহণ করে হজ্জ করবো। তিনি বলেন, তাহলে, এটা ফেরত দাও। (এর দ্বারা বুঝা যায়, ওয়াসেলা এর বিক্রেতা নয়, বরং দর্শক ছিলেন) উষ্ট্রীর মালিক বলল,আল্লাহ তোমার সংশোধন করুন। তুমি কি এর মাধ্যমে আমার বিক্রি বরবাদ করে দিতে চাও? তখন তিনি জওয়াব দেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি,

لاَيَحِلُّ لاَحَدٍ يَبِيْعُ شَيْئًا اِلاَّ بَيَّنَ مَافِيْهِ وَلاَيَحِلُّ لِمَنْ عَلِمَ ذٰلِكَ اِلاَّ بَيَّنَهُ.

‘বিক্রয়দ্রব্যের দোষ-ক্রটি বর্ণনা করা ছাড়া কারোর জন্য কোন কিছু বিক্রি করা বৈধ নয় এবং এ সম্পর্কে যে জানে, তার পক্ষেও চুপ করে থাকা বৈধ নয়, বরং তার প্রকাশ করা উচিত। (বায়হাকী, হাকেম)

৬. মুসলমানের জন্য নিষিদ্ধ কষ্ট

ইসলামে সকল প্রকার জুলুম হারাম। দুনিয়া ও আখেরাতে জালেমকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তবে মজলুম জালেমকে মাফ করে দিলে সে শাস্তি থেকে মাফ পেতে পারে।

মানুষ ও পশুকে কষ্ট দেয়া এক প্রকার জুলুম। তাই আল্লাহ জুলুমকে হারাম করে তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

মূলতঃ মুসলমানকে মানবতার জন্য দয়া ও কল্যাণের প্রতিবিম্ব হতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দূরে সরে গেলে সে ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। ইসলাম মোমেনের গুণ প্রসঙ্গে যে মূলনীতি ঘোষণা করেছে, জুলুম ও কষ্টদান তার বিপরীত। আল্লাহ বলেছেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلاَمًا.

‘দয়ালু আল্লাহর বান্দাহ তারাই যারা পৃথিবীতে নরমভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে তখন তারা সালাম বলে।’ (সূরা আল ফোরকান : ৬৩)

www.amarboi.org

আল্লাহ্ আরও বলেন, 'তারা যখন বেহুদা কথাবার্তা শোনে তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, আমাদের জন্য আমাদের কাজ এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না।' (সূরা ফোরকান : ৫৫)

আল্লাহ মোমেনদেরকে কষ্ট দেয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন,

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُّبِيْنًا.

'যারা বিনা অপরাধে মোমেন পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয় তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।' (সূরা আহযাব : ৫৮)
রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিম্নোক্ত হাদীসে মুসলমানদের সকল আচরণ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী বর্ণনা করেছেন,

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ.

'সেই ব্যক্তি মুসলমান যার হাত ও মুখ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।' (বোখারী ও মুসলিম)
রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দোযখ থেকে দূরে থাকতে এবং বেহেশত প্রবেশ করতে চায়, আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমানের অবস্থায় তার যেন মৃত্যু হয় এবং সে নিজের জন্য যা ভালবাসে অন্যের জন্যও যেন তাই ভালবাসে।' (মুসলিম)

কষ্ট নিজের জন্য অপসন্দনীয় হলে অন্যের জন্যও তাই হওয়া উচিৎ। ফলে অন্যকে কষ্ট দেয়া উচিত নয়।

কোন সৃষ্টিকে কষ্ট না দেয়া মুসলমানের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ইসলাম এমন এক দীন যাতে রাস্তায় কিংবা গাছের ছায়ায় কিংবা মানুষের আরাম ও বসার স্থলে পেশাব করার জন্য অনুসারীদেরকে দোযখের কঠিন আজাবের হুমকী দিয়েছে। শুধু তাই নয়, সাধারণ সড়কে মুসলমানের বসাও নিষিদ্ধ। যদি এর মাধ্যমে পথচারীদের প্রতি চোখ ও জিহবা দ্বারা কিংবা ময়লা নিক্ষেপের মাধ্যমে কষ্ট দেয়া হয়। ইসলাম বদ্ধ পানিতে কিংবা মিষ্টি পানির নহরে পেশাব করাকে নিষিদ্ধ করেছে। কেননা, এর মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ হয় এবং সংক্রামক রোগ বিস্তার

www.amarboi.org

লাভ করে। ইসলাম মানুষকে প্রাণী ও কীট-পতঙ্গের প্রতি কষ্ট না দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছে এবং তাকে দয়ার গুণ থেকে বিচ্যুত হতে নিষেধ করেছে। হাঁ যদি কঠোরতা প্রদর্শনের কোন কারণ সৃষ্টি হয় তাহলে তা ভিন্ন জিনিস। এই দ্বীন অন্য মুসলিম ভাইয়ের জন্য খুবই সংবেদনশীল। তাই শ্রমিকের পারিশ্রমিক দেরীতে দেয়া কিংবা ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও টালবাহানা করা হারাম। এ সকল বিষয়ে আমরা কিছু হাদীস উল্লেখ করবো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

اِتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ قَالُوْا وَمَا اللاَّعِنَانِ؟ قَالَ الَّذِيْ يَتَخَلَّى فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْ ظِلِّهِمْ.

'তোমরা দু'টো অভিশপ্ত কাজ থেকে বেঁচে থাক। তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, দু'টো অভিশপ্ত কাজ কি? তিনি উত্তরে বলেন, যে জনগণের রাস্তায় কিংবা ছায়ায় পেশাব-পায়খানা করে।' (মুসলিম)

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবরুদ্ধ বা আটক পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।' (মুসলিম, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ)

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রবহমান পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।' (তাবরানী)

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'তোমরা রাস্তার উপর বসোনা।' সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের রাস্তায় না বসে উপায় নেই, আমরা বসে বসে গল্প-গুজব করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যদি তোমরা বসতেই চাও তাহলে রাস্তার অধিকার আদায় করবে। তাঁরা প্রশ্ন করেন, রাস্তার অধিকার কি? তিনি বলেন, চোখ অবনত রাখা, কষ্ট না দেয়া, সালামের জওয়াব দেয়া এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ করা।' (বোখারী, মুসলিম)

হিশাম বিন হাকিম বিন হিযাম থেকে বর্ণিত। তিনি সিরিয়ার কিছু সংখ্যক অনারব কৃষকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখেন তাদেরকে মাথায় তেল ঢেলে প্রখর রোদে ফেলে রাখা হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এটা কেন? তাঁকে বলা হল, তারা খাজনা, অন্য বর্ণনায়, জিজইয়া কর দিতে অস্বীকার করেছে। তখন হিশাম বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, 'যারা

www.amarboi.org

মানুষকে দুনিয়ায় কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবেন।' তারপর তিনি আমীরের দরবারে প্রবেশ করেন ও কথা বলেন। তারপর তাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ)

জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি গাধার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন যে, এর মুখে দাগ দেয়া হয়েছে এবং তার পেট থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি এরূপ করেছে, তার উপর আল্লাহর অভিশাপ।' এরপর তিনি মুখে দাগ দেয়া ও মারা নিষিদ্ধ করেছেন। (ইবনে হিব্বান, তিরমিযী)

ইবনে ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'এক মহিলা একটি বিড়ালকে বেঁধে রাখার অপরাধে দোজখে প্রবেশ করেছে। সে তাকে খেতে দেয়নি কিংবা জমীনের পোকা-মাকড় খাওয়ার জন্য ছেড়েও দেয়নি।' (বোখারী)
ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি একটি ভেড়াকে শুইয়ে ছুরি ধার দিচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, 'তুমি কি একে দু'বার মারতে চাও? তুমি একে শোয়ানোর আগে কেন ছুরি ধার দাওনি?' (তাবারানী, হাকেম)
আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'আমি কেয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির শত্রু হব। যে আমার নামে শপথ ও চুক্তি করে তা লংঘন করেছে; যে স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রী করে এর মূল্য ভোগ করেছে এবং যে কোন শ্রমিক থেকে কাজ আদায় করে তার পারিশ্রমিক দেয়নি।' (বোখারী)

নিন্দা

গীবত বা নিন্দা হচ্ছে, জিহবার মারাত্মক ত্রুটি। মানুষের প্রত্যেকটি কথা ও কাজের হিসেব নেয়া হবে। তাই কথা বলার সময় তাকে চিন্তা করতে হবে, সেটা ভাল, না খারাপ। যদি খারাপ হয় তাহলে, তা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। জিহবা আল্লাহর বিরাট নেয়ামত। আল্লাহ এই নেয়ামতের সদ্ব্যবহার পসন্দ করেন। সেজন্য তিনি এর যথার্থ হিসাব-নিকাশের লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন,

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ.

'সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সর্বদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।' (সূরা ক্বাফ : ১৮) অর্থাৎ যথার্থ হিসেবের জন্য মানুষের প্রত্যেকটি কথা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

www.amarboi.org

আবু বকর সিদ্দিক (রা) নিজ জিহ্বার দিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, هٰذَا الَّذِيْ اَوْرَدَنِى الْمَوَارِدَ 'এটাই আমাকে ধ্বংসের ঘাঁটে পৌছিয়ে দিয়েছে।' হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেছেন, 'সেই আল্লাহর শপথ যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, জিহবা ছাড়া অন্য কিছু থেকে অধিকতর বিরত থাকার প্রয়োজন নেই।'

গীবত মোমেনের জন্য একটি খারাপ গুণ। এটা এমন এক সামাজিক ব্যাধি যার ক্ষতি ও পরিণতি মারাত্মক। পবিত্র কোরআন গীবতকারীর এক বীভৎস ছবি পেশ করে বলেছে,

وَلَايَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ.

'তোমাদের কেউ যেন কারও পেছনে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে?' (সূরা হুজরাত : ১২)
এই আয়াতে গীবত করাকে মুর্দার (লাশ) থেকে গোশত ছিন্ন ভিন্ন করে খাওয়ার সাথে তুলনা করে একে অত্যন্ত জঘন্য কাজ বলা হয়েছে। কোন সুরুচিবোধ সম্পন্ন মানুষই তা পছন্দ করতে পারে না।

নিন্দার সংজ্ঞা

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ـ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ؟ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

'তোমরা কি জান, গীবত কি? তাঁরা উত্তর দেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জানেন। তিনি বলেন, গীবত হচ্ছে, তোমার ভাইয়ের এমন বিষয় উল্লেখ করা যা সে শুনলে অপসন্দ করবে। প্রশ্ন করা হল, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে? তিনি উত্তরে বলেন, তুমি যা বল তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলে তুমি তার গীবত করলে, আর যদি তার মধ্যে না থাকে, তাহলে তুমি তাকে অপবাদ দিলে।' (মুসলিম)

এই হাদীসের আলোকে ওলামায়ে কেরাম গীবতের সংজ্ঞা ও সীমানা নির্ধারণ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ,

www.amarboi.org

কোন মুসলমান ভাইয়ের এমন দোষ-ত্রুটি তার পেছনে বলা যা তার কাছে পৌঁছলে সে অসন্তুষ্ট হবে ও অপসন্দ করবে, সেটাই গীবত। আর তার মধ্যে তা না থাকলে সেটা হবে অপবাদ। অপবাদের গুণাহ্ নিন্দার চাইতেও ভয়াবহ।

উদাহরণ

যেমন, তার শরীরের বা বংশের ত্রুটি, তার চরিত্র ও কাজ-কর্মের ত্রুটি, তার দীনদারী ও দুনিয়াদারীর ত্রুটি, এমনকি তার কাপড়- চোপড়, ঘর ও সওয়ারীর ত্রুটি পেছনে বলা।

মানুষের শরীরের ব্যাপারে গীবতের ধরন হচ্ছে, একথা বলা যে, লোকটি কানা, কাল, খোঁড়া, লম্বা, খাট, হলুদ, শ্বেতী, টাকপড়া ইত্যাদি।

বংশের ব্যাপারে এরূপ বলা যে, লোকটির বংশ খারাপ ও নীচু, তার মা খারাপ কিংবা বাপ নিকৃষ্ট।

চরিত্র সম্পর্কে এরূপ বলা যে, সে খারাপ চরিত্রের অধিকারী, কৃপণ, অহংকারী, লোক দেখানোকারী, ভীরু, দুর্বল ইত্যাদি।

দীনদারীর ব্যাপারে এরূপ বলা যে, সে চোর, মিথ্যুক, মদখোর, বিশ্বাসঘাতক, জালেম, যাকাত অনাদায়কারী. রুকু সাজদাহ ঠিকমত আদায় করে না, নাপাক থাকাকে পছন্দ করে এবং মা বাপের অনুগত নয়।

দুনিয়াদারী সম্পর্কে এরূপ বলা যে, পেটুক, বেআদব, বেশী ঘুমায়, লোকদেরকে সম্মান করে না, অন্যের বিষয়ে মাথা ঘামায় না ইত্যাদি।

পোষাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে এরূপ বলা, জামার হাত লম্বা, ময়লা কাপড়, সংকীর্ণ প্যান্ট, লম্বা কাপড় পরে।

পেশার ব্যাপারে এরূপ বলা, ঝাড়ুদার, নাপিত ইত্যাদি।

অন্যের মর্যাদা খাট করার লক্ষ্যে মুখের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা, কাজ বা ইঙ্গিত, চোখের বা হাতের ইশারা ইত্যাদি সবই গীবতের পর্যায়ভুক্ত।

হযরত আয়েশা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলেছিলেন,

حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ اَنَّهَا قَصِيْرَةٌ فَقَالَ لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مَزَجْتِ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجْتِهِ.

'আপনার জন্য সুফিয়ার খাট হওয়াই যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'তুমি

www.amarboi.org

এমন এক শব্দ উচ্চারণ করলে যদি তা দিয়ে সাগরের পানিকে ঘোলা ও পঁচা করতে চাও, করতে পারবে।'

অর্থাৎ নবী (সা) হযরত আয়েশার ঐ কথায় ঘৃণা প্রকাশ করেন। কারুর কাছে কোন লোক সম্পর্কে আলোচনা হলে তিনি যদি প্রচ্ছন্নভাবে তার মর্যাদা খাট করার উদ্দেশ্যে এরূপ বলেন,
'আল্লাহ আমাকে কার্পণ্য থেকে রক্ষা করেছেন,' অথবা 'আমি অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভোগ করা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই' ইত্যাদি। এর দ্বারা গীবতের সাথে লোক দেখানোর মনোভাব প্রকাশ পাওয়াতে গুণাহ দ্বিগুণ হয়ে গেছে।
গীবতের জন্য শর্ত হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুপস্থিতি। কারুর উপস্থিতেতে কোন দোষ-ক্রটি উল্লেখ করলে তা গীবত হবে না। সেটাকে সমালোচনা কিংবা গালি-গালাজ বলা যেতে পারে। এক মত অনুযায়ী কারুর সামনা-সামনি দোষ-ক্রটি উল্লেখ করাও গীবত। কিন্তু প্রথমটির গীবত হওয়ার ব্যাপারে শক্তিশালী দলীল-প্রমাণ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, مَا كَرِهْتَ اَنْ تُوَاجِهَ بِهِ اَخَاكَ فَهُوَ غِيْبَةٌ 'তুমি তোমার ভাইয়ের সামনা-সামনি যা বলতে অপছন্দ কর, তাই গীবত।'

গীবতের কারণ

গীবতের অন্যতম কারণ হচ্ছে, ১. রাগ ও ঝাল মিটানো ২. সাথীদের অনুমোদন ও বন্ধুদের সাথে গল্প-গুজব ৩. বেহুদা কথা বলা ৪. মোনাফেকী করা ৫. সম্মানিত লোকদেরকে অন্যদের সামনে হেয় করা ৬. লোকদেরকে হাসানোর জন্য তামাশা করা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা।

গীবতের হুকুম

কোরআন, হাদীস ও ইজমাউল উম্মাহ দ্বারা গীবতকে হারাম করা হয়েছে। গীবত কবীরা গুণাহ না সগীরা গুণাহ তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা কুরতুবী বলেছেন, গীবত সর্বসম্মতভাবে কবীরা গুণাহ। কিন্তু এটা সর্বসম্মত কিনা, তা নিশ্চিত নয়, বরং বিতর্কিত। কেননা, ইমাম গাজালী এবং শাফেঈ মাজহাবের ওমদাহ কিতাবের লেখকের মতে, গীবত সগীরা গুণাহ। মাহদী বলেছেন, তা কবীরা গুণাহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মোতাযেলাদেরও একই মত। আল্লামা যারাকশী বলেছেন, আশ্চর্যের বিষয় হল, তারা মৃত জন্তু ভক্ষণ করাকে কবীরা গুণাহ বলে অথচ গীবতকে কবীরা গুণাহ বলেন না। আল্লাহ গীবতকে মৃত মানুষের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন।

www.amarboi.org

যারা একে সগীরাহ্ গুণাহ বলেন, তাদের প্রমাণ হচ্ছে, যদি তা সগীরা গুণাহ্ না হয় তাহলে, অধিকাংশ মানুষই ফাসেক হয়ে যাবে অথবা সামান্য কিছু বাদ দিয়ে সকল মানুষই ফাসেক হয়ে যাবে। এটা বিরাট কষ্ট সাধ্য বিষয়। এর বিরুদ্ধে এই বলে জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, গুণাহর প্রসার ও সকল লোকের তা করার কারণে গুণাহটি সগীরা হতে পারে না। এই উম্মাহর মধ্যে যখন নেক লোক বেশী ছিল তখন তা বেশী প্রসার লাভ করেনি। কেননা, বারবার করলে তা যে কবীরা গুণাহ এ বিষয়ে সবাই একমত। তবে আজকের যুগে এ গুণাহটি ব্যাপকহারে প্রসার লাভ করেছে।

আল্লামা আলূসী তাঁর তাফসীর রুহুল মাআনীতে মত দু'টো উল্লেখ করার পর বলেছেন, গীবত কোন সময় সগীরা এবং কোন সময় কবীরা গুণাহ্ হতে পারে। যে গীবত সগীরা গুণাহ্ সেটি হচ্ছে, যার দ্বারা মানুষের বেশী কষ্ট হয় না। যেমন, পোশাক, সওয়ারী ও ঘর ইত্যাদির দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা। আর যে গীবত কবীরা গুণাহ সেটি হচ্ছে, অলী ও ওলামায়ে কেরামের গীবত করা এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়ার লক্ষ্যে কঠোর গালি-গালাজ করা, লোকদেরকে তাদের থেকে বিরত রাখা এবং তাদের কথা বার্তা শুনা থেকে দূরে রাখার জন্য বদনাম করা।

যাই হোক, গীবত সর্বসম্মতভাবে কবীরা গুণাহ্ বলা ঠিক নয়।

আল্লামা নববী তাঁর 'আজকার' বইতে লিখেছেন, যদি কোন আলেমের দোষ বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে তার ভুল ধরিয়ে দেয়া হয় এবং লোকেরা যেন সে ভুলের অনুসরণ না করে কিংবা তার জ্ঞানের দুর্বলতা থেকে লোকদেরকে বাঁচানোর জন্য যদি তা প্রকাশ করা হয় তাহলে, তা গীবত হবে না। বরং এই নিয়তে তা প্রকাশ করলে সওয়াব পাবে। কোন লেখক কিংবা অন্য কেউ যদি বলে যে, অমুক সম্প্রদায় বা দল এরূপ বলেছে এবং সেটা ভুল, অজ্ঞতা কিংবা উদাসীনতা, তাহলে, তাও গীবত হবে না। গীবত হবে ব্যক্তি বা দলকে যদি সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয়।

গীবত শুনার হুকুম

ইমাম নববী তাঁর 'আজকার' বইতে লিখেছেন, গীবতকারীর জন্য যেমন গীবত করা হারাম তেমনি, শ্রোতার জন্যও তা শুনা এবং সমর্থন করা হারাম। কোন ব্যক্তি যদি কাউকে নিন্দা করতে দেখে, তাহলে, তার কর্তব্য হল, বাহ্যিক ভয়ের আশংকা না থাকলে, তাকে নিন্দা করতে নিষেধ করা। আর যদি প্রতিবাদ বা নিষেধ করতে ভয় থাকে তাহলে, এর প্রতি মনে মনে ঘৃণা পোষণ করা এবং মজলিশ থেকে সরে পড়া। সুযোগ থাকলে সরে পড়া ওয়াজিব। যদি মুখ দিয়ে

www.amarboi.org

গীবতের প্রতিবাদ করা যায় এবং ভিন্ন কথার মাধ্যমে গীবতের মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়া যায়, তাহলে তাই করতে হবে। এরূপ না করলে গুণাহ হবে। আর যদি কেউ কাউকে নিন্দা বন্ধের আহ্বান জানায় কিন্তু মনে মনে তা অব্যাহত থাকাকে পসন্দ করে, তাহলে আবু হামেদ ইমাম গাজালীর মতে, এটা হবে মুনাফেকী এবং এটুকুন বলার কারণে সে গুণাহ থেকে মাফ পাবে না। অন্তরে অবশ্যই ঘৃণা থাকতে হবে।

আর যে মজলিশে গীবত করা হয়, কিন্তু বিরোধিতা করার অক্ষমতা রয়েছে, কিংবা বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তা গ্রহণযোগ্য হয়নি, তাহলে, সেই নিন্দা শুনা হারাম। ঐ মুহূর্তে মুখে ও মনে কিংবা শুধু মনে মনে আল্লাহর জিকির করতে হবে অথবা তা শুনা থেকে বিরত থাকার জন্য অন্য বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। যদি মজলিশকে বয়কট করা সম্ভব হয় তাহলে, তাই করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন,

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُضُوْنَ فِيْ اٰيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ.

'যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আয়াতসমূহে ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়। যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর জালেমদের সাথে বসবেন না।' (সূরা আল আনআম : ৬৮)

ইবরাহীম বিন আদহাম থেকে বর্ণিত আছে, তাঁকে এক বিয়ের অলিমা অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়া হলে তিনি তাতে হাজির হন। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অনুপস্থিত এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানের লোকেরা বলল, তিনি ভারী। তখন ইবরাহীম বিন আদহাম মনে মনে চিন্তা করেন, যে জায়গায় গীবত করা হয় আমি সে জায়গায় আমন্ত্রিত হয়েছি। তারপর তিনি অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং পরবর্তী তিন দিন পর্যন্ত আর কিছু খাননি।[১]

---

১. 'আজকার' ইমাম নববী, ৩০২ পৃঃ।

www.amarboi.org

আল্লাহ বলেন,

وَاِذَا سَمِعُوْا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَا اَعْمَالُنَـا وَلَكُـمْ اَعْمَـالُكُمْ سَـلاَمٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِى الْجَاهِلِيْنَ.

'তারা যখন বেহুদা ও বাজে কথা শুনে তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, আমাদের জন্য আমাদের কাজ এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না।' (সূরা কাসাস : ৫৫)

আল্লাহ্ আরও বলেছেন,

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُوْلٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً.

'নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তর-এ সকলকে জিজ্ঞেস করা হবে।' (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৬)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ رَدَّ اللّٰهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'যে ব্যক্তি অন্য ভাইয়ের ইজ্জত-সম্মান রক্ষার জন্য জবাব দেবে, আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তার মুখ থেকে দোজখের আগুন সরিয়ে দেবেন।'

কা'ব বিন মালেক যখন তাবুক যুদ্ধে যোগদান না করে বাড়ীতে বসেছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাবুকে বসে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কাব বিন মালেক কি করেছে? বনি সালামার এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সে নিজের পোষাকের প্রাচুর্য ও আত্মম্ভরিতার কারণে আটকা পড়ে গেছে। তখন মুআজ বিন জাবাল (রা) বলেন, তুমি খুব মন্দ কথা বলেছ! আল্লাহর কসম, হে রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আমরা তাঁর ব্যাপারে ভাল ছাড়া খারাপ কিছু জানি না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) চুপ হয়ে গেলেন। (বোখারী ও মুসলিম)

অমুসলমানের নিন্দার হুকুম

ইবনুল মোনজের ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْـرَهُ 'তোমার ভাই যা অপছন্দ করে তা তোমার উল্লেখ করা' এই হাদীস সম্পর্কে বলেন, এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, যে

www.amarboi.org

তোমার দীনি ভাই নয়, তার কোন নিন্দা হয় না। অনুরূপভাবে, কোরআন মজীদেও ভাইয়ের কথা উল্লেখ আছে। যে ব্যক্তি দীনি ভাই নয়, যেমন, ইহুদী, নাসারা ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারী লোকসহ যে সমস্ত মুসলমান বেদআতের কারণে ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে, যেমন বাহাই, কাদিয়ানী, কারামেতা ইত্যাদি তাদের বিরুদ্ধে অপছন্দনীয় কিছু বললে তা গীবত হবে না। তবে জিম্মী এর ব্যতিক্রম। কেননা, তার জান-মাল ও ইজ্জত-সম্মান মুসলমানদের কাছে সংরক্ষিত। তাই তার গীবত করা যাবে না।

ইমাম গাজালীকে কাফেরের বিরুদ্ধে নিন্দা করার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তিন কারণে তা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ। ১. কষ্ট দেয়া ২. আল্লাহর সৃষ্টির ক্ষতি করা ও হেয় করা এবং ৩. এ বেহুদা কাজে সময় নষ্ট করা। প্রথমটি হারাম, ২য়টি মাকরূহ এবং ৩য়টি উত্তম নয়।

জিম্মীর মর্যাদা মুসলমানদের মত। কেননা, শরীয়তে তার জান-মাল ও ইজ্জতের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

مَنْ سَمَّعَ يَهُوْدِيًّا اَوْنَصْرَنِيًّا فَلَهُ النَّارُ.

'যে ব্যক্তি কোন ইহুদী ও নাসারাকে কষ্টদানের উদ্দেশ্যে কিছু শুনায় তার জন্য রয়েছে দোযখ।' (ইবনে হিব্বান)

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহুদী-নাসারার নিন্দা করাও হারাম। তবে যুদ্ধরত কাফেরের গীবত নিষিদ্ধ নয়। বেদআতকারী যদি কুফরী করে তাহলে, তার অবস্থা হবে যুদ্ধরত কাফেরের অবস্থা। অন্যথায় তাদের অবস্থা হবে মুসল্মানের মত। তবে তার বেদআতের কথা উল্লেখ করা মাকরুহ্ নয়।

গীবত থেকে তওবা করা

অন্যান্য গুণাহ থেকে তওবা করার মতই গীবত থেকে তওবা করা ওয়াজিব। গীবতকারী দুটো অপরাধ করে। একটা হচ্ছে, আল্লাহর হক বা অধিকার নষ্ট করে। আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ করলে সে জন্য তার কাফফারা হচ্ছে ১. তওবা ২. লজ্জিত হওয়া এবং ৩. গুণাহ মাফ চাওয়া।

গীবতকারী বান্দাহর হক বা অধিকার নষ্ট করলে তার জন্য ৪র্থ শর্তটি হচ্ছে, অধিকার ফেরত দেয়া। যেমন, চোরাইকৃত মাল বা লুটকৃত মাল ফেরত দেয়া,

www.amarboi.org

কিংবা অধিকারের মালিককে তার অধিকার ফেরত নিতে সক্ষম করা। যেমন, প্রহৃত ব্যক্তিকে মারের মাধ্যমে প্রতিশোধ গ্রহণ, বিচারকের মাধ্যমে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদেরকে হত্যার এবং যাকে গালি দেয়া হয়েছে তাকে গালির মাধ্যমে প্রতিশোধের সুযোগ দেয়া। তবে, কেউ যদি নিজ অধিকার ক্ষমা করে দেয় তাহলে, কোন সমস্যা থাকে না।

ইমাম নববী (র) বলেছেন, তওবার শর্ত তিনটি, ১. গুণাহর জন্য লজ্জা বোধ করা ২. পুনরায় সে গুণাহ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা ৩. গুণাহর কাজটি ত্যাগ করা।

ওলামায়ে কেরাম এক বিষয়ে মতভেদ পোষণ করেন। আর সেটি হল, গীবতকারী যার গীবত করেছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া শর্ত কিনা, নাকি সে নিজে নিজের ও নিন্দাকৃত ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে গুণাহ মাফ চাবে অথবা নিন্দাকৃত ব্যক্তির কাছে গীবতের খবর পৌঁছে গেলে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া ওয়াজিব, আর না পৌঁছলে কি ওয়াজিব নয়? অধিকাংশ আলেম ১ম বিষয়ের প্রবক্তা। অর্থাৎ নিন্দাকৃত ব্যক্তির কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

হাসান বসরী ২য় মতের ধারক। অর্থাৎ নিন্দাকারী নিজেরও নিন্দাকৃত ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তাদের কাছে নিন্দার খবর পৌঁছিয়ে তাদের মন ভারী করবে না। ৩য় মতের ধারক হলেন আল্লামা খাইয়াতি। ইবনুস সাব্বাগ এবং ইমাম নববীসহ আরও অনেকে এই মতের সমর্থক। ইবনুস সালাহসহ অন্যরা এটাকে উত্তম বলেছেন। যারাকশীও এটাকে পছন্দনীয় বলে রায় দিয়েছেন। ইবনু আবদুল বার ইবনু মোবারক থেকেও অনুরূপ মত বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান বিন ওয়াইনাহ এর সপক্ষে বিতর্ক পর্যন্ত করেছেন। আর সেটি হল, নিন্দাকৃত ব্যক্তির কাছে গীবতের খবর পৌঁছে গেলে, তার কাছে ক্ষমা চাওয়া ওয়াজিব, আর না পৌঁছলে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া ওয়াজিব নয়, বরং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

মুজাহিদ বলেছেন, তোমার ভাই এর নিন্দার কাফফারা হল, তুমি তার প্রশংসা করবে এবং তার কল্যাণের জন্য দো'আ করবে। অনুরূপভাবে সে মরে গেলেও করবে।

উপরোক্ত আলোচনা নিন্দাকৃত সেই ব্যক্তির সাথে প্রযোজ্য যে দূর দেশে থাকে না, কিংবা মৃত নয়। যদি দূর দেশে থাকে কিংবা মৃত হয় তাহলে, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে গুণাহ মাফ চাইতে হবে এবং তাদের যে পরিমাণ ক্ষতি করা হয়েছে সে পরিমাণ প্রশংসা করতে হবে। পাগল ও বালকের নিন্দাও হারাম।

www.amarboi.org

নিন্দাকৃত ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চাওয়ায় অবস্থায় নিন্দাকারী কি নিন্দার হুবহু ভাষা ও শব্দ প্রকাশ করবে, না অস্পষ্টভাবে এতটুকুন বলবে যে, আমি আপনার নিন্দা করেছি? ইমাম নববী বিস্তারিত ভাষায় বলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এর কারণ উল্লেখ করেছেন যে, নিন্দাকৃত ব্যক্তি হয়তো গীবতের একাংশ মাফ করতে পারে এবং লোকজনের কাছে খারাপ প্রভাব সৃষ্টিকারী অন্য অংশ মাফ নাও করতে পারে।

কোন ব্যক্তি কারুর কাছে ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করাই উত্তম। তবে ওয়াজিব নয়। কেননা, এটা তার হক। আর হক দান করা ঐচ্ছিক বিষয়, ওয়াজিব নয়। ক্ষমা করাই যে উত্তম তা হযরত আবু দামদাম এর বর্ণনা থেকে বুঝা যায়। তিনি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন, হে আল্লাহ! আমি মানুষের জন্য আমার ইজ্জত-সম্মান দান করে দিলাম। (তাফসীরে রুহুল মাআনী, ২৬ খঃ ১৬০ পৃঃ)

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, 'কাউকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টার পর সে যদি রাজী বা সন্তুষ্ট না হয়, সে শয়তান।' নিঃসন্দেহে ক্ষমা বান্দাহ ও আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং এর বিরাট সওয়াব রয়েছে।

নিন্দা একাধারে লাভ ও ক্ষতিকর ব্যবসা

নিন্দাকারী এই ব্যবসায়ের ক্ষতিগ্রস্ত অংশীদার। সে যদি মাফ না পায় তাহলে তার অবস্থা হবে অত্যন্ত করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لاَخِيْهِ مِنْ مَّال اَوْ عِرْض فَلْيَأتِهِ فَلْيَسْتَحِلْهَا مِنْهُ قَبْلَ اَنْ يُّؤْخَذَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ دِرْهَمٌ وَلاَ دِيْنَارٌ فَاِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَاُعْطِيَهَا هٰذَا وَاِلاَّ اُخِذَ مِنْ سَيِّأتِ هٰذَا فَاُلْقِىَ عَلَيْهِ.

'কেউ যদি কোন ভাইয়ের মাল-সম্পদ ও ইজ্জত সম্মানের উপর জুলুম করে তাহলে তাকে কেয়ামতের দিন পাকড়াও করার আগেই যেন তার কাছে যায় ও মাফ চেয়ে নেয়। কেননা, তখন তার কাছে দেরহাম, দীনার বলতে কিছুই থাকবে না। যদি তার নেকী থাকে তাহলে, সেখান থেকে নিন্দার বদলা কেটে নেয়া হবে। অন্যথায় নিন্দাকৃত ব্যক্তির গুণাহ কেটে এনে এর উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।

অপরদিকে, নিন্দাকৃত ব্যক্তির বিরাট লাভ। এ বিষয়ে আবু উমামা আল বাহেলী (রা) বলেন,

www.amarboi.org

إِنَّ الْعَبْدَ يُعْطَى كِتَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَرٰى فِيْهِ حَسَنَاتٍ لَمْ يَكُنْ عَمِلَهَا فَيَقُوْلُ يَارَبِّ مِنْ اَيْنَ هٰذَا لِيْ؟ فَيَقُوْلُ هٰذَا بِمَا اغْتَابَكَ النَّاسُ وَاَنْتَ لاَ تَشْعُرُ.

'বান্দাহকে কেয়ামতের দিন আমলনামা দেয়া হবে। সে তাতে এমন কিছু নেক দেখবে যা সে করেনি। তখন সে বলবে, হে রব! এটা কোথা থেকে এল? তখন আল্লাহ বলবেন, এটা হচ্ছে, তোমার বিরুদ্ধে লোকদের ঐ নিন্দার বিনিময় যে সম্পর্কে তুমি জানতে না।'

কোন্ কোন্ বিষয়ের নিন্দা জায়েয?

খাঁটি শরীয়তসম্মত প্রয়োজন ছাড়া কারুর নিন্দা করা জায়েয নেই। নিন্দা করার ৬টি শরীয়তসম্মত কারণ হচ্ছে,

১. জালেমের জুলুমের বিরুদ্ধে মজলুম বিচারক কিংবা প্রশাসনের কাছে ইনসাফের জন্য বলতে ও ফরিয়াদ করতে পারবে। সে বলতে পারবে, অমুক আমার টাকা-পয়সা নিয়ে গেছে, গালি দিয়েছে কিংবা জুলুম করেছে ইত্যাদি। এর প্রমাণ হচ্ছে, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ স্বামীর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে অভিযোগ করে যে, আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক, সে আমার ও সন্তানদের প্রয়োজন পূরণের উপযোগী অর্থ-সম্পদ দেয় না। কিন্তু আমি গোপনে তার অজান্তে কিছু অর্থ নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তুমি তোমার ও সন্তানদের প্রয়োজন পূরণ পর্যন্ত সৎভাবে নাও।' (বোখারী, মুসলিম)

২. অন্যায়ের পরিবর্তন ও প্রকাশ্য পাপীকে গুণাহ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম ব্যক্তির কাছে এইভাবে বলে সাহায্য চাওয়া যে, অমুক ব্যক্তি এ ধরনের অন্যায় কাজ করে। তাকে এ থেকে বিরত রাখুন। এর উদ্দেশ্য হল, অন্যায়ের প্রতিরোধ করা, অন্যথায় তা বলা হারাম। এর প্রমাণ হল, সম্ভবের ভেতর হলে অন্যায় দূর করা ও প্রতিরোধ করা ফরজ। চাই নিজে দূর করুক বা অন্যকে দিয়ে করুক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, أُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا তোমার অত্যাচারী ও অত্যাচারিত ভাইকে সাহায্য কর।'

www.amarboi.org

৩. ফতোয়া চাওয়া। মুফতীর কাছে এভাবে বলা, আমার আব্বা, ভাই, চাচা, প্রতিবেশী, কিংবা শ্বশুর আমার উপর এই এই জুলুম করেছে। এখন তাদের সাথে আমার কি ধরনের আচরণ হালাল বা হারাম হবে? প্রয়োজনের কারণে তা জায়েজ। যেমনটি আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে অভিযোগ করেছে।

৪. মুসলমানদেরকে কোন এক ব্যক্তির ভুলের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়ে তাদেরকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। এমতাবস্থায় তার ক্ষতি থেকে সতর্ক করা ফরজ। যেমন, হাদীস শাস্ত্রের বর্ণনাকারীদের সমালোচনা, সাক্ষীদের সমালোচনা, অজ্ঞ লোকদের শিক্ষাদানের বিরুদ্ধে সমালোচনা, অজ্ঞলোকদের ফতোয়ার বিরুদ্ধে সমালোচনা ইত্যাদি।

এর প্রমাণ হচ্ছে, সকল মুসলমানদের উপর নসীহত ও উপদেশ ফরজ। তা না হয়, সত্য হারিয়ে যাবে এবং তা অনুপযুক্ত লোকের কবলে চলে যাবে এবং মুসলমানরা বিভ্রান্ত হবে। এ মর্মে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা যায়। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চায়। তিনি বলেন, 'তাকে অনুমতি দাও। সে তার সম্প্রদায়ের নিকৃষ্ট সাথী।' (বোখারী ও মুসলিম)

এর দ্বারা ইমাম বোখারী ফেতনা ও সংশয় সৃষ্টিকারীদের নিন্দা করা জায়েয বলে প্রমাণ করেন।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَا اَظُنُّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِيْنِنَا شَيْئًا.

'আমি মনে করিনা যে, অমুক দুই ব্যক্তি দীন সম্পর্কে কিছু জানে।' (বোখারী) এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী লাইস বিন সা'দ বলেন, ঐ দুই ব্যক্তি মোনাফেক ছিল।

ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বললাম, 'আবুল জাহম এবং মুআবিয়া (রা) আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, মোআবিয়া হচ্ছে, ফকীর-দরিদ্র, তার কোন অর্থ-সম্পদ নেই। আর আবু জাহম কখনও কাঁধ থেকে লাঠি নামায় না।' অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, "আবু জাহম স্ত্রীদেরকে মারধোর করে।"

www.amarboi.org

এটা একটি প্রশস্ত অধ্যায় যাতে প্রত্যেক মুসলমানের উপদেশ সংকুলানের ব্যবস্থা রয়েছে। উপদেশের বিষয়বস্তুর সাথে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিশেষ কোন ক্রুটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে উপদেশের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন ক্রুটির উল্লেখ গীবতের অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ কাউকে উপদেশ দেয়ার সময় বলা যায় যে, অমুক লোক ভ্রান্ত, অন্যায়, পাপ ও অশ্লীল কাজের আহ্বানকারী, তার সাথে মিশনা। এ রকম বলা জায়েয। আর যদি আরও কিছু বাড়িয়ে বলা হয় যেমন, সে দেখতে বিশ্রী, কিংবা কাপুরুষ ইত্যাদি তাহলে, তা জায়েয হবে না। কেননা, এটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। শেষকথা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু যোগ করা হলে সেটা গীবত হবে। তবে প্রয়োজনীয় সতর্ককারী উপদেশ চালু রাখতে হবে। বিয়ে-শাদী, প্রতিবেশী গ্রহণসহ বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দানের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কীকরণ দরকার আছে।

ইমাম নববী বলেছেন, যে সকল সতর্কীকরণ জায়েয তার মধ্যে এগুলোও অন্তর্ভুক্ত আছে। কোন ছাত্র যদি কোন বেদআতীর কাছে জ্ঞান শিখতে যায় তাহলে তাকে বেদআতী আলেম সম্পর্কে সতর্ক করা। কোন ব্যক্তি মুসলমানদের দায়িত্বভার গ্রহণ করল, কিন্তু সে নিজ দায়িত্ব খারাপভাবে আঞ্জাম দেয় এবং মানুষের উপর জুলুম করে, ঘুষ খায় অথবা মূর্খ ও ফাসেক-জালেমদেরকে নেক, ঈমানদার ও আলেমদের উপর প্রাধান্য দেয় তাহলে তার ক্ষতি থেকে জনগণকে রক্ষার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করে তাকে বরখাস্ত করা কিংবা শাস্তি দানের ব্যবস্থা করা জায়েয। মুসলমানদের উপর থেকে জুলুম দূর করা ওয়াজিব।

উপদেশের জন্য শর্ত হচ্ছে খালেস নিয়ত থাকা। কিন্তু যদি বাহ্যিকভাবে উপদেশ, আর অভ্যন্তরীণ দিক থেকে অন্যকে হেয় করার চেষ্টা করা হয় তাহলে, তা জায়েয হবে না।

৫. কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে গুণাহ ও বেদআত করলে তার বিরুদ্ধে বলা জায়েয। যেমন, কেউ রমজানে প্রকাশ্যে মদপান করে এবং মেহমানদেরকে মদ পান করার জন্য বোতল পেশ করে। অথবা কেউ উলঙ্গ ও খারাপ মহিলাদের সাথে উঠাবসা করে। কেউ পত্র-পত্রিকা বা ম্যাগাজিনে নির্লজ্জ ও নগ্ন ছবি ছাপে, যুবক-যুবতীদের মধ্যে যৌন আবেদন ও আবেগ সৃষ্টির খারাপ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসের প্রচার-প্রসার করে, চরিত্র ধ্বংস করে, মানুষকে অপরাধী হতে উৎসাহিত করে, অন্যায়ভাবে রক্ত প্রবাহিত করে, মোমেনদের সাথে যুদ্ধ করে

www.amarboi.org

কাফেরদের তাদের উপর অগ্রাধিকার দেয়, কেউ যদি তার বিরোধীকে জেল দেয়, আটক করে, কিংবা অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তাকে হয়রানী করে, এমনকি হত্যা করে তাহলে, তার বিরুদ্ধে নিন্দা করা জায়েয।

কিন্তু আমরা যেন তার প্রকাশ্য গুণাহ ও অন্যায়ের চাইতে বেশী কিছু না বলি। মদখোর সম্পর্কে আমরা যেন কাপুরুষ, খুনী, নিকৃষ্ট ইত্যাদি অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার না করি। কেননা, প্রকাশ্যে গুণাহ ও অন্যায়কারী নিজেই নিজ অপরাধ প্রকাশ করেছে, অন্যজনের তা প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই।

৬. মানুষ সমাজে যে নামে বা উপাধি ছাড়া পরিচিত, সেই নাম বা উপাধি কিংবা বিশেষ পরিচিতির উল্লেখ করা জায়েয। যেমন, এরূপ বলা, কানা, খোঁড়া, অন্ধ এসেছে। এর দ্বারা তার সম্মানহানির নিয়ত করা হারাম।

চোগলখুরী[১]

সংজ্ঞা : অধিকাংশ আলেমের মতে, চোগলখুরী বলতে বুঝায়, খারাপ ও নষ্টামীর উদ্দেশ্যে একজনের কথা আরেকজনের কাছে বলা। যা প্রকাশ করা ক্ষতিকর ও অপছন্দনীয় তা প্রকাশ করে দেয়া। যার কথা প্রকাশ করা হচ্ছে তিনি বা যার কাছে প্রকাশ করা হচ্ছে তিনি অথবা তৃতীয় কোন ব্যক্তির কাছে প্রকাশিত বিষয়টি অপছন্দনীয় হবে। সেই প্রকাশ কথা, লেখা বা ইঙ্গিতের মাধ্যমেও হতে পারে। প্রকাশিত বিষয়টি বর্ণিত ব্যক্তির ত্রুটি হতেও পারে, নাও হতে পারে। এর মূল লক্ষ্য হল, গোপন বিষয় ফাঁস করে দেয়া যা অবশ্যই অপছন্দনীয় কাজ। কেউ কারুর কোন ত্রুটি দেখলে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেই সংশোধনের উদ্দেশ্যে বলবে। নতুবা চুপ থাকা উচিত। হাঁ, যদি তাতে কোন মুসলমানের উপকার হয় কিংবা কোন গুণাহ প্রতিরোধ করা যায় কেবলমাত্র তখনই সে বিষয়টি ফাঁস করা যাবে, এর আগে নয়।

ইয়াহইয়া বিন আকসাম বলেছেন, চোগলখোর যাদুকরের চাইতেও বেশী ক্ষতিকর। কেননা, চোগলখোর এক ঘন্টায় যে ক্ষতি করতে পারে, যাদুকর এক বছরেও তা পারে না।

কথিত আছে, চোগলখোরের কাজ শয়তানের চাইতেও বেশী ক্ষতিকর। কেননা, শয়তান কল্পনা ও কুমন্ত্রণার মাধ্যমে কাজ করে আর চোগলখোর কাজ করে প্রত্যক্ষ দর্শন ও সাক্ষাতের মাধ্যমে।

---

১. আন-নামীমাহ, আবদুল মালেক কাসেম, দারুল কাসেম প্রকাশনী, রিয়াদ, ১৯৯৩

www.amarboi.org

লক্ষ্য

চোগলখোরীর লক্ষ্য হল, ফেতনা-ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা। দু'পক্ষের মধ্যে আগুন জ্বালানো, শত্রুতা সৃষ্টি এবং হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টিই চোগলখোরীর মূল দৃষ্টিভঙ্গী। মোটকথা, একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগিয়ে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করা এবং তিলকে তাল করে একজনের বিরুদ্ধে অন্যের মনকে বিষায়িত করাই চোগলখোরের আসল লক্ষ্য।

মুসলিম সমাজের বন্ধন

মুসলিম সমাজ ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। মুসলমানের অন্তর ভালবাসার রঙ্গে রঙিন হবে এবং সবার মুখে থাকবে হাঁসি-খুশি। মোমেন-মুসলমান ভাই-এর সম্পর্কে থাকবে নম্রতা। কেননা, কোরআন তাদেরকে ভাই বলে পরিচয় দিয়েছে। আল্লাহ বলেন,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ.

'মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই।' (সূরা হুজুরাত : ১০)

যে সকল জিনিস মোমেন ভাইদের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টি করে আল্লাহ সে সকল জিনিসকে হারাম ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেছেন,

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ.

'নিঃসন্দেহে, শয়তান তোমাদের মধ্যে মদ এবং জুয়ার মাধ্যমে শত্রুতা ও ঝগড়া সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর জিকর ও নামাজ থেকে বিরত রাখতে চায়। তোমরা কি এগুলো থেকে দূরে থাকবে না?' (সূরা আল মায়েদা : ৯১)

আল্লাহ মুমিনদের মধ্যে ভাল সম্পর্ক সৃষ্টি করার পর তা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا.

www.amarboi.org

‘তোমরা আল্লাহর ঐ নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁর নেয়ামতের কারণে ভাই হয়ে গেছ।’ (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

মহান আল্লাহ্ আরও বলেছেন,

هُوَ الَّذِىْ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَافِى الْاَرْضِ جَمِيعًا مَا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ.

‘তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাকে এবং মোমেনদেরকে নিজ থেকে সাহায্য করেছেন এবং তাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন। তুমি নিজে যদি পৃথিবীর সকল সম্পদও ব্যয় করতে তথাপি তাদের অন্তরে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন।’ (সূরা আনফাল : ৬৩)

মুসলিম সমাজের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ইসলাম জোর তাকিদ দিয়েছে। সে সুবাদে শুধু পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক রাখা কিংবা তা পুনর্বহালের লক্ষ্যে মিথ্যা বলাকেও জায়েয করেছে। ইসলাম যেখানে মিথ্যাকে বিরাট পাপ এবং এর ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির নিন্দা করেছে, কিন্তু এখানে এসে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে অর্থাৎ পারস্পরিক সুসম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য খুবই সীমিত পর্যায়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয়াকে জায়েয বলেছে। পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্য আল্লাহ বলেছেন,

فَاتَّقُوْا اللهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنَكُمْ.

‘তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক কর।’ (সূরা হুজুরাত : ১০)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوْا بَلَى يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ اِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَاِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِىَ الْحَالِقَةُ.

www.amarboi.org

'আমি কি তোমাদেরকে নামাজ, রোজা ও সদকার মর্যাদার চাইতে উত্তম মর্যাদা সম্পর্কে বলবো না? সাহাবায়ে কেরাম বলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলেন, পারস্পরিক সম্পর্ক সংশোধন করা। পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করা হচ্ছে সকল কল্যাণের মূলোৎপাটনকারী ও সকল মন্দকে আহ্বানকারী।' (আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান, তিরমিযী)

ইসলাম পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করার জন্য উৎসাহিত করেছে। তাই হাদীসে এসেছে, ৭ ব্যক্তি হাশরের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবে যে দিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। এর মধ্যে এক ব্যক্তি হল, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজের দীনি ভাইদের সাথে সাক্ষাত করে। (বোখারী)

প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের উচিত, অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত থাকা এবং জিহবাকে সংযত রাখা। হাঁ, যাতে কল্যাণ রয়েছে শুধু তাই বলা। যদি কোন কল্যাণের বিষয়ে কথা বলা-না বলা সমান হয়, তাহলে চুপ করে থাকাই উত্তম। কেননা, অনেক সময় মোবাহ বা বৈধ কথাও অপছন্দনীয় এবং নিষিদ্ধ হারাম পর্যন্ত পৌঁছায়। মানুষের অভ্যাস এরকমই।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তার উচিত, কথা বললে সে যেন ভাল কথা বলে, নচেত যেন চুপ থাকে।'

হিসেব-নিকেশ করে কথা বললে তা আর চোগলখুরী পর্যন্ত পৌঁছে না। তাই উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসগুলোকে সামনে রাখলে চোগলখুরীর পরিবর্তে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সৌরভ পাওয়া যাবে।

তাই ইমাম শাফেঈ (র) বলেছেন, "কেউ কথা বললে তিনি যেন বলার আগে চিন্তা করেন। প্রয়োজন ও কল্যাণ থাকলে কথা বলবে এবং কল্যাণের ব্যাপারে সন্দেহ থাকলে চুপ করে থাকবে যে পর্যন্ত না বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়।

মোটকথা, চোগলখুরী হচ্ছে বন্ধুতা ও ভালবাসার বিপরীত। দু'জনের মধ্যে ভালবাসা নষ্ট করার জন্য ৩য় ব্যক্তি হিসেবে চোগলখোরের ভূমিকা অতুলনীয়। চোগলখোর ঘনিষ্ট বন্ধুর বেশ ধারণ করে দু'পক্ষের ভীষণ ক্ষতি করে। তাই চোগলখোর সম্পর্কে মোমিন-মুসলমানকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

www.amarboi.org

চোগলখুরীর হুকুম

চোগলখুরী নিকৃষ্ট কবীরা গুণাহ। আজকাল এ সমস্যা ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। খুব কম লোকই এ রোগ থেকে মুক্ত। চোগলখুরী বিরাট অপরাধ। কোরআন, হাদীস ও ইজমাউল উম্মাহ দ্বারা তা হারাম করা হয়েছে। হাফেজ ইবনুল মোনজেরী বলেছেন, মুসলিম উম্মাহ চোগলখুরীকে হারাম ঘোষণা করেছে। এটা আল্লাহর কাছে বিরাট গুণাহ।

কোন সময় চোগলখুরী কবীরা গুণাহ না হয়ে সগীরাহ গুণাহও হতে পারে। তবে এটা কোন্ সময় সগীরা বা কবীরা হবে সেটা নির্ভর করে চোগলখুরীর ফলাফলের উপর। ফলাফল ও প্রভাব যত বেশী হবে, চোগলখুরীর গুণাহও ততবেশী হবে। কোন সময় চোগলখুরীর কারণে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কারুর চাকুরী শেষ করে দিতে পারে, তার বর্ধিত বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে কমিয়ে দিতে পারে। তাকে জেল-জুলুম দিতে কিংবা অন্য কোন শাস্তি দিতে পারে।

এছাড়াও চোগলখুরীর কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তালাক সৃষ্টি করা যায়, স্থিতিশীল কোন পরিবারের স্থিতিশীলতা নষ্ট করা যায়। বাপ ও সন্তানের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা যায়, ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের কিংবা এক প্রতিবেশীর সাথে অন্য প্রতিবেশীর সম্পর্ক নষ্ট করা যায়। ক্ষতির আকৃতি ও প্রকৃতির মাধ্যমে গুণাহর আকৃতি-প্রকৃতি বিচার করতে হবে।

আমাদের উচিত, সর্বদা ভাল কথা বলা, খারাপ কথা থেকে দূরে থাকা, লোকদের মধ্যে তা প্রচার না করা এবং ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তা অন্যের কাছে না বলা। ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ মুসলিম সমাজে এ জাতীয় বিশৃংখলা ও ফেতনা-ফাসাদ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি ইসলামের সামজিক লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

চোগলখুরীর কারণ

বিভিন্ন কারণে মানুষ চোগলখুরী করে। কারণগুলো হচ্ছে, ১. চোগলখুরী হারাম হওয়ার বিষয়ে জ্ঞানের অভাব। ক্ষতিকর ও ক্ষতির বিস্তার করা, বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা, সংসার ধ্বংস করা এবং মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি ও শত্রুতা সৃষ্টি করা, যা সম্পূর্ণ হারাম। চোগলখুরী দ্বারা ঐ সকল কাজ আঞ্জাম দেয়া হয়।

www.amarboi.org

২. মনের মধ্যে যে হিংসা-ঘৃণা ও বিদ্বেষ আছে তার ঝাল মিটানোর জন্য হিংসাকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে চোগলখুরী করা হয়।

৩. বন্ধু-বান্ধবের কাছে কিংবা তাদের মজলিশে নৈকট্য লাভ করার উদ্দেশ্যে নূতন খবর পেশ করা। চোগলখুরী হচ্ছে এর উত্তম মাধ্যম।

৪. ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের কাছে কারুর ক্ষতি করার লক্ষ্যে চোগলখুরী করা হয়। অফিসারের কাছে নীচু কর্মচারীরা একে অপরের বিরুদ্ধে চোগলখুরী করে থাকে।

৫. কারুর সান্নিধ্য লাভ করার জন্য তার কাছে অন্যের বিরুদ্ধে চোগলখুরী করা।

৬. বেহুদা কথাবার্তার জন্য বিভিন্ন আড্ডা বসে। সে সকল আড্ডায় বা আসরে চোগলখুরী পান্তা ভাতের মত সহজ আলোচ্য বিষয়।

৭. কৃত্রিমতার ইচ্ছা, গোপন বিষয়ে জানার আগ্রহ এবং লোকদের অবস্থা জানার জন্য চোগলখুরীর ধারাল অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। কেননা, ব্যক্তি অনেক সময় নিজেকে কৃত্রিম বিশেষজ্ঞ কিংবা হিতাকাংখী হিসেবে প্রকাশ করার জন্য কথার ফুলঝুরি ঝাড়ে ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলে। ফলে সে চোগলখুরীর মধ্যে নিমজ্জিত হতে বাধ্য হয়।

চোগলখুরী হারাম হওয়ার দলীল

চোগলখুরী ইসলামে হারাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কোরআন মজীদে বলেছেন,

وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِيْنٍ، هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ، مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ، عُتُلٍّ بَعْدَ زَنِيْمٍ.

‘যে অধিক শপথ করে সে লাঞ্ছিত, আপনি তার আনুগত্য করবেন না, যে পেছনে নিন্দা করে, একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়, যে ভাল কাজে বাধা দেয়, সে সীমা লংঘন করে, সে পাপিষ্ঠ। কঠোর স্বভাব, তদুপরি কুখ্যাত’। (সূরা কলম : ১০-১৩)

এই আয়াতে আল্লাহ ‘একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগানোর নিন্দা করেছেন।’ আর এটাই চোগলখুরী। আল্লাহ আরও বলেন,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

অর্থাৎ ‘প্রত্যেক প্রশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ।’

www.amarboi.org

এখানে সকল هُمَزَةٍ ও لُمَزَةٍ এর ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, هُمَزَةٍ অর্থ 'চোগলখোর'।

আল্লাহ আরও বলেছেন, حَمَّالَةَ الْحَطَبِ অর্থ 'কাঠ বহনকারীণী'। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হল, কথা বহনকারীণী। কাঠ যেমন আগুন বিস্তারে সাহায্য করে তেমনি চোগলখুরী মানুষের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

হযরত হোজাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ। 'চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করবে না।' (বুখারী, মুসলিম)

জান্নাতে প্রবেশ না করলে সে অবশ্যই দোজখে প্রবেশ করবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

شِرَارُ عِبَادِ اللهِ الْمَشَّائُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ وَالْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الْاَحِبَّةِ.

'নিকৃষ্ট বান্দাহ তারা যারা চোগলখুরী করে এবং ভাই-বন্ধুদের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে।'[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেছেন,

اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ؟ قَالُوْا : بَلٰى - قَالَ الْمَشَّاءُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفْسِدُوْنَ بَيْنَ الْاَحِبَّةِ، اَلْبَاغُوْنَ لِلْبَرَاءِ الْعَيْبِ.

'আমি কি তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে সে সম্পর্কে বলবো না? তারা বলেন, 'হাঁ'। তিনি বলেন, যারা চোগলখুরী করে, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করে এবং যারা দোষ-ত্রুটি প্রচারে আগ্রহী (তারাই নিকৃষ্ট লোক)।

আমাদের উচিত, রাসূলুল্লাহর (সা) এই বাণীটি গভীরভাবে বিবেচনা করা,

مَنْ اَشَاعَ عَلٰى مُسْلِمٍ كَلِمَةً يَشِيْنُهُ بِهَا بِغَيْرِحَقٍّ شَانَهُ اللهُ بِهَا فِىْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'কেউ যদি অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি প্রচার করে, আল্লাহ এর বিনিময়ে কেয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করবেন ও তাকে অপমান করবেন।'

---

১. এহইয়া উলূমুদ্দিন ঃ ইমাম গাজ্জালী (র)

www.amarboi.org

চোগলখুরীর এ শাস্তিতো হচ্ছে কিয়ামতের দিন। কিন্তু এর আগেও কবরে তার আজাব হবে। এ প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত।

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ بَلٰى اِنَّهُ كَبِيْرٌ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ لاَيَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ.

'রাসূলুল্লাহ (সা) দু'টো কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, দু'কবরের বাসিন্দার আজাব হচ্ছে। তবে তাদেরকে বড় কোন বিষয়ে আজাব দেয়া হচ্ছে না। হাঁ, বিষয়টি আসলেই বড়। তাদের একজন চোগলখুরী করত এবং অন্যজন পেশাব থেকে বাঁচার চেষ্টা করত না।' (বোখারী)

'তাদের বড় কোন বিষয়ে আজাব দেয়া হচ্ছে না' এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, অর্থাৎ তাদের ধারণা অনুযায়ী তা বড় বিষয় ছিল না। কেউ কেউ বলেছেন, ঐ কাজ ত্যাগ করা তাদের জন্য বড় বিষয় ছিল।

কেউ কেউ বলেন, চোগলখুরীর কারণে ১/৩ ভাগ কবর আজাব হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, فَاِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ.

'পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করা হচ্ছে, সকল কল্যাণের মূলোৎপাটন করা এবং সকল মন্দকে টেনে আনা।' (আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান, তিরমিযী)

চোগলখোরের সাথে আচরণের পদ্ধতি

কারুর কাছে চোগলখুরী করা হলে কিংবা যদি একথা বলা হয় 'অমুক তোমার বিষয়ে এই বলেছে' বা 'তোমার ব্যাপারে এই করেছে' অথবা 'সে তোমার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে' অথবা 'তোমার শত্রুকে ক্ষেপিয়ে তুলছে' কিংবা 'তোমার দুর্নাম করছে' অথবা এ জাতীয় আরও কিছু বলা হলে ৬টি আচরণ করা যায়।

১. তাকে বিশ্বাস না করা। কেননা, চোগলখোর ফাসেক। তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ বলেছেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ.

'হে ঈমানদারগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ

www.amarboi.org

নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশতঃ কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধন না কর।' (সূরা হুজুরাত : ৬)

২. তাকে এ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দেয়া এবং তার কাজটিকে মন্দ বলা দরকার। আল্লাহ বলেছেন, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ 'তুমি নেক কাজের আদেশ কর এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখ।'

৩. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্যে তার উপর রাগ করা। কেননা, সে আল্লাহর কাছে রুষ্ঠ ব্যক্তি। যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে তার প্রতিও অসন্তুষ্ট হওয়া যুক্তিসঙ্গত।

৪. অনুপস্থিত ভাই সম্পর্কে খারাপ ধারণা না করা। আল্লাহ বলেছেন,

اِجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ فَاِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ.

'তোমরা বেশী বেশী ধারণা করা থেকে বিরত থাক। কেননা, কিছু কিছু ধারণা গুনাহ।'

৫. চোগলখোর যেন আপনাকে অনুসন্ধান, গোপন বিষয়ে জানা এবং অন্যের অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে জানার জন্য আগ্রহী করে না তোলে। কোরআন এ জাতীয় কাজ নিষেধ করেছে। আল্লাহ বলেন, وَلَاتَجَسَّسُوْا 'তোমরা গোয়েন্দাগিরী করো না।'

৬. আপনি নিজে চোগলখোরের অনুরূপ মন্দ কাজে জড়িত হবেন না। আপনি এরকম বলবেন না, 'অমুক আমার কাছে অমুকের বিষয়ে একথা বলেছে।' ফলে আপনিও চোগলখোর এবং নিন্দুক হয়ে যাবেন।

হাসান বসরী বলেছেন, যে তোমার কাছে অন্যের চোগলখোরী করে সে অন্যের কাছে তোমার চোগলখুরীও করবে। এটা দ্বারা চোগলখোরকে ঘৃণা করার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। কেননা, চোগলখোর মিথ্যা, গীবত-নিন্দা, বিশ্বাসঘাতকতা, হিংসা, মুনাফেকী ও ধোঁকার আশ্রয় নেয় এবং যাদের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করায়। এর মাধ্যমে সে জমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, اِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنِ اتَّقَاهُ النَّاسُ لِشَرِّهِ.
'মানুষ যাদের ক্ষতি থেকে বাঁচার চেষ্টা করে, তারা হচ্ছে নিকৃষ্ট লোক।' চোগলখোর অবশ্যই এর অন্তর্ভুক্ত।

www.amarboi.org

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

'ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না' لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

প্রশ্ন কারা হল, ছিন্নকারী কে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী।' চোগলখোর মানুষের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করে। তাই সে এ হাদীসের মর্মানুযায়ী দোষী ব্যক্তি।

অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, 'ছিন্নকারী' বলতে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী' বুঝানো হয়েছে।

চোগলখোরের বিরুদ্ধে আমাদের বুজুর্গ ব্যক্তিদের ভূমিকা

ওমার বিন আবদুল আযীয (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর কাছে এক ব্যক্তি প্রবেশ করে অন্য এক ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করল। ওমার বিন আবদুল আযীয বললেন, তুমি যদি চাও, তাহলে, আমরা তোমার বিষয়টি বিবেচনা করবো। আর সে বিবেচনা হচ্ছে, তুমি মিথ্যাবাদী হলে, নিম্নোক্ত আয়াত তোমার ব্যাপারে প্রযোজ্য,

اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا.

'যদি তোমাদের কাছে কোন ফাসেক ব্যক্তি কোন খবর নিয়ে আসে তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে।' (সূরা হুজুরাত : ৬)

আর যদি সত্যবাদী হও, তাহলে, তোমার ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াত প্রযোজ্য, هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ 'যে পেছনে নিন্দা করে, একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়।' (সূরা কলম : ১১)

ওমার বিন আবদুল আযীয বলেন, তুমি চাইলে আমরা তোমাকে ক্ষমা করে দিতে পারি। লোকটি বলল, হে আমীরুল মুমেনীন! আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আর চোগলখোরী করবো না।

বর্ণিত আছে। এক বিজ্ঞ লোকের বন্ধু তাঁর কাছে গেল এবং বিজ্ঞ লোকের অন্য বন্ধু সম্পর্কে কিছু খারাপ কথা বলল। তখন বিজ্ঞ লোকটি বলেন, তোমার সাক্ষাত বিলম্বিত হয়েছে এবং তুমি তিনটি অপরাধ করেছ।

(১) তুমি আমার ভাই সম্পর্কে আমার মনে বৈরীভাব সৃষ্টি করেছ।

(২) তুমি কেবল মনকে দুশ্চিন্তাযুক্ত করেছ এবং

(৩) তোমার আমানতদার অন্তরকে দোষী করেছ।

www.amarboi.org

মোস'আব বিন যোবায়ের বলেছেন, আমরা চোগলখোরীকে গ্রহণ করা চোগলখোরী করার চাইতেও বেশী অপরাধ মনে করি।

ইমাম গাজালী (র) বলেছেন, কেউ কোন মানুষের অপসন্দনীয় কিছু দেখলে সে ব্যাপারে চুপ থাকা উচিত। হাঁ, যদি মুখ খুললে তাতে অন্যান্য মুসলমানের উপকার হয় কিংবা কোন গুণাহর প্রতিরোধ হয়, তখনই কেবল সে সম্পর্কে মুখ খোলা যাবে। এর উদাহরণ হচ্ছে, একজন দেখল যে, কেউ অন্যায়ভাবে কারো মাল-সম্পদ নিয়ে যাচ্ছে। তখন ঐ বিষয়ে তার সাক্ষী দেয়া জরুরী।

বকর বিন আবদুল্লাহ বলেন, তোমাদের উচিত এমন কাজ করা যা ঠিক হলে সওয়াব পাবে এবং বেঠিক হলে গুণাহ হবে না। আর যে কাজ ঠিক হলে সওয়াব পাওয়া যাবে না এবং বেঠিক হলে গুণাহ হবে, সে কাজ থেকে দূরে থাকা জরুরী। তাঁকে প্রশ্ন করা হল, শেষোক্তটা কি? তিনি বলেন, লোকদের সম্পর্কে কুধারণা করা। কেননা, তা ঠিক হলে তোমাদের কোন সওয়াব নেই। বরং ভুল হলে গুণাহ হবে।

মোহাম্মদ বিন কা'বকে প্রশ্ন করা হল, মোমিনের কোন কোন গুণাবলী নিকৃষ্ট? তিনি উত্তরে বলেন, 'বেশী কথা বলা, গোপনীয়তা ফাঁস করা এবং প্রত্যেকের কথা বিশ্বাস করা।'

এক ব্যক্তি আমর বিন ওবায়েদকে বলল, অমুক ব্যক্তি আপনার সম্পর্কে অব্যাহত খারাপ কাহিনী বর্ণনা করে। তখন আ'মর তাকে বলেন, হে অমুক! তুমি তার কথা আমাদের কাছে বর্ণনা করে তার মজলিসের অধিকার রক্ষা করনি এবং আমি যা অপছন্দ করি তা আমার ভাই থেকে আমাকে পৌঁছিয়ে আমার অধিকারও রক্ষা করনি। তবে আমি জানি। আমাদের সবার মৃত্যু হবে, কবর আমাদের স্বাগত জানাবে, কেয়ামত আমাদেরকে একত্রিত করবে এবং আল্লাহ আমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম বিচারক।

লোকমান তাঁর সন্তানকে উপদেশ দেন, হে বৎস! আমি তোমাকে কিছু চারিত্রিক গুণের উপদেশ দিচ্ছি। এগুলো মেনে চললে তোমার নেতৃত্ব অব্যাহত থাকবে। আত্মীয়-অনাত্মীয় সবার সাথে তোমার চারিত্রিক গুণ প্রকাশ কর, ভদ্র লোকদের কাছে তোমার অজ্ঞতা আটকে রাখ, তোমার ভাইদের হেফাজত কর, তোমার আত্মীয়ের হক আদায় কর, তাদের ব্যাপারে চোগলখোরের কথা গ্রহণ কর না, কিংবা তোমার অনিষ্টকারী বিদ্রোহীর কানকথা শুনবে না। তোমার ভাইতো এমন হওয়া উচিত, কেউ কারো কাছ থেকে দূরে সরে গেলে পরস্পর পরস্পরের দোষ-ত্রুটি বলে বেড়াবে না।

www.amarboi.org

একদিন খলীফা সোলাইমান বিন আবদুল মালেক ইমাম যোহরীর সাথে বসা ছিলেন। তখন খলীফার কাছে এক লোক আসল। খলীফা তাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি জানতে পেরেছি, তুমি আমার সম্পর্কে কিছু কথা বলেছ। লোকটি উত্তরে বলে, না আমি এরূপ কথা বলিনি। তখন খলীফা সোলাইমান বলেন, যে আমার কাছে খবর দিয়েছে, সে কিন্তু সত্যবাদী। ইমাম যোহরী খলীফাকে বলেন, চোগলখোর কখনও সত্যবাদী হয় না। তখন সোলায়মান বলেন, আপনি সত্য কথা বলেছেন। চলুন। আর তিনি লোকটিকে বলেন, তুমি শান্তি ও নিরাপদে চলে যাও।

চোগলখোরের দুই রূপ

চোগলখোরের দুই মুখ। সে দু'মুখী নীতি গ্রহণ করে। সে প্রত্যেকের মনোরঞ্জনের জন্য কথা বলে এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। সে কারো সামনে তার প্রশংসা করে এবং পেছনেই নিন্দা করে। মূলত দ্বিমুখীতা শত্রুতা সৃষ্টির উত্তম হাতিয়ার।

রাসূলুল্লাহ (সা) এ সকল দ্বিমুখী লোকের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন,

مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ لِسَانًا مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'দুনিয়ায় যার দুই মুখ, কেয়ামতের দিন তার একটি আগুনের জিহ্বা হবে।'
রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন,

تَجِدُوْنَ مِنْ شَرِّ عِبَادِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِيْ يَأْتِيْ هٰؤُلَاءِ بِحَدِيْثٍ وَهٰؤُلَاءِ بِحَدِيْثٍ.

'কেয়ামতের দিন তোমরা দ্বিমুখী লোককে সর্বনিকৃষ্ট লোক হিসেবে দেখতে পাবে, যে এদের কাছে এক রকম এবং অন্যদের কাছে আরেক রকম কথা বলে।'

হাম্মাদ বিন সালামাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক একটি দাস বিক্রি করল এবং ক্রেতাকে বলল, তার মধ্যে চোগলখুরী ছাড়া আর কোন ত্রুটি নেই। ক্রেতা এটাকে হালকাভাবে গ্রহণ করল এবং দাসটিকে কিনে নিল। দাসটি নতুন মনিবের কাছে কিছু দিন থাকার পর মনিবের স্ত্রীকে বলল, আপনার স্বামী আপনাকে ভালবাসেন না এবং তিনি বিষয়টিকে আপনার কাছে থেকে গোপন রাখতে চান। আপনি কি চান যে, সে কেবল আপনাকেই ভালবাসুক ? স্ত্রী বলল,

www.amarboi.org

হ্যাঁ, অবশ্যই। দাসটি বলল, তাহলে, আপনি শোয়ার সময় একটি ব্লেড নিয়ে শুবেন এবং ঘুমের মধ্যে তার ভেতরের কিছু দাঁড়ি কেটে ফেলবেন।

তারপর সে মনিবের কাছে গিয়ে বলল, আপনার স্ত্রী এক গোপন বন্ধু সংগ্রহ করেছে এবং সে আপনাকে হত্যা করতে চায়। আপনি কি এর প্রমাণ চান? মনিব বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই। তারপর দাস মনিব ও তার স্ত্রীকে রাতে ঘুমের বিছানায় যেতে বলল। মনিব স্ত্রীর হাতে ব্লেড দেখে ভাবল যে, স্ত্রী সত্যিই তাকে হত্যা করতে চায়। মনিব স্ত্রীর হাত থেকে ব্লেড নিয়ে স্ত্রীকে হত্যা করে ফেলল। তারপর স্ত্রীর পক্ষের আত্মীয়রা এসে মনিবকে হত্যা করল। এরপর মনিব পক্ষের লোকেরা আসল এবং দু'পক্ষের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেল।

চোগলখুরী থেকে বাঁচার উপায়

চোগলখুরী থেকে বাঁচার জন্য একমাত্র পথ হচ্ছে, অবসর সময়ে আল্লাহর জিকর ও স্মরণে ব্যস্ত থাকা, নেক লোকদের সাথে উঠা-বসা করা, কোরআন, হাদীস পাঠ করা, মানুষের কল্যাণ কামনা করা, কারো ক্ষতি ও অমঙ্গল কামনা না করে পরোপকারের চিন্তা করা এবং আল্লাহর শাস্তি ও পুরস্কারের কথা মনে রাখা।

৯. মিথ্যা বলা

মিথ্যা, মানব সমাজে ব্যাকটেরিয়ার মত আস্তানা গেড়ে আছে। খুব কম মানুষই তা থেকে মুক্ত এবং খুব কম সমাজই তা থেকে বেঁচে আছে। মানব সমাজে নবী, সিদ্দীক ও সম্মানিত নেক মোমিনরা না থাকলে মিথ্যুকদের কারণে গোটা জমীন বিষাক্ত হয়ে যেত। বহু দেশ মিথ্যুক শাসকদের বিভ্রান্তির কারণে ক্লান্ত-শ্রান্ত। বহু নেতা সম্মান-সম্ভ্রমের মুখোশ পরে আছে, অথচ তারা খুবই নিকৃষ্ট। অনেক লোক বীর সেজে বসে আছে। কিন্তু তাদের রক্তে বিশ্বাসঘাতকতার স্রোত প্রবাহিত। মিথ্যা কথা কত লোককে নিহত করেছে, কত ইয়াতীমকে প্রতারিত ও নিঃস্ব করেছে, কত ঘরে মিথ্যার কারণে আগুন লেগেছে! যে কোন অধিকার বিনষ্ট, ক্ষুধার্ত ফকীরের কষ্ট, নির্মম লোকের জুলুম এবং আগ্রাসনের পেছনে মিথ্যার যে কোন আবরণ অবশ্যই রয়েছে। মিথ্যার দোর্দণ্ড প্রতাপের কারণে মানুষকে ধারণা দেয়া হয়েছে যে, ক্ষতিটাই দয়া, অনাহার কৃপা, কঠোর হস্তের জুলুম ইনসাফ এবং নিষ্পেষণকারীর আগ্রাসন সম্মান ও অনুগ্রহ।

এটাই মিথ্যার আসল চেহারা যা ন্যায়ের মাপকাঠিকে উল্টিয়ে দেয়, বাস্তব সত্যকে বিকৃত করে এবং প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে বিগড়িয়ে দেয়।

www.amarboi.org

মিথ্যা যদি কথা বলতে পারত তাহলে সে বলত; আমি শক্তিধরের অস্ত্র, মুনাফেকীর ঢাল, ব্যর্থ লোকের সম্বল, লোক দেখানোর প্রশান্তি, ধোঁকাবাজদের নেটওয়ার্ক এবং অপরাধীদের আশ্রয়স্থল।

আল্লাহ বলেন, اِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ.

'যে ব্যক্তি অপচয়কারী ও মিথ্যুক, আল্লাহ তাকে হেদায়াত করেন না।' (সূরা আল-মোমেন : ২৮)

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ.

'কেয়ামতের দিন আপনি আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যাবাদীদের চেহারা কাল দেখতে পাবেন।' (সূরা যুমার : ৬০)

اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ.

'যারা আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনের উপর ঈমান আনে না তারাই মিথ্যা-প্রতারণা করে এবং তারাই মিথ্যাবাদী।' (সূরা নাহল : ১০৫)

মিথ্যার বিপরীত হচ্ছে, সত্যবাদিতা। আল্লাহ সত্যবাদিতার প্রশংসা করে বলেছেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ.

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।' (সূরা আত তাওবা : ১১৯)

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِسْمَاعِيْلَ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلاً نَّبِيًّا.

'এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা বর্ণনা করুন, তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবী।' (সূরা মরিয়ম : ৫৪)

আল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর দো'আ উল্লেখ করেছেন :

رَبِّ هَبْ لِىْ حُكْمًا وَّ الْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ وَاجْعَلْ لِىْ لِسَانَ صِدْقٍ فِىْ الْاٰخَرِيْنَ.

www.amarboi.org

'হে আমার রব! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর, আমাকে নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর।' (সূরা শো'আরা : ৮৩-৮৪)

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'তোমরা সত্যবাদিতা অবলম্বন কর। সত্যবাদিতা নেকীর দিকে পথপ্রদর্শন করে এবং নেকী বেহেশতের দিকে পথ দেখায়। ব্যক্তি সত্য বলতে বলতে এবং সত্যের উপর টিকে থাকার চেষ্টা করতে করতে আল্লাহর কাছে সত্যবাদী হিসেবে লিখিত হয়। তোমরা মিথ্যা থেকে বাঁচ। মিথ্যা গুণাহর পথ দেখায় এবং গুণাহ দোযখে নিয়ে যায়। বান্দাহ মিথ্যা বলতে এবং মিথ্যার উপর টিকে থাকার চেষ্টা করতে থাকলে আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী হিসেবে লিখিত হয়।' (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

সামুরা বিন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'একরাত স্বপ্নে আমি দু'ব্যক্তিকে দেখলাম তারা আমার কাছে এসেছে। (তারা হল, ফেরেশতা) তারা আমাকে বলল, আপনি যে লোকটির গাল চিরে দেয়া হচ্ছে দেখছেন, সে মিথ্যুক। তারপর সে আবার মিথ্যা কথা বলবে এবং সর্বত্র তা ছড়িয়ে পড়বে। তারপর আবার তার চোয়াল চিরে দেয়া হবে। এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত তা চলতে থাকবে।' (বোখারী)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'মোনাফিকের লক্ষণ ৩টি। সে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, সে যখন ওয়াদা করে, তা ভঙ্গ করে এবং তার কাছে কোন জিনিস আমানত রাখা হলে তার খেয়ানত করে।' (বোখারী)

মুসলিম শরীফে আরও একটু বেশী বর্ণিত আছে যে, 'যদিও সে নামায, রোযা করে এবং নিজেকে মুসলমান মনে করে।'

আবদুল্লাহ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ الْمَلَكُ عَنْهُ مِيلاً مِنْ نَتَنِ مَا جَاءَ بِهِ.

'বান্দাহ মিথ্যা বললে ফেরেশতারা এর দুর্গন্ধের কারণে তার থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়।' (তিরমিযী-হাদীসটি হাসান বলেছেন।)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে মিথ্যার চাইতে অন্য কোন দোষ বেশী ঘৃণিত ছিল না।' (আহমদ)

বাহয বিন হাকীম নিজ পিতা এবং তাঁর দাদার বর্ণনা পরম্পরায় রেওয়ায়েত করেছেন,

www.amarboi.org

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَيْلٌ لِّلَّذِىْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبَ وَيْلٌ لَهٗ، وَيْلٌ لَهٗ.

'আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি লোকদেরকে হাসানোর উদ্দেশ্যে কথা বলে ও মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তার ধ্বংস। একথা তিনি তিনবার বলেন।' (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও বায়হাকী)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না। তাদেরকে পবিত্র করবেননা এবং তাদের দিকে তাকাবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। সে তিন ব্যক্তি হল, বৃদ্ধ যেনাকারী, মিথ্যুক রাজা ও অহংকারী ফকীর-মিসকীন।' (মুসলিম)

আবু বোকরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে সর্ববৃহৎ কবীরা গুণাহ সম্পর্কে বলবো না? তাঁরা বলেন, হাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা ও মা-বাপের নাফরমানী করা। তারপর তিনি ঠেস দিয়ে বসে বলেন, ওহো! মিথ্যা কথা। তিনি বার বার তা বলতে লাগলেন আর আমরা ইচ্ছা করেছিলাম যদি তিনি চুপ হতেন।' (বুখারী, মুসলিম)

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গুণাহমূলক শপথ করে অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের সম্পদ খাওয়ার জন্য, সে ব্যক্তি যখন আল্লাহর সাথে মিলিত হবে তখন আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট থাকবেন।' (বোখারী, মুসলিম)

সে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ করার জন্য মিথ্যা শপথ করেছিল, সে জন্য আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন।

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

اَعْظَمُ الْخَطَايَا عِنْدَ اللهِ اللِّسَانُ الْكَذُوْبُ وَشَرُّ النَّدَامَةِ نَدَامَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

'আল্লাহর নিকট মিথ্যা জিহবা সবচাইতে বড় গুণাহ এবং সর্বাধিক নিকৃষ্ট অপমান হচ্ছে কেয়ামতের দিনের অপমান।'

রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করা হল, 'যে কাজের দরুন মানুষ দোযখে যাবে তা কি? তিনি উত্তরে বলেন, 'সেটা হচ্ছে, মিথ্যা।' (মুসনাদে আহমদ)

www.amarboi.org

'রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : মিথ্যা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ না করা পর্যন্ত কেউ পূর্ণ মোমেন হতে পারে না। এমনকি হাসি-ঠাট্টা ছলেও মিথ্যা না বলা উচিত।' (মুসনাদে আহমদ।)

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেছেন, 'মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, মিথ্যা পাপের দোসর। মিথ্যা ও পাপ উভয়ই জাহান্নামে যাবে।' (ইবনে হিব্বান)

ইমাম শা'বী বলেছেন, আমি জানি না, কার আযাব বেশী, মিথ্যুকের না কৃপণের।

ওয়াজিব মিথ্যা

ইমাম গাযালী (র) বলেছেন, কথা হচ্ছে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছার হাতিয়ার। যদি আকাঙ্খিত বিষয়টি খুবই জরুরী হয় এবং মিথ্যা বলা ছাড়া তা অর্জন করার আর কোন উপায় না থাকে, এমতাবস্থায় মিথ্যা বলা ওয়াজিব। এর উদাহরণ হচ্ছে, কোন লোক এমন জালেম থেকে আত্মগোপন করে আছে, যে অন্যায়ভাবে তাকে হত্যা করতে চায়। আর আপনি সে পলাতকের আশ্রয়স্থল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। এমতাবস্থায় আপনি তার আবাসস্থল সম্পর্কে জানেন না বলে মিথ্যা বলা ওয়াজিব। যদি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়েও জিজ্ঞেস করা হয়, তথাপিও সে ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলা ওয়াজিব। অন্যায়ভাবে কেউ কোন মুসলমান কিংবা জিম্মীকে হত্যা ও জেল দিতে চাইলে কিংবা কারুর অর্থ-সম্পদ লুট করতে চাইলে এমতাবস্থায় অন্যায়কে ঠেকানোর জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়া জরুরী।

যদি শত্রুরা কোন মুসলিম গেরিলাকে আটক করে এবং তার সাথী অন্যান্য মুসলিম মুজাহিদদের তথ্য প্রকাশ অথবা মুসলমানদের গোপন বিষয়ে জানার জন্য তাকে আল্লাহর কসম দেয়, তা সত্ত্বেও তার তথ্য ফাঁস না করা উচিত এবং সে সম্পর্কে কিছু জানে না বলে মিথ্যা বলা জরুরী। অনুরূপভাবে, কোন ব্যক্তি যদি নিজের দেশ, সম্পদ ও ইজ্জত-সম্মানের প্রতিরক্ষারত অবস্থায় শত্রুর কাছে গোপন তথ্য প্রকাশের জন্য কসমের সম্মুখীন হয় এবং সে তথ্য প্রকাশ করে দিলে যদি নিজের পরিবার-পরিজন ও ভাইদের ক্ষতি হয়, সে ক্ষেত্রে তা প্রকাশ না করে মিথ্যা বলা ওয়াজিব।

জায়েয মিথ্যা

তিন বিষয়ে মিথ্যা বলা জায়েয বলে হাদীসে এসেছে।

www.amarboi.org

১. যুদ্ধক্ষেত্রে।

যুদ্ধ হচ্ছে, ধোঁকা ও চালবাজি। যুদ্ধের দাবী হল, শত্রুকে বিভ্রান্ত করা এবং এমন বিষয়ে সন্দিহান করে তোলা যার কোন অস্তিত্ব নেই। যথাসাধ্য যুদ্ধের মানসিক পদ্ধতিকে অত্যন্ত কৌশল ও প্রজ্ঞার সাথে প্রয়োগ করা।

২. দুই ঝগড়াকারীর মধ্যে আপোষ করে দেয়া।

কখনও আপোষের দাবী হচ্ছে, আপোষকারী প্রত্যেক পক্ষের কাজ ও কথার যুক্তি জানার পর নৈকট্য ও বিরোধ সৃষ্টির কারণগুলো জানবে। তারপর কোন লোকের প্রতি এমন ভাল কথা বলেছে বলে উল্লেখ করবে যা সে বলেনি এবং আপোষের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী প্রতিপক্ষের কোন কোন কথাকে সে অস্বীকার করবে।

৩. দাম্পত্য জীবনে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা।

এ জন্য কোন সময় স্ত্রীকে স্বামীর ব্যাপারে কিংবা স্বামীকে স্ত্রীর ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হতে পারে। পরস্পর অন্তরে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো গোপন রাখবে যা দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফাটল সৃষ্টি এবং ঝগড়া ও বিরোধ সৃষ্টির কারণ হতে পারে। শুধু তাই নয়, উভয় উভয়ের জন্য এমন মিষ্টি-মধুর কথার ফুলঝুরি ঝাড়বে যা সত্য নয়, কিন্তু এর মাধ্যমে ভালবাসা ও প্রশান্তি বাড়বে এবং দাম্পত্য জীবন সুখী হবে। কেননা, দাম্পত্য সম্পর্ক রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী এবং তাকে শক্তিশালী, সুন্দর ও ফলপ্রসূ করার জন্য মিথ্যাসহ সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لَيْسَ بِكَذَّابٍ مَنْ اَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ خَيْرًا اَوْ نَمَى خَيْرًا.

'যে ব্যক্তি দু'জনের মধ্যে আপোষ করার উদ্দেশ্যে ভাল বলে কিংবা ভাল বিষয়ে চোগলখুরী করে, সে মিথ্যুক নয়।' (বোখারী ও মুসলিম)

উম্মে কুলসুম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

مَاسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخِّصُ فِىْ شَيْئٍ مِّنَ الْكَذِبِ اِلاَّ فِىْ ثَلاَثٍ: اَلرَّجُلُ يَقُوْلُ الْقَوْلَ يُرِيْدُ بِهِ الْاِصْلاَحَ وَالرَّجُلُ يَقُوْلُ الْقَوْلَ فِى الْحَرْبِ وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ اِمْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا.

www.amarboi.org

'আমি তিন বিষয় ছাড়া আর কোন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)কে মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনিনি। ১. যে ব্যক্তি আপোষ-রফার উদ্দেশ্যে কথা বলে। ২. যে ব্যক্তি যুদ্ধের বিষয়ে কথা বলে এবং ৩. যে স্বামী নিজ স্ত্রীর সাথে কিংবা স্ত্রী নিজ স্বামীর সাথে কথা বলে।' (মুসলিম)

ইমাম গাযালী (র) বলেছেন, এই তিন ধরনের মিথ্যার বিষয়, নিষিদ্ধ মিথ্যা থেকে ব্যতিক্রমধর্মী। ঐ সকল বিষয়ও এ তিনটি বিষয়ের অনুরূপ, যেগুলোর সাথে বিশুদ্ধ ইচ্ছা সংশ্লিষ্ট রয়েছে। অর্থাৎ তাঁর মতে অন্যান্য মিথ্যাকে এর উপর কেয়াস করে দেখতে হবে, সেগুলো এ তিন শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে কি না। যদি ভাল ও প্রশংসার যোগ্য কোন ইচ্ছা পাওয়া যায় এবং মিথ্যার আশ্রয় নেয়া ছাড়া তা অর্জন করা না যায়, তখন মিথ্যা জায়েয হবে। যেমন, কোন জালেম কাউকে আটক করে তার সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তা অস্বীকার করা জায়েয, যেন জালেম অন্যায়ভাবে তার সম্পদ হস্তগত করতে না পারে।

অথবা কোন শাসক যদি কাউকে তার ব্যক্তিগত এমন বিষয় জানার জন্য অনর্থক আটক করে যা ব্যক্তি ও আল্লাহর সাথে সীমিত। যেমন, যদি তাকে কৃত যেনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন তার মিথ্যা বলা জায়েয। সে উত্তর দেবে, আমি যেনা করিনি। কারো বিরুদ্ধে যেনার অপবাদ দেইনি এবং মদ পান করিনি, ইত্যাদি। কেননা, অশ্লীল কাজের ঘোষণাও আরেকটি অশ্লীল কাজ এবং গুণাহ, যা তার কৃত গুণাহর সাথে গিয়ে যোগ হয়। সে জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَنِ ارْتَكَبَ شَيْئًا مِنْ هٰذِهِ الْقَاذُوْرَاتِ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ.

'যে ব্যক্তি এ সকল নোংরা কাজ করে সে যেন তা আল্লাহর আবরণে গোপন রাখে।' (হাকেম, আল্লামা ইরাকী বলেছেন, হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ)

অনুরূপ কেউ নিজ ভাইয়ের গোপন বিষয় ও মান-সম্ভ্রমের বিষয় প্রকাশের জন্য জিজ্ঞাসিত হলে, তার উচিত, তা অস্বীকার করা।

ইমাম গাযালী (র) এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, বিষয়টি ব্যক্তিগত ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল। যদি কুপ্রবৃত্তি চাঙ্গা হয় এবং এ জাতীয় অনুমতির পেছনে উঠে পড়ে লেগে যায় তাহলে, মিথ্যার মধ্যে জড়িয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। অথচ সে মনে মনে ভাববে যে, সেটা জায়েয। সে জন্য তিনি বলেছেন, মিথ্যাকে ত্যাগ করাই হচ্ছে দৃঢ়তা ও মজবুতী। শুধু ওয়াজিব মিথ্যার ক্ষেত্রেই মিথ্যার আশ্রয় নেয়া উচিত।

www.amarboi.org

বাহ্যিক অর্থ ত্যাগ করে চালাকী করে ভিন্ন অর্থ গ্রহণের হুকুম (تَعْرِيْضٌ وَ تَوْرِيَةٌ)

ইমাম নববী (র) বলেছেন, تَعْرِيْضٌ ও تَوْرِيَـةٌ এর অর্থ একই। আর তা হল, এমন এক শব্দ ব্যবহার করা যার বাহ্যিক অর্থ এক কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্য। অথচ, শব্দের উভয়বিধ অর্থই গ্রহণযোগ্য। এটা এক ধরনের চালবাজি।

ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, যদি অনুরূপ করার জন্য শরীয়ত সম্মত কোন প্রয়োজন থাকে যাতে সম্বোধনকারীকে ধোঁকা দেয়ার সুযোগ রয়েছে অথবা এমন কোন প্রয়োজন যা পূরণ না করে উপায় নেই, তখন ঐ রূপ শব্দের বাহ্যিক অর্থের পরিবর্তে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করা জায়েয। কিন্তু যদি ঐ রূপ কিছু না হয় ও চালবাজী ত্যাগ করা সম্ভব হয় এবং তা সত্ত্বেও অনুরূপ শব্দ প্রয়োগ করা হয় তাহলে তা মাকরূহ হবে, হারাম নয়। তবে শর্ত হচ্ছে, অনুরূপ শব্দের মাধ্যমে কোন বাতিল জিনিসকে গ্রহণ কিংবা সত্যকে দমন করা যাবে না। এমন হলে তা হারাম হবে।

সাহাবী ও তাবেঈদের বক্তব্য থেকেও এর পক্ষে-বিপক্ষে সমর্থন ও অসমর্থন দুটোই পাওয়া যায়। এক ব্যক্তি ইবরাহীম নখয়ীকে (র) তালাশ করে। তিনি চাকরানীকে বলেন, তাকে বল, সে যেন তাঁকে মসজিদে তালাশ করে। চাকরানী একথা বলেনি যে, তিনি এখানে আছেন বা নেই। এর আরেকটি উদাহরণ হল, কেউ কাউকে খাওয়ার দাওয়াত দিল। তিনি উত্তরে বলেন যে, আমি নিয়ত করেছি। তিনি এর দ্বারা বুঝাতে চান যে, তিনি রোজার নিয়ত করেছেন। আসলে তিনি না খাওয়ার নিয়ত করেছেন।

অনিচ্ছাকৃত মিথ্যার হুকুম

ইচ্ছাকৃত মিথ্যার গুণাহ আছে। কিন্তু অনিচ্ছাকৃত মিথ্যার গুণাহ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

'যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃত মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন দোযখে নিজ ঠিকানা লিখে নেয়।' (বোখারী ও মুসলিম)

কেউ যদি ভুলে কিংবা অজ্ঞতাবশতঃ মিথ্যা বলে, সে গুণাহগার হবে না। উল্লিখিত হাদীসই এর প্রমাণ।

www.amarboi.org

১০. অন্যের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা

আল্লাহ কোরআনে মজীদে বলেছেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ.

'হে ঈমানদারগণ! কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না।' (সূরা আল হুজুরাত : ১১)

এখানে উপহাস বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ বলতে বুঝায় কাউকে হেয় করা বা খাট করা এবং লোকদেরকে তার দোষ-ত্রুটির কথা বলে হাসানো। তা কোন সময় কথা, কোন সময় ইশারা-ইঙ্গিত আবার কোন সময় কথা ও কাজ দ্বারা অভিনয় করার মাধ্যমেও হতে পারে। কারো উপস্থিতিকে বিদ্রূপ করলে তা নিন্দা হবে না। সেটা ঠাট্টা-বিদ্রূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

ঠাট্টা-বিদ্রূপের মাধ্যমে কাউকে কষ্ট দেয়া হারাম। তবে কেউ যদি ঠাট্টা-বিদ্রূপের মাধ্যমে কষ্ট না পায়, বরং আনন্দিত হয়, তাহলে তা হারাম হবে না।

ঠাট্টা-বিদ্রূপের হারাম হওয়ার জন্য সে সকল হাদীস প্রযোজ্য যা মুসলমানদেরকে ঘৃণা না করার জন্য বর্ণিত হয়েছে। ঠাট্টা-বিদ্রূপকে হারাম করার পেছনে মানবিক অনুভূতির হেফাজত এবং তাকে কোন কথা বা ইশারা অনুভূতির মাধ্যমে আহত না করার উদ্দেশ্যই কাজ করেছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَايُلْقِىْ لَهَا بَالاً يَهْوِىْ بِهَا (اى فى جهنم) اَبْعَدَ مِنَ الثُّرَايَا.

'মানুষ কোন সময় এমন শব্দ উচ্চারণ করে যা সে চিন্তা করে না। কিন্তু তা তাকে এমন দোযখে নিক্ষেপ করে যার দূরত্ব সুরাইয়া তারকার দূরত্ব থেকেও আরো বেশী।' ঠাট্টা-বিদ্রূপের পরিণতিও সে রকম।

www.amarboi.org

১১. গালি ও অভিশাপ

কোন কোন ব্যক্তির মুখ অন্যের ব্যাপারে এমন সাঁড়াশী যেন এটা তার নিজের অঙ্গ নয় কিংবা এর পেছনে কোন বুদ্ধি-প্রজ্ঞা কাজ করে না। তার মুখ থেকে যা ইচ্ছা খারাপ কথা এবং এমন সব বাক্য বের হয় যেমন পঁচা গোশত থেকে ঘৃণিত পোকা বের হয়। আপনি যদি তার সাথে একটু মতপার্থক্য করেন, কিংবা সন্তোষজনক কাজ না করেন তাহলে, আপনাকে তার সীমাহীন গালি ও অভিশাপ শুনতে হবে। সে তার ভাইয়ের সাথে কথা বললে তাকে কষ্ট দেয় এবং সামান্য একটু মতবিরোধ হলেই তার প্রতি গালি-গালাজ ও অভিশাপের বৃষ্টি বর্ষণ করে। যে নিজ ভাইয়ের অধিকার পূরণ করে না, সে মুসলমান নয়, যদিও সে নামায রোযা করে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ.

'মুসলমান সে ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।'

কোরআন-হাদীসে গালিকে হারাম করা হয়েছে এবং গাল-মন্দকারী ও অভিশাপদাতার প্রতি কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَنًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا.

'যারা বিনা অপরাধে মোমিন পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।' (সূরা আহযাব : ৫৮)

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهٗ كُفْرٌ.

'মুসলমানকে গালি দেয়া গুণাহ ও ফাসেকী এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা কুফুরী।' (বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'দুই গালিদাতা যখন গালি দেয়, তখন যাকে গালি দেয়া হয়েছে সে ব্যক্তির বিজয়ের আগ পর্যন্ত প্রথম গালিদাতার উপর এর গুণাহ বর্তাবে।' (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

www.amarboi.org

আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لاَيَكُوْنُ اللَّعَّانُوْنَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'অভিশাপদানকারীরা হাশরের দিন কারো জন্য সুপারিশ করতে এবং সাক্ষ্য দিতে পারবে না।' (মুসলিম, আবু দাউদ)

সালামাহ বিন আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত আছে, 'আমরা যখন কোন লোককে তার ভাইয়ের প্রতি অভিশাপ দিতে দেখতাম, তখন ভাবতাম যে, সে কবীরা গুণাহ করছে।' (তাবরানী, সনদ ভাল)

আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ، فَتُغْلَقُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ دُوْنَهَا، ثُمَّ تَهْبَطُ اِلَى الْاَرْضِ فَتُغْلَقُ اَبْوَابُهَا دُوْنَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِيْنًا وَّشِمَالاً، فَاِنْ لَّمْ تَجِدْ مَسَاغًا، رَجَعَتْ اِلَى الَّذِىْ لُعِنَ، فَاِنْ كَانَ اَهْلاً وَاِلاَّ رَجَعَتْ اِلَى قَائِلِهَا.

'বান্দাহ যখন অভিশাপ দেয় তখন তা আসমানে উঠে। কিন্তু আসমানের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। তারপর তা জমীনে নেমে আসে। কিন্তু জমীনের দরজাও বন্ধ করে দেয়া হয়। তারপর তা ডানে-বামে যায় এবং থাকার জায়গা না পেলে যাকে অভিশাপ দেয়া হয়েছে তার কাছে যায়। সে যদি ঐ অভিশাপের উপযুক্ত হয় তাহলে, তার উপর পতিত হয়, অন্যথায় অভিশাপদানকারীর উপর গিয়েই তা পড়ে।' (আবু দাউদ)

ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِىْ.

'সে ব্যক্তি মোমিন নয়, যে মানুষকে গাল-মন্দ করে, অভিশাপ দেয়, অশ্লীল গুণাহ করে ও অর্থহীন কথাবার্তা বলে।' (তিরমিযী)

যাদেরকে অভিশাপ দেয়া যায়

ইমাম নববী (র) বলেছেন, কোন মোমিন মুসলমানকে অভিশাপ দেয়া সর্বসম্মতভাবে হারাম। অনির্দিষ্ট খারাপ লোকের প্রতি অভিশাপ দেয়া যায়।

www.amarboi.org

যেমন, আল্লাহ জালেমদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন। কাফিরদের প্রতি কিংবা ইহুদী-নাসারার প্রতি অভিশাপ দিন অথবা ফাসেক ও ছবি অংকনকারীদের প্রতি অভিশাপ দিন, ইত্যাদি। তিনি বোখারী ও মুসলিম থেকে সম্মিলিতভাবে কিংবা পৃথকভাবে বর্ণিত কতগুলো হাদীস দ্বারা যাদের উপর অভিশাপ জায়েয তা বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'শরীরে রং খোদাইকারী ও রং গ্রহণকারীর উপর আল্লাহর লা'নত। সুদখোর ও সুদ দাতার উপর আল্লাহর লা'নত। ছবি অংকনকারীর উপর আল্লাহর লা'নত। যে জমীনের আলের পরিবর্তন করে তার উপর আল্লাহর লা'নত। ডিম চোরের উপর আল্লাহর লা'নত। আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবেহকারীর উপর আল্লাহর লা'নত। মা-বাপের উপর অভিশাপদানকারীর উপর আল্লাহর লা'নত। নবীদের কবরকে মসজিদ বানানোর কারণে ইহুদী নাসারাদের উপর আল্লাহর লা'নত।

তিনি এক গাধার মুখে আগুনের দাগ দেখে বলেন, যে এর মুখে দাগ দিয়েছে তার উপর আল্লাহর লা'নত।'

তারপর ইমাম নববী বলেছেন, কোন কোন আলেমের মতে, সুনির্দিষ্ট কোন গুণাহগার ব্যক্তির প্রতি অভিশাপ দেয়া জায়েয। যেমন, ইহুদী, খ্রিষ্টান, জালেম, যেনাকারী, ছবি অংকনকারী, চোর, সূদখোর ইত্যাদি। তাদের দলীল হচ্ছে, বর্ণিত হাদীসের প্রকাশ্য ভাষ্য।

ইমাম গাযালী বলেছেন, অভিশাপ দেয়া হারাম। তবে, যাদের মৃত্যু কুফরীর উপর হয়েছে বলে আমরা জানি, কেবল-মাত্র তাদেরকেই নাম ধরে অভিশাপ দেয়া যায়। যেমন, আবু লাহাব, আবু জাহল, ফেরআউন, হামান প্রভৃতি। কেননা, অভিশাপ বা লা'নত হচ্ছে, আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। অথচ আমরা জানি না ঐ ফাসেক বা কাফেরের মৃত্যু কিসের উপর হয়েছে। তার প্রতি অভিশাপের অর্থ হল, তাকে স্থায়ীভাবে রহমত থেকে বঞ্চিত করার জন্য বদ দো'আ করা। আর কাফের হয়ে মৃত্যু বরণ না করলে তা হতে পারে না। অথচ এরকম বদ দো'আ জায়েয নেই।

ইমাম গাযালী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যে সকল সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর অভিশাপ দিয়েছেন, তিনি কুফরীর উপর তাদের মৃত্যু হবে বলে জানতে পেরেছিলেন। ইমাম গাযালী সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর লা'নত করা যে জায়েয নেই

www.amarboi.org

সে বিষয়ে বোখারী শরীফের ওমার বিন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসের প্রমাণ পেশ করেছেন। সে বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহর (সা) সময় আবদুল্লাহ নামক এক ব্যক্তির উপাধি ছিল গাধা। রাসূলুল্লাহ (সা) তা শুনে হাসেন। তিনি মদপান করার দায়ে তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন। তাকে একদিন ডেকে এনে বেত্রাঘাত করা হল। তখন কাওমের একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ! তার উপর অভিশাপ দাও। কেননা, সে অধিক মদ পান করেছে। তখন নবী (সা) বলেন, তাকে অভিশাপ দিও না। আল্লাহর কসম, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে, একথা ছাড়া আমি তার বিষয়ে আর কিছু জানি না।'

ইমাম গাযালী আরও বলেন, বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া কোন মুসলমানের প্রতি কবীরা গুণাহর অভিযোগ আনা জায়েয নেই এবং ভাল করে যাঁচাই করা ছাড়া কোন মুসলমানকে ফাসেকী ও কুফরীর অভিযোগে অভিযুক্ত করাও জায়েয নেই।

১২. যেনার অপবাদ

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

'যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর এর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে ৮০টি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফরমান। কিন্তু যারা এরপর তওবা করে এবং সংশোধিত হয়, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান।' (সূরা নূর : ৪, ৫)

এ দুটো আয়াত প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি অন্য এমন কাউকে যেনার অপবাদ দেয়, যে সৎ ও পবিত্র এবং যেনা করে না বলে প্রসিদ্ধ, তার জন্য তিন রকম শাস্তি রয়েছে, যদি সে ৪জন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে। (১) ৮০টি বেত্রাঘাত (২) তার সাক্ষ্য কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না। (৩) শহরে তার অপবাদের শাস্তির কথা প্রকাশ করে দিতে হবে যাতে করে লোকেরা এ জাতীয় তৎপরতা থেকে বিরত থাকে। তওবা করার আগ পর্যন্ত তার এ অবস্থা অব্যাহত

www.amarboi.org

থাকে। নারী বা পুরুষ যার বিরুদ্ধেই অপবাদ দেয়া হয়, এ শাস্তি সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জ্ঞানী, বালেগ ও স্বাধীন হতে হবে।

মূলকথা, কারোর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ বড় মারাত্মক অপরাধ। তাই ইসলাম একে ধ্বংসাত্মক গুণাহ্ বলেছে।

আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তোমরা ৭টি ধ্বংসাত্মক গুণাহ থেকে বেঁচে থাক। তারা বলল, সেগুলো কি ? তিনি বলেন, আল্লাহর সাথে শিরক, যাদু, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা; সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল খাওয়া, যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং সহজ-সরল সতী নারীর বিরুদ্ধে যেনার অপবাদ দেয়া। (বুখারী, মুসলিম)

১৩. জিহ্বার বিপদ

জিহ্বার বিপদ ও এর সামাজিক ফলাফল মারাত্মক। একটি শব্দ কোন সময় ফেতনা সৃষ্টি, একটি জাতির ধ্বংস, বন্ধুকে হারানো, দীনের ক্ষতি কিংবা কোন কবীরা গুনাহর মধ্যে নিক্ষেপ করে। তাই আমরা কোরআন ও হাদীসে এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সতর্ক বাণী দেখতে পাই। বেহুদা কথা, জিহ্বার অপব্যবহার, ভেবে-চিন্তে কথা না বলা, আল্লাহর তদারকী কিংবা পরকালের ভয়কে সামনে না রেখে কথা বলার বিরুদ্ধে আমাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন,

لَاخَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا.

'তাদের অধিকাংশ শলা-পরামর্শ ভাল নয়, কিন্তু যে শলা-পরামর্শ দান-খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে করত, তা ভিন্ন জিনিস, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এ কাজ করে আমি তাকে বিরাট সওয়াব দান করব।' (সূরা আন নিসা : ১১৪)

আল্লাহ বলেন,

لَايُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا.

'আল্লাহ কোন খারাপ বিষয় সম্পর্কে বলা পছন্দ করেন না। তবে, কারও উপর জুলুম হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা। আল্লাহ শ্রবণকারী ও বিজ্ঞ।' (সূরা নিসা : ১৪৮)

www.amarboi.org

আল্লাহ আরও বলেন,

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ.

'তোমরা মূর্তিসমূহের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা বলা থেকে দূরে থাক।' (সূরা আল হজ্জ : ৩০)

আল্লাহ বলেন,

مَا يَكُوْنُ مِنْ نَجْوٰى ثَلاَثَةٍ اِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ اِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ اَكْثَرَ اِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَمَا كَانُوْا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ.

'তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচজনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি তাদের সাথে আছেন, তারা যা করে, তিনি কেয়ামেতের দিন তা তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।' (সূরা মোজাদালা : ৭)

আল্লাহ আরও বলেন,

وَالَّذِيْنَ لاَ يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَاِذَا مَرُّوْا بِالْلَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا.

'এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন বেহুদা ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়।' (সূরা ফোরকান : ৭২)

সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজ জিহবার মালিকানা অর্জন করেছে, যার ঘর তার জন্য প্রশস্ত হয়েছে এবং নিজ গুণাহর জন্য কান্নাকাটি করেছে, তার জন্য সুসংবাদ।' (তাবরানী আওসাত এবং আস সাগীর গ্রন্থে তা বর্ণনা করে বলেছেন, হাদীসটির সনদ হাসান)

সাহল বিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَنْ يَّضْمَنُ لِىْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ.

www.amarboi.org

'যে ব্যক্তি আমাকে তার দুই চোয়াল ও পায়ের মধ্যবর্তী স্থানের হেফাজতের নিশ্চয়তা দেবে আমি তার বেহেশতের নিশ্চয়তা দেবো।' (বোখারী, তিরমিযী)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছেন, 'বান্দাহ কোন সময় এমন শব্দ উচ্চারণ করে যার ফলে সে পূর্ব থেকে পশ্চিমের দূরত্বের চাইতেও অপেক্ষাকৃত বড় দোযখে নিক্ষিপ্ত হয়।' (বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ)

রাসূলুল্লাহ (সা)কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোন্ জিনিস মানুষকে সর্বাধিক বেহেশতে প্রবেশ করাবে? তিনি উত্তরে বলেন, তাকওয়া এবং নেক চরিত্র। তারপর তাঁকে প্রশ্ন করা হল, কোন জিনিস মানুষকে সর্বাধিক দোযখে নিয়ে যাবে? তিনি উত্তরে বলেন, মুখ ও লজ্জাস্থান।' (তিরমিযী) হাদীসটি হচ্ছে, নিম্নরূপ,

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ اَكْبَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ فَقَالَ : الاَجْوَفَانِ اَلْفَمُ وَالْفَرَجُ.

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْكُتْ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করেন, তিনি যেন ভাল কথা বলেন, নতুবা চুপ করে থাকেন।' (বোখারী, মুসলিম)

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। 'আল্লাহর কসম, জমীনে জিহবার চাইতে আর কিছুকে দীর্ঘ মেয়াদী জেলে রাখার প্রয়োজন নেই। (তাবরানী)

আসলাম থেকে বর্ণিত। একদিন ওমার (রা) আবু বকর (রা)-এর কক্ষে প্রবেশ করলেন। আবু বকর নিজ জিহবা টানছিলেন। ওমার (রা) বলেন, আপনি এটা বন্ধ করুন। আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। তখন আবু বকর তাঁকে বলেন, এটাই আমাকে নিকৃষ্টতম ঘাঁটে পৌঁছিয়েছে।' (মালেক, বায়হাকী)

আবু সালামাহ বিন আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। 'এক মেয়েলোক অন্যান্য আরও কয়েকজন মেয়েলোকসহ হযরত আয়েশার কাছে উপস্থিত ছিলেন। তাদের

www.amarboi.org

মধ্য থেকে একজন মেয়েলোক বলল, আল্লাহর কসম, আমি বেহেশতে প্রবেশ করবো। আমি মুসলমান হয়েছি, চুরি করিনি, যেনা করিনি। তারপর সে স্বপ্নে দেখল যে, তাকে কেউ জিজ্ঞেস করেছে, তুমি কি কসম করে বেহেশতে যাওয়ার কথা বলেছ? এটা কি করে হয়? অথচ যা তোমার প্রয়োজন নেই, সেই জিনিসের ব্যাপারে তুমি কার্পণ্য কর এবং যা তোমার সাথে জড়িত নয় এমন বেহুদা বিষয়ে কথা বল। তিনি পরের দিন সকালে হযরত আয়েশার কাছে হাজির হন এবং তাঁর কাছে স্বপ্নটি বলেন। তিনি বলেন, তুমি যে সকল মহিলাদের সামনে ঐ কথা বলেছিলে তাদেরকে ডাক। হযরত আয়েশা সবাইকে ডেকে পাঠান। তারপর মহিলাটি তাদের কাছে স্বপ্নের বিষয়টি বর্ণনা করেন।' (বায়হাকী)

আওযাঈ বলেছেন, ওমার বিন আবদুল আযীয আমাদের কাছে লিখেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে, সে স্বল্পতেই দুনিয়ায় তুষ্ট হবে। আর যে ব্যক্তি কাজের তুলনায় কথা গণনা করে তার কথার পরিমাণ কমে যায়। তবে সে প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথা বলে।'

www.amarboi.org

চতুর্থ নীতি : সামাজিক অধিকার

সামাজিক কর্তব্য ও সামাজিক আচরণ পদ্ধতি ভালভাবে বুঝা ও অধ্যয়ন করা :

সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য অত্যন্ত ব্যাপক। এটা কোন সময় ফরয-ওয়াজিব এবং কোন সময় নফল-মোস্তাহাবের পর্যায়ে থাকে। তবে তা সকল মানুষ, দ্বীন-ধর্ম, আত্নীয়-অনাত্নীয়, ব্যক্তি, সমষ্টি ও স্থান-কাল-পাত্রভেদে সবার সাথে জড়িত। তাই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আকীদার পরেই সামাজিক অধিকার ও কর্তব্যের স্থান। মক্কী সূরাগুলোর প্রায় সবকটিতেই এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মাদানী সূরাগুলোতে এ বিষয়ের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ফলে কিছু কিছু সূরার সম্পূর্ণটাই এ আলোচনা দিয়ে ভরা। যেমন সূরা নিসা, মায়েদা, তাওবা, নূর, তালাক ইত্যাদি।

সকল আলেম ও ইমাম এসকল বিষয়ে কলম ধরেছেন ও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইসলামের আর কোন বিষয় এত বেশী বিস্তৃত ও শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট নয়। কিন্তু বহুলোক, অনেক ইসলামী দল এবং সংস্থা এসকল বিষয়ের ওপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করে না। এ সকল সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে, সমাজ নিরাপদ ও স্থিতিশীল হয় এবং তাতে দয়া ও পবিত্রতার সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ সকল অধিকারের মধ্যে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পৃথিবীতে বহু মতবাদ ও মতাদর্শ রয়েছে। যেগুলো মানবতার কল্যাণের জন্য বড় বড় শ্লোগান দেয়। কিন্তু পৃথিবীর শুরু থেকে এ যাবত ঐ সকল মানবীয় মতবাদ মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারেনি। আর না পেরেছে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে। কিন্তু এর বিপরীতে, যখনই আল্লাহর নবীর-রাসূলগণ মানুষকে আল্লাহ্ প্রদত্ত কল্যাণ, রহমত, বরকত ও দয়ার দিকে আহ্বান করেছেন, তখনই তাদের অন্তর সত্যের আলো দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, শিরক ও বিদআত থেকে দূরে থেকে মন্দ কাজ ও চারিত্রিক ত্রুটি থেকে মুক্তি পেয়ে সৌভাগ্যের পরশমণি লাভ করেছে। আর এর মাধ্যমেই লাভ করেছে সত্যিকার স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা।

www.amarboi.org

আল্লাহ এক নবী থেকে আরেক নবী পর্যন্ত কিংবা স্বল্প সময় ব্যাপী ঐ কল্যাণের ফলগুধারা অব্যাহত রেখেছেন। কোন সময় তা ব্যাপক জনগোষ্ঠী এবং কোন সময় স্বল্প মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ মর্মে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : 'আমার সামনে বিভিন্ন উম্মতকে পেশ করা হয়েছে। এমনকি আমি কোন নবীর সাথে ক্ষুদ্র একটি দল, অন্য নবীর সাথে একজন কিংবা দুইজন লোককে দেখতে পেয়েছি। আর কোন কোন নবীর সাথে কাউকেই দেখতে পাইনি।' (মুসলিম)

আমরা যদি নিজেরা ইসলামী আকীদার সত্যিকার উদাহরণ পেশ না করি তাহলে, আমরা সাফল্যের সাথে অন্য মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে ডাকতে সক্ষম হবো না। তাই প্রথমেই প্রয়োজন হচ্ছে, নিজেদের পরিবর্তন। আমাদের আকীদায় আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে বড় জানা ও মানা যাবে না এবং তাঁকে ছাড়া কারো ইবাদাত এবং রুকু-সাজদাও করা যাবে না। শরীয়তের ব্যাপারে ঘোষণা করতে হবে, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শরীয়াহ তথা আইন ও নিয়ম-পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন আইন ও নিয়ম-পদ্ধতি মানি না, আমাদের আচরণে প্রকাশ করতে হবে যে, আমরা দয়ালু, সহানুভূতিশীল, সুসংবাদদাতা, সংস্কারবাদী, গোলযোগ সৃষ্টিকারী নই; একত্রকারী, বিচ্ছিন্নকারী নই; নেক ও কল্যাণের পথে সহযোগী; ধৈর্য ও দয়ার ব্যাপারে উপদেশদানকারী, নিঃস্ব ও দুস্থ মানুষের সেবায় জান-মাল দিয়ে ত্যাগ স্বীকারকারী, ক্ষুধার্তকে অন্নদানকারী, মজলুমের ওপর থেকে নির্যাতন ও বেইনসাফ দূরকারী।

এ সকল গুণাবলীর ক্ষেত্রে আমাদেরকে উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে। এর ফলেই আমাদের আদর্শ জীবন অন্যের জন্য উত্তম অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য হবে। এক্ষেত্রে সাফল্য আমাদেরকে নেতৃত্ব ও হেদায়েতের উপযোগী করে গড়ে তুলবে এবং আমরা শ্রেষ্ঠ উম্মায় পরিণত হতে সক্ষম হবো।

আমাদের এ অবস্থা দেখে বহু লোক আমাদের সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করবে, আমাদের পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণা করবে এবং দ্বীন আমাদেরকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে যে স্তরে পৌঁছিয়েছে তার গভীর সন্ধান করবে। অনৈসলামী সমাজকে ইসলামী সমাজে পরিবর্তন করার লক্ষ্যে কাম্য পরিবর্তন হবে মৌলিক বিষয়। সে জন্যই আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.

www.amarboi.org

'আল্লাহ সে জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যে জাতি নিজের ভাগ্য নিজে পরিবর্তন করে না।' (সূরা রা'দ : ১১)

এজন্যই হযরত শো'আইব (আ) নিজ জাতিকে বলেছিলেন, 'আমি তোমাদেরকে যে বিষয়ে নিষেধ করি সে বিষয়ের বিরোধিতা করার ইচ্ছা পোষণ করি না। (সূরা হূদ : ৮৮)

আর সে কারণেই এক জনপদের জনৈক মোমিন ব্যক্তি বলেছিলেন,

اِتَّبِعُوْا مَنْ لاَيَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُهْتَدُوْنَ.

'তোমরা এমন সব লোকদের অনুসরণ কর যারা তোমাদের কাছে তাদের. দ্বীনী কাজের বিনিময় চায় না এবং তারাও হেদায়েতপ্রাপ্ত।' অর্থাৎ ঐ মোমিন ব্যক্তিটি বলেছিল, দাওয়াতাদানকারীরা তাদের কাজের কোন পারিশ্রমিক চায় না এবং তারা নিজেরা যা বলে তার ওপর অটল আছে।

যারা কোরআনে নবী-রাসূলদের ঘটনা অধ্যয়ন করেন, তারা দেখতে পাবেন যে, নবুয়্যত দেয়ার আগে কিংবা পরে অর্থাৎ উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ নিজ রাসূলরদেরকে উত্তমভাবে তৈরি করেন। যাতে কাওমের লোকেরা ঐ বিষয়ে নবীর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ নবী-রাসূল ছাড়া অন্য কাউকে এত কঠোরভাবে গড়ে তোলেন না। কেননা, নবী-রাসূলগণ হচ্ছে মানুষের জন্য আদর্শ ও অনুসরণীয়।

কোরআনের পাঠক মাত্রই বুঝতে পারবেন যে, আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ১৮ জন নবী-রাসূলের কথা উল্লেখ করে নির্দেশ দিয়েছেন,

اُوْلٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ.

'আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন এবং আপনিও তাদের হেদায়েতের অনুসরণ করুন।' (সূরা আনআম : ৯০)

ইসলামের সামাজিক অধিকারের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কষ্টদায়ক। মানুষের চোখ এই দিকেই নিবদ্ধ থাকে। ব্যক্তিগত ইবাদতের প্রতি অন্যাদের দৃষ্টি এত বেশী নিবদ্ধ নয়। মানুষ সাধারণতঃ আবেদদের প্রতি বেশী গুরুত্ব দেয় না। কোন মানুষের ক্ষতি ও অপকার করা ছাড়াই যে কেউ ব্যক্তিগত ইবাদত আঞ্জাম দিতে পারে। কিন্তু যখনই ব্যক্তি সমাজের সাথে মিশে, সংস্কারকের

www.amarboi.org

ভূমিকা পালন করে, আল্লাহর কাছে দায়িত্ব মুক্তির জন্য ইসলামের নির্দেশিত কাজগুলো করে এবং অসহায় ও দুর্গত মানুষের সেবা করে তখনই সে এমন এক যুদ্ধে জড়িয়ে যায়, যার জন্য উপযুক্ত অস্ত্র দরকার এবং অন্যের কাছে নিজের সত্যতা প্রমাণের জন্য উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। আর দাঈ' বা সংস্কারকদের সর্ববৃহৎ অস্ত্র হল, 'অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন'। আর এই পরিবর্তন বলতে বুঝায়, আকীদার সংশোধন, বুঝের সংশোধন, শিক্ষার সংস্কার, ইবাদতের সংশোধন এবং আচরণের সংশোধন ইত্যাদি। পরিবর্তনটাকে একটা কারখানার সাথে তুলনা করা যায় যেখান থেকে আল্লাহর রাস্তায় চলার জন্য প্রতিনিধি তৈরি করা হয়। কাজেই পরিবর্তনের ঐ কারখানা থেকে উপযুক্ত দাঈ' তৈরি করতে হবে।

সমাজ হচ্ছে ইবাদতের ক্ষেত্র

যে ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ দ্বীনের বুঝ-জ্ঞান দান ও মুক্তির পথ প্রদর্শন করেছেন, তিনি সাধারণ মানব সমাজই হোক কিংবা মুসলিম সমাজই হোক, সেটাকে আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর নৈকট্য লাভের এক প্রশস্ত ক্ষেত্র মনে করে নিজে নেক কাজের চৌরাস্তায় দাঁড়ানোর সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। কেননা, সমাজ হচ্ছে, আল্লাহর দীনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দান, আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা এবং মানুষের মনে এর বীজ রোপণের উত্তম চারণক্ষেত্র।

সমাজ হচ্ছে– ছোট-বড়, যুবক-যুবতী এবং নারী-পুরুষকে আল্লাহর অধিকারসহ মানুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অধিকার শিক্ষা দেয়ার উত্তম স্থান। হাদীসে এসেছে, একজন ব্যক্তিকে সৎপথ প্রদর্শন বা হেদায়াত করা দুনিয়া এবং এর মধ্যে আরও যত মূল্যবান জিনিস আছে সেগুলো অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান। সমাজ হচ্ছে, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার স্থান। এর মাধ্যমে মানুষের ওপর থেকে আল্লাহর আজাব-গজব দূর হয়, মানুষ সঠিক পথে চলতে শিখে এবং অপবিত্রতা ও নোংরামী হতে পবিত্র থেকে গোমরাহ ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী শয়তানের অনুসরণ থেকে রক্ষা পায়।

সমাজ হচ্ছে, এমন জায়গা যেখানে মানুষের মনে দয়া-মায়ার বীজ লাগানো হয় এবং ভাল কথা, উপকারী কাজ ও মহান সাহায্য- সেবার মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে লোকদেরকে অবগত করানো যায়। ফলে, লোকেরা ইসলামকে ভালবাসবে এবং বিবেক, মন ও গভীর আবেগ সহকারে এ দ্বীনকে গ্রহণ করবে আর মনে করবে যে, ইসলামের কোন বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে না।

www.amarboi.org

সমাজে রয়েছে স্বামী-স্ত্রী। তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সদ্ব্যবহার করলে এবং একে অন্যের অধিকার ভাল করে জানলে তাদের জীবনে সুখের নহর প্রবাহিত হবে এবং আনন্দ ও স্থিতিশীলতার সয়লাব বয়ে যাবে। আর এর সুফল সন্তানরাও লাভ করবে।

তাতে আরও আছে মাতা-পিতা। তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা নেক গুণ; উত্তম আচরণ, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায় এবং তাদের প্রতি বিভিন্ন কর্তব্য পালন হচ্ছে আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম সামাজিক ইবাদত। এ জন্য তিনি সন্তানকে পরকালে উত্তম বিনিময় দেবেন।

সমাজে আছে, সন্তান। এদের মাধ্যমেই আমাদের জাতি তৈরি হবে এবং তাদের মধ্যেই আমরা আমাদের সম্মান ও ইজ্জত খুঁজে পাবো। আমরা যদি তাদের উত্তম প্রতিপালন ও শিক্ষা দান করি, যদি তাদেরকে আল্লাহর দ্বীন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা শিক্ষা দেই তাহলে, তারা নিজ উম্মাহর শৌর্য-বীর্য ফিরিয়ে আনার মত যোগ্যতা ও সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে, আর তাদেরকে নিয়ে মুসলিম উম্মাহ গর্ব করবে।

সমাজে রয়েছে প্রতিবেশী, নিকট ও দূর প্রতিবেশী। তাদের প্রত্যেকের রয়েছে অধিকার। সে অধিকারগুলো হচ্ছে, সদ্ব্যবহার এবং সম্মান। এর সওয়াব অন্যান্য অনেক ইবাদত থেকে উত্তম।

সমাজে রয়েছে ইয়াতীম, মিসকীন, অভাবী, দুস্থ, অসুস্থ, বিপদগ্রস্ত ও ঋণগ্রস্ত মানুষের মিছিল। অনেক লোক বিপদ-আপদে জর্জরিত, কেউ অভাবের কারণে সন্তান ও স্ত্রীর প্রয়োজন পূরণ করতে পারছে না, কেউ কোন নির্দয় জালেমের অধীন পিষ্ট হচ্ছে, কেউ ভদ্র ও শরীফ হওয়ার অপরাধে চাকরীচ্যুত এবং অনেকের প্রতি মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। কেননা, সে জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও খেয়ানতে অংশ নেয়নি, সত্য কথা বলার দায়ে কাউকে জেলে নিক্ষেপ করা হয়েছে, অনেক বিধবার উপার্জনক্ষম কেউ নেই, বহু ইয়াতীম সন্তান বাপের মৃত্যুতে হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, অভাবের কারণে অনেকে লেখা-পড়া অব্যাহত রাখতে পারছে না– ইত্যাকার হাজারো সমস্যা সমাজে বিরাজমান।

আপনি যদি সমাজের মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানী বুঝতে পারেন এবং তাদের সমস্যা ও প্রয়োজন জানতে পারেন, তারপর যদি তাদের দুঃখ ব্যথা দূর করার জন্য ভূমিকা পালন করেন, ক্ষুধার্তকে খাবার দেন এবং দুস্থ, বিপদগ্রস্ত ও

www.amarboi.org

সমস্যা গ্রস্ত ব্যক্তিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সাহায্য করেন তাহলে, আপনি উত্তম ইবাদত ও উত্তম আমল করলেন। এ বিষয়ে বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

নিঃসন্দেহে ভাল কথা বলা সদকাহ, দ্বীনি ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলা সদকাহ, সৎকাজের আদেশ সদকাহ, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা সদকাহ, সমস্যাগ্রস্তকে সাহায্য করা ইবাদত, ইয়াতীমের সম্মান করা ইবাদত, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো ইবাদত, সালামের উত্তর দেয়া ইবাদত, হাঁচির জবাব দেয়া ইবাদত, রোগীর সেবা করা ইবাদত, সুখ ও দুঃখের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করাও ইবাদত।

হাদীসে বর্ণিত আছে, এক বেশ্যা মহিলা একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর ফলে আল্লাহ তার সকল গুণাহ মাফ করে দিয়েছেন। কেউ যদি কোন পিপাসার্ত মানুষকে পানি পান করায় তাহলে তার সওয়াব কি পরিমাণ হবে?

হাদীসে আরও বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি জনগণের চলাচলের রাস্তা থেকে একটি গাছ সরিয়ে দেয়ায় এর বিনিময়ে জান্নাত লাভ করেছে। অন্য একজন দান-সদকার কারণে বেহেশতে প্রবেশ করেছেন বলেও হাদীসে বর্ণিত আছে। হাদীসে আছে, 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি কোন দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির পথ সহজ করেন, এর বিনিময়ে আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার পথ সহজ করে দেন।' 'আর যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন।' 'বান্দাহ যে পর্যন্ত অন্য কোন বান্দার সাহায্য করে, সে পর্যন্ত আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন।' 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের বিপদ দূর করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহও তার বিপদ দূর করবেন।'

'যে ব্যক্তি কোন গাছ লাগায় কিংবা কৃষি কাজ করে, তারপর তা থেকে কোন মানুষ, পাখী কিংবা পশু খায়, তাহলে, সেটা তার জন্য সদকাহ হবে।'

'যে ব্যক্তি অন্য কোন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দো'আ করে, আল্লাহ তার জন্য অনুরূপ দো'আ করার লক্ষ্যে একজন ফেরেশতা নিয়োগ করেন।'

এভাবে, আরো অগণিত উদাহরণের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে, সমাজ হচ্ছে, বৃহত্তম ইবাদতগাহ এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম আমলের স্থান।

আমাদের পূর্ববর্তী মুসলমানরা এ জিনিসগুলোকে উত্তমভাবে উপলব্ধি করে এর সদ্ব্যবহার করেছেন। তাই আমরা বিভিন্ন মুসলিম দেশে বহু ওয়াকফ দেখতে

www.amarboi.org

পাই। এর মধ্যে অক্ষম ও রোগীদের জন্য ওয়াক্ফ, হাসপাতাল ও চিকিৎসা উপকরণের জন্য ওয়াকফ, ছাত্রাবাসের জন্য ওয়াকফ, পশু-পাখী যত্নের জন্য ওয়াকফ, গোলাম ও অসহায় লোকদের জন্য ওয়াকফ ইত্যাদি।

আজকেও মুসলিম বিশ্বে মানুষের সমস্যার শেষ নেই। এ সকল সমস্যার সমাধানের জন্য বহু সমাজসেবামূলক কর্মসূচীর অবকাশ রয়েছে। আজও ভাত-কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, কুসংস্কার দূর করার লক্ষ্যে বহু সমাজসেবামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা যায়।

সামাজিক অধিকারের প্রকারভেদ

ইসলামের সামাজিক অধিকার দু'প্রকার।

১. বিশেষ সামাজিক অধিকার। যেমন, আত্মীয়, প্রতিবেশী ও সমপাঠি হওয়ার কারণে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি সামাজিক অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্য।

২. সাধারণ সামাজিক অধিকার যা সকল মুসলমানের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাতে বিভিন্ন মাজহাব, পেশা ইত্যাদির কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। অনুরূপভাবে অমুসলমানদের প্রতিও ঐ সব অধিকার প্রযোজ্য।

বিশেষ সামাজিক অধিকারের পরিধি

১. পরিবার : ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার বলতে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের ক্ষুদ্র সমষ্টিকে বুঝায়। স্বামী ও স্ত্রী হচ্ছে পরিবারের মূল চালিকা শক্তি। এরপর গোটা সমাজ হচ্ছে বহু পরিবারের সমষ্টির নাম। পরিবার পদ্ধতির উপরই সমাজ দাঁড়িয়ে আছে এবং বিকাশ লাভ করছে। আর তার সমান্তরাল ও দিগন্ত রেখার ওপরই জাতি সত্তার উৎপত্তি। তাই পরিবারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ এবং সম্মান প্রদর্শনের বিরাট প্রভাব রয়েছে। ইসলাম এমন পারিবারিক প্রথা চালু করেছে যাতে পরিবারের সদস্যদের কোন স্বার্থপরতা থাকবে না এবং থাকবে না কোন জবরদস্তি ও কঠোরতা।

ক. কোরআন মজিদ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি করতে চায় যে, তারা একে অপরের জন্য অত্যন্ত জরুরী এবং পরিপূরক। কোরআন পুরুষকে বলেছে, স্ত্রী তোমার অংশ বিশেষ। জীবিত পুরুষের জন্য তার বিভিন্ন অঙ্গ জরুরী। আর

www.amarboi.org

নারীকে বলেছে, তুমি পুরুষ থেকে পৃথক হয়েছ, অথচ সে তোমার মূল। মানুষ মূল থেকে মুক্ত হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কোরআনে বলেন,

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا.

'তিনিই তোমাদেরকে একই সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন; আর তার থেকে তৈরি করেছেন জোড়া, যাতে তার কাছে শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারে।' (সূরা আ'রাফ : ১৮৯)

এই আয়াতে 'একই নফস' বলতে আদম এবং 'স্ত্রী' বলতে হাওয়া (আ)কে বুঝানো হয়েছে।

খ. স্বামী-স্ত্রী ভালবাসা, ঐক্য ও সম্প্রীতির মধ্যে বাস করবে। তাদের মধ্যে আবেগ-অনুভূতি, শয়ন-স্বপন, জীবনের সৌন্দর্যের দৃষ্টিভঙ্গি, গোপনীয়তা, প্রত্যাশা, কাজ, উপলব্ধি এবং সন্তান উৎপাদনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ঐক্য থাকতে হবে। সন্তানের উদ্দেশ্যে তাদের নিদ্রাভঙ্গ ও জাগরণের বিষয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ.

'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।' (সূরা আল বাকারা : ১৮৭)

আল্লামা কুরতুবী এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, পোশাকের মূল হচ্ছে, কাপড়। স্বামী-স্ত্রীকে রূপক অর্থে পোশাক বলার কারণ হল, উভয়ের দেহের মিলন যেন কাপড়রূপী পোশাক যা পরস্পরকে ঢেকে রাখে। আল্লামা আর-রাবী এর অর্থ সম্পর্কে বলেছেন, স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের বিছানা, আর তোমরা তাদের লেফ।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হচ্ছে, সম্মিলন ও সম্প্রীতির সম্পর্ক। যেমন, ঈসা (আ) বলেছেন, 'স্ত্রীর কাছে স্বামী নিজ মা-বাপ থেকেও অধিকতর প্রিয়। তুমি কি দেখনা, স্ত্রী নিজ মা-বাপকে ছেড়ে স্বামীর সাথে এসে জড়িত হয়?' আবেগ ও সহজাত দিক থেকে এটি একটি শক্তিশালী সম্পর্ক।

গ. আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার স্বভাবজাত ও আবেগের সম্পর্ককে আল্লাহর মহান নিদর্শন ও নেয়ামত বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

www.amarboi.org

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَّرَحْمَةً. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

'আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।' (সূরা রূম : ২১)

স্ত্রীর কাছে স্বামীর প্রশান্তি লাভ এবং স্বামীর সাথে স্ত্রীর সম্প্রীতি একটি স্বভাবসম্মত ও রুচিপূর্ণ প্রাকৃতিক ব্যাপার। প্রাকৃতিক সম্পর্কের কারণেই উভয়ের মধ্যে ভালবাসা, দয়া ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। উভয়ের তৃপ্ত সহজাত সম্পর্ক ভালবাসা, দয়া ও রহমতের সকল দরজা উন্মুক্ত করে দেয় যেন একে অপরের মধ্যে মিশে যায় এবং পরস্পর পরস্পরের জন্য জীবনের বহু ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়। সহজাত সম্পর্কের কারণে উভয় উভয়ের প্রতি ভাল ব্যবহার ও সৎ আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। বিয়ের বৈধ পদ্ধতির মাধ্যমে যে কোন স্ত্রীলোক যে কোন পুরুষ এবং যে কোন পুরুষ যে কোন স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য লাভ করে চরম প্রশান্তি লাভ করতে পারে।

আবেগ ক্ষণস্থায়ী হয়। যেমন কোন বিভ্রান্ত যুবক কোন যুবতীর প্রতি বিশেষ কোন আবেগ পোষণ করে, তার সাথে কিছুদিন খেল-তামাশা ও অবৈধ সম্পর্ক রেখে অন্য যুবতীর প্রতি দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। যৌন তাড়নায় সে পশুর মত দিকবিদিক ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট ভালবাসা, দয়া ও সম্প্রীতি স্থায়ী জিনিস। তা হঠাৎ করে অন্যদিকে অপসারিত হয় না। বরং এর ফলে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের স্থিতিশীলতা আসে। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, দুঃখ-বেদনা, শিক্ষা-দীক্ষা, চরিত্র, মেজাজ, কামনা-বাসনাসহ মনের গোপন বিষয়সমূহে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়। এই সামঞ্জস্যের উত্তম সূচনার জন্য বিয়ের পূর্বে একে অপরকে দেখে নেয়া উত্তম এবং পরস্পর পরস্পর সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানা উচিত। বিয়ের পরে তাদের মধ্যে ঐ সম্পর্কের উষ্ণতা অনুভূত হওয়া উচিত যাতে করে দাম্পত্য জীবন সুখী ও আরামদায়ক হয়। সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমে সুখের সংসারের ভিত্তি রচনা করা হয়।

www.amarboi.org

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ কেউ দীর্ঘস্থায়ী দয়া ও ভালবাসার বিভিন্ন উপকরণকে উপেক্ষা করে। ফলে, তাতে আবেগ আহত হয় এবং ভালবাসায় ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। তারপর তা তালাক পর্যন্তও গড়াতে পারে।

ঘ. কোরআনের মধ্যে নারী অধিকার সম্পর্কে সূরা নিসা হচ্ছে একটি দীর্ঘ সূরা। তাই আবহমান কাল ধরে ইসলামে নারী অধিকার স্বীকৃত। বিশেষ কোন কারণে তা কখনও নষ্ট হবে না। যদি তালাকের মত মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাহলে যেন স্ত্রীকে প্রদত্ত দেন মোহর থেকে কোন কিছু প্রত্যাহার করা না হয়। আমরা স্বামী-স্ত্রীর বিস্তারিত অধিকার সম্পর্কে আরও আলোচনা করবো।

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

প্রায় সকল লেখক, তাদের বই-পুস্তকে স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে আগে আলোচনা করেন, পরে স্বামীর অধিকার সম্পর্কে কলম ধরেন। স্ত্রীর অধিকারের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যেই তারা এরকম করেন।

পবিত্র কোরআন স্ত্রীদের ফরজ ও নফল অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। অনুরূপভাবে, রাসূলুল্লাহও (সা) স্ত্রীদের কল্যাণ কামনা এবং তাদেরকে সদুপদেশ দেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। ওলামায়ে কেরাম স্ত্রীদের অধিকারগুলো কি তা নির্দিষ্ট করেছেন। সেগুলো হচ্ছে :

১. স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করা : স্বামীদের-স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা জরুরী। তাদের সাথে নরম ও ভদ্র ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের জন্য কষ্ট স্বীকার করতে হবে। তবে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ওয়াজিব এবং তাদের পক্ষ থেকে কষ্ট সহ্য করা মোস্তাহাব। আল্লাহ বলেছেন,

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

‘তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে ভাল ও সদ্ব্যবহার কর।’ (সূরা নিসা : ১৯)

আল্লামা কুরতবী তাঁর তাফসীরে বলেছেন, স্বামী এবং অভিভাবক সকলের ওপর স্ত্রীলোকের সাথে ভাল ব্যবহার করা জরুরী।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরও বলেছেন,

فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ.

‘তারপর হয় ভালভাবে নিয়মানুযায়ী রাখবে, আর না হয় সহৃদয়তার সাথে ছেড়ে দেবে।’ (সূরা বাকারা : ২২৯)

www.amarboi.org

এখানে স্ত্রীর দেনমোহর ও ভরণ-পোষণসহ সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া বিনা অপরাধে স্ত্রীর মুখে মারা যাবে না।

স্ত্রীর সাথে নরম হতে হবে, শক্ত কিংবা কঠোর হওয়া চলবে না এবং দুই স্ত্রী থকালে অন্যের স্ত্রীর প্রতি অধিক ঝোঁক প্রবণতা প্রকাশ করা যাবে না। স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করলে তা আত্মার জন্য শান্তি এবং মনোরম জীবনের নিশ্চয়তা আনয়ন করে।

কেউ কেউ বলেছেন, স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে, স্ত্রী যেমন স্বামীর উদ্দেশ্যে সাজ-গোজ করবে, স্বামীকেও স্ত্রীর উদ্দেশ্যে একইভাবে সাজ-সজ্জা করতে হবে।

ইয়াহইয়া বিন আবদুর রহমান হানজালী বলেছেন, আমি মোহাম্মদ বিন হানাফিয়ার কাছে গেলাম। তিনি একটি লাল চাদর পরে বেরিয়ে আসলেন এবং তার দাঁড়ি থেকে ফোঁটা ফোঁটা সুগন্ধযুক্ত মেশক-আম্বর পড়তে লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তিনি উত্তরে বলেন, এই চাদরটি আমার স্ত্রী আমাকে পরিয়ে দিয়েছে এবং আমার মুখে মেশক-আম্বর লাগিয়ে দিয়েছে। আমরা তাদের কাছে যা চাই তারাও আমাদের কাছে তাই চায়।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) বলেন : 'আমি আমার স্ত্রীর সামনে সাজ-সজ্জা করাকে তেমনি পছন্দ করি যেমনি আমরা তাদের সাজ-সজ্জাকে পছন্দ করি।' (তাফসীরে কুরতুবী)

স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহারের বিষয়ে আল্লাহ আরও বলেছেন :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.

'আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে; তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।' (সূরা আল বাকারা : ২২৮)

ইবনে আব্বাস এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন : স্বামীদের যেমন স্ত্রীদের সাথে ভাল ও সদ্ব্যবহার জরুরী, তেমনি স্ত্রীদেরও স্বামীদের আনুগত্য করা ফরজ। এই কারণে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, স্বামীর উচিত স্ত্রীর কাছে সাজ-সজ্জা করা এবং স্ত্রীরও উচিত, স্বামীর কাছে সাজ-সজ্জা করা। প্রথমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে, ঘাম দূর করতে হবে, শরীর, মুখ ও বগলের নীচের দুর্গন্ধ

www.amarboi.org

দূর করতে হবে, খোশবু লাগাতে হবে, নখ কাটতে হবে, উত্তম পোশাক পরতে হবে, চুলে তেল দিতে হবে, চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়াতে হবে এবং দাঁড়ি ও মাথার কেশ বিন্যাস করতে হবে। যাতে করে ঘৃণা সৃষ্টির মত কোন কিছু না থাকে। অর্থাৎ স্ত্রীর কাছে এমন পছন্দনীয় সাজে থাকতে হবে যাতে করে স্ত্রী অন্য পুরুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ না করে। সাজ-সজ্জা যেন পুরুষের পোশাক বাদ দিয়ে নারীর বেশ ধরার জন্য না হয়।

স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহারের জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) অনেক নির্দেশ আছে। বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি বলেন : 'তোমরা স্ত্রীদের প্রতি ভাল উপদেশ দাও। তারা তোমাদের সহকারিণী। তোমরা ঐটা ছাড়া তাদের কোন কিছুর মালিক নও।' (তিরমিযী)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসলূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ.

'যার চরিত্র উত্তম সে পূর্ণ মোমিন এবং তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।' (তিরিমিযী)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসলূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : 'নারীদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা তোমার জন্য কখনও সোজা হতে পারে না। তুমি যদি তাকে ভোগ কর তাহলে, সেই বক্রতাসহ ভোগ করতে হবে। যদি তুমি তাকে সোজা করতে যাও, তাহলে তাকে ভেঙ্গে ফেলবে। আর ভেঙ্গে ফেলার মানে হচ্ছে তালাক।'

অর্থাৎ আল্লাহ স্ত্রীলোককে বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করেছেন। স্ত্রী লোকের প্রকৃতি হচ্ছে, পুরুষের তুলনায় বেশী ভুল করা। স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে সুখী ও শান্তিপূর্ণ জীবন গড়ে তুলতে চায়, তাহলে তাকে বুঝতে হবে তার স্ত্রীর ত্রুটি স্বাভাবিক এবং এজন্য তাকে অধিক সমালোচনা দোষারোপ ও পাকড়াও করা উচিত নয়। এর ফলে দাম্পত্য জীবন দোযখের আগুনে পরিণত হবে। বরং স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহজভাবে চলবে এবং ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে তাকাবে। তাহলে, শান্তি স্থিতিশীলতা আসবে। আর যদি প্রতিটি ছোট বড় বিষয়ে সমালোচনা শুরু করে এবং মনে করে যে স্ত্রীকে নির্দোষ ও ত্রুটিমুক্ত করা যাবে, তাহলে কখনও ঐ রকম ত্রুটিমুক্ত পাবে না। বরং কঠোরতার ফল হবে, তালাকের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনের ভাঙ্গন। স্বামী এটা বুঝতে পারলে বহু সংকট থেকে বাঁচতে পারবে।

www.amarboi.org

স্ত্রী সাধারণতঃ যে ধরনের ভুল করে, যা মানুষের কাছে বহুল পরিচিত সামাজিক কোন ভুল নয়, কিংবা তা সমাজের নিয়ম-নীতির পরিপন্থী কোন আচরণ নয়। বরং নারীরা উল্টো পুরুষের তুলনায় সামাজিক নিয়ম-নীতি পালনের ক্ষেত্রে অধিকতর আগ্রহী। শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে সমানভাবে পাকড়াও করতে হবে এবং সমানভাবে সমালোচনা করতে হবে। পবিত্র কোরআন বলেছে, স্ত্রী যদি প্রকাশ্য কোন অশ্লীল কাজ করে তাহলে, স্বামী তাকে অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি কিংবা তালাক দিতে পারে। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, অশ্লীল কাজ বলতে যেনা কিংবা তার সহায়ক বিষয়কে বুঝায়। কিংবা স্ত্রী যদি কুভাষী কিংবা কর্কশ হয়, অথবা স্বামীর সাথে ঝগড়া করে বা স্বামীর চাইতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার চেষ্টা করে, তাহলেও তাকে শাস্তি দিতে পারে। হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, স্ত্রীরা পুরুষদের চাইতে ভিন্নধর্মী লিঙ্গের মানুষ। তাই তাদের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা এবং চরিত্র-বৈশিষ্ট্য পুরুষদের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনার জগত থেকে পৃথক হতে বাধ্য। পুরুষের প্রতি স্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি স্ত্রীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির মত নয়। বরং তা ভিন্নধর্মী। কেউ যদি আপন স্ত্রীকে হুবহু নিজের মত করে নেয়ার ইচ্ছা করে এবং দাম্পত্য জীবন চালিয়ে নেয়ার মত একে শর্ত হিসেবে গ্রহণ করে, তাহলে সে ভুল করবে।

জ্ঞানীর কাজ হচ্ছে স্ত্রীর বক্রতাকে এ দৃষ্টিতে নেয়া যে, এটাই তার প্রতি আকর্ষণ ও সৌন্দর্যের কারণ এবং এ কারণেই একজন আরেকজনের সাথে যুক্ত হয় এবং একে অপরের প্রতি আগ্রহী হয়।

ত্রুটিহীন স্ত্রীলোক ত্রুটিহীন পুরুষ কামনা করে কিংবা পুরুষের ওপর নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে পুরুষকে ঘৃণা করে, যা দাম্পত্য সম্পর্ককে সম্পূর্ণ শেষ করে দেয়। স্ত্রী এর মাধ্যমে নিজের নারীত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ কিংবা স্বামীর ওপর নিজেকে কর্তা মনে করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) পুরুষবেশী স্ত্রীলোক এবং স্ত্রীবেশী পুরুষের ওপর অভিশাপ দিয়েছেন। মূলকথা, প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলবে। আর এটাই তাদের সৌন্দর্য ও পূর্ণতার কারণ হবে।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهِ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِىْ.

www.amarboi.org

'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আমি আমার স্ত্রীদের কাছে তোমাদের অপেক্ষা উত্তম।' (ইবনে হিব্বান)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেছেন :

إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ.

'সেই পূর্ণাঙ্গ মোমিন যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং নিজ পরিবারের সাথে বিনয়ী।' (তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ স্ত্রীদের সাথে সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার করতেন, সর্বাধিক নরম আচরণ করতেন এবং অত্যধিক ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে তাকাতেন। কোন কোন স্ত্রীর কাছ থেকে অন্যান্য মেয়েলোকের মত ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তিনি তাদেরকে মাফ করে দিতেন, রাগ করতেন না।

বর্ণিত আছে, একবার হযরত ওমার বিন খাত্তাবের স্ত্রী ওমারের কথার সমালোচনা করায় তিনি স্ত্রীকে বলেন, তুমি হাসিমুখে আমার কথার সমালোচনা করছ? স্ত্রী উত্তরে বলেন : রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীরাও তাঁর কথার সমালোচনা করতেন। অথচ তিনি আপনার চাইতে উত্তম ব্যক্তি ছিলেন। এক বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহর (সা) এক স্ত্রী সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন।

স্ত্রীর সাথে হাসিমুখ থাকাও তার সাথে সদ্ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়াও সুন্দর শব্দ ব্যবহার করা এবং সন্তান ও স্বামীর খেদমতের কারণে স্ত্রীর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। স্ত্রী রাগ করলে তাকে খুশী করা, কষ্ট পেলে তা লাঘব করা, অসুস্থ হলে তার প্রতি সেবার দায়িত্ব পালন করা এবং রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) মত স্ত্রীদের ঘরের কাজে সহযোগিতা করা, নিরিবিলি হলে তার সাথে হাঁসি-ঠাট্টা এবং আদর-যত্ন করাও সদ্ব্যবহারের অংশ। জেনে রাখা দরকার যে, ষাট বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ স্ত্রীদের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করতেন। তিনি জানতেন যে, তাদেরকে খুশী করা সদ্ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। আমরা যদি বাইরের লোকদের সাথে সদ্ব্যবহারের জন্য আদিষ্ট হই তাহলে সর্বাধিক নিকটবর্তী পিতা, সন্তান ও স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করা আরও বেশী জরুরী।

কেউ যদি নিজ স্ত্রীকে খুশী করার জন্য তার সাথে ঠাট্টা ও হাসি-তামাশা করে এবং যদি তা আল্লাহর ওয়াস্তে করা হয়, তাহলে, তার আমলনামায় একটি নেকী লেখা হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা)কে বলেছেন :

www.amarboi.org

وَاِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ اُجِرْتَ عَلَيْـهَا حَتَّـى اللُّقْمَةِ تَضَعُهَا فِيْ فَمِ اِمْرَأَتِكَ.

'তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যদি কোন খরচ কর তার বিনিময়ে সওয়াব পাবে। এমনকি যদি তোমার স্ত্রীর মুখে খাবারের লোকমা তুলে দাও, তারও সওয়াব পাবে।' (বোখারী, মুসলিম)

স্ত্রীর মুখে স্বামীর লোকমা তুলে দেয়ার বিষয়টি স্ত্রীর অসুখ কিংবা স্বামীর আদর ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় শোভা পায় না। এখানে স্ত্রীর মুখে আদরের অর্থেই লোকমা তুলে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। একজন সমঝদার মুসলমান নিজ স্ত্রীর সাথে ভালবাসা ও আদর-যত্নের মাধ্যমে ইবাদাতের সওয়াব লাভ করতে পারে।

স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে কৃত্রিমতা ও কঠোরতা অবলম্বন করে এবং তার থেকে দূরে দূরে থাকে, তাহলে সে দাম্পত্য সম্পর্কের অর্থই বুঝেনি। সে দাম্পত্য সম্পর্ক বলতে স্ত্রী সহবাস ও সন্তানকেই বুঝেছে, অন্য কিছু নয়। তবে স্বামীকে অবশ্যই নিজের পুরুষত্ব, ব্যক্তিত্ব ও লজ্জার হেফাজত করতে হবে। সে কারণেই ওমার বিন খাত্তাব (রা) বলেছেন, 'স্বামীর উচিত, স্ত্রী ও পরিবারে সাথে শিশুর মত থাকা। তারা যদি তার কাছে কাম্য জিনিস পায় তাহলে, তাকে পুরুষ হিসেবে বিবেচনা করবে।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কেরামকে এ ধরনের দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলার লক্ষ্যে উৎসাহিত করছেন। তিনি হযরত জাবের (রা)কে বলেন,

هَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ؟

'কেন তুমি একজন কুমারীকে বিয়ে করলে না, যেন তুমি তার সাথে এবং সে তোমার সাথে খেল-তামাশা ও হাসি-মজা করত?' (বোখারী, মুসলিম)

কুমারী মেয়ে কম বয়স্ক হওয়ার কারণে খেলা-ধুলার সাথে সম্পৃক্ত থাকে। ফলে, সে স্বামীর প্রতি অধিকতর ঝোঁক প্রবণ হবে এটাই স্বাভাবিক। রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক মসজিদে নববীতে ইথিওপিয়ার নিগ্রো মুসলমানদেরকে যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট খেলা-ধুলার অনুমতি দেয়ার পেছনে হযরত আয়েশার চিত্তবিনোদন উদ্দেশ্য ছিল। তিনি নবীর (সা) পেছনে দাঁড়িয়ে সেই খেলা-ধুলা উপভোগ করেন। (বেখারী, মুসলিম)

www.amarboi.org

২. দেনমোহর : আল্লাহ্ স্ত্রীর জন্য স্বামীর ওপর বিয়ের দেনমোহর ফরজ করেছেন। দেনমোহর হচ্ছে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সম্মান প্রদর্শন ও তার সাথে জীবন যাপনের আগ্রহের বাস্তব প্রকাশ। স্ত্রী এই অর্থ নিজের হেফাজতে কিংবা সুদবিহীন ব্যাংকে রাখতে পারে অথবা স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়সহ যে কোন ব্যবসা-বাণিজ্যে খাটাতে পারে এবং মুনাফা অর্জন করতে পারে।

স্বামী, বাপ, ভাই কিংবা সন্তান নারীর মোহরের অর্থের মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না এবং তা ভোগ-ব্যবহার করতে পারবে না। হাঁ, স্ত্রী খুশী হয়ে দান করলে বা ভোগ-ব্যবহারের অনুমতি দিলে তখনই কেবল তা ভোগ করা জায়েয হবে। তবে, দেনমোহরের অর্থ স্বামীকে বা অন্য কাউকে দান করার জন্য চাপ সৃষ্টি কিংবা কোন ছল-ছাতুরীর আশ্রয় নেয়া যাবে না এবং ঐ অর্থ ত্যাগ করার জন্য কোন কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করা যাবে না। মূলকথা, স্ত্রীর এই অর্থ খাওয়ার জন্য কোন তদবীর করা যাবে না। জবরদস্তি, ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে অথবা স্ত্রীর লজ্জা কিংবা দুর্বলতার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তার অনুমতি বের করে দেনমোহরের টাকা খাওয়া হারাম হবে।

স্ত্রীকে দেনমোহর দানের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ্ রাববুল আলামীন বলেছেন:

وَاٰتُوْا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا.

'আর তোমরা স্ত্রীদেরকে খুশী মনে তাদের দেনমোহর দিয়ে দাও। তারা যদি সন্তুষ্টচিত্তে তা থেকে কিছু অংশ দেয় তবে তোমরা তা আনন্দের সাথে ভোগ কর'। (সূরা নিসা : ৪)

আল্লাহ্ আরও বলেন :

وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ـ اَتَأْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا.

'যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন সম্পদ দান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ করো না। তোমরা কি অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গুনাহর মাধ্যমে তাকে গ্রহণ করবে?' (সূরা নিসা : ২০)

www.amarboi.org

প্রথম আয়াতে স্ত্রীর দেনমোহরকে ফরজ করা হয়েছে এবং তার সন্তুষ্টি ছাড়া সেখান থেকে কোন কিছু গ্রহণ করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২য় আয়াতে স্বামীকে স্ত্রীর দেনমোহর থেকে অন্যায়ভাবে কিছু গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ আয়াতে স্ত্রীকে বেশী দেনমোহর দেয়া জায়েয বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু বিয়েতে অতিরিক্ত দেনমোহর ধার্য করা ক্ষতিকর হতে পারে। কেননা, সামর্থ্যের বাইরে হলে কিংবা তা আদায় করতে কষ্ট হলে, দেনমোহর নিজ গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে।

অতিরিক্ত দেনমোহর ধার্য করার অন্য অর্থ দাঁড়ায়, স্ত্রীকে মূল্যবান পণ্য হিসেবে চড়াদামে চড়ানো। এর ফলে, বিয়ের বাজারে মন্দা সৃষ্টি হয় এবং সামর্থ্যের অভাবে বহু আগ্রহী লোক বিয়ে করতে পারে না। তখনই কুমারিত্ব সমস্যাসহ বিয়ের বাজারে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়। উপযুক্ত বয়সে বিয়ে করতে অপারগ হলে ব্যভিচার, সমকামিতা ও গোপন অভ্যাস সৃষ্টি হতে বাধ্য। অথচ এগুলো ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই ক্ষতিকর।

মাইমুন নিজ পিতা থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন : 'যে ব্যক্তি কম কিংবা বেশী দেনমোহরের ভিত্তিতে কোন স্ত্রীকে এ নিয়তে বিয়ে করে যে, তাকে তা পরিশোধ না করে ধোঁকা দেবে, সে ব্যক্তি দেনমোহর আদায় না করে মারা গেলে আল্লাহর সাথে যেনাকারী হিসেবে সাক্ষাত করবে।' (তাবরানী এ হাদীসটি আসসাগীর এবং আল আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইবনুল মোনজেরী বলেছেন, হাদীসের বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য)

৩. **স্ত্রীর ভরণ-পোষণ :** স্বামীর ওপর স্ত্রীর খোরপোষ ও ভরণ-পোষণ ফরজ। স্ত্রীর ভাত-কাপড়, বাসস্থান ও চিকিৎসাসহ সকল অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করার দায়িত্ব স্বামীর। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন :

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ.

'পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল। এজন্য যে আল্লাহ একের ওপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এজন্য যে তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।' (সূরা নিসা : ৩৪)

আল্লাহ আরও বলেছেন : لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ.

'সামর্থ্যবান ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী (স্ত্রীর জন্য) খরচ করবে।' (সূরা তালাক : ৭)

www.amarboi.org

আল্লাহ আরও আদেশ দিয়েছেন :

أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ.

'তোমরা তাদেরকে সামর্থ্য অনুযায়ী এমন বাসস্থানে রাখ, যেখানে তোমরা নিজেরা থাক।' (সূরা তালাক : ৬)

এ আয়াত দু'টোতে স্ত্রীদের খাবার ও বাসস্থানকে সামর্থ্য অনুযায়ী ভাল ও যুক্তিসঙ্গত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُّضَيِّعَ مَنْ يَعُوْلُ.

'কোন ব্যক্তির গুণাহগার হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যাদেরকে পালন করে, তাদেরকে খোরপোষ দেয় না।' স্ত্রী খোরপোষ পাওয়ার অন্যতম হকদার। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ ظَهْرِ غَنِىً وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَاَبْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ قِيْلَ مَنْ اَعُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ اِمْرَاتُكَ مِمَّنْ تَعُوْلُ تَقُوْلُ اَطْعِمْنِىْ وَاِلاَّ فَارِقْنِىْ وَجَارِيَتُكَ تَقُوْلُ اَطْعِمْنِىْ وَاسْتَعْمِلْنِىْ وَوَلَدُكَ يَقُوْلُ اِلٰى مَنْ تَتْرُكُنِىْ؟

'ধনী অবস্থায় দান করা উত্তম সদকা। নীচু হাত থেকে উঁচু হাত (দাতার হাত) উত্তম। যাদেরকে পালন করার দায়িত্ব তোমার ওপর রয়েছে আগে তাদের জন্য খরচ কর। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কাকে পালন করবো ? তিনি উত্তরে বলেন : তোমার স্ত্রী তোমার প্রতিপালনের হকদার। সে বলবে, আমাকে হয় খাবার দাও, না হয় বিদায় কর। তোমার দাসী বলবে, আমাকে খাবার দাও ও কাজে লাগাও। তোমার সন্তান বলবে, আমাকে কার কাছে ছেড়ে যাচ্ছেন ?' (বোখারী, মুসলিম, আহমদ)

স্বামী স্ত্রীর জন্য মধ্যমপন্থায় খরচ করবেন। অর্থাৎ সামর্থ অনুযায়ী খরচ করতে হবে। স্বামী তার স্ত্রী ও সন্তানের জন্য যা খরচ করবেন, আল্লাহর কাছে সেটার সওয়াব পাবেন। সেটা হচ্ছে উত্তম সদকা।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

www.amarboi.org

دِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِـىْ سَبِيْلِ اللهِ وَدِيْنَـارٌ اَنْفَقْتَـهُ فِـىْ رَقَبَـةٍ وَدِيْنَـارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلٰى مِسْكِيْنٍ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ اَعْظَمُهَا اَجْرًا الَّذِىْ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ.

'আল্লাহর পথে জিহাদ, দাস মুক্তি, ফকীর-মিসকিন এবং তোমার পরিবারের জন্য তুমি যে দীনার (অর্থ) খরচ কর, তার মধ্যে তোমার পরিবারের জন্য ব্যয়কৃত অর্থই সর্বাধিক সওয়াব পাওয়ার যোগ্য।' (মুসলিম)

ব্যক্তির উচিত, নিজ পরিবার, সন্তান এবং আরও যাদেরকে তিনি পালন করেন তাদের জন্য হালাল উপার্জন করা। তা না হয়, বরকত উঠে যাবে। তিনি যাদেরকে হারাম খাওয়াচ্ছেন তাদের গুণাহ তাকেই বহন করতে হবে।

ভদ্র ব্যক্তি সর্বদা আপন পরিবার পরিজনের প্রতি দাতাসুলভ ব্যয় করে। ফলে, তাদেরকে কখনও প্রতিবেশী এবং আত্মীয়দের প্রতি তাকিয়ে থাকতে হয় না। অপচয় করা ছাড়াই তিনি তাদের দাবী ঠিকমত পূরণ করেন।

৪. বিয়ের ব্যাপারে স্ত্রীকে নিজ ইচ্ছামত স্বামী গ্রহণের স্বাধীনতা দিতে হবে :

নারীর জীবনে বিয়ের চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম বিষয় দ্বিতীয়টা নেই। ইসলাম নারীকে তার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে। বর্ণিত আছে, 'খানসা বিনতে খাদ্দাম আনসারী রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে অভিযোগ করলেন, তার বাবা তাকে তার মতের বিপরীত একজন পুরুষের সাথে বিয়ে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ বিয়ে বাতিল করে দেন।' (বোখারী, মুসলিম)

৫. স্বামী স্ত্রীকে দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শিক্ষা দেবে :

স্বামীকে স্ত্রীর বিষয়ে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কেননা, তিনি স্ত্রীর তদারককারী। প্রত্যেক তদারককারীকে তিনি যাদের তদারক করেন তাদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে বলে হাদীসে এসেছে। সে পবিত্রতা অর্জন, অজু-গোসল, হায়েজ-নেফাস, এস্তেহাজা, নামায, রোযা এবং কোরআন পাঠ ও আল্লাহর জিকির সম্পর্কে যা যা জানে না, তা শিক্ষা দিতে হবে। এছাড়া তাকে নিজ পরিবার, প্রতিবেশী এবং আত্মীয়দের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কেও শিক্ষা দিতে হবে। কিভাবে শরীয়তসম্মত পোষাক পরতে হয়, অন্য পুরুষের সাথে একাকী না থাকা এবং প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে কিভাবে পুরুষদের সাথে আলাপ করবে ইত্যাদি বিষয়ে তাকে জ্ঞান দান করতে হবে। স্বামী নিজে না জানলে

www.amarboi.org

আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে। নিজে না পারলে স্ত্রীকে জানার জন্য বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিতে হবে। এমনকি ফরজ-ওয়াজিব শিক্ষার জন্য স্বামীর অনুমতি ছাড়াও স্ত্রী বাইরে চলে যেতে পারে। কিন্তু ফরজ-ওয়াজিব শিক্ষা লাভের পর স্ত্রী বিনা অনুমতিতে বাইরে যেতে পারবে না।

৬. স্ত্রীকে সৎকাজের আদেশ এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা :

এটাও আল্লাহর কাছে স্বামীর জবাবদিহির অংশ বিশেষ। কেননা, আল্লাহ বলেছেন :

وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، لاَنَسْـئَلُكَ رِزْقًا نَحْـنُ نَرْزُقُـكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ.

'আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রিয্ক চাই না। আমিই আপনাকে রিয্ক দেই এবং মোত্তাকীদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।' (সূরা তোয়াহা : ১৩২)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ.

'হে মোমেনরা! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে সেই দোযখ থেকে বাঁচাও, যার জ্বালানী হচ্ছে মানুষ ও পাথর।' (সূরা তাহরীম : ৬)

আল্লাহ আমাদেরকে নিজেদের এবং পরিবারের লোকদের জান দোযখ থেকে বাঁচানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা যদি আল্লাহর আদেশ মানি, নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকি এবং নিজ পরিবারকে সকল নরম পন্থা প্রয়োগ করেও কোন ফল না পেয়ে কঠোর পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমে উপযুক্ত বিষয়ের অনুসরণ করাই তাহলে, দোযখ থেকে বাঁচতে ও বাঁচাতে পারি। স্ত্রী কোন পাপ করলে এবং স্বামী তাতে বাধা দেয়ার ক্ষমতা সত্ত্বেও রাজী থাকলে, স্বামীর গুণাহ হবে। সেজন্য তার শাস্তি হবে। যদি সে গুনাহ কুফরী হয় তাহলে, স্ত্রী আর স্বামীর জিম্মায় থাকে না। তিক্ত হলেও সত্য যে, এটাই এ যুগে বেশী। বহু স্ত্রী দ্বীন, কোরআন, নবী ও আল্লাহকে গালি দিয়ে কুফরী করে কিংবা নামায, রোযা, যাকাত এবং হজ্জের ফরযকে অস্বীকার অথবা দ্বীনের কোন জিনিসকে ঘৃণা ও তুচ্ছ করা এবং নামাযী রোযাদারের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার মাধ্যমে কুফরী করে। স্বামীও যদি অনুরূপ করে তাহলে, সেও কাফের হয়ে যাবে এবং তখন তার স্ত্রী আর তার জিম্মায় থাকবে না।

www.amarboi.org

মূলকথা, স্বামী স্ত্রীকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। যেমন, অ-মোহরেম ব্যক্তিদের সামনে হাত ও মুখ ছাড়া শরীরের অন্যান্য অঙ্গ খুলতে নিষেধ করবে, তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা ও ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলতে বারণ করবে এবং নামায-রোযা ত্যাগ না করা এবং অন্যান্য গুনাহ থেকে দূরে রাখবে।

যদি স্ত্রী নাফরমানী করে অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে আনুগত্য না করে এবং ওয়াজ নসীহত ও বুঝানোর মাধ্যমে কোন উপকার না হয়, তাহলে তার কাছ থেকে শোয়ার বিছানা আলাদা করে ফেলতে হবে। এতেও যদি কোন লাভ না হয়, তাহলে, এমনভাবে মারবে যেন রক্ত না বের হয় এবং হাড়-না ভাঙ্গে। ১০টা হাল্কা বেত্রাঘাতের বেশী যেন মার দেয়া না হয়। যদি এতসব কিছুতেও কোন ফায়দা না হয়, তাহলে যদি এ স্ত্রী থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয় তাহলে, তাকে তালাক দিতে হবে। এমতাবস্থায় স্বামী স্ত্রীর ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষণের খরচ কমানোর জন্য চাপ দিতে পারবে কিংবা স্ত্রীর কারণে যে ক্ষতি হয়েছে তারও কিছুটা ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে। হাঁ, যদি সন্তানের কারণে তালাক দেয়া সম্ভব না হয় তাহলে, সে আল্লাহর কাছে ওজরগ্রস্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। এ বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

৭. স্ত্রীকে কষ্ট না দেয়া এবং তার অনুভূতির প্রতি সদয় নজর দেয়া : দাম্পত্য জীবন যৌন আচরণ ও আবেগ-অনুভূতির শক্তিশালী উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। সদ্ব্যবহার, উত্তম আচরণ ও সমঝোতার মনোভাব দাম্পত্য জীবনে ভালবাসা দয়া-মায়া ও প্রাণ চাঞ্চল্যকে বাড়িয়ে দেয় এবং বার বার একে পুনর্জীবিত করে। অপরদিকে, খারাপ আচরণ, গালি-গালাজ অভিশাপ এবং বিদ্বেষ-বিদ্রূপের তোপধ্বনি সেই সম্পর্কে উত্তেজনা সৃষ্টি করে ও ফাটল ধরায়। এর ফলে, ভালবাসা বিদায় নেয় এবং ঘৃণা-বিদ্বেষ এর স্থান দখল করে। ফলে, পরিবারের অবস্থা অবনতির দিকে দ্রুত ধাবিত হয় এবং সন্তানরা এর খারাপ প্রভাবে প্রভাবিত হয়। কোন কোন সময় তারা বাপের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে উঠে। কেননা, মা সর্বদা তাদের চোখের উপর রয়েছে এবং মা ছাড়া তারা অন্য কিছু বুঝে না। এটা তাদের সামাজিক আচরণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই স্বামীর উচিত, স্ত্রীর প্রতি খারাপ আচরণের বেলায় সতর্ক হওয়া। মানুষ কেন, যে কোন পশু-পাখীকেও কষ্ট দেয়া হারাম। যে ব্যক্তি কোন মানুষ কিংবা প্রাণীকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন। তাহলে, যে স্বামী স্ত্রীকে কষ্ট দেয় তার বিষয়টি আরও কত মারাত্মক হতে বাধ্য। কেননা, আল্লাহ তাকে নিজ কালেমা ও বাণী দ্বারা স্ত্রীর ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

www.amarboi.org

যে ব্যক্তি সন্তানের মা ও নিজ জীবন সঙ্গীনীকে কষ্ট দেয় সে কিভাবে নিজে শান্তিতে থাকতে পারে? তিনি কি এমন লোককে কষ্ট দিচ্ছেন না যিনি তার মাল-সম্পদের হেফাজত করেন, জীবন যাপনের ব্যবস্থা করেন, সন্তানের প্রতিপালন করেন এবং তার চাহিদা পূরণ করেন? কিভাবে তাকে কষ্ট দেয়া হয়, যাকে স্বামী স্ত্রী হিসেবে, বন্ধু হিসেবে এবং আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন? যিনি স্বামীর জন্য ও সন্তানের জন্য নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিচ্ছেন তাকে কি করে কষ্ট দেয়া যায়? এমন স্ত্রীকে কি করে কষ্ট দেয়া যায় যে স্বামীর সন্তুষ্টির কারণে প্রয়োজনে নিজ পরিবারের লোকদেরকে অসন্তুষ্ট করে এবং তাদের সাথে সম্পর্কও ছেদ করে? একজন মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে, ভগ্ন ও আহত মনে ব্যাণ্ডেজ দ্বারা জোড়া লাগানো এবং বিপদগ্রস্তের বিপদ দূর করা। যে স্বামী স্ত্রীর মন ভাঙ্গে ও তার অন্তরকে আহত করে এবং তার ওপর বিপদ ঢেলে দেয় সে স্বামীর অবস্থাটা কি দাঁড়ায়? সে ভুলে গেছে, স্ত্রী মানবতার দৃষ্টিতে তার বোন, ইসলামের চোখে তার বোন, সে তার জীবনের প্রতিবেশী, স্ত্রী স্বামীর বহু কল্যাণ সাধন করেছে, অথচ আজ সে তাকে স্ত্রী হিসেবে ভুলে গেছে।

আল্লাহ মুসলমানদের ওপর অন্য কোন মুসলিম ভাইকে নজর, কথা ও চালচলনের মাধ্যমে কষ্ট দেয়া হারাম করেছেন। তিনি সর্বাবস্থায় অন্য কোন মুসলমান ভাইয়ের অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে ওয়াজিব করেছেন। এমতাবস্থায়, একজন স্বামী কি করে তার স্ত্রীর উপর বিপদের পাহাড় ডেকে আনতে পারে? স্বামী কি ভুলে গেছে, কেয়ামতের দিন স্ত্রী আল্লাহর সামনে তার কাছে নিজ অধিকার আদায় এবং জুলুমের শাস্তি দাবী করবে? অথচ আল্লাহ হলেন, সর্বাধিক ন্যায় বিচারক। তিনি স্বামীর কাছ থেকে সকল অধিকার আদায় করে স্ত্রীকে দেবেন। প্রথমে স্বামীর নেক আমল থেকে স্ত্রীকে দেয়ার পর পাওনা বাকী থাকলে স্ত্রীর গুণাহ স্বামীর ওপর চাপাবেন এবং স্বামীকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।

স্বামী স্ত্রীর দুর্বলতার অসদ্ব্যবহার করে যদি বিনা কারণে স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাহলে বুঝতে হবে, তার মধ্যে মানবতার উপাদানটুকুই অনুপস্থিত। তখন সে একজন বন্য মানুষ ও হিংস্র বাঘ। তাকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করা যায় না। কেননা, মুসলমান হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।

রাসূলুল্লাহ (সা) স্ত্রীদেরকে নিম্নোক্ত গালি দিতে নিষেধ করেছেন : قَبَّحَكِ اللّٰهُ

www.amarboi.org

অথবা قَبَّحَ اللّٰهُ وَجْهَكَ 'আল্লাহ তোমার অমঙ্গল করুন।' কিংবা 'আল্লাহ্ তোমার চেহারা নষ্ট করুন।' এমতাবস্থায় স্ত্রীকে অন্যান্য শব্দ দ্বারা গালি-গালাজ করা, অভিশাপ দেয়া, ত্যাগ করা কিংবা মারার বিষয়ে চিন্তা করা যায় কি ?

রাসূলুল্লাহ (সা)কে স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার কি এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : 'স্বামী যখন কাউকে খাওয়ায় তখন স্ত্রীকে খাওয়াবে, যখন নিজে কাপড় পরে তখন তাকে কাপড় পরাবে, তাকে মন্দ চেহারার অধিকারিণী বানানোর জন্য বদদো'আ করবে না, তাকে মারবে না, আর যদি মারতে হয়, তাহলে, হালকা মারবে এবং তাকে রাতে শোয়ার বিছানা ছাড়া আর কোন অবস্থায় ত্যাগ করবে না।'

৮. একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে ইনসাফপূর্ণ পালা বণ্টন :

আল্লাহ পুরুষকে নারীর চাইতে বেশী শক্তিশালী করে তৈরি করেছেন। তাই পুরুষদের একাধিক স্ত্রীর প্রয়োজন হতে পারে। স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের সাথে রাত্রি যাপন, ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের ক্ষেত্রে ইনসাফপূর্ণ সাম্য ওয়াজিব। ইসলামী বিধানে একজন স্বামী ৪জন স্ত্রীকে এক সাথে রাখতে পারে। যদি কোন স্ত্রীর কাছে এক বা একাধিক রাত যাপন না করে তার প্রতি অবিচার করা হয় তাহলে, পরবর্তীতে এর ক্ষতি পূরণ হিসেবে ঐ রাত যাপন করতে হবে। হাঁ, যদি স্ত্রী তার ঐ অধিকার প্রত্যাহার করে তাহলে এর ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন নেই। বর্ণিত আছে, নবীপত্নী হযরত সাওদা (রা) হযরত আয়েশার জন্য নিজ পালা উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

এক স্ত্রীকে সম্পদ দিয়ে অন্য স্ত্রীকে বঞ্চিত রাখলে সেটাও জুলুম হবে। সেই সম্পদ নগদ অর্থ, পোশাক ও স্বর্ণালঙ্কার যাই হোক না কেন, আর ভরণ-পোষণের সাম্য বাসস্থান, পোশাক ও খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে প্রযোজ্য। মূলকথা হল, যতটুকু ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা যায় ততটুকু ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ওয়াজিব। আর প্রকৃতিগত কারণে যতটুকুতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা যায় না, তাতে কোন অসুবিধে নেই। যেমন, একজনের চাইতে অন্যজনের প্রতি মনের ঝোঁক বেশী কিংবা যৌন আচরণের ক্ষেত্রে একজনের চাইতে অন্যজনের প্রতি বেশী আগ্রহ ইত্যাদি। এটা মানুষের প্রকৃতিগত ব্যাপার যার ওপর মানুষের নিজের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ স্ত্রীদের মধ্যে খরচ ও রাত্রি যাপনের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করতেন এবং বলতেন :

اَللّٰهُمَّ هٰذَا جُهْدِىْ فِيْمَا اَمْلِكُ وَلاَ طَاقَةَ لِىْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ اَمْلِكُ.

www.amarboi.org

'হে আল্লাহ্! আমি আমার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার মধ্যে এই চেষ্টা করছি। আর আপনি যে ক্ষমতার মালিক এবং যার মালিক আমি নই, তাতে আমার নিয়ন্ত্রণের কোন শক্তি নেই।' (নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ ও ইবনে হিব্বান)

এটা সর্বজনবিদিত যে, হযরত আয়েশা রাসূলুল্লাহর (সা) সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইন্তেকালের সময় জিজ্ঞেস করেন, আগামীকাল কার ঘরে আমার পালা? নবী পত্নীরা বুঝলেন যে, তিনি মনে মনে হযরত আয়েশার ঘরে যেতে চান। তখন তাঁরা সবাই ঐক্যমতের ভিত্তিতে হযরত আয়েশার পক্ষে নিজেদের পালা উৎসর্গ করেন। এরপর তিনি হযরত আয়েশার বুকের মধ্যে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যু শয্যায় থেকেও তিনি স্ত্রীদের পালা বণ্টনের ক্ষেত্রে ইনসাফ এবং সাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ণ সতর্ক ছিলেন এবং এ ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

مَنْ كَانَ لَهُ اِمْرَأَتَانِ فَمَالَ اِلَى اِحْدَاهُمَا دُوْنَ الْاُخْرَى وَفِىْ رِوَايَةٍ لَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ.

'যার দু'জন স্ত্রী আছে এবং সে একজনের দিকে অন্যজনের তুলনায় বেশী ঝুঁকে পড়েছে, অন্য বর্ণনায় আছে, সে তাদের মধ্যে ইনসাফ করেনি, কেয়ামতের দিন সে বাঁকা গাল নিয়ে উত্থিত হবে।' (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান)

তবে আল্লাহ বলেছেন :

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ.

'তোমরা কখনও নারীদের ব্যাপারে সাম্য ও ইনসাফ রক্ষা করতে পারবে না, যদিও তোমরা এর আকাঙ্খী হও। অতএব সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড়ো না যে, অন্যজনকে দোদুল্যমান অবস্থায় রেখে দেবে।' (সূরা নিসা : ১২৯)

এখানে ইনসাফ ও সাম্য বলতে পূর্ণাঙ্গ ইনসাফ ও সাম্যের কথা বলা হয়েছে যা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, মানুষ নিজ প্রবৃত্তির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নয়। কোন স্ত্রী যদি দৈহিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত বেশী সুন্দরী

www.amarboi.org

হয় অথবা উত্তম চরিত্রের অধিকারিণী হয় কিংবা কম বয়স্কা হয়, তাহলে সে স্বামীর কাছে অন্য স্ত্রীর তুলনায় বেশী নিকটবর্তী হতে পারে। আর এ জন্য আল্লাহ্ স্বামীকে পাকড়াও করবেন না। কিন্তু যদি এর ফলশ্রুতি হিসেবে অন্য স্ত্রীর কাছে রাত্রি যাপন করা না হয় কিংবা তাকে ভরণ-পোষণ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়, তাহলে সে এমন দোদুল্যমান অবস্থায় থাকবে, যে না সে বিয়ের স্বাদ উপভোগকারিণী আর না তালাকপ্রাপ্তা। এরূপ করা স্বামীর জন্য হারাম এবং স্ত্রীর প্রতি জুলুম। তখন সে অন্য স্ত্রীর প্রতি পূর্ণমাত্রায় ঝুঁকে পড়ে।

যারা এ আয়াতকে বহু বিয়ে হারাম হওয়ার দলীল হিসেবে পেশ করে, তাদের জন্য এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তারা রোগাক্রান্ত ও নিকৃষ্ট চিন্তার অধিকারী। এ আয়াতের অর্থ যদি এটাই হয় তাহলে, নবী (সা) একাধিক বিয়ে করতেন না। এমন কি সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং বিভিন্ন ইমামগণও একাধিক বিয়ে করা থেকে বিরত থাকতেন।

৯. ভারসাম্যপূর্ণ আত্মমর্যাদাবোধ : আত্মর্যাদাবোধ বলতে, নিজ স্ত্রীর প্রতি কিংবা অধীনস্থ অন্য কারোর প্রতি অথবা নিজের বিশেষ কোন বিষয়ে অন্যের অংশগ্রহণের ফলে সৃষ্ট রাগ ও ক্রোধের অনুভূতিকে বুঝায়।

স্বামী হচ্ছে, স্ত্রীর পূর্ণ দায়িত্বশীল। আল্লাহ ও সমাজের লোকের কাছে তাকে সে দায়িত্বের জবাবদিহি করতে হবে। স্বামী যদি স্ত্রীকে শরীয়ত এবং সামাজিক রীতি-নীতির বিরুদ্ধে যা ইচ্ছে তাই করার জন্য ছেড়ে দেয়, তাহলে, সে লোকের চোখে হেয় ও ঘৃণিত প্রতিপন্ন হবে। তার কোন ব্যক্তিত্ব নেই বলেই সবাই মনে করবে। লোকেরা এমন স্বামী সম্পর্কে বলবে, 'তাকে তার স্ত্রী চালায়', 'তার হাতে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, বরং সে স্ত্রীর দাস,' কিংবা 'তার স্ত্রীর পুরুষত্ব অধিকতর' ইত্যাদি। আরও মজার বিষয় হল, খোদ নিজ স্ত্রীই স্বামীকে ব্যক্তিত্বহীনতার জন্য খারাপ চোখে দেখবে। ফলে স্বামী-প্রধান পরিবারের পরিবর্তে স্ত্রী-প্রধান পরিবার গড়ে উঠবে। অথচ স্ত্রীরা সব সময় একথা অনুভব করে যে, স্বামীর ব্যক্তিত্ব শক্তিশালী হোক। পুরুষের জন্য এরকম আত্মমর্যাদার অনুভূতি অত্যন্ত প্রয়োজন। যার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ শক্তি নেই সমাজে ও দ্বীনের দৃষ্টিতে সে মর্যাদাবান ব্যক্তি বলে বিবেচিত হয় না।

স্বামী আত্মমর্যাদাবোধের কারণে তার স্ত্রীর সতর ও সৌন্দর্যের প্রতি অন্যের নজরকে সহ্য করতে পারে না। অনুরূপভাবে, স্ত্রীও চায়না যে, তার স্বামীর সাথে অন্য কোন মেয়েলোক স্ত্রীসুলভ আচরণ করুক।

www.amarboi.org

আত্মর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষই স্বভাবজাত প্রকৃতির অধিকারী। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَغَارُ وَالْمُؤْمِنُ يَغَارُ.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ মর্যাদাশীল এবং মোমিনরাও আত্মমর্যাদার অধিকারী।' (বোখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেছেন,

إِنِّىْ لَغَيُوْرٌ وَمَا مِنْ اِمْرِئٍ لاَ يَغَارُ اِلاَّ مَنْكُوْسُ الْقَلْبِ.

'নিশ্চয়ই আমি আত্মমর্যাদাশীল। যে ব্যক্তি আত্মমর্যাদাশীল নয় সে উল্টো অন্তরের অধিকারী।' (এহইয়া উলুমুদ্দিন)

একজন মুসলমানের কাছে আকাঙ্খিত বিষয় হল, সে নিজে ভারসাম্যপূর্ণ আত্মমর্যাদার অধিকারী হবে। ফলে, যে সকল বিষয়ের পরিণতি খারাপ, সে বিষয়ে তাকে উদাসীন হলে চলবে না।

আত্মমর্যাদাবোধ যথার্থ হলে তা প্রশংসনীয়। মানুষের মধ্যে তা অবশ্যই থাকা উচিত। রাসূলে করিম (সা) বলেন, 'আল্লাহর সম্মানবোধ আছে। মোমিনের আত্মসম্মানবোধ আছে। মানুষের উপর আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা আল্লাহর সম্মানবোধ।'

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন, 'সা'দের আত্মসম্মানবোধ দিয়ে তোমরা কি কর? আল্লাহর কসম, আমি সা'দের তুলনায় অধিক আত্মসম্মানের মালিক। আল্লাহ আমার চেয়ে অধিক সম্মান রাখেন। এ সম্মানের কারণেই তিনি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পাপাচার হারাম করেছেন। আল্লাহর তুলনায় অন্য কারও অধিক সম্মান বোধের ওজর করা পছন্দনীয় নয়। এ কারণেই তিনি সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা রাসূল প্রেরণ করেছেন। তার চেয়ে অধিক প্রশংসা অন্য কেউ পছন্দ করে না। এ কারণেই তিনি জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।'

আরেক হাদীসে এসেছে, 'আমি মে'রাজের রাতে জান্নাতের মধ্যে একটি প্রাসাদ দেখলাম। প্রাসাদের আঙ্গিনায় একটি যুবতী ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ প্রাসাদ কার? একজন জবাব দিল, ওমরের। আমি তার ভেতরে দেখতে চাইলাম। কিন্তু হে ওমার! তোমার আত্মসম্মানবোধের কথা মনে পড়ে গেল। হযরত ওমর কেঁদে বলেন, আমি আপনাকে কি আত্মসম্মানবোধ দেখাবো ?'

www.amarboi.org

এ সকল হাদীসের মাধ্যমে যথার্থ আত্মসম্মানবোধের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

স্ত্রীর গোপন বিষয়ে বাড়াবাড়ি, গোঁয়ার্তুমী এবং গোয়েন্দাগিরির ক্ষেত্রে একজন মুসলমানকে ভারসাম্যপূর্ণ আত্মমর্যাদার অধিকারী হওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ (সা) স্ত্রীলোকের গোপন বিষয়ে জানা এবং তাদের ত্রুটি প্রকাশ থেকে বিরত থাকার জন্য নিষেধ করেছেন। তিনি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় আত্মমর্যাদা এবং অপছন্দনীয় আত্মমর্যাদা সম্পর্কে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

اِنَّ مِنَ الْغِيْرَةِ مَايُحِبُّهُ اللّٰهُ وَمِنْهَا مَايُبْغِضُـهُ اللّٰهُ... فَاَمَّـا الْغِـيْرَةُ الَّتِىْ يُحِبُّهَا اللّٰهُ فَالْغِيْرَةُ فِىْ الرِّيْبَةِ وَالْغِيْرَةُ الَّتِـىْ يُبْغِضُـهَا اللّٰهُ فَالْغِيْرَةُ فِىْ غَيْرِ رِيْبَةٍ.

'আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় দু'প্রকার আত্মমর্যাদা আছে। আল্লাহর পছন্দনীয় আত্মমর্যাদা হচ্ছে সন্দেহজনক বিষয়ে আত্মমর্যাদাবোধ এবং আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় আত্মমর্যাদা হচ্ছে, সন্দেহবিহীন বিষয়ে আত্মমর্যাদাবোধ।' (আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান)

হাদীসে কারণ ভিত্তিক পছন্দনীয় আত্মমর্যাদাবোধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সন্দেহ উদ্রেককারী কারণ থাকলে এর অনুসন্ধান ওয়াজিব হয়ে যায়। যদি সন্দেহ দূরকারী কারণ পাওয়া যায় তাহলে আর কোন সমস্যা অবশিষ্ট থাকল না। তবে কারণ বিহীন সন্দেহের ভিত্তিতে আত্মমর্যাদাবোধ আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়। লোকেরা এ জন্য তাকে দোষারোপ করবে। কেননা, এ জাতীয় আত্মমর্যাদার মাধ্যমে সমাজ জীবনের পবিত্র পরিবেশ দূষিত হয় এবং ভালবাসা ও বন্ধুত্বের রশিকে ছিন্ন করে। এ জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ শেষ পর্যন্ত জলাতংক রোগের অবস্থা সৃষ্টি করে এবং সে লোকদের কাছে হাসি তামাশার পাত্রে পরিণত হয়। সমাজে এ জাতীয় নারী-পুরুষের সংখ্যা কম নয়।

পছন্দনীয় আত্মমর্যাদাবোধই দ্বীন ও শরীয়তের কাম্য। কোন স্বামী নিজ স্ত্রীকে নিয়ে রাস্তায় চলার সময় কিংবা অন্য কোন স্থানে যাওয়ার পর যদি অন্য পুরুষ স্ত্রীর প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করে, তাকে উত্যক্ত করে কিংবা খারাপ আচরণ করে, তখনই স্বামী আত্মমর্যাদাবোধের কারণে অগ্নিশর্মা হয়ে যায়। আর যদি স্ত্রী

www.amarboi.org

নিজেই উলঙ্গ বা আধা উলঙ্গ অবস্থায় চলে অথবা উরু, বুক, পেট ও পিঠের কোন অংশ খোলা রেখে চলে, তখন লোকেরা সে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু ব্যক্তিত্বহীন কিংবা আত্মমর্যাদাহীন স্বামীর তাতে কোন বিরক্তিকর অনুভূতি থাকে না। উল্টো সে তাতে আরও সন্তুষ্ট থাকে। শুধু তাই নয়, এ জাতীয় স্বামীরা দেখে যে তার স্ত্রী অন্য পুরুষের সাথে বসে আড্ডা দেয়, পায়ের উপর পা তুলে তাদের সাথে দৃষ্টিকটু অবস্থায় বসে থাকে কিংবা অন্য পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য নাচ-গান করে, অন্য পুরুষের শরীর জড়িয়ে ধরে, দর্জির দোকান ও বিউটি পার্লারে যায় এবং পুরুষদের কাছে নিজের শরীরের সকল অংশ প্রকাশ করে কিংবা অফিস আদালতে পুরুষ সহকর্মীদের সাথে হাসি-খুশী ও গল্প-গুজবে কাটিয়ে দেয়, কিন্তু তাদের স্বামীরা কিছু বলে না। হাদীসে এ জাতীয় স্বামীদেরকেই উল্টো মনের অধিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তারা দ্বীনের দৃষ্টিতে বিকৃত ও হীন ব্যক্তিত্ব, সম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট। এমন কি বানরের আত্মমর্যাদাবোধ থেকেও তাদের আত্মমর্যাদা আরও কম। তাদেরকে পুরুষ বলা উচিত নয়। এ জাতীয় পুরুষ ইসলামের মানদণ্ড এবং উন্নত চারিত্রিক মানদণ্ডের দৃষ্টিতে বহু দূরে অবস্থান করছে।

এই আত্মমর্যাদাবোধের অভাবের কারণেই বহু আত্মীয় স্ত্রীর সাথে একাকী বসে খোশগল্প করে এবং বৈঠকে নিন্দা ও অপবাদসহ বহু আলোচনায় জড়িয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে তাদের অবৈধ সম্পর্কের দরজা খুলে যায়। বহু বাবুর্চি দ্বারা অনেক স্ত্রীর ইজ্জত-সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়। বহু গাড়ীর ড্রাইভার স্ত্রী, মেয়ে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে বহু অপরাধ করা সত্ত্বেও পরিবারে ব্যক্তিগত ড্রাইভার রাখা বন্ধ হয়নি। আত্মমর্যাদাবোধ থাকলে, কি করে পরিবারের সবাই এক সাথে বসে প্রেম পিরীতি ও লারে-লাপ্পা গান শুনে ও নাচ দেখে, কিংবা নাটক উপভোগ করে? আত্মমর্যাদাবোধের অভাবেই সমাজে আজ ধ্বংসের ডংকা বেজে উঠেছে।

১০. স্ত্রীকে নিজ আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে বেড়ানোর সুযোগ দিতে হবে : বিয়ের মাধ্যমে স্বামীর বাড়ীতে আসার কারণে স্ত্রী তার আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যে মা-বাবা ও আত্মীয়রা তাকে লালন-পালন করেছে তাদেরকে দেখার আগ্রহ মানবিক-স্বভাবজাত। অধিকন্তু প্রয়োজনে, মা-বাবার সেবার সুযোগও তাকে দিতে হবে। অন্যথায়, আত্মীয়ের অধিকার ক্ষুণ্ন করার কারণে স্ত্রী গুণাহগার হবে। ইসলাম স্ত্রীর এই অধিকারকে স্বীকার করে।

www.amarboi.org

স্ত্রীর প্রতি স্বামী যদি উল্লিখিত ১০টি অধিকার পূরণ করে তাহলে, নারী জাতি পৃথিবীতে সর্বোত্তম সম্মান ও সুখ লাভ করতে সক্ষম। আর এ অধিকারগুলো পূরণ করা ইসলামের অন্যতম দাবী। অমুসলিম সমাজের মহিলারা যতই তথাকথিত নারী স্বাধীনতার শ্লোগান দিক না কেন, তারা মুসলিম সমাজের নারীদের মত এমন সুখ ভোগ করতে সক্ষম নয়। উপরন্তু পাশ্চাত্যের অমুসলিম সমাজের মেয়েরা পরিবার প্রথাকে ভেঙ্গে আজ 'না ঘরকা, না ঘাটকা' এ অবস্থার সম্মুখীন। তারা পারিবারিক সুখ-শান্তি থেকে বঞ্চিত।

ইসলামই কেবল নারী জাতির সর্বোত্তম শান্তি, নিরাপত্তা ও সুখের নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম।

স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার

পরিবারকে একটা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সাথে তুলনা করলে স্বামী হচ্ছে সে রাষ্ট্রের রাজা আর স্ত্রী হচ্ছে, রাণী। রাজা ও রাণী নিজ দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করে একটি সুখী রাষ্ট্র তৈরি করতে পারে।

স্বামীকে পরিবারের সকল খরচ বহন করতে হয়। স্ত্রী ও সন্তানের বর্তমান এবং ভবিষ্যত সুখ-শান্তি নিশ্চিত করার জন্য তাকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। এছাড়া স্বামীর ওপর রয়েছে পরিবারের বাইরে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্নমুখী দায়-দায়িত্ব। স্বামীকে দেশরক্ষা, শিল্পায়ন, নির্মাণ কাজ, অর্থনৈতিক লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারসহ বহুমুখী দায়িত্ব পালন করে সামাজের চাকাকে সচল রাখতে হয়। ইসলামী শরীয়ত স্ত্রীর ওপর এ সকল দায়িত্ব অর্পণ করেনি। স্ত্রী যদি স্বামীর কাজে সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণ করে তাহলে, স্বামীর দায়িত্ব পালন সহজ হয়। তাই স্ত্রীকে অবশ্যই দুটো দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে হবে।

১. স্ত্রীকে স্বামীর প্রশান্তি, দয়া ও ভালবাসার আধার হতে হবে, তাতে করেই সৌভাগ্য ও স্থিতিশীলতা আসবে।

২. স্ত্রীকে সন্তানের প্রতি মায়ের পূর্ণ-ভূমিকা পালন করতে হবে। যার ফলে তারা সমাজের উপযুক্ত যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

এর অর্থ এ নয় যে, স্ত্রীর জন্য কোন কাজ, জ্ঞান শিক্ষা দান বা অন্যান্য পেশায় যোগদান করা নিষিদ্ধ। বরং এর অর্থ হচ্ছে, এগুলোর সব কিছু স্ত্রীর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

www.amarboi.org

কিছু কাজ ও পেশা আছে যা নারী ছাড়া সম্পাদন করা যাবে না। এছাড়া অন্য ক্ষেত্রে তাদেরকে নিয়োগ করার অর্থ হল, প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন কাজের জন্য সৃষ্ট একটা বিরাট মানবশক্তির অপচয় করা। জাতির ভবিষ্যত আশা-ভরসা তথা ছেলে-মেয়েদের প্রতিপালনের ক্ষেত্রে বিরাট বিচ্যুতি ঘটবে।

উপরিউক্ত দু'টো দায়িত্ব ছাড়া আর সকল দায়িত্ব যেহেতু পুরুষের ওপর ন্যস্ত, সেহেতু যুক্তি ও আইনের দাবী হচ্ছে, পরিবারের নেতৃত্ব পুরুষের হাতে থাকা এবং স্ত্রী ও সন্তানদের কর্তব্য হল, তাঁর আনুগত্য করা।

এর অর্থ এও নয় যে, ইসলাম পুরুষকে সকলের ওপর নিজ মত চাপিয়ে দেয়ার জন্য স্বৈরাচারী বানিয়ে দিয়েছে। এটা যুক্তি ও আইনের বিপরীত। বরং পারিবারিক পরিবেশকে যৌথ পরামর্শ ও আলোচনার ভিত্তিতে সুন্দর ও সুষ্ঠ করতে হবে এবং ভালবাসা ও দয়ার আড়ালে মতামত বিনিময় অব্যাহত রাখতে হবে। যদি স্বামী ও স্ত্রী কোন বিষয়ে মতভেদ পোষণ করে তাহলে, স্বামীর আনুগত্য করাই জরুরী হয়ে পড়বে।

অনুরূপভাবে, স্বামী যে আদেশ করবে, তা যেন স্ত্রী মেনে নেয়। এটাই মূলত, স্ত্রীর ওপর স্বামীর কর্তৃত্বের অর্থ। স্ত্রীর চাইতে স্বামীর মর্যাদা বেশী। যার কারণে পারিবারিক নেতৃত্ব তার হাতে থাকবে। কেননা, পুরুষরাই প্রধান ঋণগ্রহণকারী, ব্যয়ভার বহনকারী, মুজাহিদ, সাহায্যকারী ও স্ত্রীর প্রতিরক্ষাকারী। তাই সুবিধে ভোগের মোকাবিলায় আনুগত্য করা এবং স্বার্থের বিনিময় একটা স্বীকৃত সত্য যা শরীয়ত, আইন ও যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে উপযুক্ত। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদেরকে স্ত্রীর ওপর স্বামীর মর্যাদা সম্পর্কে কোরআনের আয়াত ও হাদীসগুলো বুঝতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.

'আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর ভাল পন্থায়। আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।' (সূরা নিসা : ২২৮)

আল্লামা কুরতুবী এ আয়াতে বর্ণিত 'দারাজাহ' শব্দের অর্থ 'মর্যাদা' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন : জ্ঞান-বুদ্ধি, ব্যয়ভার বহনের শক্তি, রক্তপণ, উত্তরাধিকার এবং জেহাদের ক্ষেত্রে পুরুষের এ মর্যাদা রয়েছে।..... এর দ্বারা পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায় এবং এ কারণে স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার, স্বামীর

www.amarboi.org

উপর স্ত্রীর অধিকার অপেক্ষা বেশী প্রতীয়মান হয়। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

وَلَوْ اَمَرْتُ اَحَدًا بِالسُّجُوْدِ لِغَيْرِ اللهِ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

'আমি যদি আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাজদা করার আদেশ করতাম তাহলে, অবশ্য স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম সে যেন তার স্বামীকে সাজদা করে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 'দারজাহ' শব্দ পুরুষদেরকে স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের ইঙ্গিত দেয়। অর্থাৎ স্বামী যেন এসকল দায়িত্ব নিজের জন্য করণীয় হিসেবে গ্রহণ করে। ইবনে আতিয়্যা বলেন, এটা খুবই সুন্দর ও পরহেযগারীমূলক মন্তব্য।

আল্লাহ বলেন :

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ.

'পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল, এজন্য যে আল্লাহ একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।' (সূরা নিসা : ৩৪)

ইবনুল জাওযী 'যাদুল মাসীর' গ্রন্থে নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে লিখেছেন, নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব সাধারণভাবে, বেশী জ্ঞান-বুদ্ধি, যুদ্ধলব্ধ মাল ও উত্তরাধিকারের অধিক হিস্সা, জুমআর নামায এবং জামায়াতে নামায, খেলাফত, নেতৃত্ব, জেহাদ এবং তালাকসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রযোজ্য।

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ পুরুষদের অর্থ ব্যয় সম্পর্কে যা বলেছেন, এর অর্থ হল, দেনমোহরসহ কোরআন ও হাদীসে আরও যে সকল ব্যয় নির্বাহ নির্ধারিত রয়েছে সেগুলোতে অর্থ ব্যয় করা।

আল্লামা আক্কাদ বলেছেন, আল্লাহ পুরুষদেরকে নারীদের উপর যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তা প্রাকৃতিকভাবে। তারপর তাদের ওপর স্ত্রীদের ব্যয় নির্বাহকে ফরয করেছেন। শুধু অর্থ ব্যয়ের কারণেই পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব নয়। যদি তাই হয়, তাহলে, কোন ধনী স্ত্রী যদি স্বামীর অর্থের মুখাপেক্ষী না হয় কিংবা স্বামীর জন্য অর্থ ব্যয় করে, তখন কি হবে? আসলে, মানব ইতিহাসের প্রথম দিক থেকে তাকালেই আমরা নারীদের ওপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাই।

www.amarboi.org

পুরুষকে এ শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া সত্ত্বেও ইসলাম নারীর মর্যাদা কোন অংশে খাট করেনি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ.

'মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশ্‌ত।'

যে কোন সন্তানের কাছে মায়ের এ মর্যাদা স্বীকৃত। আল্লাহ হযরত মরিয়মের গুণ বর্ণনায় বলেছেন :

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى.

'পুরুষ মহিলার মত (এত মহান গুণের অধিকারী) নয়।' অর্থাৎ যোগ্যতা, আমল, চরিত্র ও ঈমানের বলে মহিলারাও পুরুষের চাইতে অধিক মর্যাদা লাভ করতে পারে। কেননা, মর্যাদার মালিক আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা সে মর্যাদা দান করেন।

১. স্ত্রীর তুলনায় স্বামীর মর্যাদা ভালভাবে জানা : কোরআন নারীর ওপর পুরুষের নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছে। এখন এ বিষয়ে হাদীসের বর্ণনা পেশ করবো।

উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اَيُّمَا اِمْرَاَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ.

'কোন স্ত্রী যদি এমতাবস্থায় মারা যায় যে, তার স্বামী তার ওপর সন্তুষ্ট, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, হাকেম। তিরমিযী একে হাসান এবং হাকেম একে সহীহ সনদ বিশিষ্ট বলেছেন)

হোসাইন বিন মোহসেন থেকে বর্ণিত। তাঁর এক ফুফু রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে আসেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন :

أَذَاتُ زَوْجٍ اَنْتِ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَاَيْنَ اَنْتِ مِنْهُ؟ قَالَتْ مَا اٰلُوْهُ اِلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ فَكَيْفَ اَنْتِ لَهُ؟ فَاِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ.

'তোমার কি স্বামী আছে? তিনি বলেন : হাঁ। তিনি প্রশ্ন করেন : তুমি তার প্রতি কি অনুগত না অহংকারী? তিনি বলেন : আমার অক্ষমতা ও অপারগতা ছাড়া

www.amarboi.org

আমি তার আনুগত্য ও সেবার ব্যাপারে কোন ত্রুটি করি না। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেন, তুমি তার জন্য কি রকম? সে তো তোমার বেহেশত ও দোজখ।' (আহমদ ও নাসাঈ ভাল সনদ সহকারে এবং হাকেম সহীহ্ সনদ সহকারে তা বর্ণনা করেছেন।)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে প্রশ্ন করলাম :

اَىُّ النَّاسِ اَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ زَوْجُهَا قُلْتُ فَاَىُّ النَّاسِ اَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ اُمُّهُ.

'নারীর ওপর সর্বাধিক অধিকার কার? তিনি উত্তরে বলেন : তার স্বামীর। তারপর আমি জিজ্ঞেস করি, পুরুষের ওপর সর্বাধিক অধিকার কার? তিনি উত্তর দেন যে, তার মায়ের।' (বাজ্জার ভাল সনদ সহকারে তা বর্ণনা করেছেন।)

এ হাদীসের মর্যাদার বিনিময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। স্ত্রীর ওপর স্বামীর মর্যাদা ও অধিকার সর্বাধিক এবং এ অধিকার পূরণের মোকাবিলায় আল্লাহ সন্তানের ওপর মায়ের অধিকার সর্বাধিক করেছেন। আল্লাহর ইনসাফ কতইনা চমৎকার!

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

لَوْ كُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لاَحَدٍ لاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

'আমি যদি কাউকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাজদা করার নির্দেশ দিতাম তাহলে, স্বামীকে সাজদা করার জন্য স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম।' (তিরমিযী, তিনি এটাকে হাসান হাদীস বলেছেন)

আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন :

لاَيَنْظُرُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى اِمْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِىَ لاَ تَسْتَغْنِىْ عَنْهُ.

'আল্লাহ ঐ স্ত্রীলোকের দিকে তাকাবেন না যে নিজ স্বামীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, অথচ সে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল।' (নাসাঈ, বাজ্জার)

www.amarboi.org

২. স্বামীর আনুগত্য ও উত্তম আচরণ করা : পুরুষ যেহেতু নারীর ওপর কর্তৃত্বশীল, সেহেতু স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর জন্য ফরয এবং স্বামীর আদেশ অমান্য করা হারাম। যদি সে আনুগত্যহীনতা থেকে ফিরে না আসে এবং স্বামীর কাছ থেকে ক্ষমা না চায়, তাহলে তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তি দেয়া হবে। স্বামীর সাথে স্ত্রীর আচরণ এমন হবে যেমন বাপের সাথে সন্তানের আচরণ, বরং তার চাইতেও বেশী।

হাদীসে বলা হয়েছে, স্বামীকে সাজদা করা জায়েয থাকলে স্ত্রীকে সাজদার নির্দেশ দেয়া হত। নেক স্ত্রীরা এটা ভাল করে বুঝে ও স্বামীর অধিকার পূরণের চেষ্টা করে। তারা স্বামীর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহর অসন্তোষ থেকে মুক্তির জন্য প্রত্যেকটি ছোট ও বড় গুণাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। আল্লাহ বলেন :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ اللّٰهُ.

'নেককার স্ত্রীরা আনুগত্য করে এবং আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালে তার হেফাজত করে।' (সূরা নিসা : ৩৪)

এর ব্যাখ্যা হল, নেক স্ত্রীরা স্বামীর আনুগত্য এবং তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের রেখে যাওয়া বিষয়সমূহের হেফাজত করে। তখন তারা নিজেদের জান এবং স্বামী ও সন্তানের ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তাদের মাল-সম্পদের হেফাজত করে। একজন নেক স্ত্রীর প্রধান গুণ হল, স্বামীর আনুগত্য করা। মূলতঃ আনুগত্য হল, উত্তম আচরণের অন্তর্ভুক্ত। কোন সময় স্ত্রী আনুগত্য করলেও স্বামীর সাথে সদ্ব্যবহার করে না। অথচ সদ্ব্যবহার দাম্পত্য জীবনের প্রধান গুণ। সদ্ব্যবহার হচ্ছে, রুচি, শিল্প এবং সামষ্টিক উন্নত প্রশিক্ষণ। এর মাধ্যমেই ভালবাসা ও দয়ার অমিয় ধারা অব্যাহত থাকে। অনেক সময় সোহাগপূর্ণ মুচকী হাসি, ভালবাসা সিক্ত দৃষ্টি, ভদ্র ও নরম ব্যবহার এবং ভদ্রোচিত পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে বিরাট সংকটের সমাধান হয়ে যায়।

যে স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করে ও সদ্ব্যবহার করে সে স্ত্রী স্বামীর আস্থা, স্থায়ী ভালবাসা ও তার প্রতি স্বামীর সৌভাগ্যের অনুভূতি অর্জন করে ধন্য হয়। তখন স্বামী স্ত্রীকে এর পরিবর্তে বহুগুণ বেশী দান করে। এমনকি অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, শেষ পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে তার প্রতিটি ইচ্ছা পূরণে সক্ষম হয়। শুধু তাই নয়, তখন উল্টো স্বামী স্ত্রীর আনুগত্য শুরু করে। স্বামীর আবেগ-অনুভূতি, নম্রতা ও ভদ্রতার চাইতে যদি স্ত্রীর আবেগ-অনুভূতি অধিকতর হয়,

www.amarboi.org

তখন স্ত্রী মূলতঃ স্বামীর মনের মালিক হয়ে যায় এবং তাকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, এ স্ত্রীকে ছাড়া তার সত্যিকার সৌভাগ্য আসতে পারে না। কম সংখ্যক স্ত্রীই একথাটি বুঝতে পারে কিংবা বুঝলেও সে অনুযায়ী কাজ করতে পারে। ফলে স্বামীরা স্ত্রী থেকে দূরে অবস্থান করে।

আসলে আনুগত্য শব্দটি ব্যাপক। এর মধ্যে আল্লাহর নাফরমানী ছাড়া স্বামীর সকল আদেশ অন্তর্ভুক্ত এবং স্বামী যা নিষেধ করে কিংবা যাতে সন্তুষ্ট নয়, তা থেকে বিরত থাকাও এর দাবী। তাই স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী স্বামীর বা নিজের কোন নিকটাত্মীয়কেও ঘরে প্রবেশ করানো উচিত নয়। অপরদিকে, স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়া কিংবা নিজের বাপের বাড়ীতে যাওয়াও উচিত নয়।

স্বামীর বিশেষ কিংবা সাধারণ অনুমতি ছাড়া তার অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা জায়েয নেই। স্বামী যদি স্ত্রীকে বিরাট লেন-দেনের বিষয়ে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যয় করার নির্দেশ দেয় তাহলে, স্ত্রী সে অনুযায়ী ব্যয় করতে পারবে। কিন্তু ছোট-খাট বিষয়ে ব্যয় করলে তাতে কোন অসুবিধে নেই। যেমন, ভিক্ষুক কিংবা প্রতিবেশীকে সামান্য খাবার, অর্থ ও পুরাতন কাপড় দান করা ইত্যাদি।

স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল রোযা রাখা জায়েয নেই। যদি নফল রোযা রাখে কিন্তু স্বামী যৌন চাহিদা পূরণ করতে চায় তাহলে, স্ত্রীকে রোযা ভেঙ্গে স্বামীর প্রয়োজনে সাড়া দিতে হবে। অনুরূপভাবে, স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল হজ্জ ও ওমরাহ আদায় করতে পারবে না। তবে যদি ফরয হজ্জ কিংবা ওয়াজিব ওমরাহ হয়, তাহলে, স্বামীকে জানানো দরকার। অনুমতি দিলে ভাল। আর না দিলে, বিনা অনুমতিতেই ঐ ফরয আদায় করতে হবে। কেননা, আল্লাহর নাফরমানীর মাধ্যমে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।

এখন আমরা উপরোক্ত বক্তব্যগুলোর সমর্থনে প্রয়োজনীয় দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করবো।

রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের সময় নারীদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে বলেছিলেন :

اَلاَ اِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَحَقُّكُمْ عَلَيْـهِنَّ اَلاَّ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ وَلاَ يَأْذَنَّ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لِمَـنْ تَكْرَهُـوْنَ اِلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ اَنْ تُحْسِنُوْا اِلَيْهِنَّ فِيْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

www.amarboi.org

'ওহে! তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার আছে এবং তোমাদের ওপরও তাদের অধিকার আছে। তাদের ওপর তোমাদের অধিকার হল, তোমাদের অপছন্দনীয় ব্যক্তিদেরকে যেন তোমাদের সম্মত ছাড়া তোমাদের বিছানা ব্যবহারের অনুমতি না দেয় এবং তোমাদের সম্মত ছাড়া যেন তোমাদের অপছন্দনীয় লোকদেরকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি না দেয়। আর তোমাদের ওপর তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার হল, তোমরা তাদের প্রতি তাদের পোষাক-আষাক ও খাবারের বিষয়ে সদ্ব্যবহার করবে। (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী। তিরমিযী এটাকে হাসান-সহীহ হাদীস বলেছেন।)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا وَاطَاعَاتْ بَعْلَهَا دَخَلَتْ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ.

'যদি কোন মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং নিজ স্বামীর আনুগত্য করে, সে যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা, বেহেশতে প্রবেশ করবে।' (ইবনে হিব্বান)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لاَيَحِلُّ لِامْرَأَةٍ اَنْ تَصُوْمَ وَزَوجُـهَا شَـاهِدٌ اِلاَّ بِإِذْنِـهِ وَلاَتَـأذَنْ فِىْ بَيْتِهِ اِلاَّ بِأِذْنِهِ.

'স্বামী ঘরে থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রীর নফল রোযা রাখা জায়েয নেই এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী কাউকে যেন ঘরে প্রবেশের অনুমতি না দেয়।' (বোখারী ও মুসলিম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ اِلَى فِرَاشِهِ فَلَـمْ تَأْتِـهِ فَبَـاتَ غَضْبَـانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ.

'কোন স্বামী স্ত্রীকে নিজ বিছানায় ডাকলে সে যদি অস্বীকৃতি জানায় এবং স্বামী নারাজ অবস্থায় রাত কাটায়, ভোর পর্যন্ত সারা রাত ব্যাপী ফেরেশতারা ঐ স্ত্রীকে অভিশাপ দেয়।' (বোখারী, মুসলিম)

www.amarboi.org

ইবনে ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اِثْنَانِ لاَ تَجَاوِزُ صَلاَتُهُمَا رُؤُوْسَهُمَا : عَبْدٌ اٰبِقٌ مِنْ مَوَالِيْهِ حَتّٰى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتّٰى تَرْجِعَ.

'দুই ব্যক্তির নামাজ তাদের মাথা অতিক্রম করে না। ভেগে যাওয়া গোলাম যে পর্যন্ত না মনিবের কাছে ফিরে আসে এবং নাফরমান স্ত্রী যে পর্যন্ত না স্বামীর কাছে ফিরে আসে।' (তাবারানী-সনদ সহীহ)

তালক বিন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهٖ فَلْتَأْتِهِ وَاِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ.

'যখন স্বামী স্ত্রীকে নিজ প্রয়োজনে ডাকে, তখন চুলার কাজে ব্যস্ত থাকলেও সে যেন তার ডাকে সাড়া দেয়।' (তিরমিযী)

ইবনে ওমার (রা) থেকে আরও বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি,

اِنَّ الْمَرْأَةَ اِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا وَزَوْجُهَا كَارِهٌ لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِيْ السَّمَاءِ وَكُلُّ شَيْئٍ مَرَّتْ عَلَيْهِ غَيْرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ حَتّٰى تَرْجِعَ.

'কোন স্ত্রী যদি স্বামীকে অসন্তুষ্ট অবস্থায় রেখে ঘর থেকে বের হয়, আকাশের সকল ফেরেশতা তাকে অভিশাপ দেয় এবং জিন ও মানুষ ছাড়া সে আর যাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করে তারাও সবাই অভিশাপ দিতে থাকে, যে পর্যন্ত না সে ফিরে আসে।' (তাবরানী-আওসাত গ্রন্থ)

রাসূলুল্লাহ (সা)বলেছেন,

اَيُّمَا اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ.

'কোন স্ত্রীলোক স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মারা গেলে বেহেশতে প্রবেশ করবে।' (হাকেম, তিরমিযী)

www.amarboi.org

মু'আজ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لاَتُؤْذِىْ اِمْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِىْ الدُّنْيَا اِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنَ: لاَتُؤْذِيْهِ، قَاتَلَكِ اللهِ فَاِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ اَنْ يُّفَارِقَكِ اِلَيْنَا.

'কোন স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দিলে, বেহেশতের হুরদের মধ্যে যে হুর তার সঙ্গিনী হবে, সে হুরটি বলতে থাকবে, তুমি তাকে কষ্ট দিও না, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুক। তিনি তোমার কাছে প্রবাসী মুসাফির। সহসাই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলন ইবাদত। এতে বিরাট সওয়াব রয়েছে। যৌন মিলন শুধু দুনিয়াবী ভোগ-বিলাস নয়। এর শুভফল যেমনি দুনিয়ায় রয়েছে, তেমনি পরকালেও এর সওয়াব ও শুভ পরিণতি স্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। কিছু সংখ্যক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলেন,

يٰارَسُوْلَ اللهِ ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالْاُجُوْرِ، يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّى وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُوْنَ بِفُضُوْلِ اَمْوَالِهِمْ قَالَ: اَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَاتَصَدَّقُوْنَ بِهِ اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةً وَاَمْرٌ بِمَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ وَنَهِىٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِىْ بُضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ اَيَاتِىْ اَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا اَجْرٌ قَالَ اَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِىْ الْحَرَامِ اَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ فَكَذٰلِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِىْ الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ اَجْرٌ.

'হে আল্লাহর রাসূল! ধনীরা অধিক সওয়াব নিয়ে গেল। তারা আমাদের মতই নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং অতিরিক্ত অর্থ দান-সদকা করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ কি তোমাদের জন্য দান-সদকার ব্যবস্থা

www.amarboi.org

রাখেননি? প্রত্যেক তাসবীহ (সোবহানাল্লাহ) সদকা; প্রত্যেক তাহমীদ (আল হামদুলিল্লাহ) সদকাহ; প্রত্যেক তাহলীল (লাইলাহা ইল্লাল্লাহ) সদকাহ; সৎকাজের আদেশ সদকাহ; অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা সদকা এবং তোমাদের স্ত্রী সহবাস সদকা। তাঁরা প্রশ্ন করেন, আমরা যৌন চাহিদা পূরণ করলেও কি তাতে সওয়াব হবে? তিনি বলেন, তোমরা যদি হারামভাবে যৌন চাহিদা পূরণ কর তাতে যেমন গুনাহ হয়, তেমনি হালাল ও বৈধ উপায়ে যৌন চাহিদা পূরণ করলে তাতে সওয়াব হয়।' (মুসলিম)

যেনা-ব্যভিচারসহ হারাম পন্থায় যৌন চাহিদা পূরণ করা কবীরা গুনাহ এবং এর শাস্তিও অত্যন্ত কঠোর। দুনিয়াতে বেত্রাঘাত ও পাথর নিক্ষেপে হত্যা, আর পরকালে দোজখ। তার মোকাবেলায় স্ত্রী সহবাসের সওয়াবও তেমনি বিরাট দান সদকার সওয়াবের সমতুল্য। স্ত্রীরা স্বামীদের যৌন চাহিদা পূরণ করলে এবং তা যত বেশী করবে তারা আল্লাহর কাছে তত বিশাল দান-সদকার সওয়াব পাবে।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত।

قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ اَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ الَّتِىْ تَسُرُّهُ اِذَا نَظَرَوَتُطِيْعُهُ اِذَا اَمَرَ وَلاَتُخَالِفُهُ فِىْ نَفْسِهَا وَلاَ مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ.

'রাসূলুল্লাহ (সা)কে প্রশ্ন করা হল, কোন স্ত্রীলোক উত্তম? তিনি জবাবে বলেন, যে স্ত্রীর প্রতি তাকালে স্বামী খুশী হয়। যে স্ত্রী স্বামীর আদেশ পালন করে এবং যে স্ত্রী নিজের জানমালের ব্যাপারে স্বামী যা অপছন্দ করে তার বিরোধিতা করে না।' (নাসাঈ, বায়হাকী)

এক ব্যক্তি সফরে যাওয়ার সময় স্ত্রীকে বলে গেল উপর তলার কক্ষ থেকে নীচে নামবে না। নীচ তলায় তার পিতা বাস করত। ঘটনাক্রমে সে স্ত্রীর পিতা অসুস্থ হয়ে পড়ল। স্ত্রী নীচে পিতার কাছে নামার অনুমতি চেয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে লোক পাঠাল। তিনি বলেন, স্বামীর আদেশ পালন কর। শেষ পর্যন্ত পিতা মারা গেল। সে আবার নীচে নামার অনুমতি প্রার্থনা করে। রাসূলুল্লাহর (সা) আবার বললেন, স্বামীর আদেশ পালন কর। ফলে পিতাকে কবরে দাফন করা হল। কিন্তু সে নীচে নামল না। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ মহিলাকে বলে পাঠালেন যে, তুমি যে স্বামীর আদেশ পালন করেছ, এর বিনিময়ে আল্লাহ তোমার পিতার গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। (এহইয়াউল উলূম, ইমাম গাজালী)

www.amarboi.org

তাবরানী একটু পার্থক্য সহকারে বর্ণনা করেছেন, 'আল্লাহ ঐ ধৈর্যশীলা স্ত্রীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) কে অহী মারফত জানিয়ে দেন যে, স্বামীর আনুগত্য করায় আল্লাহ তার সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।' (তাবরানী)

আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

اِطَّلَعْتُ فِيْ النَّارِ فَإِذَا اَكْثَرُ اَهْلِهَا النِّسَـاءُ فَقُلْنَ لِمَ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ يَكْثُرْنَا اللَّعْنَ وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ.

'আমি দোজখে উঁকি দিয়ে দেখলাম এর অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা। মহিলারা বলল, হে নবী! এর কারণ কি? তিনি বললেন, মহিলারা বেশী বেশী অভিশাপ দেয় এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (বোখারী)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক যুবতী রাসূলুল্লাহর (সা) খেদমতে হাজির হয়ে আরয করল, হে নবী! আমি একজন যুবতী। মানুষ আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেয় কিন্তু আমার কাছে বিয়ে ভাল লাগে না। আমি এখন জানতে চাই, স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার কি? তিনি উত্তরে বলেন, ধরে নেয়া যাক যে, স্বামীর আপাদ-মস্তক পুঁজে ভর্তি। যদি স্ত্রী ঐ পুঁজ চেটে নেয়, তবুও তার শোকরিয়া আদায় করতে পারবে না। যুবতীটি জিজ্ঞেস করল, আমি কি বিয়ে করবো? তিনি বললেন, করে নাও। বিয়ে করা উত্তম।'[১]

খাসআ'ম গোত্রের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্র (সা) খেদমতে এসে আরয করল : আমি স্বামীহীনা, বিয়ে করতে চাই। এখন জানতে চাই, স্বামীর অধিকার কি? তিনি উত্তর দেন : স্বামীর অধিকার এই যে, সে যদি উটের পিঠে থেকেও সহবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে স্ত্রী অস্বীকার করতে পারবে না। অন্য অধিকার হচ্ছে, কোন জিনিস তার ঘর থেকে তার অনুমতি ছাড়া কাউকে দিবে না। দিনে তুমি রোযা রাখলে কেবল ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকবে। কেননা, তোমার রোজা কবুল হবে না। তুমি যদি স্বামীর আদেশ ছাড়া ঘর থেকে বের হও, তবে ঘরে ফিরে না আসা এবং তওবা না করা পর্যন্ত ফেরেশতারা তোমার প্রতি অভিশাপ দিতে থাকবে।[২]

---

১. এহইয়াউল উলূমুদ্দিন, ইমাম গাজালী,
২. ঐ

www.amarboi.org

স্ত্রী স্বামীর জন্য কেমন হবে তা নিজ কন্যার প্রতি এক আরাবী বিদূষী মহিলা আসমা বিনতে খারেজা আল ফোজারীর উপদেশ থেকে উপলব্ধি করা উচিত। তিনি তার মেয়ের বিয়ের সময় তাকে বলেন : তুমি যে ঘরে এতদিন ছিলে সেখান থেকে এখন এমন এক শয্যায় যাচ্ছ, যে সম্পর্কে তুমি অবগত ছিলে না এবং এমন এক ব্যক্তির কাছে যাচ্ছ যার সাথে পূর্বে থেকে পরিচিত ছিলে না। সুতরাং তুমি তার জমীন হবে, ফলে সে তোমার আসমান হবে। তুমি তার শয্যা হলে সে তোমার খুঁটি হবে। তুমি তার দাসী হলে সে তোমার গোলাম হবে। তার কাছে বেশী কিছু দাবী করবে না, তাহলে, সে রাগ করবে। তার থেকে দূরে থাকবে না, তাহলে, সে তোমাকে ভুলে যাবে। সে তোমার নিকটবর্তী হলে তুমি ও তার নিকটবর্তী হবে। তার নাক, কান ও চোখের দিকে নজর রাখবে। সে যেন তোমার কাছ থেকে সুঘ্রাণ ছাড়া অন্য কোন ঘ্রাণ না পায়। সে যখন শুনে তখন যেন তোমার কাছ থেকে ভাল কথা শুনে এবং যখন দেখে তখন যেন সুন্দর কিছু দেখে। জেনে রাখ, পানিই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি।

আসমায়ী বলেন : আমি জঙ্গলে গিয়ে একজন নেহায়েত রূপসী মহিলাকে তার স্বামীসহ দেখলাম। স্বামী ছিল চরম কুশ্রী। আমি মহিলাকে বললাম : আশ্চর্যের বিষয়, তুমি এমন ব্যক্তির স্ত্রী হয়ে সুখী আছ! সে বলল : চুপ কর। তুমি ভুল করছ। আসল ব্যাপার এই যে, সম্ভবতঃ সে আল্লাহর সন্তুষ্টির কোন কাজ করেছে, যার বিনিময়ে আমাকে লাভ করেছে। আর সম্ভবতঃ আমার দ্বারা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কোন কাজ হয়েছে, যার শাস্তি স্বরূপ আমি এ স্বামী পেয়েছি। সুতরাং আল্লাহ আমার জন্য যা পসন্দ করেছেন, আমি তাতে সন্তুষ্ট থাকবো না কেন? আসমায়ী বলেন : মহিলাটি আমাকে একেবারে নিরুত্তর করে দিল।[১] মোট কথা, স্ত্রী সর্বাবস্থায় স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

৩. স্বামীর জন্য সেজেগুজে চলা

সৌন্দর্যের মূল্য অপরিসীম। যে শিশু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও চুল সিঁথি করা, সে এবং সুন্দর পোষাক পরিহিত লোক অথবা সুঘ্রাণের প্রতি মানুষের ভালবাসা ও আকর্ষণ স্বাভাবিক। এছাড়া, সাজানো কক্ষ, ফুল, প্রাকৃতিক ছবি, সুন্দর চেয়ার এবং মনোরম বিছানা দ্বারা পরিপাটি কক্ষে বসলে স্নায়ু স্নিগ্ধ হয়ে আসে এবং মানসিক প্রশান্তি বেড়ে যায়।

---

১. এহইয়াউল উলুমুদ্দিন, ইমাম গাজালী।

www.amarboi.org

অনুরূপভাবে, শষ্য-শ্যামল সবুজ ভূখণ্ডে পানির নহর প্রবাহিত হলে, গাছের ডালপালা নুঁইয়ে পড়লে, পাখীর কলরব শুনলে যেখানে কবির মনে ভাবের তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তখন সেখানে জীবনের স্বাদ উপলব্ধি করা যায়।

স্বামীও যদি সুসজ্জিতা স্ত্রীকে দেখে যে সে তার উদ্দেশ্যে সুগন্ধি ব্যবহার করে, ঘর-বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, সকল বিষয় সুষ্ঠভাবে সংগঠিত করে, মুচকী হাসি সহকারে তাকে স্বাগত জানায়, তার সাথে আলাপ করে, আবেগ-উচ্ছাসের স্বাদ উপলব্ধি করে, তার আবেগ, ভালবাসা, সোহাগ ও আদর-যত্নের কারণে নিজের দুঃখ-কষ্ট ভুলে যায়, তার আরামের সময়ে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং অভ্যাস অনুযায়ী স্বামীর প্রবেশ ও প্রস্থানের সময়কার সকল প্রয়োজন পূরণ করে, সে স্ত্রীকে দেখলে ও স্বামী আনন্দিত না হয়ে পারে না। মূলতঃ সেই স্ত্রী তার কাছে দুনিয়ার উত্তম সম্পদ ও হুর, জীবনের আনন্দ-খুশী এবং ঘরের আলো ও সৌন্দর্য। যদি গোটা দুনিয়া একদিকে এবং এই স্ত্রী অন্যদিকে দাঁড়ায়, তাহলে, সকল পুরুষ এ স্ত্রীকেই পছন্দ করবে। কেননা, তার হাতে রয়েছে সৌভাগ্যের চাবিকাঠি ও জীবনের সম্পদ। রাসূলুল্লাহ (সা) কতইনা যথার্থ বলেছেন,

اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

'দুনিয়া হচ্ছে, সম্পদ। দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে, নেক স্ত্রী।' (মুসলিম)

অন্য আরেক হাদীসে নেক স্ত্রীর ব্যাখ্যা এসেছে যে, 'তুমি তার দিকে তাকালে আনন্দ পাও, তাকে কোন শপথ করালে সে তা পূরণ করে এবং তুমি তার থেকে দূরে গেলে সে নিজের এবং তোমার সম্পদের হেফাজত করে।' গুণবতী স্ত্রী যদি সুসজ্জিতা হয়, তাহলে তার দিকে তাকালে অধিক আনন্দ পাওয়া যাবে।

অতীত ইতিহাসে, মুসলিম নারীরা সমস্ত শরীর ও চুলের সাজগোজ করত। কেউ সৌন্দর্য চর্চা না করলে তাকে দুঃখিত ও পেরেশান বলে বিবেচনা করা হত যে, হয় তার স্বামী মারা গেছে, কিংবা সে স্বামী থেকে পালিয়ে এসেছে, অথবা স্বামীর প্রতি উপেক্ষা কিংবা নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুর কারণে দুঃখের মধ্যে পতিত হয়েছে। অথচ আল্লাহ কোরআন মজীদে বলেছেন, মহিলারা শিশুকাল থেকেই সাজগোজকে পছন্দ করে এবং এর মধ্যেই তারা লালিত পালিত হয়। সৌন্দর্য চর্চা ত্যাগ করা নারী চরিত্রের পরিপন্থী। আল্লাহ বলেন,

أَوَ مَنْ يُنَشَّأُ فِى الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ.

www.amarboi.org

'তারা কি এমন ব্যক্তিকে আল্লাহর জন্য বর্ণনা করে যে, অলংকারে লালিত পালিত হয় এবং বিতর্কে কথা বলতে অক্ষম।' (সূরা যুখরুফ : ১৮)

এই আয়াতে আল্লাহ– ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা-কাফেরদের এই বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তোমরা কি আল্লাহর জন্য এটা ছাড়া অন্য কোন কিছু পেলে না? এরা তো দুর্বল এবং তারা অলংকার ও সাজগোজের মধ্যে লালিত। এমনকি তারা বাক-বিতণ্ডায়ও দুর্বল। তারা পুরুষদের সাথে যুক্তি ও বিতর্কের ক্ষেত্রে দুর্বল। স্ত্রীলোকের স্রষ্টা এবং তাদের স্বভাব সম্পর্কে বিজ্ঞ মহান আল্লাহই তাদের ব্যাপারে এ সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ওসমান বিন মাজউনের স্ত্রী মেন্দী লাগাতেন এবং খোশবু ব্যবহার করতেন। এরপর তিনি তা ত্যাগ করেন এবং আমার কাছে আসেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার স্বামী কি উপস্থিত না সফরে গেছেন? তিনি উত্তর দেন, উপস্থিত আছে। কিন্তু ওসমান না দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী, আর না স্ত্রীর প্রতি। হযরত আয়েশা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার কাছে আসলে আমি তাকে বিষয়টি বললাম। তিনি ওসমানের সাথে সাক্ষাত করেন এবং জিজ্ঞেস করেন, হে ওসমান! আমরা যা বিশ্বাস করি তুমিও কি তা বিশ্বাস কর? তখন ওসমান বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! তখন তিনি বলেন, তাহলে, তুমি আমাদের অনুসরণ কর।' (আহমদ)

এ হাদীসের ঘটনা থেকে বুঝা যায়, হযরত আয়েশা ওসমান বিন মাজউনের স্ত্রীর জন্য স্বামীর উপস্থিতিতে তার রূপচর্চা ও সাজ-সজ্জা ত্যাগ করাকে অপছন্দ করেছেন। এদিকে, বিষয়টিকে ইসলামের শিক্ষা মাফিক প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) ও হস্তক্ষেপ করেন।

বোখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসের সারাংশ হচ্ছে, হযরত সালমান আল-ফারেসী আবু দারদার সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হন। (হিজরতের পর এরকম ঘটেছে) সালমান আবু দারদার সাথে সাক্ষাত করতে যান কিন্তু তাঁকে পাননি। তিনি তাঁর স্ত্রীকে সাদামাটা ও সাজগোজ হীনভাবে দেখতে পান। তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। স্ত্রী বলেন, দুনিয়া কিংবা স্ত্রীর প্রতি আবু দারদার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে সর্বদা রোজা রাখে এবং নামাজ পড়ে। তারপর যখন আবু দারদা ঘরে ফিরেন, তখন সালমানের জন্য খাবার প্রস্তুত করেন। আবু দারদার রোজা ভাংগার আগ পর্যন্ত সালমান খেতে অস্বীকৃতি জানান। আবু দারদা তাঁর সাথে একত্রে খান। তারপর রাত হলে, রাতের ১ম ভাগে আবু দারদা

www.amarboi.org

তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার ইচ্ছা করেন কিন্তু সালমান তাঁকে রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশের আগে নামাজ পড়তে নিষেধ করেন। তারপর সালমান তাঁকে বলেন, তোমার উপর তোমার রবের, তোমার শরীরের এবং স্ত্রীর হক আছে। প্রত্যেককে তার হক বা অধিকার দিয়ে দাও। তারপর আবু দারদা রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে যান এবং হযরত সালমানের কথাগুলো শুনান। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, সালমান সত্য বলেছে।

আল্লামা আসমায়ী বলেন, আমি গ্রামীণ এলাকায় এক বেদুইন মহিলাকে লাল জামা পরিহিতা অবস্থায় সাজগোজ সহকারে দেখলাম। তার হাতে তাসবীহর ছড়া। তখন আমি বললাম : তাসবীহর ছড়া সাজগোজের সাথে মানানসই নয়। তখন মহিলাটি কবিতার মাধ্যমে জবাব দেন,

'আল্লাহর কসম! আমার একটি বিষয়কে আমি ছেড়ে দিতে পারি না, পক্ষান্তরে, আমার অবসর সময়ের অন্য একটি দিক রয়েছে। আসমায়ী বলেন, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি একজন নেককার স্ত্রীলোক এবং তিনি নিজ স্বামীর জন্য সাজগোজ ও রূপচর্চা করেন।

মোটকথা, আদর্শ স্ত্রী স্বামীর চোখ শীতল করে এবং সংসারে বেহেশতের সুখ-শান্তি সৃষ্টি করে। তাই গুণবতী স্ত্রী কাম্য। অপরদিকে, চালবাজী ও চাপাবাজি করে কৃত্রিম প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করলে ঘরে অশান্তি এবং দোজখের আগুন জ্বলতে থাকে।

www.amarboi.org

স্ত্রীদের সাজ-সজ্জা

জায়েয ও নাজায়েয সাজ-সজ্জা

জায়েয সাজ-সজ্জা

জায়েয সাজ-সজ্জার লক্ষ্য হচ্ছে, স্ত্রীর রূপ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা। সৌন্দর্য চর্চার উপাদান অনেক। যেমন, পোশাক, গয়না-অলংকার, সুঘ্রাণ, দুহাত ও পায়ে মেন্দীর রঙ লাগানো, সুরমা ব্যবহার করা, মুখে ক্রীম, পাউডার কিংবা চুলে বিভিন্ন রং লাগানো ইত্যাদি। তবে চুলে কাল রং লাগানো ঠিক নয়, এটা মাকরূহ। শর্ত হল, কাউকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে নয়। যদি এর মাধ্যমে ধোঁকা দেয়া হয়, তাহলে তা জায়েয হবে না। এছাড়াও চুলের কাঁটা ব্যবহার, মেকআপ করা ইত্যাদি বৈধ সকল রূপচর্চা জায়েয।

ঘরে সাজতে স্ত্রীদের অনীহা ও তার কারণ

বহু স্ত্রী ঘরে সাজ-সজ্জা করে না এবং এক্ষেত্রে বিরাট অনীহা প্রকাশ করে। স্বামীদের অভিযোগেরও শেষ নেই যে, স্ত্রীরা তাদের আগ্রহ অনুযায়ী ঘরে সাজে না। কিন্তু তারা ঘরের বাইরে যাওয়ার জন্য খুবই সাজে। স্বামীর জন্যই স্ত্রীকে সাজতে হবে। স্বামীই স্ত্রীর সাজ-সজ্জার সর্বাধিক অধিকারী। এর বিপরীত যদি স্ত্রী বাইরে যাওয়ার সময় সুন্দর ও উত্তম পোশাক পরে, প্রসাধনী ও সুগন্ধি লাগায়, অলংকার পরে, দামী জুতা-মোজা পরে ও ভ্যানিটি ব্যাগ বহন করে তাহলে, এর উদ্দেশ্য এটা ছাড়া আর কি হতে পারে যে, তারা অন্যান্য মহিলা কিংবা পুরুষদের সামনে নিজেদেরকে সুন্দরী ও যোগ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করে? পক্ষান্তরে, ঘরে এ ব্যাপারে চরম অবহেলা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করে। ঘরে না সুন্দর পোশাক ও অলংকার পরে, আর না উত্তম প্রসাধনী ব্যবহার করে কিংবা সুগন্ধি লাগায়, আর না চুলকে উত্তম উপায়ে সিঁথি করে। ঘর যেন তার সৌন্দর্যের মালগুদাম, সৌন্দর্যের সকল উপায়-উপকরণ বাক্সবন্দী। স্বামীকে নিজ সৌন্দর্য প্রদর্শন থেকে বঞ্চিত রাখার পরিকল্পনা ছাড়া এর পেছনে আর কি লক্ষ্য থাকতে পারে?

দেখা যাবে যে, স্ত্রী ঘরে অব্যাহতভাবে একই কাপড়, কিংবা পুরাতন কাপড় পরছে অথবা নিকৃষ্ট এবং সৌন্দর্যবিহীন পোশাকটাই বারবার পরছে, এমতাবস্থায়, বাইরের কোন মহিলা মেহমান আসলে ঐ পোশাকে তাকে স্বাগত

www.amarboi.org

জানাতে লজ্জা পায়। তখন অন্য কাপড় বদল করে মেহমানের সামনে হাজির হয়। অথচ, মূল্যবান ও দামী পোশাক কেনার জন্য স্বামীর মাথার ঘাম পায়ে ফেলা অর্থ ব্যয় হলেও সে স্বামীর মনের সন্তুষ্টির প্রতি কোন গুরুত্ব নেই।

ঘরে স্ত্রী চুলকে সুন্দর করে সিঁথি করে না। বরং আওলাকেশী অবস্থায় থাকে, কিন্তু কোন অনুষ্ঠানে গেলে চুলের খুব সুন্দর সাজগোজ করে। অনেকে বিউটি পার্লারে গিয়ে সেজে আসে।

বহু স্ত্রী ঘরে মাসের পর মাসও স্বর্ণলংকার বা মূল্যবান গয়না পরে না। কিন্তু বাইরে যাওয়ার সময় তা পুরোই পরে।

শুধু তাই নয়, প্রসাধনীর ব্যাপারে দেখা যায়, বাইরে যাওয়ার সময় নিজের চেহারাকে রঙ্গিন কোন জিনিসের অংশ বানিয়ে নেয়। কিন্তু ঘরে তার ধারে পাশেও হাঁটে না। সুগন্ধির ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। বাইরে যাওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করলে পর পুরুষের নাকে এর ঘ্রাণ যাবে। তখন সেই স্ত্রীর গুণাহ হবে যেনাকারিণীর মত।

কোন কোন স্ত্রী সর্বদাই ঘরে স্বামীর জন্য সাজতে অনাগ্রহী। বড় জোর নিজেকে হয়তো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। যেমন, মাসিক স্রাব, নেফাস কিংবা সফরে যাওয়ার মত বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা রক্ষার চেষ্টা করে।

এখন প্রশ্ন হল, স্ত্রী কেন ঘরে সেজেগুজে সুন্দরভাবে চলতে অনীহা প্রকাশ করে? এ অবহেলার কারণ কি?

এ অনীহা ও অবহেলার কয়েকটা কারণ হতে পারে এবং এ কারণগুলোর যে কোনটা যে কোন স্ত্রীর সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

১. স্ত্রী স্বামীর অধিকারের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণ করে না। অথচ স্বামীর এ বিরাট অধিকার তুচ্ছ করা স্ত্রীর জন্য বিরাট গুণাহ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়। স্ত্রীর এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পেছনে যে সকল বিষয় কাজ করে তাহল, তার উপযুক্ত জ্ঞান ও শিক্ষার অভাব, নিজ পরিবার, বিদ্যালয় ও প্রচার মাধ্যমে নেতিবাচক প্রভাব, দীনের প্রতি উদাসীন, বস্তুবাদী বান্ধবীর সাহচর্য, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যৌন চাহিদা বৃদ্ধির আশংকার মত অত্যন্ত মারাত্মক কুসংস্কার।

২. স্ত্রী সাজলে স্বামী যদি তার সৌন্দর্যের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ না করে, তখন স্ত্রী হতাশা ও বিরক্তি বোধ করে সাজা ছেড়ে দেয়।

৩. ঘরে সাজলে স্ত্রীর নুতন ও সুন্দর পোষাক নষ্ট কিংবা দামী প্রসাধনী শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা। কিন্তু এটা সে বুঝেনা যে, স্বামী সন্তুষ্ট থাকলে এবং এগুলো

www.amarboi.org

শেষ হয়ে গেলে পুনরায় স্বামীকে দিয়ে সেরূপ সুন্দর জিনিস কেনা ও সংগ্রহ করা সম্ভব।

৪. ঘরের বাইরের কাজে স্ত্রীর অধিক ব্যস্ততার কারণে সে ঘরে সাজতে পারে না। হয় স্ত্রী চাকুরী করে, সামাজিক কাজে ঘন ঘন ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, তখন সে ঘরে সাজার জন্য সময় পায় না।

৫. স্বামী বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে ঘরের বাইরে সময় কাটায়। ফলে, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও স্ত্রী স্বামীর জন্য সাজার সুযোগ পায় না।

৬. স্ত্রীর অক্ষমতা ও অলসতার কারণে স্বামীর জন্য সাজে না।

স্বামীদের জন্য স্ত্রীদের কেন সাজা উচিত?

১. **নেককার স্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা :** রাসূলুল্লাহ (সা) নেক স্ত্রী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'দুনিয়া হচ্ছে সম্পদ । দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে নেক স্ত্রী।' এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নেককার স্ত্রী কাকে বলে? রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং নেককার স্ত্রীর নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন : 'আমি কি তোমাদেরকে পুরুষের সর্বোত্তম সম্পদ কি সে বিষয়ে বলবো না? আর তা হচ্ছে, নেক স্ত্রী-যার দিকে নজর করে স্বামী খুশী হয়, স্বামী যা আদেশ করে স্ত্রী তার হুকুম পালন করে এবং স্বামী দূরে চলে গেলে সে স্বামীর সহায়-সম্পত্তি হেফাজত করে।'

এ হাদীসে স্ত্রীকে দেখে স্বামী খুশী হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। সে খুশী কখন ও কিভাবে অর্জিত হয়? তা অর্জিত হয় স্ত্রীর হাসিমুখ, উষ্ণ সম্বর্ধনা, সুন্দর সাজ এবং উত্তম সুগন্ধির মাধ্যমে।

২. স্বামী নিজ স্ত্রী এবং সন্তানদের ভরণ-পোষণ ও ব্যয় নির্বাহের জন্য দিন-রাত কষ্ট করে। কষ্টার্জিত অর্থ থেকেই সে স্ত্রীর জন্য সুন্দর পোশাক-আশাক, গয়না-অলংকার এবং প্রসাধনী কিনে। যে স্বামী এত কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে, সে স্বামীর কি স্ত্রীর সৌন্দর্য উপভোগের অধিকার নেই? যা উপভোগ করলে তার কষ্ট কিছুটা লাঘব হতে পারত?

৩. আল্লাহ্ নিজ বান্দাহর উপর তার নেয়ামতের নিদর্শন দেখতে চান। এ মর্মে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি হাদীস বর্ণিত আছে। স্ত্রী ঘরে সেভাবে সেজেগুজে না চললে ঐ হাদীসের উপর আমল করা হয় না।

৪. সাজের মধ্য দিয়ে স্ত্রী নিজ আত্মার প্রশান্তি ও মানসিক শান্তির প্রকাশ ঘটাবে। তার স্বামীর জন্য এ মহান দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হওয়া দরকার।

www.amarboi.org

৫. মায়ের উচিত, নিজে সেজে নিজ মেয়ে সন্তানদেরকে এই অধিকার পালনের শিক্ষা দেয়া। তারা মাকে অনুরূপ করতে দেখে ভবিষ্যতে নিজেরাও এর অনুসরণ করবে।

স্ত্রীরা তখন এ অধিকার যথাযথভাবে পালন করতে পারবে যখন তারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবে,

১. স্বামীর অধিকার সম্পর্কে জানা ও এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা।

২. স্বামীর এ অধিকার পালনের মাধ্যমে সওয়াবের নিয়ত করা। কেননা, বান্দার যে কোন আমলের সওয়াব তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, اِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ

৩. খারাপ ও বিভ্রান্তিকর ফিল্ম না দেখা।

৪. দ্বীনদার মহিলা সাথীর সাথে চলাফেরা করা। তাহলে তারা তাকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দেবে।

৫. লোক দেখানোর মনোভাব দূর করা। বাইরে সেজেগুজে যাওয়ার উদ্দেশ্য লোক দেখানো ছাড়া আর কিছুই নয়। আর লোক দেখানোর কাজ হচ্ছে, ছোট শিরক।

৬. আল্লাহর কাছে নেককার মহিলা হবার দোয়া করা।

স্বামীদেরও উচিত, সমস্যা জেনে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। স্ত্রী সাজলে স্বামীর উচিত, তার সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্যের প্রশংসা করা। কোন সময় যদি স্ত্রী সন্তান ও ঘরের কাজের চাপে এবং সময়ের অভাবে সাজতে না পারে তাহলে, সে বিষয়ে স্ত্রীকে সাহায্য করা এবং তার কাজ হালকা করে দেয়া যেন সে সাজার সময় পায়।

স্ত্রীদের সাজা যেমন স্বামীদের কাছে প্রিয়, তেমনি স্বামীর সাজাও স্ত্রীর কাছে প্রিয়। সে জন্য ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, 'আমি আমার স্ত্রীর জন্য সেরূপ সাজি, যেমন করে আমার স্ত্রী আমার জন্য সাজে। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

'আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। (সূরা বাকারা : ২২৮)

www.amarboi.org

কুরতুবী ইবনে আব্বাসের উক্তি সম্পর্কে যা বলেন তার সংক্ষিপ্ত সার হল, স্বামীর উচিত, স্ত্রীর কাছে এমন সুন্দরভাবে সাজা যা স্ত্রীকে আনন্দ দান করবে এবং অন্য কোন পুরুষের প্রতি তার কোন আকর্ষণ হবে না। স্বামীর উচিত, সুগন্ধি লাগানো, মেসওয়াক করা, দাঁড়ি খেলাল করা, শরীরের ও কাপড়ের ময়লা আবর্জনা দূর করা, চুলের সৌন্দর্য চর্চা করা এবং নখ পরিষ্কার করা। এগুলো হচ্ছে, স্বভাবজাত ও প্রকৃতিসম্মত কাজ।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি ধূলা-মলিন ও আওলাকেশী অবস্থায় নিজ স্ত্রী সহ ২য় খলিফা হযরত ওমার বিন খাত্তাবের কাছে প্রবেশ করেন। স্ত্রী হযরত ওমার (রা) কে তাদের বিয়ে বিচ্ছেদের আহ্বান জানান। হযরত ওমার স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর অসন্তুষ্টি বুঝতে পেরে স্বামীকে গোসল করা এবং নখ কাটার নির্দেশ দেন। স্বামী এগুলো সেরে আসলে তিনি তাকে স্ত্রীর কাছে যাওয়ার আদেশ দেন। যে স্ত্রী ইতিপূর্বে তাকে ঘৃণা ও অপছন্দ করত, সে স্ত্রী স্বামীকে সুন্দর ও পরিবর্তিত অবস্থায় দেখতে পেয়ে চুমো খান এবং বিচ্ছেদের দাবী প্রত্যাহার করেন। তখন ওমার (রা) বলেন,

وَهَكَذَا فَاصْنَعُوْا لَهُنَّ فَوَاللهِ اِنَّهُنَّ لَيُحْبِبْنَ اَنْ تَتَزَيَّنُوْا لَهُنَّ كَمَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَتَزَيَّنَ لَكُمْ.

'তোমরা স্ত্রীদের জন্য এরূপই কর। আল্লাহর শপথ! তোমরা যেমন তাদের সাজা পছন্দ কর, তারাও তোমাদের সাজা পছন্দ করে।'[১]

স্বামীদের একথা জানা উচিত যে, স্ত্রীদের মনোভাব খুবই সংবেদনশীল। যে কোন ভাল কিংবা মন্দ কথা তাদের মনে পুরুষদের চাইতে বেশী দাগ কাটে। তাই স্ত্রীদের সাজ-সজ্জার প্রতি স্বামীর যত্ন ও প্রশংসার প্রয়োজন রয়েছে।

বিদেশ সফর থেকে ফিরে গেলে স্ত্রীর জন্য কিছু ভাল উপঢৌকন নিয়ে যাওয়া উচিত। এছাড়াও স্ত্রীর মনে কোন খটকা সৃষ্টি হলে স্বামীর সাথে উন্মুক্ত মন নিয়ে তা আলোচনা করা জরুরী। স্ত্রী যেন সাজ-সজ্জার নামে স্বামীর অভাব ও অক্ষমতাকে আরও বাড়িয়ে না দেয়। সামর্থের ভেতর থেকেই সব কিছু করতে হবে।

---

১. সাপ্তাহিক আদদাওয়াহ-সংখ্যা ১৫২১, ১৪ই ডিসেম্বর-১৯৯৫, রিয়াদ, সৌদী আরব।

www.amarboi.org

নিষিদ্ধ ও নাজায়েয রূপচর্চা

নিষিদ্ধ সৌন্দর্য চর্চা দু'প্রকার।

১. যার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করা হয়।

বোখারী এবং মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ বিন মাসউদের বিশুদ্ধ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এটি নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ اَلْمُغَيِّرَاتِ لِخَلْقِ اللّٰهِ فَقَالَتْ لَهُ إِمْرَأَةٌ فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ وَمَالِيْ لاَ اَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

'আল্লাহ শরীর খোদাইকারিণী নারী এবং তা প্রার্থনাকারিণী নারী, চোখের ভ্রূ তোলার জন্য প্রার্থনাকারিণী নারী, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দাঁত ধারকারিণী নারী এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তনকারিণী নারীর উপর লা'নত বর্ষণ করেছেন। তাঁকে একজন মেয়েলোক বলল, যাকে আল্লাহর রাসূল অভিসম্পাত দিয়েছেন তাকে আমরা কেন অভিসম্পাত দেবো না?'

শরীর খোদাইকারিণী নারী চামড়ার ভেতর সুঁই ঢুকিয়ে তাতে নীল জাতীয় কিছু প্রবেশ করায় যেন ঐ অংশের রং নীল হয়ে যায়। আল্লাহ তাদের উপর অভিসম্পাত এবং যে মহিলারা তা করার আবেদন জানায় তাদেরকেও লা'নত দিয়েছেন। অপর দিকে অন্য কোন মহিলার কাছে নিজ চোখের ভ্রূ চিকন করার লক্ষ্যে তা তোলার আবেদনকারিণী মহিলাকে 'মোতানাম্মেসা' বলা হয়। তা হারাম এবং এর উপর আল্লাহর লা'নত। তবে নারীর মুখমণ্ডল থেকে পশম অথবা দাঁড়ী ও গোঁফ ফেলা মোস্তাহাব। কেননা, এগুলো নারীর প্রাকৃতিক চুলের অন্তর্ভুক্ত নয়। দাঁতের মধ্যে সামান্য ফাঁক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যারা দাঁত ধার দিয়ে চিকন করে তাদের উপরও আল্লাহ লা'নত বর্ষণ করেন।

ইবনে ওমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ.

www.amarboi.org

'আল্লাহ্ অন্য মানুষের চুল সংযোগকারিণী নারী এবং তার জন্য আবেদনকারিণী মহিলাসহ শরীর খোদাইকারিণী নারীর উপর লা'নত বর্ষণ করেন।' (বোখারী, মুসলিম)

অন্য মানুষের চুলের সংযোগ হারাম। তবে মানুষ ছাড়া যদি অন্য কোন প্রাণীর চুলের সংযোগ দেয় তাহলে, অধিকাংশের মতে তা হারাম। তবে শাফেঈ' মাযহাবের কিছু সংখ্যক ওলামা, স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে এটাকে জায়েয বলেছেন।

এসবের হারাম হওয়ার কারণ হল, এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি ঘটানো হয়। পরচুলা ব্যবহারের হুকুমও অনুরূপ। কেননা, এটা আল্লাহর সৃষ্টির পূর্ণ বিকৃতি। তবে মানুষ ব্যতীত অন্য প্রাণীর চুল হলে কিছু সংখ্যক শাফেঈর মতে তা জায়েয।

২. রূপ-সৌন্দর্য দেখা হারাম-এমন লোকজনের উদ্দেশ্যে সৌন্দর্য চর্চা করা : যাদের জন্য সৌন্দর্য চর্চা করা যায়েজ তারা হল, স্বামীসহ ঐ সকল পুরুষ যাদের সাথে মেয়ে লোকের বিয়ে চিরস্থায়ীভাবে হারাম। তারা হচ্ছে : নিজ বাপ, ভাই, ছেলে, ছেলের ছেলে, শ্বশুর, স্বামীর ছেলে ইত্যাদি। শর্ত হল, ঐ ব্যক্তিকে আমানতদার হতে হবে যিনি আল্লাকে ভয় করেন। তারা ফাসেক ও গুণাহগার হলে তাদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করা জায়েয নেই, সেটা নিজ ভাই হলেও না। এ জাতীয় বহু দুর্ঘটনার তথ্য আমাদের কাছে রয়েছে।

অনুরূপভাবে, তারা মুসলিম মহিলাদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে। তবে, অমুসলিম মহিলাদের সামনে সৌন্দর্য প্রদর্শনের বিষয়ে মতভেদ আছে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আয়াতটিই হচ্ছে, ভিত্তি। আল্লাহ বলেছেন,

وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ او التَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُوْلِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَو الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ.

'তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনা, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত দাসী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা

www.amarboi.org

নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত অন্য কারুর কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।' (সূরা আন নূর : ৩১)

স্ত্রীলোক যদি এ সকল লোক ছাড়া অন্যদের সামনে সুসজ্জিতাবস্থায় আসে, তাহলে তা গুণাহ হবে, যতবার এভাবে সৌন্দর্য প্রকাশ করবে ততবারই গুণাহ হবে। আল্লাহ বলেছেন,

وَلاَ تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْاُوْلٰى.

'তোমরা প্রথম জাহেলী যুগের অনুরূপ নিজেদের' সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না।' (সূরা আহযাব : ৩৩)

আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসলূল্লাহ (সা) বলেছেন,

كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ اِذَا اسْتَعْطَرَتَ فَمَرَّتْ بِالْـمَجْلِسِ كَذَا وَكَذَا زَانِيْةٌ.

'প্রত্যেক চোখ যেনা করে। মেয়েলোক যখন সুগন্ধি মেখে কোন মজলিশের পাশ দিয়ে এভাবে ওভাবে অতিক্রম করে, সেও যেনাকারিণী।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

নাসাঈ ইবনু খোযাইমা এবং ইবনু হিব্বানের এক বর্ণনায় এসেছে,

اَيُّمَا اِمْرَأَةٍ اِسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلٰى قَوْمٍ لِيَجِدُوْا رِيْحَهَا فَـهِىَ زَانِيَـةٌ وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ.

'কোন স্ত্রীলোক সুগন্ধি মেখে কোন সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে যদি এজন্য অতিক্রম করে যে তারা তার কাছ থেকে সুঘ্রাণ লাভ করবে তাহলে সে যেনাকারিণী। আর প্রত্যেক চোখ যেনা করে।'

এর অর্থ হল, সে যেনার দিকে আহ্বানকারিণী। এ জাতীয় তৎপরতার জন্য সে ফাসেক ও গুণাহগার হবে। 'চোখ যেনা করে' এর অর্থ হল, স্ত্রীদের নিষিদ্ধ সতরের দিকে তাকানো গুণাহ। কেননা, হারাম দৃষ্টি যেনার কারণ এবং যৌন কামনা সৃষ্টির উপায়।

www.amarboi.org

ইবনু খোযাইমা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لاَيَقْبَلُ اللهُ مِنْ اِمْرَأَةٍ صَلاَةً خَرَجَتْ اِلَى الْمَسْجِدِ وَرِيْحُهَا تَعْصِفُ حَتّٰى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ.

অর্থ : 'আল্লাহ সেই স্ত্রীলোকের নামাজ কবুল করবেন না, যে সুগন্ধি মেখে তার ঘ্রাণ বাতাসে ছড়িয়ে মসজিদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেছে, যে পর্যন্ত না সে ঘরে ফিরে আসে ও গোসল করে।'

এটা হল, মসজিদে যাওয়ার পরিণতি। কিন্তু যে মহিলারা সুঘ্রাণ ছড়িয়ে খোলামেলা পুরুষের মজলিশ কিংবা অনুষ্ঠান অথবা তাদের ক্লাব ও ঘরে যায় তাদের অবস্থা কি হবে?

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا، قَوْمٌ مَّعَهُمْ سِيَاطٌ كَاَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ، رُؤُوْسُهُنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَيَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَيَجِدْنَ رِيْحَهَا وَاِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا.

'দোজখের দু'প্রকার লোককে (দুনিয়ায়) দেখিনি। এক প্রকার হচ্ছে, যাদের কাছে গরুর লেজের মত লম্বা লাঠি রয়েছে এবং এর দ্বারা তারা লোকদেরকে মারে। ২য় প্রকার হচ্ছে, সেই সকল স্ত্রীলোক যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ, গুণাহর প্রতি ঝোঁক প্রবণ এবং অন্যদেরকেও গুণাহর প্রতি আকৃষ্টকারিণী, তাদের মাথার খোঁপা অহংকারী উটের কুজের মত উঁচু। তারা না বেহেশতে যাবে আর না বেহেশতের ঘ্রাণ পর্যন্ত পাবে। অথচ বেহেশতের ঘ্রাণ তো এত এত দূরের পথ থেকেও পাওয়া যায়।' (মুসলিম)

রাসলূল্লাহর (সা) এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে। কেননা, তাঁর উম্মতের মধ্যে এ দু'ধরনের লোকের আবির্ভাব ঘটেছে।

১. লাঠি দিয়ে জাতির লোকদেরকে মারার ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ শাসকগণ জনগণের উপর অত্যাচার-নির্যাতন চালায়।

www.amarboi.org

২. কাপড় পরেও যে স্ত্রীলোক উলঙ্গ থাকে, এর অর্থ হল, শরীরের কিছু অংশ ঢাকে আর কিছু অংশ খোলা রাখে অথবা এমন পাতলা কাপড় পরে যে, শরীরের ভেতর দেখা যায় কিংবা তা এত সংকীর্ণ যে, স্ত্রীলোকের শরীরের উঁচু-নীচু অংশ পরিষ্কার দেখা যায়।

এ জাতীয় মেয়েলোক নিজেরা গুণাহ করে এবং অন্যদেরকেও গুণাহর প্রতি আকৃষ্ট করে যেন অন্যরাও তাদের মত উলঙ্গপনাকে পছন্দ করে। তাছাড়া তারা বিউটি পার্লারে গিয়ে উটের কুজের মত উঁচু করে খোঁপা বাঁধে এবং গর্ব ও অহংকার সহকারে অন্যের কাছে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করে। তাই তাদের শাস্তি হল, তারা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং তারা বেহেশত থেকে এত দূরে থাকবে যে এর ঘ্রাণও পাবে না। অন্য হাদীসে এসেছে, ৫শ' বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকেও বেহেশতের ঘ্রাণ পাওয়া যাবে।

স্ত্রীলোকের এ বর্বর আচরণের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

اَلْعِنُوْهُنَّ فَاِنَّهُنَّ مَلْعُوْنَاتٌ.

'তাদেরকে অভিশম্পাৎ দাও কেন না, তারা অভিশপ্ত।' (ইবনে হিব্বান, হাকেম)

'অভিশপ্ত' অর্থ আল্লাহর রহমত থেকে বিদূরিত।

প্রত্যেক মুসলিম মহিলার কর্তব্য হল, সৌন্দর্য চর্চাকে নিজ স্বামী পর্যন্ত সীমিত রাখা। তবে মোহরম ব্যক্তিদের পর্যন্ত তা সম্প্রসারিত করতে দোষ নেই। এছাড়া অন্যদের সামনে সাজ-গোজের কোন সুযোগ নেই।

সতর্কতা

১) বিয়ের আগে বাপ, মা ও ভাইসহ যারা অভিভাবক, মেয়েরা তাদের দায়িত্বে থাকবে। আর বিয়ের পরে তারা নিজ স্বামীর দায়িত্বে থাকবে। মেয়েরা গুণাহ ও মন্দ কাজ করলে তাদেরকে তা থেকে বিরত রাখা দায়িত্বশীলদের কর্তব্য এবং স্বামীর ওপর ফরজ হল, স্ত্রীকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা।

২) মেয়েদের বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল ধরানোর লক্ষ্যে মেয়ের আত্মীয়-স্বজনের হস্তক্ষেপ করা হারাম। মেয়ের বাপ ও স্বামীর পক্ষ থেকে কোন আদেশ করা হলে প্রথমে স্বামীর আদেশ পালন করা ফরজ। পরে বাপের। আর যদি বাপ ও স্বামীর আদেশ বিপরীতমুখী ও সংঘর্ষমুখর হয়,

www.amarboi.org

তাহলে, স্বামীর আনুগত্য করাই ফরজ। কেননা, স্ত্রী তখন বাপের দায়িত্ব থেকে স্বামীর দায়িত্বে স্থানান্তরিত হয়ে যায়।

৩) সংশ্লিষ্ট দেশের আচার-আচরণ ও নিয়ম অনুযায়ী স্ত্রী নিজের এবং স্বামীর সেবা করবে। স্ত্রীকে স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের সেবার জন্য বাধ্য করা যাবে না। এতে করে স্ত্রী স্বামীর খেদমতের সুযোগ পায়না এবং খেদমতের যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলে।

৪) স্ত্রী স্বামীর সাথে পৃথক বাড়ীতে বাস করার অধিকার রাখে। এতে করে স্বামীর সাথে স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়। অবশ্য অভাবের কারণে অনেক সময় তা সম্ভব নাও হতে পারে।

৫) স্বামীর মা, বাপ, দাদা-দাদী, নানা-নানী, ফুফু-খালাসহ অন্যান্য আত্মীয়দেরকে সম্মান-শ্রদ্ধা করা স্ত্রীর কর্তব্য। তারা স্বামীর ঘরে স্ত্রীর আত্মীয়ের চাইতে বেশী অধিকারের দাবীদার। তাই কোন অবস্থাতেই স্ত্রী যেন স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করে কিংবা বৈরীভাব সৃষ্টির চেষ্টা না চালায়। কোন কোন সময় স্ত্রী স্বামীর সাথে তার আত্মীয়দের সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি এবং নিজ পক্ষের আত্মীয়দেরকে কাছে টানার চেষ্টা করে। এটা গুণাহর কাজ। আত্মীয়তার হক আদায় করা জরুরী। তাই স্ত্রী যেন এ পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়।

মূলতঃ সেই স্ত্রীই উত্তম যে, উভয়পক্ষের আত্মীয়ের মধ্যে ভারসাম্য ও সম্প্রীতি রক্ষা করে চলতে সক্ষম।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার অশান্তি ও বিরোধ দূর করার উপায়

যদি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ কিংবা দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টি হয় এবং সে জন্য বনিবনা না হয়, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক এর সমাধান করতে হবে। নিজের কুপ্রবৃত্তি কিংবা শয়তানের আকাংখা অনুযায়ী ফয়সালা করা যাবে না। বরং সমাধানের পদ্ধতি হল; যদি স্ত্রী ঝগড়া-বিবাদ ও বিরোধের কারণ হয়, তাহলে স্বামীর উচিত, স্ত্রীকে তার দায়িত্ব কর্তব্যের বিষয়ে ওয়াজ-নসীহত করে বুঝানো এবং তাকে আল্লাহর আজাব, গযব ও শাস্তির ভয় দেখানো। এতে যদি উপকার না হয়, তাহলে স্ত্রীকে বয়কট করতে হবে। অর্থাৎ এক বিছানায় শোয়া যাবে না, আর এক বিছানায় শুলেও তার দিকে মুখ করে নয়, বরং পিঠ দিয়ে

www.amarboi.org

শুবে। স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক রাখবে না এবং হাসি-ঠাট্টাও করবে না। স্বামীর ভিন্ন কক্ষে শোয়াই উত্তম। এভাবে তিনদিন থেকে ১ মাস পর্যন্ত অব্যাহত রাখবে, এর অধিক নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ স্ত্রীদের সাথে অনুরূপ করেছেন। অর্থাৎ একমাস যাবত বয়কট করেছেন। যদি বয়কটে কোন উপকার না হয়, তাহলে, তাকে না মেরে তার বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে হবে যে পর্যন্ত সে নিজের ভুল বুঝে এবং স্বামীর অধিকারের বিষয়ে নিজেকে জালেম অনুভব করে। তারপর যদি স্বামীর বাড়ীতে পরিশুদ্ধ হয়ে ফিরে আসে তাহলে, বিরোধের অবসান হয়ে গেল। আল্‌হামদুলিল্লাহ।

যদি তাতেও কাজ না হয় এবং মারলে যদি উপকার হয় তাহলে, স্ত্রীকে মারতে হবে। কোরআনে স্ত্রীকে মারার বিষয়ে বর্ণিত আল্লাহর আদেশের ব্যাখ্যায় একদল ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, স্ত্রীকে শুধুমাত্র হাত দিয়ে মারবে। অন্য একদল মেসওয়াক দিয়ে মারার কথা বলেছেন। মেসওয়াক সাধারণতঃ এক বিঘত লম্বা ও এক আঙ্গুল মোটা হয়। আরেকদল আলেম বলেছেন, এক হাত লম্বা মেসওয়াক দিয়ে মারতে হবে। এটা হচ্ছে, মারের লাঠির সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য। আর মারের সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ১০। তবে শর্ত হল, যেন রক্ত বের না হয় এবং হাড় ভাঙ্গা না যায়। হাতের মার কিংবা লাঠির মার যাই হোক না কেন, সর্বাবস্থায় মুখে মারা যাবে না। মারের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, হালকা মার দেয়া যাবে, কঠোর মার নয়। মারের ব্যাপারে এই হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ। মারের লক্ষ্য হল, স্বামী-স্ত্রীর পরিবার-পরিজন হতে দূরে থেকে স্ত্রীকে সংশোধনের চেষ্টা করা। যাতে করে স্বামী-স্ত্রীর আবেগের বিস্ফোরণ, অন্যের হস্তক্ষেপ এবং পরস্পরের গোপন বিষয় প্রকাশিত না হয় এবং পরিস্থিতির ক্রমাবনতিকে ঠেকানো যায়। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ বলেছেন,

وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا.

'আর যে সকল স্ত্রীদের মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা কর, তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং মার দাও। যদি তাতে বাধ্য হয়ে যায়, তবে

www.amarboi.org

তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ।' (সূরা নিসা : ৩৪)

স্ত্রীকে মারা ইসলামী শরীয়তের সাধারণ ও স্বাভাবিক কোন আইন নয়। বরং জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান স্বামীর জন্য এটাকে সর্বশেষ চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে বৈধ করা হয়েছে। তবে যে সকল স্বামীরা বিনা কারণে স্ত্রীকে গাল-মন্দ করে এবং কঠোরভাবে মারে, তাদের জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ পশুর সাথেও কঠোর আচরণ পছন্দ করেন না। তারা ইসলাম, দয়া ও মানবতা থেকে বহু দূরে অবস্থান করে। তারাই ইসলামের মারাত্মক ক্ষতি করে। তাদেরকেই শাস্তি দেয়া দরকার এবং তাদের কাছ থেকেই প্রতিশোধ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এতক্ষণ আমরা বিরোধের জন্য স্ত্রী দায়ী হলে সে সমস্যার সমাধানের বিষয়ে আলোচনা করলাম। যদি স্বামী কিংবা স্বামী-স্ত্রী দু'জনই বিরোধের জন্য দায়ী হয় তাহলে, ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের পরিবার থেকে দু'জন সালিশকারী নিয়োগের নির্দেশ দেয়। তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সংশোধন ও সমঝোতার চেষ্টা চালাবেন। তাতেও যদি কোন লাভ না হয়, তাহলে, তালাক দিতে কোন আপত্তি নেই। আল্লাহ বলেন,

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ.

'কোন স্ত্রী যদি স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা অবহেলার আশংকা করে তাহলে, পরস্পর কোন সংশোধন ও সমঝোতা করে নিলে তাদের উভয়ের কোন গুনাহ নেই। বরং মিমাংসাই উত্তম।' (সূরা নিসা : ১২৮)

আল্লাহ আরও বলেন,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُّرِيْدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا.

'যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতির আশংকা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ পাঠাও। তারা উভয়ে মিমাংসা চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে সমঝোতা করে দেবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সব কিছু অবহিত।' (সূরা নিসা : ৩৫)

www.amarboi.org

স্ত্রী যদি স্বামীর মধ্যে দূরত্ব ও উপেক্ষা দেখে, তাহলে প্রথম আয়াতে তাকে একজন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে স্বামীর সাথে আপোষের ফর্মূলা বাতলানো হয়েছে। দাম্পত্য জীবনকে স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে, প্রয়োজনে স্ত্রী নিজের কিছু অধিকারের দাবী ত্যাগ করবে।

২য় আয়াতে বলা হয়েছে, যদি স্বামী-স্ত্রী দু'জনই বিরোধের জন্য দায়ী হয়, তাহলে বিচারক কাজী কিংবা অভিভাবক দু'জন ন্যায়পরায়ণ সালিশ পাঠাবে এবং তারা স্বামী-স্ত্রীর মতামতের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা কিংবা বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করবে।

দুনিয়ার অন্য কোন মতবাদ কিংবা আদর্শের মধ্যে এ জাতীয় নৈতিক চরিত্র পাওয়া যাবে না যা পরিবারের প্রতি দয়া এবং প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে ইসলামে পাওয়া যায়। আল্লাহর কাছে তালাক হল নিকৃষ্ট হালাল বস্তু। ইসলাম তালাকের জন্য কিছু নিয়ম কানুন রেখেছে যা স্ত্রীর দুঃখ-কষ্ট লাঘবে সহায়ক। আর তা হচ্ছে, বিচ্ছেদের কারণে যে কষ্ট হবে, তা দূর করার জন্য স্ত্রীকে হাদিয়া ও মোতআ' হিসেবে কিছু দিয়ে সম্প্রতির পরিবেশে বিদায় করতে হবে, ঘৃণা ও নির্মমতা সহকারে নয়।

দাম্পত্য জীবনকে সুখী ও মধুময় করার পদ্ধতি

দাম্পত্য জীবন সুখী হলে মধুর সংসার গড়ে উঠে। তবে তা নির্ভর করে পারিবারিক জীবনের সমস্যাগুলো দূর করার উপর। এক্ষেত্রে আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনকে উদাহরণ হিসেবে রাখতে হবে। তারপর সাহাবায়ে কেরামসহ অন্যান্য বুজুর্গ ও মনীষীদের দাম্পত্য জীবনকেও সামনে রাখা দরকার। কেননা, তাদের দাম্পত্য জীবন ছিল সুখী ও অনুকরণীয়। ঈমান ও চরিত্রের মাধুর্যে তাদের মত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন অযৌক্তিক চাহিদা, আচরণ ও সমস্যা বিরাজ করেনি কিংবা করলেও তা স্থায়ী হয়নি। বরং দ্রুত সমাধান হয়ে গেছে। দাম্পত্য সম্পর্ককে সুখী ও মধুময় করার পদ্ধতি অনেক। সেগুলো হচ্ছে,

১. নারীদের প্রকৃতি কিছুটা বাঁকা। তাই সেভাবে তাদেরকে চালাতে হবে। তাদের প্রকৃতি বিরোধী কাজ করলে অশান্তি আসতে বাধ্য। পুরুষকে তা অবশ্যই বুঝতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

www.amarboi.org

'আমার কাছ থেকে নারীদের সাথে ভাল ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ কর। তাদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের সেই উপরের হাড়টাই বেশী বাঁকা।' যদি তুমি তা সোজা করতে যাও, ভেঙ্গে ফেলবে, আর যদি ফেলে রাখ তাহলে সর্বদা বাঁকা থাকবে। তাই তোমরা নারীদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে।' (বোখারী ও মুসলিম) মুসলিম শরীফের আরেক বর্ণনায় এসেছে, হাড় সোজা করতে গিয়ে ভেঙ্গে ফেলা অর্থ হল, তালাক দেয়া।'

২. স্বামী বা স্ত্রীর দুইজন বা একজন যদি রাগান্বিত থাকে, তাহলে অন্যজনের উচিত চুপ থাকা এবং পরে শান্ত পরিবেশে কথা বলা। রাগের সময় কোন বিষয়ের সুষ্ঠ সমাধান হয়না। তাই শান্ত পরিবেশে যে কোন বিষয়ের সুরাহা করা উচিত। আবু যার (রা) তাঁর স্ত্রীকে বলেন, 'আমি রাগান্বিত হলে তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করবে এবং তুমি রাগান্বিত হলে আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করবো। নতুবা আমরা এক সাথে থাকতে পারবো না।'[১]

রাগের সময় কোন ঝগড়ার কারণে হঠাৎ করে তালাক দেয়ার চিন্তা করা উচিত নয়। শান্ত পরিবেশে ঐ সমস্যার সমাধান তালাক ছাড়াই সম্ভব। তালাককে দাম্পত্য জীবনের সমস্যার সামাধান মনে করা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং তালাকের মাধ্যমে পারিবারিক সমস্যা আরো জটিল হয়। এক হাদীসে বর্ণিত আছে। 'শয়তান সন্ধ্যায় তার আরশ নিয়ে সাগরে বসে এবং সকল শয়তানের কাছ থেকে পুরা দিনের কাজের রিপোর্ট গ্রহণ করে। সবাই বিভিন্ন রিপোর্ট পেশ করে। বড় শয়তান সেগুলো শুনে তাদেরকে বিদায় করে দেয়। এক শয়তান এসে রিপোর্ট করে যে, সে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তালাক সংঘটিত করেছে। বড় শয়তান তাকে কাছে নিয়ে বসায় ও সম্মান করে।' (মেশকাত) এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, পারিবারিক ভাঙ্গন সৃষ্টি করতে পারলে সেটা শয়তানের এক মহান কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। কেননা, একজন লোককে একটা নেক থেকে দূরে রাখতে পারলে একটা গুনাহ হয়। কিন্তু তালাকের মাধ্যমে অসংখ্য গুনাহর রাজপথ ও বহু সমস্যার জন্ম দেয়া যায়। আর শয়তান সেটাই চায়। তাই আমাদেরকে তালাক দেয়ার আগে সংশোধন ও সমঝোতার চেষ্টা করতে হবে।

৩. স্বামীর উচিত স্ত্রীর ত্রুটিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। কেননা, দোষ-ত্রুটিমুক্ত কোন পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী বেহেশত ছাড়া দুনিয়ায় পাওয়া মুশকিল। তাই স্ত্রীর

---

[১] সাপ্তাহিক আদ্‌দাওয়া, ১৫১৯ সংখ্যা, ৩০শে নভেম্বর, ১৯৯৫, রিয়াদ, সৌদী আরব।

www.amarboi.org

অপূর্ণাঙ্গতা নিয়েই স্বামীকে চলতে হবে। অনুরূপভাবে, একজন স্ত্রীরও একথা বুঝা দরকার যে, পূর্ণ গুণাবলী সম্পন্ন স্বামী বেহেশত ছাড়া দুনিয়ায় পাওয়া যাবে না। তাই স্বামীর মধ্যে যতটুকু গুণাবলী আছে, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করতে হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন,

فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا.

'বিশেষ কোন দুর্বল দিকের কারণে যদি স্ত্রীদেরকে অপছন্দ কর, তবে সম্ভাবনা আছে যে, তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ যার মধ্যে আল্লাহ তোমাদের জন্য অফুরন্ত কল্যাণ ও মঙ্গল রেখেছেন।' (সূরা নিসা : ১৯)

রাসূলুল্লাহ (সা)ও বলেছেন,

لَايَفْرِكُ مُؤْمِنٌ مُّؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا اٰخَرَ.

'একজন মোমেন স্বামীর একজন মোমেন স্ত্রীর উপর রাগ করা ঠিক নয়। স্ত্রীর কোন আচরণ খারাপ দেখলে তার অন্য ভাল আচরণ দ্বারা সন্তুষ্ট হতে পারবে।' (মুসলিম)

৪. দাম্পত্য সম্পর্ক ঠিক রাখার স্বার্থে স্ত্রীর উচিত, নিজেদের মধ্যকার গোলযোগ সম্পর্কে নিজের মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনকে না জানানো। বরং ধৈর্য ও ত্যাগের মাধ্যমে তা সংশোধনের চেষ্টা করবে ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠার পথে পা বাড়াবে। কেননা, স্ত্রীর আত্মীয়েরা সমস্যায় বেশী নাজুক অনুভূতি পোষণ করবে। যখন নিজের পক্ষ থেকে সমাধানের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়, তখনই কেবল নিজ আত্মীয়কে তা জানানো উচিত; এর আগে নয়।

অপরদিকে স্বামী ও স্ত্রীর আত্মীয়দের উচিত, হস্তক্ষেপ থেকে দূরে থাকা এবং স্বামী-স্ত্রীকেই তাদের সমস্যার সমাধান করার জন্য সুযোগ দেয়া। এর ফলে, পারিবারিক কলহ দূর হতে পারে।

৫. **অপচয় থেকে দূরে থাকতে হবে।** খাওয়া, দাওয়া, পোশাক, আশাক, গয়না-গাটি, ফার্নিচার ও থাকার জায়গার ব্যাপারে অপচয় বন্ধ করতে হবে। অপচয়কারীরা শরীর ও পেটের দাবী পূরণ করার কারণে তারা সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে যায়। তারা আল্লাহর ইবাদতের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ে। তাই এই অপচয় থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ বলেছেন,

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ.

www.amarboi.org

অর্থ : 'অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।' অপচয় মানুষকে শয়তানী কাজের দিকে ঠেলে দেয় এবং ভাল কাজ থেকে দূরে রাখে। দুঃখের বিষয় যে, নারী সমাজ শাড়ী-গয়নার ব্যাপারে অপচয়ে লিপ্ত থাকে। ধনী ও সচ্ছল পরিবারের মহিলাদের শাড়ী ও জুতার কোন সীমাসংখ্যা নেই। অনুরূপভাবে গয়না-অলংকারও থাকে বহু। এগুলো নিঃসন্দেহে বিলাসিতা ও অপচয়। ঈমানদার স্ত্রীদের এই অপচয় থেকে বাঁচার চেষ্টা করা জরুরী।

অনেক সময় স্ত্রীর পক্ষ থেকে অপচয়ের দাবী পূরণ করতে গিয়ে পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি হয়। তাই পারিবারিক অশান্তি রোধ করার স্বার্থে অপচয় বন্ধ করতে হবে।

৬. পারিবারিক অসন্তোষ দূর করার উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, প্রতি মাসে পারিবারিক বৈঠক করা। পরিবারের সদস্যরা সেই বৈঠকে অংশ গ্রহণ করবেন এবং গৃহস্বামী ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে গঠনমূলক সমালোচনার ব্যবস্থা করবেন। বৈঠকের উদ্দেশ্য হবে সংশোধন ও সৎপরামর্শ দান। হাদীসে এসেছে,

اَلْمُؤْمِنَ مِرْآةٌ لِاَخِيْهِ.

অর্থ : 'একজন মোমেন আরেকজন মোমেনের জন্য আয়নাস্বরূপ।' আয়না যেমন চেহারার দাগ-কালিমা বাতলায় তেমনি, পরিবারের সদস্যরাও একে অপরের দোষ-ত্রুটি সহানুভূতির সাথে আলোচনা করে সংশোধনের ব্যবস্থা করবেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে,

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ.

'আল্লাহর আয়াত ও হেকমতের কথা যা তোমাদের ঘরে পাঠ করা হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে।' (সূরা আহযাব : ৩৪)

এখানে 'হেকমত' বলতে তাফসীরকারগণ 'হাদীস'কে বুঝিয়েছেন। পারিবারিক বৈঠকে কোরআন ও হাদীস থেকেও আলোচনা করা উচিত। কোরআন এরূপ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

৭. **স্ত্রীকে আদর-সোহাগ করা** : এর বহু প্রকারভেদ আছে, যেমন (ক) আদরের সুরে ডাকা। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আয়েশাকে আয়েশা না ডেকে 'হে আয়েশা' কিংবা 'হোমায়রা' (ছোট লাল সুন্দরী) ডাকতেন।

(খ) স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দেয়া। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

www.amarboi.org

اِنَّكَ مَهْمَا اَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَاِنَّهَا صَدَقَـةٌ حَتّٰـى اللُّقْمَـةِ الَّتِـىْ تَرْفَعُهَا اِلٰى فِىْ اِمْرَأَتِكَ هِىَ صَدَقَةٌ.

'তুমি পরিবারের জন্য যা যা খরচ করবে তা সদকা হবে। এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে খাদ্যের লোকমা তুলে দিলে তাও সদকা হবে।'

(গ) পরস্পর পরস্পরকে উপহার বিনিময় করা। এক্ষেত্রে স্বামীর সুযোগ বেশী।

৮. দাম্পত্য জীবনের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা : কেননা, স্বামী-স্ত্রী উভয়ই মানুষ। আর মানুষ মাত্রই ভুল করে। স্ত্রী সংসারের বোঝাসহ সন্তান-সন্ততির বিরাট দায়িত্ব পালন করে। তাই তার ভুলগুলো ক্ষমার চোখে দেখা দরকার। অনুরূপভাবে, স্ত্রীরও একথা বুঝা উচিত, স্বামীর দায়িত্ব অনেক বেশী। তার আচরণে যদি কোন ভুল হয়ে যায় তাহলে সে ভুল উপেক্ষা করবে আর ভাল কাজ করবে বেশী। তাই অধিকতর ভাল কাজগুলোর জন্য কৃতজ্ঞতা এবং সামান্য ভুলগুলোর প্রতি মার্জনা দরকার।

৯. সৌন্দর্য চর্চা ও সুগন্ধি লাগানো : স্বামী-স্ত্রীর অন্তরে বন্ধন মজবুত করার জন্য এ পদ্ধতি খুব বেশী সহায়ক। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) বলেছেন,

اِنِّىْ لَاتَزَيَّنُ لِاِمْرَأَتِىْ كَمَا تَتَزَيَّنُ لِىْ.

'আমি আমার স্ত্রীর জন্য সাজ-সজ্জা করি যেমনি সে আমার জন্য সাজ-সজ্জা করে।'

খলীফা ওমার বিন আবুদল আযীয (রা) বলেন,

فَاصْنَعُوْا لَـهُنَّ فَـوَاللّٰهِ اِنَّـهُنَّ لَيُحْبِبْـنَ اَنْ تَـتَزَيَّنُوْا لَـهُنَّ كَمَـا تُحِبُّوْنَ اَنْ تَتَزَيَّنَ لَكُمْ.

'তোমরা তাদের জন্য সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্য চর্চা কর। আল্লাহর কসম, তোমরা যেমন তাদের সাজ-সজ্জা পছন্দ কর, অনুরূপভাবে, তারাও তোমাদের সাজ-সজ্জা এবং সৌন্দর্য চর্চা পসন্দ করে।'

সৌন্দর্যপ্রীতি নারী-পুরুষের প্রকৃতি। দু'জনই সৌন্দর্যকে পছন্দ করে।

১০. নিজ স্ত্রীর রূপ-গুণের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা : অনেক স্বামী নিজ স্ত্রীর সৌন্দর্য ও আকার-আকৃতিকে ফিল্ম কিংবা ম্যাগাজিনে ছাপানো সুন্দরী নারীর ছবির সাথে

www.amarboi.org

তুলনা করে। এর মাধ্যমে সে শয়তানের আক্রমণের শিকার হয় এবং অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এটা না করা উচিত এবং অন্য স্ত্রীর দিকে তাকানো কিংবা তার সাথে নিজ স্ত্রীর তুলনা করা নিষিদ্ধ। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত।

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ رَأٰى اِمْرَأَةً فَاتَى اِمْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَشُ مَنِيْئَةً لَهَا فَقَضٰى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى اَصْحَابِهٖ فَقَالَ اِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِيْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِيْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ فَاِذَا اَبْصَرَ اَحَدُكُمْ اِمْرَأَةً فَلْيَأْتِ اَهْلَهُ فَاِنَّ ذٰلِكَ يَرُدُّ مَا فِيْ نَفْسِهٖ.

'রাসূলুল্লাহ (সা) একজন মেয়েলোককে দেখার পর নিজ স্ত্রী যয়নবের কাছে যান। যয়নব তখন নিজের শরীরের চামড়া মালিশ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাথে নিজ প্রয়োজন পূরণ করেন। (অর্থাৎ সহবাস করেন) তারপর তিনি সাহাবায়ে কেরামের কাছে যান এবং বলেন : নারী শয়তানের আকৃতিতে আগমন করে ও বিদায় নেয়। তোমরা যদি এরূপ কোন নারী দেখ তাহলে, নিজ স্ত্রীর কাছে চলে যাবে। এটা তোমাদের মনে যে যৌনাকাংখা সৃষ্টি হয় তা দূর করে দেবে।'

এ হাদীসে কোন বেপর্দা নারী দেখার কারণে যদি কারুর মনে যৌন আবেগ সৃষ্টি হয় তাহলে, নিজ স্ত্রীর কাছে গিয়ে সে আকাংখা পূরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্য নারীর কারণে মানুষের মনে খারাপ ধারণা ও যৌন আবেগ সৃষ্টি হতে পারে।

১১. স্ত্রীর সাথে বসে আলাপ আলোচনা করা : এবিষয়ে বহু স্বামী ত্রুটি করে। তারা ঘরের বাইরে বহু সময় কাটায় এবং স্ত্রীর সাথে খোশগল্পের কোন সময় তাদের হাতে নেই। অনেক স্বামী তো স্ত্রীর সাথে তেমন একটা কথাই বলেনা কিংবা মোটেও হাসি-ঠাট্টা করে না। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত খাদীজার কাছে নিজের সমস্যা ও দুঃখ-কষ্ট বর্ণনা করতেন এবং খাদীজা তাকে শান্তনা দিতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় নিজ স্ত্রী উম্মে সালমার পরামর্শ গ্রহণ করেন। সাংসারিক বিষয়াদিতে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা রাসূলুল্লাহর সুন্নাত।

১২. স্ত্রীদের ওপর কড়াকড়ি ও কঠোরতা আরোপ না করা এবং তাদের কোন ত্রুটি হলে তা ক্ষমা করে দেয়া উচিত। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল বহুবার স্ত্রীদের

www.amarboi.org

প্রতি সহানুভূতি, শুভাকাংখা ও সৎপরামর্শের নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূললুল্লাহ (সা) বলেছেন :

وَاسْتَوْصَوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ.

'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে সৎ ও ভাল উপদেশ দাও। তারা তোমাদের সহকারিণী হিসেবে আছে।'

১৩. ইবাদত, নফল কাজ ও জিক্‌র-আজকারে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করা দরকার। এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা এবং ঘরের পুনর্জীবন করা উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহর (সা) ঘর এ জাতীয় কাজের উজ্জ্বল উদাহরণ।

১৪. স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করা : এর মাধ্যমে পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি ও আনন্দ আসে এবং ঘরের এক ঘেঁয়েমী জীবনের অবসান ঘটে। রাসূলুল্লাহ (সা) এ জাতীয় আচরণ করেছেন। তিনি হযরত আয়েশার সাথে প্রতিযোগিতায়ও অবতীর্ণ হন।

১৫. ক্লান্তির মুহূর্তে স্ত্রীকে ঘরের কাজে সহযোগিতা করা : স্ত্রী তো মানুষ। তার অসুখ-বিসুখ, ক্লান্তি-শ্রান্তি ও দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। স্বামীর উচিত, তা বিবেচনা করা ও কাজে তাকে সাহায্য করা। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ স্ত্রীদের কাজে সাহায্য করেছেন বলে প্রমাণ আছে।

১৬. স্ত্রীর অনুভূতি ও মনস্তত্বের প্রতি বিবেচনা করা : এ জন্য আগে স্বামীকে স্ত্রীর মানসিকতা সম্পর্কে জানতে হবে। তারপরই স্ত্রীর অনুভূতির সদ্ব্যবহার করা সম্ভব। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেন,

'তুমি কখন আমার ওপর সন্তুষ্ট থাক এবং কখন অসন্তুষ্ট থাক তা আমি বুঝতে পারি। আয়েশা বলেন, আপনি কিভাবে তা জানতে পারেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যখন তুমি আমার উপর সন্তুষ্ট থাক তখন বল, 'না, মোহাম্মদের রবের কসম।' আর যখন রাগ কর তখন বল : না, ইব্রাহীমের রবের কসম। হযরত আয়েশা বলেন : হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার নাম ত্যাগ করি।

১৭. প্রশস্ত হাতে স্ত্রীর খাবার, পোশাক ও ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করা : এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন,

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

www.amarboi.org

'স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমাদের ওপর দায়িত্ব হল, ভাল ও উত্তম উপায়ে তাদের খাবার ও পোশাকের ব্যবস্থা করা।' এ আয়াতের দৃষ্টিতে, মোবাহ্ ও জায়েয কাজে তাদের প্রতি প্রশস্ততার বিধান আরোপ করা হয়েছে।

১৮. আল্লাহর অসন্তোষ উদ্রেককারী কাজে স্ত্রীর সংশোধনে অবহেলা না করা : স্ত্রী যদি অন্যায় ও হারাম কাজ করে, তাহলে স্বামীর তা মোটেই সহ্য করা উচিত নয়। যেমন, স্ত্রী যদি বাইরে নিজ সৌন্দর্য প্রদর্শন করে, আঁট-শাট পোশাক পরে, অধিক অধিক বাজারে যায়, অথবা নামাজ-রোজা না করে ও গান-বাজনা শুনে, তাহলে তা সাথে সাথে বন্ধ করে দিতে হবে। অনেক স্বামী এক্ষেত্রে অলসতা করে। তা কিন্তু ঠিক নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَلْحَقْهُ بِنُسُكٍ إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

'যে বান্দাহর অধীনে আল্লাহ কোন লোক রেখেছেন, সে যদি তাদের উপর আল্লাহর আদেশ-নিষেধ কার্যকর না করে তাহলে, সে বেহেশতের ঘ্রাণ পর্যন্ত পাবে না।'[১]

এ হাদীসের আলোকে পরিবার প্রধানের দায়িত্ব হল, স্ত্রী ও সন্তানদেরকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রয়োজনে বাধ্য করা।

অনুরূপভাবে, কোন অফিসের প্রধান, মহল্লা, গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, জিলা, বিভাগ, পৌরসভা, মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের প্রধানদের দায়িত্ব হল, অধঃস্তন লোকদের ওপর ফরজ, ওয়াজিব এবং হালাল, হারাম কার্যকর করা। এ দায়িত্ব পালন করা ফরজ। তা না করলে তারা বেহেশত তো দূরের কথা বেহেশতের গন্ধ পর্যন্ত লাভ করতে পারবে না।

আমাদের নেতা, কর্মকর্তা, দায়িত্বশীল ও অন্যান্য পরিচালকদের বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। কেননা, এটা তাদের উপর ফরজ ও বিরাট দায়িত্ব। এ দায়িত্ব আঞ্জাম না দিয়ে তারা যদি ব্যক্তিগতভাবে নামাজী, রোজাদার কিংবা দীনদার হয়, তাতে লাভ হবে না। সবগুলো কাজ এক সাথে করতে পারলেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে।

---

১. সাপ্তাহিক আদ্ দাওয়াহ; সংখ্যা-১৫১৯, তাং ৩০শে নভেম্বর, ১৯৯৫, রিয়াদ, সৌদী আরব।

www.amarboi.org

পিতা-মাতার উপর সন্তানের অধিকার

সন্তান মাতা-পিতার দাম্পত্য জীবনের উত্তম ফসল ও প্রত্যাশিত আকাংখা, এর দীর্ঘমেয়াদী স্মারক ও সুঘ্রাণ বিস্তারকারী, এর আলো দানকারী সূর্য, এর প্রতিধ্বনি শব্দ, এর চলমান প্রাণ, এর দীর্ঘস্থায়ী সৌন্দর্য এবং এর রক্ষাকারী ছাতা।

সন্তান শিশু অবস্থায় মারা গেলে পরকালে মাতা-পিতার জন্য সুপারিশকারী হবে, বড় হয়ে ঈমানদার হলে এবং নেককার অবস্থায় মারা গেলে, মা-বাপের নেকীর পাল্লায় তাদের নেকীর সমপরিমাণ নেকী ওজন করা হবে। আর আল্লাহর প্রিয়ভাজন নিকটতম হিসেবে মারা গেলে তাদেরকে মা-বাপসহ অন্যান্যদের জন্য সুপারিশের সুযোগ দেয়া হবে।

সন্তান উৎপাদনই দুই লিঙ্গের বিয়ের প্রধান কারণ। যৌন আকাংখার পেছনে বিয়ের এ লক্ষ্য ছাড়া আর কোন লক্ষ্য কার্যকর নেই। যার ফলশ্রুতি হিসেবে মাতা-পিতাকে সন্তানের ব্যয়ভার বহন, শিক্ষা ও লালন-পালন, চেষ্টা-প্রচেষ্টা, রাত্রি জাগরণ ও ব্যস্ততার সাগরে হাবুডুবু খেতে হয়। এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েই আল্লাহ বলেছেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً.

'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করে তার আদেশ-নিষেধ মেনে চল, যিনি তোমদেরকে একটি মাত্র আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।' (সূরা আন নিসা : ১)

মা-বাপ দাম্পত্য জীবনে নেককার ও সৌভাগ্যবান হলে এবং পরস্পর সহযোগী হলে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ঘরে বরকতময় সন্তান জন্মলাভ করবে, যারা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদ থাকবে, চাপা ও বিক্ষুব্ধ মন, জটিলতা ও পদস্খলন এবং বক্রতা ও মন্দ চারিত্রিক কারণ থেকে দূরে অবস্থান করবে। কেননা, মা-বাপের সততা ও যোগ্যতা সন্তানের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, এমনকি সন্তান ছোট থাকা অবস্থায় মা-বাপ মারা গেলেও।

www.amarboi.org

প্রিয়নবী (সা) বলেছেন,

لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَتَى اَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانَ اَبَدًا.

'তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর কাছে (সহবাসের জন্য) গেলে সে যেন বলে,

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

(আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে এবং শয়তানকে আমাদেরকে যে রিজ্ক দিয়েছ তা থেকে দূরে রাখ।) এর মাধ্যমে যদি কোন সন্তান নির্ধারিত হয় তাহলে, শয়তান কখনও তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (বোখারী, মুসলিম)

এ শুভ ফলাফলটি লক্ষ্যণীয় বিষয়। বাপ, নিজ স্ত্রীর সাথে যৌন মিলনের আগে যদি আল্লাহর নাম স্মরণ করে তাহলে, নেককার বাপের কাজের মাধ্যমে আল্লাহ সন্তানকে শয়তানের হাত থেকে হেফাজত করেন।

আল্লাহ কোরআনে মূসা (আ) এর সাথে খিজির (আ)-এর কাহিনী প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, যে নগরবাসিরা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, মূসা (আ) সে নগরের ভেঙ্গে পড়া একটি দেয়াল দু'জনে মিলে মেরামত করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন খিজির (আ) জবাবে বলেন, 'দেয়ালের ব্যাপারটি হল, সেটি ছিল নগরের দু'জন ইয়াতীম বালকের। এর নীচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল নেক লোক। আপনার রব দয়া করে ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পণ করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। আমি সম্পূর্ণ নিজ মতে তা করিনি।' (সূরা কাহাফ : ৮২)

এ আয়াতে আমরা নেক পিতার খবর জানতে পারলাম। আমাদের জানা দরকার যে, সন্তানের জন্য নেক পিতা বিশাল ও উত্তম সম্পদ। তাই ইসলাম এ বিষয়ের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং পুরুষদেরকেও এর উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপের আহ্বান জানিয়েছে। কেননা, তারাই বিয়ের প্রস্তাব দান করেন, দেনমোহর পরিশোধ করেন এবং স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাই তাদেরকে নেক স্ত্রী গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। কেননা, স্ত্রী হচ্ছে, স্বামীর বাসস্থান এবং

www.amarboi.org

সন্তান উৎপাদনক্ষেত্র। সন্তানকে দুধ পান করানো মায়েরই গুণ ও দায়িত্ব। আল্লাহ্ বলেছেন :

وَلَامَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ.

'মোশরেক মহিলা থেকে একজন মোমেন দাসী উত্তম যদিও তা তোমাদের কাছে আশ্চর্যজনক হোক না কেন।' (সূরা বাকারা : ২২১)

রাসূলুল্লাহ (সা) এক হাদীসের অংশ বিশেষে বলেছেন :

فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ. تَرِبَتْ يَدَاكَ.

'তুমি দীনদার মহিলা বিয়ে করার চেষ্টা কর।' তোমার হাত ধূলা-মলিন হোক।' (বোখারী, মুসলিম)

এখন আমরা মা-বাপের উপর সন্তানের অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো :

১. নবজাত সন্তানের কানে আজান দেয়া : নবজাত সন্তানের ডান কানে ছোট আওয়াজে আজান দেয়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহর (সা) গোলাম আবু রাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَذَّنَ فِىْ اُذْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ يَعْنِىْ بِاَذَانِ الصَّلَاةِ .

'আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) ফাতেমার ঘরে ভূমিষ্ঠ হোসাইন বিন আলীর কানে নামাযের অনুরূপ আজান দিতে দেখেছি।' (আবু দাউদ, তিরমিযী, তিরমিযী এটাকে হাসান ও সহীহ্ হাদীস বলেছেন)

২. উত্তম নাম রাখা : জন্মের দিন কিংবা ৭ম দিনে সন্তানের উত্তম নাম রাখা। মারিয়ার ঘরে নিজ ছেলে ইবরাহীমের জন্মের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

'আজ রাতে আমার এক ছেলে জন্মলাভ করেছে। আমি আমার পিতা ইবরাহীমের নামানুসারে তার নামকরণ করেছি।' (মুসলিম)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবু তালহার একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করেছে। আমি তাকে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে নিয়ে আসলাম। তিনি একটা

www.amarboi.org

খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিলেন এবং তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ।' এ দুটো ঘটনা, জন্মের ৭ দিনের মধ্যে ঘটেছে।

বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে,

كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى.

'প্রত্যেক শিশু আকীকার সাথে দায়বদ্ধ। ৭ম দিনে আকীকার পশু জবেহ করা হবে, তার মাথা মুণ্ডন করা হবে এবং নাম রাখা হবে।' (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

ওলামায়ে কেরাম নবজাত শিশুর আকীকার সাথে দায়বদ্ধ হওয়ার বিষয়ে হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আকীকা দানে সক্ষম মাতা-পিতা যদি সন্তানের আকীকা না দেয় তাহলে, সন্তানকে মা-বাপের জন্য সুপারিশ করা থেকে বিরত রাখা হবে।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আকীকা জন্মের পর থেকে ৭ দিনের মধ্যে দিতে হবে। বিনা ওজরে তা থেকে পিছানো মাকরূহ।

আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اِنَّكُمْ تُدعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَسْمَائِكُمْ فَاَحْسِنُوْا اَسْمَاءَكُمْ.

'তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন তোমাদের নাম ধরে ডাকা হবে। তাই তোমরা তোমাদের উত্তম নামকরণ কর।' (আবু দাউদ)

হাদীসে এসেছে,

اِنَّ اَحَبَّ الاَسْمَاءِ اِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَاَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَاقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ.

'আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় নাম হচ্ছে, আবদুল্লাহ এবং আবদুর রহমান, সর্বাধিক সত্যবাদী নাম হচ্ছে, হারেস ও হাম্মাম, আর সর্বাধিক মন্দ নাম হচ্ছে, হারব ও মুররাহ।'

হাদীসে আরও বর্ণিত আছে, নবী (সা) খারাপ নাম পরিবর্তন করে ভাল নাম রেখেছেন।' যেমন, তিনি আসিয়ার পরিবর্তে জামীলা, আসরামের পরিবর্তে

www.amarboi.org

যারআহ, হারবের পরিবর্তে সালম, মোদতাজে'র এর পরিবর্তে মোমবায়েস, শে'ব আদ-দালালাহ এর পরিবর্তে শেব'আল হুদা, বনু মাগইয়ার পরিবর্তে বনি রাসদাহ ইত্যাদি নামকরণ করেছেন। (আবু দাউদ এবং আল্লামা নববীর আজকার গ্রন্থ)

৩. আকীকাহ : নবজাত ছেলে-মেয়ের জন্য একটি ভেড়া বা ছাগল জবেহ করা সুন্নাত। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে, ছেলের জন্য দু'টো এবং মেয়ের জন্য ১টি জবেহ করা। ইবনু খোজাইমাসহ অন্যান্য ইমামদের বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) হাসান ও হোসাইনের জন্য একটি বকরী আকীকা করেছেন।'

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত।

اَمَرَهُمْ اَنْ يَّعُقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَاكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.

'রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে ছেলের জন্য দু'টো একই ধরনের ভেড়া এবং মেয়ের জন্য একটি ভেড়া আকীকার নির্দেশ দিয়েছেন।' (তিরমিযী)

জাহেরী দলের মতে, সক্ষম ব্যক্তির ওপর আকীকা ওয়াজিব।

আকীকার পশুর বয়স ও অন্যান্য মাস'আলা কোরবানীর পশুর মাস'আলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আকীকা শব্দের অর্থ হচ্ছে, কাটা বা টুকরা করা। আকীকাতে পশু জবেহ করা হয়। তাই একে আকীকা বলা হয়। ৭ম দিনে পশু আকীকা দেয়াই উত্তম। কেউ কেউ এর আগে এবং পরেও অনুমতি দিয়েছেন। তবে শর্ত হলো, সন্তানের বালেগ হওয়ার আগ পর্যন্ত, এরপর নয়।

৪. নবজাত শিশুর মাথার চুল মুণ্ডানো : জন্মের পর ৭ম দিবসে মাথার চুল মুণ্ডানো এবং চুলের ওজন পরিমাণ রূপা আল্লাহর রাস্তায় দান করা উত্তম কিংবা চুল না মুণ্ডালে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী আন্দাজ করে চুল পরিমাণ রূপা দান করে দিতে হবে। হাদীসে আরও এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) আদেশ দিয়েছেন :

اَنْ يُمَاطَ الْاَذَىٰ عَنِ الْوَلِيْدِ يَوْمَ سَابِعِهِ.

'নবজাত শিশুর চুল ৭ম দিনে মুণ্ডন করতে হবে।'

আরেক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) হাসানের জন্মের পর ফাতেমাকে (রা) আদেশ দিয়েছিলেন যেন তার চুল মুণ্ডন করে এবং চুলের ওজন পরিমাণ রূপা সদকাহ করে। চুল ওজন করার পর দেখা যায় যে, তা এক দেরহাম কিংবা এর চাইতে সামান্য একটু কম ছিল।

www.amarboi.org

৫. দুধ মা ঠিক করা : শরীয়ত মাকে দুধপান করানোর অনুমতি দেয়। বিশেষ কোন পরিস্থিতি ছাড়া বাপ সন্তানের মাকে দুধ পান থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে পারে না। মা ছাড়া যদি অন্য কোন মহিলার দুধ পান করাতে হয় তাহলে, উন্নত চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী মহিলাকে এ কাজে নিয়োগ করতে হবে। সে মহিলা যেন হারাম না খায়। কেননা, দুধ-সন্তানের ওপর তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা) আমাদেরকে অসৎ চরিত্রের অধিকারী লোকদের থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন। হারাম দুধে কোন বরকত নেই। কেননা, হারাম থেকে তৈরি শরীর দোজখের উত্তম খাদ্য।

৬. সন্তানের ব্যয় নির্বাহ : সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, বাপের ওপর তাদেরকে খাওয়ানো পরানো এবং প্রয়োজনীয় ব্যয় ফরজ যে পর্যন্ত ছেলে উপার্জনক্ষম হয় কিংবা মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। বাপ যদি ছেলের প্রতি বেশী গুরুত্ব দেয় এবং মেয়ের প্রতি অবহেলা করে, তাহলে তার বিরাট গুণাহ হবে। এ জাতীয় বাপের উদাহরণ হল, জাহেলী যুগের কাফেরদের মত। ইসলাম সম্পর্কে লেখা-পড়া করলে জানতে পারবে যে, ছেলের তুলনায় মেয়ের প্রতি ব্যয় করার সওয়াব অপেক্ষাকৃত বেশী।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

'দাতার উঁচু হাত গ্রহীতার নীচু হাত থেকে উত্তম। তুমি তোমার ওপর নির্ভরশীল লোকদের মধ্যে প্রথমে খরচ কর।' (তাবরানী, বোখারী, মুসলিম)

আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُّضَيِّعَ مَنْ يَّقُوْتُ.

'যাদেরকে খাদ্য দেয়ার দায়িত্ব তাদেরকে খাদ্য না দেয়া গুণাহ।' (আবু দাউদ, নাসাঈ, হাকেম)

হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، حَفِظَ اَمْ ضَيَّعَ حَتّٰى يُسْئَالَ الرَّجُلُ عَنْ اَهْلِ بَيْتِهِ.

www.amarboi.org

'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অধীনস্থ ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন যে তারা তাদের অধীনস্থদের অধিকারের হেফাজত করেছে না তা নষ্ট করেছে। এমনকি পুরুষকে তার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।' (ইবনে হিব্বান)

নিম্নোক্ত হাদীসে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জওয়াবদিহী করতে হবে।' (বোখারী ও মুসলিম)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَا وَهُوَ وَضَمَّ اَصَابِعَهُ.

'যে ব্যক্তি দু'জন বালিকাকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত পালন করে 'কেয়ামতের দিন সে এবং আমি এক সাথে উপস্থিত হবো। এই বলে তিনি নিজ আঙ্গুলগুলোকে এক সাথে মিলিয়ে নেন।' (মুসলিম)

তিরমিযী শরীফে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে :

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ اَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ وَاَشَارَ بِاِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالَّتِىْ تَلِيْهَا.

'যে ব্যক্তি দু'জন বালিকাকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত পালন করে সে এবং আমি এভাবে বেহেশতে প্রবেশ করবো যেমন তর্জনীর সাথে পাশের আঙ্গুল এক সাথে লাগা থাকে।'

হাদীসের অর্থ হল, যে নিজের দু'টো কন্যা সন্তান কিংবা দুই বোন অথবা অন্য যে কোন দু'টো মেয়েকে প্রতিপালন করে, তাদের ব্যয় নির্বাহ করে এবং তাদেরকে উত্তম শিক্ষা দেয় ও আদব শিখায়, এর বিনিময়ে আল্লাহ তাকে কেয়ামতের দিন বেহেশতে রাসূলুল্লাহর (সা) অবিচ্ছেদ্য সাথী ও প্রতিবেশী হিসেবে স্থান দেবেন। এটা হচ্ছে, এ কাজের মর্যাদার প্রমাণ।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে একজন মেয়েলোক তার দুটো মেয়েসহ ভিক্ষা প্রার্থনা করে। আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছু

www.amarboi.org

ছিল না। আমি তাকে ঐ খেজুরটি দিলাম। সে তা নিজের দুই মেয়ের মধ্যে বণ্টন করে দিল এবং তা থেকে নিজে কিছুই খায়নি। তারপর সে চলে গেল। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের কাছে আসেন এবং আমি তাকে ঘটনাটি বলি। তখন তিনি বলেন,

مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْئٍ فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ.

'যে ব্যক্তি এই কন্যা সন্তানের পরীক্ষার সম্মুখীন হবে এবং তাদের প্রতি উত্তম আচরণ করবে, তারা তার জন্য দোজখের আড়াল হবে।' (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

৭. প্রতিপালন ও শিক্ষা : এ দায়িত্বের ভিত্তি হলো আল্লাহর নিম্নোক্ত আদেশ,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের আত্মা ও পরিবারের সদস্যদেরকে দোজখের আগুন থেকে বাঁচাও-যার জ্বালানী হল মানুষ ও পাথর।' (সূরা তাহরীম : ৬) অর্থাৎ তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবার-পরিজনকে দোজখের উপায় ও কারণ থেকে দূরে রাখ। এছাড়াও 'তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল' এই হাদীসও মানুষকে উক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ দেয়।

সন্তানের উত্তম প্রতিপালন ও শিক্ষা দান মাতা-পিতার ওপর ফরজ। উত্তম প্রতিপালনের অর্থ হল, দীনের আদেশ ও নির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। এটা মা-বাপের কাঁধের ওপর অর্পিত আমানত। তারা এ বিষয়ে ত্রুটি করলে সন্তানরা পাপের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর রাস্তা থেকে দূরে সরে যায়। ফলে, কেয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। মাতা-পিতার উচিত, নিজ সন্তানদেরকে নিজের প্রতিপালক, নবী, আল্লাহর কিতাব কোরআন, আখেরাত দিবসের বিষয়বস্তুসহ সকল বিষয়ে পরিচিত করানো। তাদের অন্তরে আল্লাহর দীনি নিদর্শনের পবিত্রতার ধারণা সৃষ্টিসহ ইবাদত, চরিত্র এবং লেন-দেন সম্পর্কে দীনি দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরা, অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করা, অজু করা ও নামাজ পড়া শিক্ষা দিতে হবে। সাত বছর বয়সে তাদেরকে নামাজের জন্য অভ্যস্থ করা এবং ১০ বছর বয়সে নামাজ না পড়লে মারতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مُرُوْا اَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

www.amarboi.org

'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর বয়সে নামাজের জন্য আদেশ কর এবং দশ বছর বয়সে তাদেরকে মার, আর পৃথক কর তাদের বিছানা।' (আবু দাউদ)

মা-বাপের উচিত, সন্তানকে শরীয়তের আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া, তাদের অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং নেক লোকের ভালবাসার বীজ বপন করা, তাদেরকে খারাপ কাজে জড়িত হওয়া এবং আল্লাহর কোরআন ও রাসূলুল্লাহর হাদীসে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বাঁচানো।

রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রী উম্মে সালামার আগের ঘরের সন্তান আবু হাফস ওমার বিন আবি সালামাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) যত্ন ও তত্ত্বাবধানে ছিলাম। খাওয়ার সময় আমার হাত পাত্রের এক জায়গা থেকে খাওয়া গ্রহণ করত না, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ تَعَالَى، كُلْ بِيَمِيْنِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ.

'হে বৎস! আল্লাহর নাম বল, তোমার ডান হাতে খাও এবং যা তোমার কাছে সেখান থেকে খাও। এরপর থেকে এটাই ছিল আমার খাওয়ার পদ্ধতি।' (বেখারী, মুসলিম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান বিন আলী (রা) যাকাতের একটা খেজুর মুখে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে বলেন, কাখ, কাখ, এটা ফেলে দাও। তুমি কি জাননা, আমরা যাকাত খাইনা?' (বোখারী, মুসলিম)

মা-বাপের উচিত, সন্তানের বয়স অনুপাতে তাদেরকে পর্যায়ক্রমিকভাবে শিক্ষা দান করা। প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো শিক্ষা দিতে হবে। তবে কাহিনীর মাধ্যমে তাদের শিক্ষাদান শুরু এবং অজু ও নামাজের মত বিষয়গুলো অনুকরণ ও অনুসরণ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া উত্তম। স্ত্রীলোকের উচিত, মহিলা বিষয়ক মাস'আলাগুলো জেনে নেয়া। যাতে করে নিজ মেয়ে সন্তানদেরকে তা শিক্ষা দিতে পারে। যেমন, হায়েজ, নেফাস ইত্যাদি।

মা-বাপের উচিত, সন্তানদেরকে যুগের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শিক্ষা দেয়া। যেমন, লেখা-পড়া, সাঁতার কাটা, তীর নিক্ষেপ এবং জীবন ধারণ উপযোগী পেশা। সন্তানদেরকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা ফরজ এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের উপযোগী বিষয়গুলো শিক্ষা দেয়াও জরুরী।

www.amarboi.org

হযরত ওমার বিন খাত্তাব (রা) বিভিন্ন শহরের গভর্ণরদের কাছে লিখে পাঠিয়েছেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাঁতার কাটা, ঘোড়দৌড়, উপমা এবং উত্তম কবিতা শিক্ষা দাও।' কথিত আছে, সন্তানকে লেখা, হিসাব এবং সাঁতার কাটা শিক্ষা দেয়া মা-বাপের দায়িত্বের পরিপূর্ণতার পরিচায়ক।

হাজ্জাজ নিজ সন্তানের শিক্ষককে বলেন, 'আমার সন্তানদেরকে লেখার আগে সাঁতার শিক্ষা দিন। তারা লিখতে না জানলে অন্য লেখক খুঁজে পাবে কিন্তু সাঁতার না জানলে তার পক্ষ থেকে সাঁতার কাটার জন্য অন্য কাউকে পাবেনা।'

মা-বাপের উচিত, তাদের সন্তানের সাথী কারা তা দেখা। তাদেরকে খারাপ সাথী গ্রহণের সুযোগ দেয়া উচিত নয়। যারা খারাপ চরিত্রের অধিকারী এবং আল্লাহর নাফরমানী করে তাদেরকে নিজ সন্তানের বন্ধু হিসেবে অনুমতি দেয়া উচিত নয়। কেননা, মানব চরিত্র চোর। ব্যক্তি তার বন্ধু বান্ধবকে অনুসরণ করে, খারাপ বন্ধুর নিজের মধ্যেই কল্যাণ নেই, অন্যের জন্য সে কি করে কল্যাণকর হবে?

পুরুষের সাথে মেয়েদের একই স্থানে একত্রে চাকুরীর বিরুদ্ধে সতর্ক হতে হবে। কেননা, তা শরীয়ত বিরোধী, বিপদ আহ্বানকারী, মেয়েদেরকে দুঃসাহস যোগানদানকারী এবং অন্য পুরুষের সাথে ভালোবাসা সৃষ্টিকারী।

মেয়েদের জানা উচিত, পুরুষের সামনে মেয়েদের হারাম কাজের তিনটি মৌলিক ভিত্তি হল :

১) অমোহরেম কোন ব্যক্তির সাথে নির্জনে থাকা। অমোহরেম অর্থ যে কোন সময় সে পুরুষের সাথে ঐ মেয়ের বিয়ে বসা জায়েয।

২) অমোহরেম তথা পর পুরুষের সামনে চেহারা ও দুই হাতের কব্জি ব্যতীত শরীরের অন্য কোন অংশ খোলা জায়েয নেই এবং শর্ত হল চেহারায় যেন অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণকারী এবং ফেতনা সৃষ্টিকারী রূপচর্চা না করা হয়।

৩) মেয়েলোকের পক্ষ থেকে তার প্রতি অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণকারী কোন কিছু প্রকাশিত হতে পারবে না। যেমন কথাবার্তা, হাসি, চালচলন, সুগন্ধি, আঁটসাঁট পোশাক কিংবা খুব চাকচিক্যময় রং ব্যবহার ইত্যাদি। অপর পুরুষের সামনে সতর্কভাবে চলতে হবে।

৮. সন্তানের দয়া ও স্নেহ প্রদর্শন : সন্তান যেন সুষ্ঠভাবে গড়ে উঠে, চাপ ও মানসিক পেরেশানীর জটিলতা থেকে মুক্ত থাকে, মা-বাপের কাছে থাকা অবস্থায়

www.amarboi.org

যেন দয়া সৌভাগ্য ও স্থিতিশীলতার অনুভূতি লাভ করতে পারে, নিজেদেরকে যেন পরোপকারী হিসেবে গঠন করতে পারে, নিজ পিতা-মাতার পয়গাম যেন পরিপূর্ণ করতে পারে এবং মুসলিম উম্মাহর সম্মান ও মর্যাদা যেন বৃদ্ধি করতে পারে, সে জন্য তাদের সাথে শিশুকালে বিনম্র, সূক্ষ্ম ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করা দরকার। এর ফলে তারা স্থিতিশীলতা, মানসিক প্রশান্তি ও আন্তরিক সুখ লাভ করতে পারবে। এটা তাদেরকে নিজ পরিবারের প্রতি ভালবাসা শিক্ষা এবং পারিবারিক বন্ধনকে মজবুত করতে সাহায্য করবে। এরপর তারা যেখানেই থাকুক সেখানে একই রকম পরিবার গঠনের চেষ্টা চালাবে। প্রবৃদ্ধির প্রতিটি স্তরের উপযোগী সামঞ্জস্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জ্ঞানীরা বলেছেন, 'সন্তান হচ্ছে, বাদশাহর শরীক, কারাবন্দীর সহযোগী এবং মন্ত্রীর সহকারী।'

আর এ কারণেই নবী (সা) শিশুদের সাথে দয়া, স্নেহ ও নরম আচরণ করতেন। তিনি তাদের সাথে কঠোরতা ও জমাটবদ্ধতার বিরুদ্ধে সমালোচনা করতেন। তিনি লোকদের ভুল উপলব্ধি পরিবর্তন করার জন্য উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত পেশ করতেন। তিনি তাদের মধ্যে দয়া, ভালবাসা ও মায়া-মমতার বীজ বপন করতেন। তিনি শিশুদেরকে কোলে নিতেন, চুমু খেতেন, নিজের পিঠে সওয়ার করাতেন এবং নামাজরত অবস্থায় তাদেরকে কাঁধে বসাতেন।

এ মর্মে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলী (রা)-এর ছেলে হাসান ও হোসাইনকে চুমু দেন। আকরা বিন হাবেস আত-তামিমি তাঁর কাছে ছিলেন। আকরা বলেন, আমার ১০জন সন্তান আছে। আমি তাদেরকে কখনও চুমু খাইনি। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দিকে নজর করেন এবং বলেন, مَنْ لاَيَرْحَمُ لاَيُرْحَمُ

'যে দয়া করেনা, সে দয়া পায়না।' (বোখারী, মুসলিম)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এক বেদুঈন আসে এবং বলে, আপনারা সন্তানদেরকে চুমু খান, আমরা চুমু খাই না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

اَوَ اَمْلِكُ لَكَ اَنْ نَزَعَ اللّٰهُ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ.

'এটা কি আমার এখতিয়ারে যে তোমার অন্তর থেকে আল্লাহ দয়ামায়া ছিনিয়ে নিয়েছেন?' (বোখারী ও মুসলিম)

www.amarboi.org

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ পুত্র ইবরাহীমকে চুমু খেয়েছেন। একবার তিনি নামাজের সাজদাহ থেকে উঠতে যথেষ্ট দেরী করেন। তাঁকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, 'আমার সন্তান আমার ওপর আরোহণ করেছে এবং আমি সাজদায় আছি, আমি তাড়াতাড়ি করাকে অপছন্দ করেছি।' তাঁর ওপর যে আরোহণ করেছিল সে হচ্ছে হযরত ফাতেমার ছেলে হাসান।

বর্ণিত আছে, তিনি শিশু কোলে নিয়েছেন এবং শিশু কোলে পেশাব করে দিয়েছে। তারপর তিনি পেশাবের জায়গায় পানি ছিঁটিয়ে দিয়েছেন।

আরো বর্ণিত আছে, তিনি শিশুদের কান্না শুনে নামাজ সংক্ষিপ্ত করেছেন এবং বলেছেন,

خِفْتُ اَنْ تُفْتَنَ اُمُّهُ .

'আমি তার মাকে ফেতনায় পড়ার আশংকা করেছিলাম।'

বর্ণিত আছে, নবী করিম (সা) নিজ কন্যা যয়নাবের মেয়ে উমাইমাকে কাঁধে রেখে নামাজ পড়েছেন।

সাহাবায়ে কেরাম শিশুদেরকে সাথে নিয়ে মসজিদে নামাজ পড়তেন। কিন্তু শিশুরা দুষ্টামি করত না এবং লোকদেরকে বিরক্ত করত না। তাদেরকে নামাজের ট্রেনিং দেয়ার উদ্দেশ্যেই মসজিদে নিয়ে যেতেন। তাছাড়াও তাদেরকে সাধারণ আদব-আখলাক শিক্ষা এবং পুরুষের সাথে মেলার সাহস দানের জন্য তাদেরকে সাথে নিয়ে যেতেন। মুসলিম সমাজ ছিল এরূপ দয়াপূর্ণ।

৯. সন্তানদেরকে সমানভাবে দান করা : এ বিষয়ে নো'মান বিন বশীরের হাদীসটিই হচ্ছে মূলভিত্তি। তিনি বলেন, তাঁর পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে যান এবং বলেন, আমি আমার এই ছেলেকে কিছু দান করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তুমি কি তোমার প্রত্যেক ছেলেকে এরূপ দান করেছ? তিনি জওয়াবে বলেন, 'না'। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তা প্রত্যাহার কর।' (বোখারী, মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে অনুরূপ দান করেছ?' তিনি জওয়াবে বলেন, 'না'। তখন তিনি বলেন, আল্লাহকে ভয় করে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চল এবং তোমার সন্তানদের ব্যাপারে ইনসাফ কর।' নো'মান বলেন, আমার পিতা বাড়ী ফিরে এসে ঐ দান প্রত্যাহার করেন।

www.amarboi.org

অন্য আরেক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'তাহলে আমাকে সাক্ষী করো না, কেননা, আমি অন্যায়ের সাক্ষী হবো না।'

আরেক বর্ণনায় এসেছে, 'এ ব্যাপারে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে সাক্ষী করো।'

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (র) বলেন, এ হাদীসে সন্তানদেরকে দানের ব্যাপারে সমতা বিধানের নির্দেশ রয়েছে। কাউকে প্রাধান্য না দিয়ে সবাইকে সমান দিতে হবে। অগ্রাধিকারযোগ্য মত অনুযায়ী, এ বিষয়ে ছেলে-মেয়েকে সমান বিবেচনা করতে হবে এবং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যাবে না। হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী এটাই প্রসিদ্ধ কথা, তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যাবে না।

কেউ যদি সন্তানকে দানের ক্ষেত্রে অন্যের ওপর প্রাধান্য দেয়, কিংবা একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজনকে দান করে তাহলে, ইমাম শাফেঈ, মালেক ও আবু হানিফার দৃষ্টিতে তা মাকরূহ, হারাম নয়। কিন্তু হেবা বা দান ঠিক থাকবে। তবে তাউস ও উরওয়া, মুজাহিদ, সুফিয়ান সাওরী, আহমদ, ইসহাক ও দাউদের দৃষ্টিতে তা হারাম। তারা 'আমাকে অন্যায়ের সাক্ষী করো না।' এই হাদীসসহ অন্যান্য হাদীসের মাধ্যমে নিজেদের মতের পক্ষে প্রমাণ দেন। অপরদিকে ইমাম শাফেঈ'সহ তাঁর সাথে ঐক্যমত্য পোষণকারীরা 'আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে এর সাক্ষী কর' এই হাদীসের ভিত্তিতে নিজেদের মতের সমর্থনে প্রমাণ পেশ করেন। তাদের মতে, যদি তা হারাম হত, তাহলে তিনি অন্যকে সাক্ষী বানানোর কথা বলতেন না।

যদি কেউ বলে যে, তা ভর্ৎসনামূলক বলা হয়েছে। তাহলে, এক্ষেত্রে আমাদের জওয়াব হল, শরীয়ত প্রণেতার বক্তব্যে এর বিপরীত জিনিসই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

'আমি অন্যায়ের সাক্ষী হবো না।' রাসূলুল্লাহর (সা) এ বক্তব্যে তা যে হারাম তা প্রমাণ করে না। কেননা, এই হাদীসে উল্লেখিত 'জাওর' (অন্যায়) শব্দ হচ্ছে, সোজা ও সমান থেকে বিচ্যুতি। যা ইনসাফ বহির্ভূত তাই অন্যায় ও জুলুম। তা হারাম বা মাকরূহ যাই হোকনা কেন।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, 'আমাকে ছাড়া এ বিষয়ে অন্যকে সাক্ষী কর, রাসূলুল্লাহর (সা) এ নির্দেশ তাকে হারাম প্রমাণ করে না। তাহলে

www.amarboi.org

হাদীসের উল্লেখিত 'জাওর' শব্দের এ ব্যাখ্যা করতে হবে যে, অনুরূপ দান করা মাকরূহ তানযীহী। আর এভাবে, এক সন্তানকে বাদ দিয়ে অন্য সন্তানকে দান করলে তা যে বিশুদ্ধ এ হাদীস তার প্রমাণ। অন্য সন্তানদেরকে দান না করে শুধু এক সন্তানকে দান করলে সে দান প্রত্যাহার করা উত্তম, তবে ওয়াজিব নয়। এ হাদীস বাপ সন্তানকে প্রদত্ত দান প্রত্যাহার করার পক্ষেও দলীল। (সংক্ষেপিত)

ইবনু হাজার আসকালানী ফতহুল বারী গ্রন্থে আহমদ বিন হাম্বলের একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, কোন কারণ থাকলে, দানের ক্ষেত্রে সন্তানের মধ্যে অগ্রাধিকার দেয়া জায়েয আছে। যেমন, সন্তানের ক্রনিক রোগ, ঋণ ইত্যাদি। আবু ইউসুফ (র) বলেছেন, অগ্রাধিকারের উদ্দেশ্য যদি অন্য সন্তানদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ করা হয় তাহলে, সেক্ষেত্রে সমানভাবে দান করা ওয়াজিব হবে।

যারা সন্তানের দানের ক্ষেত্রে সাম্যকে ওয়াজিব বলেন, তাদের যুক্তি হল, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ওয়াজিব, সে সম্পর্কছেদ করা হারাম। যে জিনিস সে সম্পর্কছেদের কারণ হবে তাও হারাম হবে।

যেহেতু দানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদ করতে পরিবেশ সৃষ্টি করে, তাই তা হারাম। তাদের দলীল হল রাসূলুল্লাহর (সা) এ হাদীস :

اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَوْلاَدِكُمْ فِى النَّحْلِ كَمَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّعْدِلُوْا بَيْنَكُمْ فِى الْبِرِّ.

'তোমরা দানের ক্ষেত্রে তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সাম্য ও ইনসাফ কর, যেমনি তোমরা তাদের সবাইর কাছ থেকে সমান সদ্ব্যবহার পছন্দ কর।' (মুসলিম)

আরেক বর্ণনায় এসেছে,

اَيَسُرُّكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا اِلَيْكَ فِى الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلاَ اِذًا.

'তুমি কি এটা পছন্দ কর যে, তারা সবাই তোমার সাথে সমানভাবে সদ্ব্যবহার করুক? তিনি উত্তরে বলেন, হাঁ, অবশ্যই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তাহলে, এরূপ করো না।' (মুসলিম)

আমরা বর্ণিত হাদীসগুলোকে সামনে রাখলে বুঝতে পারবো যে, রাসূলুল্লাহ (সা) দানের ক্ষেত্রে সন্তানের মধ্যে কাউকে অগ্রাধিকার দিলে তার কঠোর পরিণতি সম্পর্কে আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। কেননা, সকল সন্তানের কাছ

www.amarboi.org

থেকে বাপের সদ্ব্যবহার পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আর কোন সন্তানকে অগ্রাধিকার দিলে, তা অন্য সন্তানের মধ্যে অসন্তুষ্টি ও ঘৃণার জন্ম দিতে পারে। তাছাড়া তা আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিন্ন করার কারণ হতে পারে। এটা জানা কথা যে, ইসলাম একই পরিবারে সমঝোতার উপায়-উপকরণ সরবারহ করতে আগ্রহী। ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ওপর তাকিদ দেয় এবং সে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে কবীরা গুনাহ বলে। অনুরূপভাবে ইসলাম মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে ফরজ এবং মা-বাপের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে কবীরা গুণাহ বলে।

যে জিনিস সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দায়ী তার হুকুমও হারাম। কোন একজন সন্তানকে দানের বেলায় অগ্রাধিকার দিলে যদি এ কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন কিংবা মাতা-পিতার সাথে অসদ্ব্যবহারের আশংকা থাকে তাহলে, এ অগ্রাধিকার যে হারাম সে বিষয়ে কারো যেন সন্দেহ না থাকে। তাছাড়া, তা জুলুম এবং একই পরিবারে কর্তব্যপরায়ণতার মূলনীতি থেকে বিচ্যুতি। মা-বাপের ভুলের কারণে বহু পরিবারে বিশৃংখলা, ভাঙ্গন ও মারামারি-কাটাকাটি দেখা দেয়। সেই অগ্রাধিকার দান কিংবা ভালবাসায় যেটাতেই হোক না কেন। আমরা ইউসুফ (আ) এর প্রতি তাঁর পিতা ইয়াকুবের অতিরিক্ত ভালবাসার ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারি। তারা এমন এক নবীর ঘরে লালিত যাদের দুই দাদা ইসহাক ও ইবরাহীম (আ) নবী ছিলেন। তারপরও সেখানে ঐ একই কারণে বিরাট দুর্যোগ ঘটে গেছে।

হাঁ, অগ্রাধিকার যদি সামান্য হয় যার প্রভাব কার্যকরী নয়, কিংবা অবশিষ্ট সকল সন্তানের পূর্ণ সম্মতি সহকারে হয় অথবা এর পেছনে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে, যেমন, রোগের কারণে কোন সন্তানের অক্ষমতা, কোন মেয়ের বিয়ে না হওয়া, এক সন্তান মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করে কিন্তু অন্য সন্তান করে না, এক সন্তান দীনদার হয়, আর অন্য সন্তান ফাসেক হয়, তখন অগ্রাধিকারকে কেবলমাত্র মাকরূহ বা জায়েয বলা যায়। এটা হল, হেবাকারীর (দানকারীর) জীবদ্দশায় বিশেষ কোন দান সম্পর্কিত হুকুম। কিন্তু বাপ যদি কোন সন্তানকে দিনের ব্যয় নির্বাহের জন্য দুই টাকা, অন্য সন্তানকে ৩ টাকা এবং আরেকজনকে তার বয়স, প্রয়োজন এবং বেশী বেশী স্কুল কামাইর জন্য ৪ টাকা দান করে তাতে কোন অসুবিধে নেই। কেননা, তা কারুর মনে কোন বিরূপ প্রভাব বা ঘৃণা সৃষ্টি করবে না।

www.amarboi.org

আর দান যদি মনে রেখাপাতকারী পরিমাণ হয় তাহলে, বাপের উচিত, কৌশলের সাথে এমন আচরণ করা যেন তা অন্যদের মনে রেখাপাত না করে। মা-বাপের খুবই সতর্ক হতে হবে। তারা যেন মেয়ের উপর ছেলেকে প্রাধান্য না দেয়। কেননা, এটা জায়েয নেই। তবে তাতে সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা ও লেখা-পড়ার ব্যয় অন্তর্ভুক্ত হবে না। বাপের কর্তব্য হল, ছেলে-মেয়েদেরকে তাদের সামর্থ অনুযায়ী যুগের উপযোগী করে গড়ে তোলা। বাপ যদি কোন ছেলে বা মেয়েকে উচ্চশিক্ষা দিতে সক্ষম এবং অন্য ছেলে বা মেয়েকে শিক্ষা দিতে অক্ষম হয়; কিংবা অন্য সন্তান ঐ সন্তানের মত লেখা-পড়া করতে আগ্রহী না হয়, তাহলে, বাপের কোন দোষ নেই। তখন একথা বলা যাবে না যে, ঐ সন্তানের লেখাপড়া বাবত যে পরিমাণ সম্পদ ব্যয় হয়েছে, ঐ সন্তানের জন্য ঐ পরিমাণ আলাদা করে দেয়া হোক। কেননা, এক্ষেত্রে বাপ, ছেলে ও মেয়ের পরিস্থিতিই বিবেচ্য বিষয়।

কোন বাপ যদি নিজের মৃত্যুর পর কোন ছেলে বা মেয়ের জন্য অসিয়ত করে যায় তাহলে, শরীয়ত সে অসিয়তকে বাতিল ঘোষণা করে। কেননা, ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করা জায়েয নেই। তবে, অন্যান্য ওয়ারিশরা তা যদি সুস্পষ্ট করে জানে ও অনুমতি দেয় তাহলে তা বৈধ হতে পারে।

সন্তানের উপর মা-বাপের অধিকার

সন্তানের ওপর মা-বাপের অধিকার অসংখ্য ও অগণিত। যদি সন্তানের পক্ষে মা-বাপের কষ্ট ও পরিশ্রমের সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। তাহলে সে মা-বাপের প্রতি সদ্ব্যবহারের পরিমাণও নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু তা নির্ধারণ করা কি কোনদিন সম্ভব? বিশেষ করে মা গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, দুধ পান, রাত্রি জাগরণ, দিনে সন্তানের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করা, ঠাণ্ডা, গরম, রোগ-ব্যাধি এবং দুর্ঘটনা থেকে সন্তানকে রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। সন্তানের ক্ষুধা-পিপাসা, কান্না থেকে তার দুঃখ-কষ্ট উপলব্ধি এবং তার হাত-পায়ের নড়াচড়া দেখে সন্তানের ভাল-মন্দ বুঝার তীব্র অনুভূতিসহ আরও অগণিত সেবা কি কোন দিন সংখ্যার বেড়াজালে আটকানো সম্ভব?

মা সন্তানের দুঃখ-কষ্টে পেরেশান হন, সন্তানের মুখে হাসি না থাকলে মায়ের মুচকী হাসি উধাও হয়ে যায়, সন্তানের জ্বর ও বিভিন্ন রোগ-শোকে মায়ের চোখের অশ্রু বয়ে যায়, সন্তান বুকের দুধ না পান করলে মায়ের খাওয়া দাওয়া হারাম হয়ে যায়, সন্তানকে রক্ষার জন্যে নিজে আগুনে ঝাঁপ দেয়, সন্তানের সুখ-

www.amarboi.org

সমৃদ্ধির জন্য মা এক পাহাড় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এবং নিজের সুখ-শান্তি ও স্বাস্থ্যের কোরবানী দেয়।

সন্তানের মুখে হাসি ফুটলে মায়ের অন্তর খুশীতে নেচে উঠে, সন্তান হামাগুড়ি দিলে কিংবা হাঁটা শুরু করলে মায়ের মনে খুশীর বন্যা বয়ে যায়, সন্তানের মুখে শব্দ ফুটলে মার কাছে তা দুনিয়ার যে কোন সুন্দরতম সুর থেকেও উত্তম মনে হয়, যখন সন্তান অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সাথে খেলে কিংবা স্কুল-মাদ্রাসায় যায়, তখন মা গোটা দুনিয়াকে সুন্দর ও আলোকজ্জ্বল ভাবতে শুরু করে। এভাবেই মা সন্তানের সাথে জিন্দেগী যাপন করে। সন্তানের সাফল্য, লাভ ও বিয়ে দেখে মা নিজের জীবনের চূড়ান্ত সাফল্যের আনন্দ লাভ করে। সন্তানের পক্ষ থেকে এমন মায়ের ভাগ্যে কি জুটা উচিত? না কি তার সকল কষ্ট-ক্লেশ ও পরিশ্রম হাওয়ায় উড়ে যাবে?

এই হচ্ছে মা। যার পায়ের কাছে আল্লাহ্ সন্তানের বেহেশত রেখেছেন।[১] আর পিতার তুলনায় সন্তানের ওপর মায়ের অধিকার ৩ গুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন।

যে সন্তান মাতাপিতাকে সন্তুষ্ট করবে সে এর মাধ্যমে আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করল। আর যে নিজ মাতাপিতাকে অসন্তুষ্ট করল সে আল্লাহ্কে অসন্তুষ্ট করল। যে মা-বাপের সাথে সদয় উত্তম ব্যবহার করল সে নিজ রবের শুকরিয়া আদায় করল এবং যে তাদের সাথে অসদ্ব্যবহার করল সে তাদের অকৃজ্ঞতা প্রকাশ করল। তারা দু'জন হচ্ছেন, বেহেশতে প্রবেশের দরজা। যে সন্তান তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে সে জান্নাতে যাবে আর যে অসদ্ব্যবহার করবে সে দোজখে যাবে।

ইসলাম মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের শ্রেণী বিভাগ উল্লেখ করে তাকে বিস্তারিতভাবে সুনির্দিষ্ট করে দেয়নি। বরং তা অবস্থা, পরিস্থিতি, প্রয়োজনীয়তা, শক্তি, মানবিক রুচিবোধ, সামাজিক প্রথা এবং সন্তানের কাছে জীবন্ত অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল।

সন্তান ও মাতা-পিতার মধ্যকার জীবন হচ্ছে উন্মুক্ত। এতে কিছু আছে গোপন রহস্য এবং কিছু আছে প্রকাশ্য, কিছু বর্ণনা করা যায়, আর কিছু বর্ণনা করা লজ্জাজনক বলে বিবেচিত হয়। যা হোক, ইসলাম সন্তানের ওপর মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারকে ফরজ করে দিয়েছে। তাদের নাফরমানীর বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছে। তাদের অধিকার সমাজের আর কারুর অধিকারের সমপর্যায়ভুক্ত নয়।

---

১. বিশুদ্ধ হাদীস অনুযায়ী মায়ের পায়ের কাছে সন্তানের বেহেশত, পায়ের নীচে নয়।

www.amarboi.org

তাই তাদের বিরুদ্ধে কোন কষ্টদায়ক কথা বা এমন কি 'উঃ' শব্দটি পর্যন্তও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সন্তান মা-বাপের কাছে বিশেষ করে তাদের বৃদ্ধকালে বিনীত বা অনুগত না হলে আল্লাহ সন্তানের ওপর সন্তুষ্ট হবেন না।

আল্লাহ বলেন,

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ.

'তাদের দু'জনের (মাতা-পিতার) জন্য দয়া ও বিনয়ের বাহু অবনত কর।'

(সূরা বনি ইসরাইল : ২৪)

অর্থাৎ ভালবাসা ও দয়ার ভিত্তিতে তাদের কাছে বিনয়ী হতে হবে।

আমরা যতবেশী মা-বাপের কাছে বিনীত হবো, ততবেশী আল্লাহ আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন। এমতাবস্থায় লোকেরা আমাদেরকে তাদের সন্তানের সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করবে। বুদ্ধিমান সন্তানেরা মা-বাপের প্রতি বিনা কষ্টে নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারে। তবে শর্ত হল, এ জন্য তাদের অনুভূতি জীবিত, অন্তর সজাগ এবং দীনদারী সতর্ক হতে হবে। পক্ষান্তরে, বোকা সন্তানেরা মা-বাপের জন্য তাদের বৃদ্ধকালে বিপদ হয় যেমন ছোট বেলায় ছিল অকর্মন্য। বিশেষ করে তারা কঠোর হৃদয়ের অধিকারী এবং পাষাণ মানসিকতার হলে এবং দীনদারী না থাকলে কিংবা আল্লাহর শাস্তিকে ভয় না করলে সে বিপদের আশংকা আরও বৃদ্ধি পায়।

প্রত্যেক মাতা-পিতা সন্তানের কথাবার্তা ও আচরণ থেকে তাদের সদ্ব্যবহারের অনুভূতি বুঝতে পারেন। সকাল বেলা হলে সন্তান মা-বাপের কাছে গিয়ে তাদেরকে সালাম দেয়, প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে এবং বের হওয়ার আগে তাদের কাছে দো'আ চায়। ঘরে ফিরে এসে প্রথমে তাদের খোঁজ খবর নেয়, তাদেরকে সালাম দেয়, তাদের বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়। পছন্দনীয় ফল-ফলাদি কিংবা অন্য কিছু সামান্য হলেও তাদের সামনে পেশ করে। সে সর্বদা তাদের আরাম বৃদ্ধি এবং সুখ-শান্তি বাড়ানোর চেষ্টা করে। আর সে জন্য প্রয়োজনে নিজের আরাম-আয়েশকে কোরবান করে। বিভিন্ন সময় তাদের কাছে উপহার নিয়ে যায়। তাদেরকে উন্মুক্ত বাতাসে, ক্ষেত-খামারে, পার্কে অথবা নদী কিংবা সমুদ্রের তীরে সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ করানোর জন্য উপলক্ষ্য খোঁজে। খাওয়ার সময় উপস্থিত হলে তাদের কাছে সর্বোত্তম খাবার পেশ করে। যদি বাপকে কাজে সাহায্য করার সুযোগ থাকে তখন তাই করে। এমনকি মায়ের কাজেও সাহায্য-সহযোগিতা করে।

www.amarboi.org

সফর থেকে ফিরে আসলে মাতা-পিতার হাতে চুমু খায় এবং সফরে যাওয়ার সময়ও অনুরূপ করে। মা-বাপ দণ্ডায়মান থাকলে তাদের সামনে বসে না। তবে অভ্যাস ও পারিবারিক নিয়মের ভিত্তিতে যে ক্ষেত্রে বসার অনুমতি রয়েছে শুধু সেক্ষেত্রেই বসে। নিজে যা করতে পারে সে কাজ করার জন্য বাপকে খাটায় না। যানবাহনে মা-বাপের আরোহণ ব্যতীত আগে নিজে আরোহণ করে না এবং তাদের আগে আগে চলে না। নিজে আগে গাড়ী থেকে নেমে মা-বাপের গাড়ীর দরজা খুলে দেয় এবং প্রয়োজন হলে, তাদেরকে গাড়ী থেকে নামায়। তারা দূরে অবস্থান করলে তাদের কাছে চিঠি লিখে তাদের খোঁজ-খবর নেয়। মা-বাপ কোন দুর্ঘটনার শিকার হলে, দুর্ঘটনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের থেকে পৃথক হয় না। মা-বাপের প্রতি দ্রুত সাড়া দেয় এবং তাদের কল্যাণের ব্যাপারে সর্বাধিক আগ্রহী হয়। তাদের ব্যাপারে অর্থ খরচের ক্ষেত্রে কোন কার্পণ্য করে না, তাদেরকে সন্তুষ্ট করার ক্ষেত্রে চেষ্টার ত্রুটি করে না। এই হচ্ছে, সে অনুগত ও মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারকারী মানুষ যার ওপর তার মা-বাপ সন্তুষ্ট এবং তারা সর্বদা তার কল্যাণের জন্য দো'আ করে।

কিন্তু যে পাষাণ হৃদয়ের এবং বদবখত সে সকল কিছু নিজের জন্য কামনা করে এবং বড় হয়েও ছোটদের মত আচরণ করে। তার সকল চিন্তা-চেষ্টা হচ্ছে, পাওয়া, দেয়া নয়; সেবা পাওয়া, সেবা করা নয়। মানুষের সাথে নরম ও ভদ্র ভাষায় কথা বলে, কিন্তু মা-বাপের সাথে পাষাণসুলভ বাক্যবান নিক্ষেপ করে, অন্যের সাথে হাসিমুখ, কিন্তু মা-বাপের সাথে কপালের চামড়া খাড়া করে কথা বলে, তাদের সাথে হিংস্র পশুর মত কর্কশ ও বর্বর ব্যবহার করে। তার কাছে যে হিংস্র নখর পাঞ্জা আছে তা দিয়ে সব কিছু এমনকি মা-বাপের খাবার পর্যন্ত থাবা দিয়ে নিয়ে যায়। মা-বাপের কোন কাজ অপছন্দনীয় হলে, নিজ বিষদাঁত দিয়ে তাকে কামড়াতে চায়। মা-বাপকে কাঁদায় এবং তাদেরকে অপমান করে।

পক্ষান্তরে, নিজ স্ত্রীকে সম্মান ও সন্তুষ্ট করে। মা-বাপের প্রত্যেকটি কথাই তার কাছে বিষতুল্য। তাদের কাছ থেকে আত্মরক্ষার সাফাই পর্যন্ত শুনতে রাজী নয়। নিজ সন্তান ও স্ত্রীর জন্য যা কঠিন তার সমাধানের জন্যই শুধু চেষ্টা করে। নিজে তৃপ্তি সহকারে খায় ও পান করে এবং মা-বাপের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেপরোয়া থাকে। অন্য মানুষের মত তাদেরও তো আগ্রহ-আকাংখা আছে, কিন্তু তাদের সে আকাংখিত খাবার ভাগ্যে জোটে না। যে সন্তানকে তারা লালন-পালন করেছে এবং তার শরীরের রক্ত-মাংস সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে আজ সে সন্তান তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে। মায়ের শরীরের নগ্নতা তার মনে কোন দাগ

www.amarboi.org

কাটেনা, কিন্তু স্ত্রীর জন্য নকশা করা দামী শাড়ী ও কাপড়-চোপড় কিনতে বাধে না। মায়ের জন্য দুটো শাড়ীকেই যেখানে যথেষ্ট মনে করা হয় সেক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য ২০টি শাড়ীকেও কম মনে করা হয়। বরং স্ত্রীর পোশাক কম হওয়ার কারণে আফসুসের সীমা নেই।

মা যদি চিকিৎসা কিংবা ঔষধের জন্য ১ টাকাও দাবী করে তার দৃষ্টিতে তা হচ্ছে মায়ের সার্বক্ষণিক রোগ-ব্যাধির বিরূপ ধারণা। পক্ষান্তরে, স্ত্রী যদি একটি টেবলেটও কেনার দাবী জানায় তাহলে, তাকে ভাল ডাক্তারের পরামর্শ, বিছানায় বিশ্রাম গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় ও শক্তিবর্ধক ঔষধ কেনার জন্য নসীহত করে এবং বলে, হে প্রিয়া! আমার মা তোমার শয্যাপাশে রাত জাগবে ও তোমার খেদমত করবে! তার বাপ দণ্ডায়মান থাকলে সে নিজে বসে থাকে এবং পা বিছিয়ে দেয়। বাপ তাকে লক্ষ্য করে কিছু বললে, নিজে চিন্তার জগতে ডুবে আছে বলে বুঝায়, বাপের মতামতকে মন্দ আখ্যায়িত করে। কোন সময় বাপের কথায় সাড়া দেয় না এবং কোন আদেশ দিলে তা পালন করে না। বাপকে টাকা-পয়সা দিলে সে জন্য গর্ব অহংকার করে। তাদের কোন প্রয়োজন পূরণ করলে মাতব্বরী ও কর্তৃত্বের মনোভাব প্রদর্শন করে। বাপ কথা বলতে চাইলে পিঠ ঘুরিয়ে দেয়, তার কথায় রাজী না হলে মা-বাপকে ধমক দেয়। সে গাড়ীতে আরোহণ করছে, অথচ বাপ দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করে কথা বলছে কিংবা সে ঐ সময় আসনের ওপর এক পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সম্পদশালী হলে অভাবী মা-বাপ থেকে তা গোপন রাখে এবং তাদের থেকে দূরে অবস্থান করে। তারা কারুর সামনে তার সাথে কথা বললে সে তাদের বিরুদ্ধে এক রাশি অভিশাপ দেয় এবং যে দিন দেশের কোন কর্তা হয়ে যায় সে দিন মা-বাপকে বহু দূরে রাখে, যাতে করে লোকেরা মনে না করতে পারে যে, এই পদমর্যাদা কি এই ফকীর পরিবারের লোকের কাছে এসেছে?

সন্তান জানে না, তার জুলুমের কারণে মাতা-পিতার চোখের পানি তাকে দোজখে নিয়ে যাওয়ার কারণ হবে এবং তারা কাফের হলেও তাদের দো'আ কবুল হবে। সন্তান যখনই মা-বাপের ওপর জুলুম করবে তখনই আল্লাহর গযব তাদের ওপর নেমে আসবে। তখন দুনিয়ার সকল ধন-সম্পদ কোন কাজে আসবেনা। মা-বাপের অবাধ্য-সন্তানের পরিণতি ও ভবিষ্যতে তার সন্তানের কাছে অনুরূপ হবে। আল্লাহ নিজ হুকুমের ওপর বিজয়ী। মজলুমের দো'আ ও আল্লাহর মাঝে কোন আড়াল নেই, যদিও মজলুম কাফের হোক না কেন, যদি মুসলমান হয়, তাহলে সন্তানের অবস্থা কি হবে?

www.amarboi.org

এখন আমরা মা-বাপের সাথে ভাল ব্যবহারের বিষয়ে কোরআন ও হাদীস থেকে দলীল-প্রমাণ পেশ করব। আল্লাহ্ বলেন,

وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا.

'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকে শরীক করবেনা এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।' (সূরা নিসা : ৩৬)

এ আয়াতে, আল্লাহ্ শিরকমুক্ত তাওহীদের পরই মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন এবং মা-বাপের ওপর অন্য কোন সৃষ্টির অধিকারকে অগ্রাধিকার দেননি। কয়েকটি কারণে এ আয়াতে আল্লাহর ইবাদতের পর মা-বাপের প্রতি সদ্ব্যবহারকে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে :

১. তারা সন্তানের জন্মদাতা এবং তার লালন-পালনকারী। তাই মা-বাপের পর আল্লাহর আর কোন বড় নেয়ামত নেই।

২. তাদের নেয়ামত আল্লাহর নেয়ামতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, তারা এর মাধ্যমে কোন প্রশংসা ও বিনিময় চায় না।

৩. বান্দাহ্ গুণাহ্ করলেও আল্লাহ্ বান্দাহর ওপর বিরক্ত হন না। অনুরূপভাবে, সন্তানের অসদ্ব্যবহার সত্ত্বেও মা-বাপ সন্তানের ওপর নিজ দয়া বন্ধ করেন না।

৪. মা-বাপ সন্তানের জন্য যে মর্যাদা ও পূর্ণতা কামনা করেন, তাছাড়া সন্তানের অন্য কোন পূর্ণতা নেই। যেমন করে আল্লাহ্ মানুষের কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু পছন্দ করেন না। সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের স্নেহ হল, সন্তান তাদের চাইতে উত্তম হলে, তাতে মাতা-পিতার কোন হিংসা নেই, যা অন্য মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়। অন্যরা নিজের চাইতে অন্য জনকে অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় দেখতে চায় না। মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহারের বিষয়ে আল্লাহ্ বলেছেন,

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلاً كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ

www.amarboi.org

ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا، رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ اِنْ تَكُوْنُوْا صَالِحِيْنَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا.

'তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে পৌঁছে, তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না, তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বল। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল : হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল।' (সূরা বনি ইসলাইল : ২৩-২৫)

এ আয়াতটি মাতা-পিতা ও সন্তানের বিষয়ে সকল হুকুমের সমন্বয় করেছে। সন্তান ধনী হোক বা গরীব হোক, সন্তানের মানসিক অবস্থা ভাল হোক বা মন্দ হোক, সর্বাবস্থায় মাতা-পিতার সাথে তার সদ্ব্যবহার জরুরী। খারাপ অবস্থার শিকার হয়ে দুঃখ-কষ্টের প্রকাশের জন্য 'উহ' শব্দ বলা কিংবা মাতা-পিতাকে তিরস্কার করা নিষিদ্ধ। মানসিক দিক থেকে ক্ষুব্ধ হয়ে মা-বাপকে রাগ করে কোন কথা বলা যাবে না। তাদের সাথে নরমভাবে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মা-বাপ বৃদ্ধ হলে তাদের সাথে আরও সুন্দর ও নরমভাবে কথা বলার জন্য কোরআন নির্দেশ দিয়েছে। সর্বশেষ তাদের জন্য দয়া ও রহমতের দো'আ করার নির্দেশ দিয়েছে।

আল্লাহ কোরআন মজীদে ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়ার জন্মের পূর্বে তার সকল মহতী গুণাবলী বর্ণনা করে বলেছেন, যে তিনি নিজ মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী ছিলেন। আল্লাহ বলেন,

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًا.

'তিনি ছিলেন পিতা-মাতার অনুগত এবং তিনি উদ্ধৃত ও নাফরমান ছিলেন না।' (সূরা মরিয়ম : ১৪)

আল্লাহ হযরত ঈসা (আ) এর বড় বড় গুণাবলী উল্লেখ করে বলেছেন যে, তিনি ছিলেন নিজ মায়ের অনুগত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

www.amarboi.org

وَبَرًّا بِوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا.

'আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন..... আমার মায়ের অনুগত থাকতে এবং তিনি আমাকে উদ্ধৃত ও হতভাগ্য করেননি।' (সূরা মরিয়ম : ৩২)

মাতা-পিতা কাফের হলেও তাদের আনুগত্য করা এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা ফরজ। তবে, আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে তাদের আদেশের আনুগত্য করা যাবে না, কেননা, এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ.

'মাতা-পিতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। যে আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করে তার পথ অনুসরণ করবে।' (সূরা লোকমান : ১৫)

আল্লাহ কোরআন মজীদে নিজ বাপের প্রতি ইবরাহীম (আ)-এর উপদেশ কত সুন্দর ভাবেই না পেশ করেছেন যা প্রত্যেক পাঠকের জন্য চিন্তার বিষয়। তিনি তাতে অত্যন্ত মিষ্টি ও নরম ভাষা ব্যবহার করেছেন। তিনি প্রত্যেক বাক্যের শুরুতে 'হে আমার পিতা ' বলে সম্বোধন করেছেন যাতে নম্রতা, আন্তরিকতা ও চরম সম্মানবোধের প্রকাশ ঘটেছে। যখন তাঁর পিতা কুফরীর গোমরাহীতে উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং দ্বিতীয় বার তাকে উপদেশ দিলে প্রস্তরাঘাত করার হুমকী দিয়ে তার কাছ থেকে চিরতরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিল, সে কঠিন এবং হৃদয় বিদারক পরিস্থিতিতেও তিনি বাপের সাথে সুন্দর, মোলায়েম, দয়ালু ও মিষ্টি উত্তর দেন যে, 'আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, আমি আমার প্রতিপালকের কাছে আপনার জন্য গুণাহ মাফ চাব।' মোখলেস ও একনিষ্ঠ কোন ব্যক্তি ছাড়া অন্যের পক্ষে এরূপ জবাব দেয়া সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেন,

'আপনি এ কিতাবে (কোরআনে) ইবরাহীমের কথা বর্ণনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন সত্যবাদী নবী। যখন তিনি তার পিতাকে বললেন, হে আমার পিতা! যা

www.amarboi.org

শোনে না, দেখেনা এবং আপনার কোন উপকারে আসেনা তার ইবাদত কেন করেন? হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে, যা আপনার কাছে আসেনি। সুতরাং আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সরল পথ দেখাবো, হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত করবেন না। নিশ্চয়ই শয়তান দয়ালু আল্লাহর অবাধ্য। হে আমার পিতা, আমি আশংকা করি দয়ালু আল্লাহর একটি আজাব আপনাকে স্পর্শ করবে, তারপর আপনি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবেন। পিতা বলল : হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করব। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও। ইবরাহীম বললেন, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমি আমার পালনকর্তার কাছে আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো। নিশ্চয়ই তিনি মেহেরবান।' (সূরা মরিয়ম : ৪৭)

আল্লাহ আরও বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْـنٍ وَفِصَالُـهُ فِـىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَى الْمَصِيْرُ.

'আর আমি মানুষকে তার পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভেধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু'বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে।' (সূরা লোকমান : ১৪)

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ؟ قَالَ الصَّلَاةُ عَلٰى وَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ برُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْـتُ ثُـمَّ اَىٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

'আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞেস করি, আল্লাহর কাছে কোন আমল সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বলেন, ঠিক সময়ে নামাজ পড়া। পুনরায় জিজ্ঞেস করি, এরপর কোন আমল উত্তম? তিনি জওয়াবে বলেন, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার ও

www.amarboi.org

তাদের আনুগত্য করা। পুনরায় পশ্ন করি, এরপর কোনটি উত্তম? তিনি বলেন, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা।' (বোখারী, মুসলিম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لاَيَجْزِىْ وَلَدُ وَالِدَهُ اِلاَّ اَنْ يَّجِدَهُ. مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيْهِ فَيُعْتِقَهُ.

'সন্তান বাপের কোন বিনিময় শোধ করতে পারেনা। হাঁ, কিছুটা পারে যদি নিজ বাপকে দাস হিসেবে দেখতে পায় এবং তাকে কিনে মুক্ত করে দেয়।' (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসে বলেন,

اِنِّىْ اَشْتَهِى الْجِهَادَ وَلاَ اَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ هَلْ بَقِىَ مِنْ وَالِدَيْكَ اَحَدٌ؟ قَالَ اُمِّىْ قَالَ: قَابِلِ اللهَ فِىْ بِرِّهَا فَاِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ فَاَنْتَ حَاجٌّ وَمُعْتَمِرٌ وَ مُجَاهِدٌ.

'আমি জেহাদে যাওয়ার জন্য আগ্রহী কিন্তু তা করার সামর্থ আমার নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমার মা-বাপের মধ্যে কেউ কি জীবিত আছে? সে জওয়াবে বলে, আমার মা আছে। তখন তিনি বলেন, তুমি তার আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত কর। যদি তুমি তা কর তাহলে, তুমি হাজী, ওমরাহ আদায়কারী ও মুজাহিদ। (আবু ইয়ালী, উত্তম সনদ সহকারে)

মুয়াবিয়াহ বিন জাহেমা থেকে বর্ণিত। জাহেমা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বলেন, আমি জেহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি, এখন এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ চাই। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেন, তোমার মা জীবিত আছে কি? তিনি জওয়াব দেন, হাঁ।' রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমার মায়ের কাছেই থাক। কেননা, বেহেশত তার পায়ের কাছে।' (ইবনে মাজাহ, হাকেম, সনদ সহীহ)

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَمُدَّ لَهُ فِىْ عُمْرِهِ وَيُزَادُ فِىْ رِزْقِهِ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحْمَهُ.

www.amarboi.org

'যে ব্যক্তি হায়াত ও রিজক বৃদ্ধির মাধ্যমে খুশী হতে চায় সে যেন নিজ মাতা-পিতার আনুগত্য ও সদ্ব্যবহার করে।' (আহমদ)

ইবনে ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

بِرُّوْا اَبَاءَكُمْ تَبَرَّكُمْ اَبْنَاءُكُمْ وَعِفُّوْا تَعِفُّ نِسَاءُكُمْ.

'তোমরা তোমদের মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহার কর, তাহলে তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং তোমরা পূত-পবিত্র থাক, তাহলে তোমাদের নারীরাও পূত-পবিত্র থাকবে।' (তাবরানী-সনদ সহীহ)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

رَغِمَ اَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُهُ قِيْلَ مَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَوْ اَحَدَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ.

'তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও; তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও; পুনরায় তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল কে সে ব্যক্তি? তিনি উত্তরে বলেন, যে নিজ বৃদ্ধ পিতা-মাতার দু'জন কিংবা একজনকে পেয়েছে, তারপরও বেহেশতে যেতে পারেনি।' (মুসলিম)

মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرُ ثَلاَثًا؟ قُلْنَا بَلٰى يَارَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ اَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ.

'আমি কি তোমাদেরকে সর্ববৃহৎ কবীরা গুণাহ সম্পর্কে বলবো না? আমরা উত্তর দিলাম, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া। তিনি হেলান দিয়েছিলেন। তারপর সোজা হয়ে বসেন এবং বলেন, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। তিনি একথাগুলো বারবার

www.amarboi.org

উচ্চারণ করতে থাকলেন আর আমরা মনে মনে বলছিলাম তিনি যদি চুপ হয়ে যেতেন।' (বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اَلْكَبَائِرُ اَلْاِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ.

'আল্লাহর সাথে শরীক করা, মা-বাপের অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা শপথ করা কবীরা গুনাহ।' (বোখারী)

আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوْا يٰارَسُوْلَ اللهِ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ، يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهُ.

'নিম্নোক্ত গুনাহগুলো কবীরা গুনাহ, মা-বাপকে গালি দেয়া। প্রশ্নকারীরা জিজ্ঞেস করলেন হে রাসূল! কেউ কি নিজের মা-বাপকে গালি দেয়? তিনি উত্তরে বলেন, হাঁ, কেউ অন্যের বাপকে গালি দিলে সেও পাল্টা তার বাপকে গালি দেয়। অনুরূপভাবে, সে অন্যের মাকে গালি দিলে সেও পাল্টা তার মাকে গালি দেয়।' (বোখারী, মুসলিম, ইত্যাদি)

মা-বাপের আনুগত্যের সাথে প্রাসঙ্গিক মাসআলা

১. বাপের আনুগত্যের চাইতে মায়ের আনুগত্যের অধিকার বেশী :

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল!

مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ؟ قَالَ اُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ: اَبُوْكَ.

'আমার উত্তম সাহচর্যের সর্বাধিক অধিকারী কে? তিনি বলেন, 'তোমার মা।' তারপর কে? তিনি বলেন, 'তোমার মা।' আবারও প্রশ্ন করে এরপর কে? তিনি

www.amarboi.org

বলেন, 'তোমার মা।' লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করে তারপর কে? তিনি বলেন, 'তোমার বাপ।' (বোখারী, মুসলিম)

আল্লামা কুরতুবী বলেছেন, এই হাদীস প্রমাণ করে যে, বাপের তুলনায় মায়ের প্রতি ভালবাসা ৩ গুণ বেশী হওয়া দরকার। কেননা, মা সন্তানের গর্ভধারণ, প্রসব এবং দুধপান ও প্রতিপালনের সাথে জড়িত। এগুলোতে বাপের ভূমিকা নেই।

ইমাম মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাঁকে এসে বলল, আমার বাপ সুদানে। তিনি আমাকে সেখানে তার কাছে যেতে বলেছেন। কিন্তু আমার মা আমাকে যেতে নিষেধ করেন। তখন তিনি লোকটিকে বলেন, তুমি তোমার বাপের আনুগত্য কর এবং মায়ের হুকুম অমান্য করো না।

ইমাম মালেকের এ বক্তব্য প্রমাণ করে যে, তাঁর কাছে মা-বাপের দুজনের আনুগত্য সমান।

লায়স বিন সা'দকে এ মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি মায়ের আদেশের আনুগত্যের নির্দেশ দেন। তাঁর মতে, মায়ের অধিকার দুই তৃতীয়াংশ, অপরদিকে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী মায়ের অধিকার ৪ ভাগের ৩ অংশ। এ হাদীস এর বিরোধী মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ।

আল্লামা মোহাসেবী তাঁর 'আর-রেআয়াহ' কিতাবে লিখেছেন, আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস মোতাবেক, মায়ের অধিকার ৩ গুণ এবং বাপের অধিকার ১ গুণ-এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। (তাফসীরে কুরতুবী)

এ কথার অর্থ হল, বাপের চাইতে মায়ের অধিক যত্ন নিতে হবে এবং তার গুরুত্ব বেশী দিতে হবে। বাপের আদেশের সাথে যদি মায়ের আদেশের সংঘাত হয় তাহলে, মায়ের আনুগত্য করা উত্তম। তবে মা-বাপের দু'জনের আদেশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সন্তানের জন্য উত্তম। মূলতঃ ইমাম মালেকের বক্তব্যে এটাই ফুটে উঠেছে বলে মনে হয়।

২. কাফের মাতা-পিতার অধিকার মুসলমান মাতা-পিতার মতই সমান :

এ বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন,

لَايَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

www.amarboi.org

'যারা তোমাদের সাথে দীনের বিষয়ে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ী-ঘর থেকে বের করেনি, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার এবং ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।' (সূরা মোমতাহিনা : ৮)

আল্লামা সুয়ূতী এ আয়াতের শানে নুজূল সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, আহমদ, বাজ্জার এবং হাকেম আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের থেকে বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন। কাতীলাহ নিজ কন্যা আসমা বিনতে আবু বকরের কাছে আসে। হযরত আবু বকর (রা) তাকে জাহেলিয়াতের যুগে তালাক দিয়েছিলেন। কাতীলাহ হযরত আসমার কাছে কিছু উপহার নিয়ে আসে। আসমা তার উপহার গ্রহণ কিংবা তাকে নিজ ঘরে প্রবেশে অস্বীকৃতি জানান। আসমা হযরত আয়েশার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এ বিষয়ে জানতে চান। হযরত আয়েশা (রা) আসমাকে জানান যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কাতীলার উপহার গ্রহণ এবং তাকে নিজ ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন। তখন মহান আল্লাহ উক্ত আয়াতটি নাজিল করেন।

বোখারী শরীফে আসমা বিনতে আবু বকর থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, 'আমার মা আমার কাছে আগ্রহ সহকারে আসেন। আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়ে জানতে চাই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) 'হাঁ' বলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই উপরোক্ত আয়াতটি নাজিল হয়।'

এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, গুণাহর কাজ ছাড়া কাফের ও ফাসেক মা-বাপের আনুগত্য এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা ফরজ। কেননা, মা-বাপ সন্তানের জন্য যা করেছে তার মোকাবিলায় কোরআন তাদের সাথে সদ্ব্যবহারকে নেক কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছে এবং এ বিষয়ে কাফের ও মুসলমান মা-বাপের সমান মর্যাদা দিয়েছে। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, কাফের মাতা-পিতা মৃত্যুর পর তাদের মাগফেরাতের জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করা যাবে না।

৩. ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের অবাধ্যতার কিছু দিক :

আল্লামা কুরতুবী বলেছেন, মাতা-পিতার বাধ্য হওয়া এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার মধ্যে তাদের প্রয়োজন পূরণ অন্তর্ভুক্ত আছে। এর ভিত্তিতে, তাদের কোন একজন যদি সন্তানকে কোন কিছুর আদেশ করে, সে কাজটি গুণাহ না হলে সন্তানের ওপর তা করা ফরজ। যদিও কাজটি মোবাহ বা

www.amarboi.org

মোস্তাহাব জাতীয়ই হোকনা কেন। কেউ কেউ বলেছেন, মোবাহ (জায়েয) কাজের আদেশ সন্তানের জন্য পালন করাও মোবাহ (জায়েয), ফরজ নয়। তবে এ বিষয়ে শর্ত হল, ঐ জায়েয বা মোস্তাহাব কাজটি না করলে যদি মাতা-পিতা অসন্তুষ্ট না হন। যদি অসন্তুষ্ট হন, তাহলে এ কাজ থেকে বিরত থাকা হারাম। কেননা, মাতাপিতাকে অসন্তুষ্ট করা হারাম।

ওরওয়াহ নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। 'মা-বাপ যা পসন্দ করে তা থেকে বিরত থাকবে না।'

সাঈদ বিন আবি বারদাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার আব্বাকে বলতে শুনেছি, তিনি ইয়েমেনের এক ব্যক্তিকে কাবার তওয়াফ করতে দেখেন যার পিঠে ছিল তার মা। সে বলতে লাগল, 'আমি তার জন্য বাধ্য ও অনুগত উট। উটের আসন খসে গেলেও আমি কিন্তু বোঝা বহন করতেই থাকব।' তারপর সে আবদুল্লাহ বিন ওমারকে জিজ্ঞেস করে, আপনার রায় কি? আমি কি আমার মায়ের প্রতিদান দিয়েছি? তিনি বলেন, 'না', সামান্যও নয়।'

বায়হাকী ও ইবনুস সুন্নী বর্ণনা করেছেন। 'আবু হোরায়রা (রা) দুই ব্যক্তিকে দেখে একজনকে জিজ্ঞেস করেন, উনি তোমার কি হয়? লোকটি উত্তর দেয়, তিনি আমার বাপ। আবু হোরায়রা (রা) বলেন, তার নাম ধরে ডাকবে না, তার সামনে দিয়ে চলবে না এবং তার সম্মুখে বসবে না।' (আল আদাবুল মুফরাদ : বোখারী)

ফোদাইল বিন আয়া'দকে মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'তুমি অলসতা সহকারে মাতা-পিতার সেবা করবেনা।'

কেউ কেউ বলেছেন, 'তুমি মাতা-পিতার সাথে জোরে কথা বলবেনা, তাদের প্রতি খারাপ দৃষ্টিতে তাকাবেনা, তারা যেন প্রকাশ্য কিংবা গোপনে তোমার পক্ষ থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন না হন, তারা যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন তাদের ওপর দয়া করবে এবং তারা মারা গেলে তাদের জন্য দো'আ করবে।' (তাফসীরে আবুস সউদ)

মা-বাপের অর্থের প্রয়োজন হলে তাদেরকে অর্থ দিতে হবে। তাদের অবস্থা সন্তান-সন্ততির অবস্থা থেকে কম স্বচ্ছল হলে তাদের অর্থনৈতিক প্রশস্ততা বিধান করা উচিত। তাদেরকে কঠিন কাজে সাহায্য করে দয়া প্রদর্শন করতে হবে।

ইবনুল কাইয়্যেম আল-জাওজিয়া বলেন, 'এটা মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার নয় যে, ছেলে ধনী ও সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও বাপ অন্যের ঘর ঝাড়ু দেবে, গাধার

www.amarboi.org

ওপর মাল বহন করবে এবং মানুষের জন্য মাথায় খাদ্য বহন করবে। অনুরূপভাবে, মা অন্যের বাড়ীতে কাজ করবে, তাদের কাপড় পরিষ্কার করবে এবং পানি পান করাবে। (যাদুল মাআ'দ)

ইবনু হাজম তাঁর 'আল-মোহাল্লা' কিতাবে লিখেছেন, বাপ-মা ও দাদা-দাদীর যদি খরচ করার মত কোন অর্থ-সম্পদ কিংবা রোজী-রোজগার না থাকে, তাহলে, তাদের খরচ বহনের জন্য সন্তানকে বাধ্য করা যাবে। তারপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তির আয় কম তথাপি তা মা-বাপ, দাদা-দাদী ও স্ত্রীর জন্য তাকে খরচ করতে হবে। সে সামর্থবান হলে তাদেরকে নিকৃষ্ট কাজ থেকে রক্ষা করতে হবে এবং এ জন্য প্রয়োজনে তাদের ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে তার সহায়-সম্পদ এবং পশু বিক্রী করতে হবে।.....কোন লোককে বিধর্মীর জন্য ব্যয় করতে বাধ্য করা যাবে না। শুধুমাত্র সন্তানকে অমুসলমান মা-বাপের জন্য ব্যয় করতে বাধ্য করা যাবে।

মা-বাপের অবাধ্যতা বলতে বুঝায়, কথা, কাজ ও আচরণের মাধ্যমে মা-বাপকে কষ্ট দেয়া। শুধুমাত্র অন্যায় ও ইসলাম বিরোধী কাজে তাদের আনুগত্য করা যাবে না। এছাড়া বাকী সকল বিষয়ে তাদের আনুগত্য করতে হবে।

৪. জেহাদে অংশগ্রহণের জন্য মা-বাপের অনুমতি সদ্ব্যবহারের অন্তর্ভূক্ত :

আল্লামা কুরতুবী বলেছেন, জেহাদ ফরজ না হলে, মা-বাপের অনুমতি ছাড়া জেহাদে না যাওয়া উত্তম। তিনি এ প্রসঙ্গে দলীল পেশ করেন,

আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক লোক এসে রাসূলুল্লাহ (সা) কাছে জেহাদে যাওয়ার অনুমতি চান। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন;

اَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ.

'তোমার মাতা-পিতা কি জীবিত? সে উত্তর দেয়, 'হাঁ'। তিনি বলেন, তাদের জন্যই জেহাদ কর।' (বোখারী, মুসলিম)

আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। ইয়েমেনের এক ব্যক্তি হিজরত করে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে আসেন। তখন রাসূলুল্লাহর (সা) তাকে জিজ্ঞেস করেন,

هَلْ لَكَ اَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ قَالَ اَبَوَاىَ، قَالَ: اَذِنَا لَكَ؟ قَالَ لاَ، قَالَ: فَارْجِعْ اِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَاِنْ اَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَاِلاَّ فَبِرَّهُمَا.

www.amarboi.org

'ইয়েমেনে কি তোমার কেউ আছে? লোকটি বলেন, আমার মা-বাবা আছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তারা কি তোমাকে অনুমতি দিয়েছে? লোকটি বলেন, না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তুমি তাদের কাছে যাও এবং তাদের অনুমতি নিয়ে আস। যদি তারা তোমাকে অনুমতি দেয়, তাহলে, জেহাদে যাও, নচেত তাদের সেবা ও আনুগত্য কর।' (আবু দাউদ)

এ দুটো হাদীস জেহাদ ফরজ না হলে, তাতে অংশ গ্রহণ না করার পক্ষে প্রমাণ। কেননা, জেহাদ ফরজ হলে তখন তা ফরজে আইন হয়ে যায়। তাতে অংশ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায় এবং না করলে বিরাট গুণাহ হয়। তখন তা ফরজে কেফায়াহ থাকে না, জেহাদ ফরজে আইন হওয়ার অবস্থা তিনটি :

১. নিজের দেশের ওপর শত্রু আক্রমণ করলে।

২. যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের নেতা আহ্বান জানালে।

৩. দেশের প্রতিরক্ষায় যুদ্ধরত সেনা বাহিনী অপর্যাপ্ত হলে এবং সেনাবাহিনীকে তার পক্ষে সাহায্য করা সম্ভব হলে।

আল্লামা জাস্‌সাস তাঁর আহকামুল কোরআন গ্রন্থে লিখেছেন, আমাদের সাথীরা বলেছেন, মা-বাপের অনুমতি ছাড়া জেহাদে অংশগ্রহণ জায়েয নেই। এটা হচ্ছে, জেহাদ যদি ফরজে কেফায়াহ হয়। তাদের মতে, জেহাদ ফরজে আইন হলে, তাতে অংশ গ্রহণের জন্য মা-বাপের অনুমতির প্রয়োজন নেই। কেননা, সে মুহূর্তে জেহাদ সবার ওপর ফরজ বিধায় কিছু লোক জেহাদ করলে তা অবশিষ্টদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে না।

তবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মা-বাপের অনুমতি ছাড়া বেরিয়ে গেলে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) জেহাদে যেতে নিষেধ করেছেন যাতে নিহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং যার ফলে মা-বাপের বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। তবে, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অন্য কোন মোবাহ কাজে বেরিয়ে পড়া নাজায়েয নয়। তাতে সাধারণতঃ হত্যার সম্ভাবনা থাকে না। সে জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই। আল্লামা জাস্‌সাস বলেন, আমাদের সাথীদের মতে, বাপ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে পুত্রের পক্ষে বাপকে হত্যা করা জায়েয নেই। কেননা, আল্লাহ বলেছেন, 'তুমি তাদের উদ্দেশ্যে 'উহ' শব্দটি ও ব্যবহার করো না' এবং 'যদি তারা উভয়েই তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।' আল্লাহ কুফরীর পক্ষে যুদ্ধ করা অবস্থায়ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। জানা কথা,

www.amarboi.org

বাধ্য না হলে, মা-বাপের ওপর অস্ত্র ধরা কিংবা তাদেরকে হত্যা করা জায়েয নেই। যেমন, যদি বাপ সন্তানকে হত্যার চেষ্টা করে এমতাবস্থায় বাপকে হত্যা করা জায়েয। অন্যথায় সে বাপকে হত্যার সুযোগ দিল। ইসলামে অন্যকে হত্যার সুযোগ দেয়া কিংবা নিজের আত্মহত্যা করার কোন সুযোগ নেই। নবী (সা) হানজালা বিন আবি আমের রাহেবকে নিজের মোশরেক পিতাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন। (আহকামুল কুরআন : আল্লামা জাস্‌সাস, ৪র্থ খণ্ড, ২৩৫ পৃঃ)

৫. মা-বাপের নির্দেশে স্ত্রী তালাক দেয়া এবং নিজের অপছন্দনীয় স্ত্রী বিয়ে করার হুকুম

আবদুল্লাহ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। 'আমার এক স্ত্রী ছিল। আমি তাকে ভালবাসতাম। কিন্তু ওমার (রা) তাকে পছন্দ করতেন না। তিনি আমাকে নির্দেশ দেন যেন আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দেই। আমি তা অস্বীকার করি। তখন ওমার (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে আসেন এবং ঘটনাটি উল্লেখ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তাকে তালাক দাও।' (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, তিরমিযী এটাকে হাসান বলেছেন)।

বাপের নির্দেশে স্ত্রী তালাকের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ উপরোক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে বলেছেন, তালাক দিতে হবে। অন্য একদলের মতে তালাক দেয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা, ওমার (রা) আল্লাহর নূর দ্বারা দেখতেন এবং দীনের স্বার্থে কাজ করতেন। তিনি খামখেয়ালী কিংবা অর্থহীনভাবে কোন কিছু করতেন না বা বলতেন না। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই সকল কিছু করতেন। আল্লামা মাকদেসী তাঁর 'আল-আদাব-আশ-শরীয়াহ' কিতাবে লিখেছেন, হাম্বলী মাজহাবের অধিকাংশ আলেমের মত হল, তালাক দেয়ার দরকার নেই।

সিন্দী বলেছেন, এক ব্যক্তি আবু আবদুল্লাহ আহমদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করল, আমার বাপ আমার বউকে তালাক দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, তুমি তালাক দিওনা। লোকটি বলল, ওমার (রা) কি তাঁর ছেলে আবদুল্লাহকে স্ত্রী তালাকের নির্দেশ দেননি? তখন তিনি বলেন, তোমার বাপ যে পর্যন্ত না ওমারের মত হয়, সে পর্যন্ত নয়। আবু বকর হাম্বলীর মতে, এ ক্ষেত্রে তালাক দেয়া ওয়াজিব। কেননা, নবী (সা) আবদুল্লাহ বিন ওমারকে তা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

www.amarboi.org

মায়ের নির্দেশে তালাক দেয়ার বিষয়েও অনুরূপ একই মতভেদ বিদ্যমান। শেখ তাকি উদ্দিন বলেছেন, মায়ের নির্দেশে তালাক দেয়া জায়েয নেই। সন্তানের কর্তব্য হল, মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করা। স্ত্রী তালাক সদ্ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত নয়।

শেখ তাকি উদ্দিন আরও বলেছেন, বাপ-মায়ের কারুর জন্যই সন্তানকে তার অপছন্দনীয় বিয়েতে রাজী করানোর অধিকার নেই। সন্তান যদি মা-বাপের নির্দেশ পালনে বিরত থাকে, তাহলে, অবাধ্য সন্তান হিসেবে বিবেচিত হবে না। তিনি বিয়েকে খানার সাথে তুলনা করেছেন। (ঐ)

আমাদের মতে, বউ যদি মা-বাপকে কষ্ট দেয় এবং এ কারণে তারা বউ তালাকের জন্য ছেলেকে নির্দেশ দেয় তাহলে তালাক দেয়া ওয়াজিব, অন্যথায় নয়। অনুরূপভাবে, বউ যদি নামাজ না পড়ে, কিংবা পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করে, নিজ সন্তানদেরকে গুণাহর কাজে উৎসাহ দেয় কিংবা বাপের অবাধ্যতা শিক্ষা দেয় তখনও তালাকের নির্দেশ কার্যকর করা ওয়াজিব হবে।

৬. মৃত্যুর পর মাতা-পিতার সদ্ব্যবহার

জীবিত অবস্থায় যেমন মা-বাপের সদ্ব্যবহার ও আনুগত্যের অধিকার স্বীকৃত, মৃত্যুর পরও তাদের সেই অধিকার সমানভাবে প্রযোজ্য। নিম্নোক্ত উপায়ে তাদের সদ্ব্যবহারের অধিকার আদায় করা যায়, তাদের জন্য গুণাহ মাফ চাওয়া, রহমত, ক্ষমা ও বেহেশতে প্রবেশ, কবর আজাব এবং দোজখের আগুন থেকে মুক্তির জন্য দো'আ করা ইত্যাদি। এটা সর্ববাদী মত। আল্লাহ বলছেন,

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا.

'আপনি বলুন, হে রব! তারা আমাকে ছোটকালে যেভাবে লালন-পালন করেছে অনুরূপভাবে আপনিও তাদের দু'জনের ওপর রহম করুন।'

নবী (সা) বলেছেন,

اِذَا مَاتَ ابْنُ اٰدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهٗ.

'আদম সন্তান যখন মারা যায় তখন তিন 'আমল ছাড়া আর সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। সে তিন 'আমল হচ্ছে, ১. সদকাহ জারিয়াহ, ২. উপকারী ইলম বা জ্ঞান এবং ৩. নেক সন্তান, যে মা-বাপের জন্য দো'আ করে।' (মুসলিম)

www.amarboi.org

এ তিন 'আমলের সওয়াব কবরে পৌঁছতে থাকবে, তা বন্ধ হবে না।

এছাড়াও মা-বাপের জন্য দান-সদকা করলে তা তাদের জন্য উপকারী হবে। এ মর্মে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)কে জিজ্ঞেস করল, আমার আব্বা মারা গেছে, কিন্তু কোন অসিয়ত করে যাননি। আমি যদি তাঁর জন্য দান করি তাতে কি তাঁর উপকারে হবে? তিনি বলেন, হাঁ' (আহমদ, মুসলিম, নাসাঈ) অনুরূপভাবে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিকট মা-বাপের জন্য নামাজ, কোরআন তেলাওয়াত, রোজা এবং অন্যান্য সকল ইবাদতের সওয়াব পৌঁছানো যায়।

ইমাম শাওকানী নাইলুল আওতার গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৯২-৯৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ওলামায়ে কেরাম দান-সদকা এবং দো'আ ছাড়া অন্যান্য ইবাদতের সওয়াব মৃত-মা-বাপের কাছে পৌঁছে কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ পোষণ করেন।

মো'তাজেলাদের মতে, এগুলোর সওয়াব মৃতের কাছে পৌঁছে না। অপরদিকে, 'শরহুল কান্‌জ' গ্রন্থে লিখিত আছে, কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির জন্য নিজের আ'মলে সওয়াব পৌঁছাতে পারে। যেমন, নামাজ, রোজা, হজ্জ, দান সদকা এবং কোরআন তেলাওয়াতসহ সকল নেক ইবাদতের সওয়াব মৃতের কাছে পৌঁছে এবং তাদের উপকারে আসে। এটা হচ্ছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত।

ইমাম শাফেঈ' এবং তার সাথীদের একটি দলের মতে, কোরআন তেলাওয়াতের সওয়াব মৃতের কাছে পৌঁছে না। অপরদিকে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, অন্য একদল আলেম এবং শাফেঈ' মাজহাবের একদল আলেমের মতে, এর সওয়াব মৃতের কাছে পৌঁছে। 'শরহুল মিনহাজ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, পসন্দনীয় মত হচ্ছে, মৃতের কাছে কোরআন তেলাওয়াতের সওয়াব পৌঁছানোর দো'আ করলে এবং এ বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প করলে সে সওয়াব পৌঁছবে। কেননা, তাও তো দো'আ। (সংক্ষেপিত)

উল্লেখ্য যে, সন্তানের ওপর মা-বাপের মৃত্যুর পর তাদের ঋণ পরিশোধ করা ফরজ। সে ঋণ চাই অর্থনৈতিক হোক কিংবা যাকাত, রোজা, হজ্জ এবং মান্নতের মত ফরজ ইবাদত হোক। অবশ্য এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

৭. মা-বাপের মৃত্যুর পর তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করা :

বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণ মিলে যে, মা-বাপের মৃত্যুর পর তাদের বন্ধুদেরকে সম্মান করা মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে, তারা

www.amarboi.org

যাদেরকে ভালবাসতেন, যত্ন নিতেন এবং আত্মীয়তার অধিকার রক্ষা করতেন সেগুলো রক্ষা করা এবং তাদের অসিয়ত পূরণ ও সদ্ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত।

আবু বারদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় আসি। আবদুল্লাহ বিন ওমার (রা) আমার কাছে আসেন। তিনি বলেন, আপনি কি জানেন আমি আপনার কাছে কেন এসেছি? তিনি উত্তরে বলেন, 'না'। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)কে বলতে শুনেছি,

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّصِلَ اَبَاهُ فِىْ قَبْرِهٖ فَلْيَصِلْ اِخْوَانَ اَبِيْـهِ بَعْـدَهُ وَاِنَّـهُ كَانَ اَبِىْ عَمَرَ وَبَيْنَ اَبِيْكَ اِخَاءٌ وَوُدٌّ فَاَحْبَبْتُ اَنْ اَصِلَ ذٰلِكَ.

'যে ব্যক্তি কবরে নিজ পিতার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে চায়, সে যেন বাপের মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে। আমার বাপ ওমার (রা) এবং আপনার বাপের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা ছিল। আমি সে সম্পর্ক রক্ষা করাকে পছন্দ করেছি।' (ইবনে হিব্বান)

আবদুল্লাহ বিন দীনার হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আবদুল্লাহ বিন ওমারের (রা) সাথে মক্কার পথে এক বেদুইনের দেখা হয়। আবদুল্লাহ বিন ওমার তাকে সালাম দেন এবং নিজ গাধার ওপর আরোহণ করান। তিনি তাকে নিজের মাথার পাগড়ী খুলে দেন। ইবনে দীনার বলেন, আমরা তাঁকে বললাম, আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করুন ও কল্যাণ দান করুন। তারা হচ্ছে গ্রামবাসী বেদুইন এবং সামান্যতেই সন্তুষ্ট থাকে। তখন আবদুল্লাহ বিন ওমার বলেন, তার বাপ আমার বাপ ওমারের বন্ধু ছিল। আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি,

اِنَّ اَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ.

'বাপের বন্ধুদের সাথে ছেলের সম্পর্ক রাখা বাপের সর্বোত্তম সম্পর্কের পরিচায়ক।' (মুসলিম)

আবু ওসাইদ মালেক বিন রাবীআ'হ আস-সায়েদী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন বনি সালামার এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করে, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে আমার সদ্ব্যবহারের কি কোন দায়িত্ব অবশিষ্ট আছে? তিনি বলেন,

www.amarboi.org

نَعَمْ، اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِيْ لاَ تُوْصَلُ اِلاَّ بِهِمَا وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا.

'হাঁ, তাদের ওপর দো'আ-দরূদ, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা, তাদের অসিয়ত পূরণ, তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবীদেরকে সম্মান করা।' (আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান, হাকেম)

উল্লেখযোগ্য যে, সন্তানের জন্য মাতা-পিতা কাফের হলেও তাদের দো'আ কবুল হয়। এ ব্যাপারে প্রমাণ হচ্ছে সেই তিন শিশুর একজন, যারা শৈশবে মায়ের কোলে থাকা অবস্থায় কথা বলেছে। সাবেক উম্মতের প্রখ্যাত আবেদ জোরাইজের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনা হয়েছিল। নবজাত শিশুর মা জোরাইজের সাথে যেনার মিথ্যা স্বীকৃতি দিল। তখন জোরাইজ আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট হন। তারপর নবজাত শিশুর পেটে লাঠি দিয়ে খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস করেন, তোর বাপ কে? শিশুটি উত্তরে বলে, অমুক রাখাল।' শিশুটির মা ঐ রাখালের সাথে এ আশায় যেনা করে যে, এর মাধ্যমে যে সন্তান জন্মলাভ করবে, সে সন্তান দ্বারা জোরাইজের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনবে। এ অভিযোগ প্রমাণিত হলে এবং জেরাইজকে অভিযুক্ত করা গেলে, এর বিনিময়ে খারাপ লোকেরা তাকে টাকা-পয়সা দেবে। কিন্তু ভূমিষ্ঠ শিশুর স্বীকারোক্তির কারণে সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়।

জোরাইজের বিরুদ্ধে এ দুর্যোগের পেছনে কারণ হল, তার মায়ের বদ দো'আ। মা বলেছিল, বেশ্যার মুখ দেখা ছাড়া যেন জোরাইজের মৃত্যু না হয়। আল্লাহ সে দো'আ কবুল করেছিলেন। (বোখারী, মুসলিম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

ثَلاَثُ دَعْوَاتٍ لاَشَكَّ فِيْ اِجَابَتِهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ، دَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلٰى وَلَدِهٖ.

'তিনজনের দো'আ কবুলের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। ১. মজলুম ও নির্যাতিত ব্যক্তির দো'আ, ২. মুসাফিরের দো'আ এবং ৩. সন্তানের প্রতি মা-বাপের বদদো'আ। (তিরমিযী -এটাকে হাসান বলেছেন)

www.amarboi.org

তাফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে অভিযোগ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাপ আমার অর্থ সম্পদ নিয়ে নিয়েছে।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيْكَ.

'তুমি এবং তোমার অর্থ সম্পদ তোমার বাপের জন্য।' (সংক্ষেপিত)

উপরোক্ত আলোচনায় একথা ফুটে উঠেছে যে, সন্তানের ওপর মা-বাপের অধিকার সর্বাধিক। সন্তানের উচিত, মা-বাপের সার্বিক সুখ-শান্তি নিশ্চিত করার চেষ্টা করা এবং তাদের যত্ন নেয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকা। তাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দেয়া, হুমকী দেয়া, ধমকের সুরে কথা বলা কিংবা বউদের কুপরামর্শে তাদেরকে ব্যথা দেয়া যাবে না। সে ব্যক্তি দুর্ভাগ্য যে, মা-বাপকে মারে কিংবা অল্প শিক্ষার কারণে তুচ্ছ করে। তাদেরকে এর শাস্তি পেতে হবে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক

দু'ধরনের লোক আত্মীয় হতে পারে। হয় তারা উত্তরাধিকার পাবে কিংবা পাবে না। কারুর মতে, শুধু মোহরম ব্যক্তিরাই আত্মীয়। আবার অন্যদের মতে, অমোহরম ব্যক্তিরাও আত্মীয় হতে পারে। মূলকথা, আত্মীয়ের মধ্যে নৈকট্যের একটা সূত্র বা বন্ধন থাকতে হবে। তাহলেই তারা আত্মীয় হতে পারবে। অগ্রাধিকারযোগ্য মত হল, মোহরম-অমোহরম নির্বিশেষে সবাই আত্মীয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তা না হলে, চাচাত ভাই, খালাত ভাই ও ফুফাত ভাই অনাত্মীয় হয়ে যায়। আসলে তা ঠিক নয়।[১] কেননা, তারা যে আত্মীয় এটা সর্বজন স্বীকৃত।

আত্মীয়তার অধিকার রক্ষার হুকুম

কাজী আয়াজ বলেছেন, আত্মীয়তার অধিকার রক্ষা করা ফরজ এবং তা ছিন্ন করা কবীরা গুণাহ। এ বিষয়ে কারো মতভেদ নেই। তবে আত্মীয়তার অধিকার রক্ষার দায়িত্বের ক্ষেত্রে ব্যবধান রয়েছে। কোন কোন আত্মীয়তার অগ্রাধিকার রয়েছে আর কোন কোন আত্মীয়তার তা নেই। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার সর্বশেষ স্তর হচ্ছে, বিচ্ছিন্নতা ত্যাগ করা এবং কথা-বার্তা চালু রাখা, এমনকি তা শুধু সালামের মাধ্যমে হলেও। শক্তি-সামর্থ্যের ওপর ও আত্মীয়তার অধিকার

---

১. ফতহুল বারী শরহে বোখারী-১০ম খণ্ড-পৃঃ ৩৪৭,

www.amarboi.org

পূরণের তারতম্য হয়। কারো জন্য তা ফরজ এবং কারো জন্য মোস্তাহাব। কেউ আত্মীয়তার আংশিক অধিকার আদায় করলে তাকে সম্পর্ক ছিন্নকারী বলা যাবে না। আর সামর্থের চাইতে কম করলে এবং যতটুকু করা দরকার তা না করলে, তাকে আত্মীয়ের অধিকার পূরণকারী বলা যাবে না।[১]

এর অর্থ হল, ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, আত্মীয়তার অধিকার পূরণ করা ফরজ এবং তা ছিন্ন করা হারাম ও কবীরা গুণাহ। কথা বললে, আত্মীয়তার সর্বনিম্ন সম্পর্ক রক্ষা করা হয়। প্রয়োজনও অবস্থার প্রেক্ষিতে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ফরজ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কারো যদি একজন ধনী ভাই ও গরীব চাচা থাকে, তাহলে সে ভাইয়ের সাথে সাধারণ আলোচনা ও কথাবার্তাই যথেষ্ট। তবে সামর্থ থাকলে চাচাকে অর্থনৈতিক সাহায্য না দিয়ে শুধু কথা বললে, আত্মীয়তার অধিকার আদায় হবে না। অর্থাৎ উভয় যদি গরীব হয় তাহলে, গরীবানা অবস্থায় একে অপরের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবে। অক্ষমতার কারণে আর্থিক সাহায্য দেয়া জরুরী নয়। যদি কারো ভাই, চাচা ও চাচাত ভাই থাকে এবং তারা সবাই যদি দরিদ্র হয়, আর যদি তাদের সবাইকে আর্থিক সাহায্য দেয়া সম্ভব না হয়, তাহলে যে বেশী নিকটবর্তী আত্মীয়, তাকে সাহায্য দিতে হবে। আর অন্যদেরকে দেখাশুনা করে এবং ভাল কথা বলে আত্মীয়তার হক আদায় করতে হবে। ফরজ দায়িত্ব পালনের পর যদি অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করা হয় তাহলে, সেটা আরো বেশী উত্তম। যেমন, ধনী ভাইয়ের খোঁজ-খবর নেয়া ও তাদেরকে দেখতে যাওয়া আবশ্যক। কিন্তু যদি একটা উপহার দেয়া যায় তাহলে, সেটা মোস্তাহাব হবে এবং এ সবের সওয়াব পাবে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক বিভিন্ন উপায়ে রক্ষা করা যায়। কোন সময় বেড়ানোর মাধ্যমে, কোন সময় আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে, কোন সময় রোগী দেখার মাধ্যমে, কোন সময় দাওয়াত গ্রহণের মাধ্যমে। এছাড়াও খুশীর মুহূর্তে অভিনন্দন জানানো, দুঃখের সময় সহানুভূতি ও শোক প্রকাশ, ঋণ পরিশোধে সহযোগিতা করা, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা এবং রোগীর সেবা করার মাধ্যমেও আত্মীয়তার অধিকার রক্ষা করা যায়। অনেক লোক আল্লাহর দীন বুঝে না, নিজের মনের কার্পণ্যের উপর বিজয়ী হতে পারে না এবং মনকে বিদ্বেষমুক্ত করতে পারেনা। তারা আত্মীয়ের সাথে কথা-বার্তা, সালাম বিনিময় ও

---

১. শরহে মুসলিম-ইমাম নওয়ী, ১৬শ খণ্ড, পৃঃ ১১৩, ১১৪

www.amarboi.org

বেড়ানোকেই যথেষ্ট মনে করে। যদিও আত্মীয় উল্লেখিত সমস্যার শিকার হয়ে সাহায্যের মুখাপেক্ষী হোকনা কেন।

নিকটতর আত্মীয় যদি আত্মীয়তার অধিকার পূরণ না করে তাহলে, দূরবর্তী আত্মীয়ের ওপর সে অধিকার আপতিত হয়। যেমন, কোন ব্যক্তির যদি অবাধ্য সন্তান থাকে এবং ভাই থাকে, সন্তান যদি পিতার অর্থনৈতিক অভাব পূরণ না করে, বিপদে সাহায্য না করে কিংবা রোগে সেবা না করে, তাহলে ভাইয়ের ওপর সে দায়িত্ব অর্পিত হয়। অর্থাৎ সে দায়িত্ব সন্তান থেকে ভাইয়ের ওপর স্থানান্তরিত হয়। তখন যদি ভাই বলে, এটাতো তার সন্তানের দায়িত্ব, আমার নয়, তাহলে সে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দায়ে অভিযুক্ত হবে এবং গুনাহ কবীরা করবে।

কোন্ আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রাখা ফরজ?

কাজী আয়াজ বলেছেন, ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে মতপার্থক্য করেছেন। এক দলের মতে, মোহরম আত্মীয়ের সম্পর্ক রক্ষা ফরজ। মোহরম আত্মীয় বলতে বুঝায় তাদের একজনকে পুরুষ ও অন্যজনকে নারী বিবেচনা করলে যদি তাদের মধ্যে বিয়ে হারাম হয়, তাহলে সেটাকেই মোহরম আত্মীয় বলা হবে। এর ভিত্তিতে চাচাত, মামাত ও ফুফাত ভাই বোনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা ফরজ নয়।

অন্য একদলের মতে, সম্পদের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যাদেরকে অংশ দেয়া হয় তারা সবাই আত্মীয়। তাতে, মোহরম-অমোহরম সবাই সমান। যারা অংশীদার হয়, তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন ও সম্পর্ক রক্ষা ফরজ। ইমাম নববীর মতে, এ মতটিই বিশুদ্ধ।[১]

তৃতীয় মতের অনুসারী হলেন, ইমাম কুরতুবী। তিনি বলেন, উপরোক্ত মত গ্রহণ করা হলে, ঐ সকল আত্মীয়রা বাদ পড়ে যারা ওয়ারিশ নয়। তাই ঐ মত ঠিক নয়। তিনি বলেন, আত্মীয় বলতে যাদেরকে বুঝায় তাদের সবার অধিকারকে স্বীকার করাই ঠিক।[২]

এছাড়াও তিনি আত্মীয়তার ব্যাপারে আরো ব্যাপক ও সুন্দর বক্তব্য পেশ করেছেন, যাতে ফেকহের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, আত্মীয়তা দু'ধরনের।

১. সাধারণ আত্মীয়তা ও ২. বিশেষ আত্মীয়তা।

---

১. শরহে মুসলিম, ইমাম নওয়ী, ১৬শ খণ্ড, ১১৩ পৃঃ।

২. তাফসীরে কোরতুবী-১৬শ খণ্ড, ২৪৮ পৃঃ।

www.amarboi.org

১. সাধারণ আত্মীয়তা হচ্ছে, দীনি সম্পর্কের আত্মীয়তা। ঈমানদারের সাহচর্যে থাকা, তাদেরকে ভালবাসা এবং তাদের বিজয় কামনা করা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে, তাদেরকে উপদেশ দেয়া, তাদের কোন ক্ষতি না করা, তাদের সাথে ইনসাফ করা, ইনসাফপূর্ণ লেন-দেন করা এবং তাদের ফরজ অধিকারগুলো আদায় করা। যেমন রোগীর সেবা, মৃতের গোসল দান, জানাযার নামাজ পড়া এবং দাফনসহ বিভিন্ন অধিকারগুলো পূরণ করা।

২. বিশেষ আত্মীয়তা হচ্ছে, বাপ ও মায়ের পক্ষ থেকে যে আত্মীয়তা সৃষ্টি হয়। তাদের সাথে সাধারণ আত্মীয়ের জন্য বর্ণিত অধিকার পূরণের পাশাপশি আরও বেশী দায়িত্ব পালন করতে হবে। যেমন, তাদের জন্য অর্থ ব্যয় করা, তাদের খোঁজ-খবর নেয়া এবং তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে তাদেরকে ভুলে না যাওয়া। অনেক আত্মীয়ের অধিকার একত্রিত হলে এবং সামর্থ্য কম থাকলে নিকটাত্মীয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

আল্লামা কুরতুবী আত্মীয়তার অর্থকে ব্যাপক করেছেন। যদিও আভিধানিক অর্থের সাথে এর মিল নেই। তথাপি মুসলমানদের প্রতি সাধারণ আত্মীয়ের অধিকার পূরণ করা ফরজ। কিন্তু এটাকে আত্মীয়তা বলা হয় না। কেননা, তারা এক 'রেহেম' বা ঔরষের জন্ম নয়। আত্মীয়তার আরবী শব্দ হচ্ছে 'রাহেম।' হাঁ, এ অর্থে তা ঠিক যে, সবাই আদম ও হাওয়া থেকে জন্মগ্রহণ করেছে। এ অর্থ গ্রহণ করলে কাফের-মোমেন সবাই আত্মীয়ের মধ্যে গণ্য হয়। অবশ্য এ জাতীয় কথা কেউ বলেননি।

আত্মীয়তার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা বা বিচ্ছিন্ন করার অর্থ

ইবনু আবু জামরাহ বলেছেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার অর্থ হচ্ছে, আত্মীয়ের জন্য সাধ্যমত কল্যাণকর কাজ করা এবং তাদেরকে ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে রাখা। এটা মোমেন আত্মীয়ের জন্য প্রযোজ্য। তবে কাফের ও ফাসেক আত্মীয়ের অবস্থা ভিন্ন।

অপরদিকে, সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ হল, যেমনটি যায়ন আলইরাকী বলেছেন, আত্মীয়ের ক্ষতি করা। অন্যদের মতে, আত্মীয়ের প্রতি সদয় ব্যবহার না করাই হচ্ছে সম্পর্ক ছিন্ন করা। কেননা, হাদীসে আত্মীয়তার সম্পর্ক অব্যাহত রাখা

www.amarboi.org

এবং সম্পর্ক ছিন্ন না করার নির্দেশ এসেছে। একাধিক ব্যক্তি বলেছেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক হচ্ছে; নেক কাজ, আর সম্পর্ক ছিন্ন করা এর বিপরীত কাজ। অর্থাৎ নেক কাজ ত্যাগ করা।

একজন আলেমের মতে, আত্মীয়তার সম্পর্ক না রাখা আর তা ছিন্ন করার মধ্যে পার্থক্য আছে। তিনি বলেছেন এর তিনটি স্তর আছে,

১. **সম্পর্ক রক্ষাকারী :** যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তিনি তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করেন এবং যে তাকে দিতে অস্বীকার করে, তিনি তাকে দান করেন।

২. **সমান সম্পর্ক রক্ষাকারী :** এটা হল, যে ব্যক্তি সম্পর্ক রক্ষা করে তিনি তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করেন এবং যে তাকে দেয় তিনি তাকে দেন।

৩. **সম্পর্ক ছিন্নকারী :** যে নিজে সম্পর্ক রক্ষা করে না এবং তার সাথেও কেউ সম্পর্ক রক্ষা করে না, যে নিজে দেয় না এবং অন্য কেউও তাকে দেয় না। সর্বাধিক কঠোর স্তরের ব্যক্তি হচ্ছে সে, যার সাথে অন্যরা সম্পর্ক টিকিয়ে রাখে কিন্তু সে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং অন্যরা তাকে দেয় কিন্তু সে দেয় না। দুইপক্ষে সমান সম্পর্কের যেমন অস্তিত্ব রয়েছে, তেমনি সমান বয়কটেরও অস্তিত্ব আছে। যে ব্যক্তি বয়কট শুরু করে তাকে সম্পর্ক ছিন্নকারী বলা হবে এবং যদি কেউ কারো ডাকে সাড়া দেয়, তাহলে তাকে সমান সম্পর্ক রক্ষাকারী বলা হবে।

আত্মীয়তার সম্পর্কের সওয়াব ও মর্যাদা

আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ.

'আল্লাহ যাদের সাথে সম্পর্ক রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, যারা তাদের সাথে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখে, আল্লাহকে এবং খারাপ হিসেবের পরিণতিকে ভয় করে।' (সূরা রাদ : ২১)
এ আয়াতে সম্পর্ক রক্ষার যে নির্দেশের কথা উল্লেখ আছে, তা হচ্ছে, আত্মীয়ের সম্পর্ক।

আল্লাহ আরো বলেন, وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ -

www.amarboi.org

'আপনি আত্মীয়, মিসকীন ও মুসাফিরের অধিকার আদায় করুন।' (সূরা বনি-ইসরাঈল : ২৬)

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّبْسَطَ لَهُ فِىْ رِزْقِهٖ وَيُنْسَاَلَهُ فِىْ اَمْرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

'যে ব্যক্তি নিজের রিজক বর্ধিত হওয়া এবং মৃত্যু দেরীতে আসা পসন্দ করে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখে।' (বোখারী, মুসলিম)

এই হাদীসের কারণে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়, তাহল আল্লাহর কাছে রিজ্‌ক যদি নির্ধারিত ও সীমিত হয় এবং হায়াত যদি সুনির্দিষ্ট হয় তাহলে কিভাবে রিজ্‌ক ও হায়াত বৃদ্ধি পাবে? ওলামায়ে কেরাম এ প্রশ্নের বিভিন্ন জওয়াব দিয়েছেন। তারা রিজ্‌ক বৃদ্ধির ব্যাপারে বলেছেন, এর তাৎপর্য হল, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে বরকত অবতীর্ণ হওয়া। এর অর্থ হল, আল্লাহ আত্মীয়তার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার মাধ্যমে রিজ্‌কে প্রশস্ততা দান করেন।

বয়স বৃদ্ধির ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এর অর্থ হল, জীবনে বরকত লাভ করা, যার ফলে আনুগত্য এবং আখেরাতের জন্য উপকারী কাজে সময় ব্যয়ের তওফীক লাভ করে। আত্মীয়তার সম্পর্ক আল্লাহর আনুগত্য, গুণাহ থেকে বাঁচা এবং আল্লাহ থেকে দূরত্ব সৃষ্টি না হওয়ার তওফীক এনে দেয়। ইবনুল কাইয়েম এ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন।

এর আরো ব্যাখ্যায় এসেছে যে, এর কারণে মৃত্যুর পরও ব্যক্তিটি অমর হয়ে থাকবে। আর এটা সম্ভব হয় উপকারী জ্ঞান, সদকা জারিয়াহ এবং তার জন্য প্রার্থনাকারী নেক সন্তান দ্বারা।

আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ (সা)কে সফরের মধ্যে তাঁর উটের লাগাম ধরে আগলে রাখে এবং প্রশ্ন করে, হে আল্লাহর রাসূল! অথবা হে মোহাম্মদ! আমাকে এমন জিনিষ বলুন যা আমাকে বেহেশতে পৌঁছাবে এবং দোজখ থেকে দূরে রাখবে। সে রাসূলুল্লাহ (সা)কে থামিয়ে দেয় এবং সাহাবায়ে কেরামের দিকে তাকিয়ে বলে, তওফীক প্রাপ্ত কিংবা হেদায়েত প্রাপ্ত।

আবু আইউব আনসারী বলেন, তুমি একথা কিভাবে বললে? কিন্তু বেদুইন একই কথার পুনরাবৃত্তি করে। তখন নবী (সা) বলেন,

www.amarboi.org

تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِـى الزَّكَـاةَ وَتُصِـلُ الرَّحِمَ دَعِ النَّاقَةَ.

'তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে; উট ছেড়ে দাও।'

লোকটি রওনা হলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

اِنْ تَمَسَّكَ بِمَا اَمَرْتُهُ بِهٖ دَخَلَ الجَنَّةَ.

'আমি তাকে যে নির্দেশ দিয়েছি, সে যদি তা মেনে চলে। তাহলে বেহেশতে প্রবেশ করবে।' (বোখারী, মুসলিম)

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَيُعَمِّرُ بِالْقَوْمِ الدِّيَارَ وَيُثَمِّرُ لَهُمُ الْاَمْوَالَ وَمَا نَظَرَ اِلَيْهِمْ مُنْـذُ خَلَقَـهُمْ بُغْضًا لَهُمْ، قِيْلَ وَكَيْفَ ذَاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ بِصِلَتِهِمْ اَرْحَامَهُمْ.

'আল্লাহ বিশেষ কোন জাতিকে বিশেষ কোন দেশে আবাদ করেন, তাদের সম্পদ বাড়িয়ে দেন এবং সৃষ্টির পর থেকে তাদের প্রতি অসন্তুষ্টির দৃষ্টি নিক্ষেপ করেননি। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! তা কিভাবে? তিনি জবাবে বলেন, তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার কারণে।' (তাবরানী-সনদ উত্তম)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

اَلرَّحِمُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ: مَنْ وَصَلَنِىْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَـنْ قَطَعَنِـىْ قَطَعَهُ اللّٰهُ.

'আত্মীয়তা আল্লাহর মহান আরশের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় বলে, যে আমার সাথে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখে, আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখেন, আর যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।' (বোখারী, মুসলিম)

www.amarboi.org

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় উদাহরণ হিসেবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ভালভাবে উপলব্ধি করার জন্য বলা হয়েছে যে, যদি সে (আত্মীয়তা) কথা বলতে পারত তাহলে, আল্লাহর দরবারের অতি নিকটের অবস্থান থেকে অনুরূপ বলতে পারত, কিংবা একজন ফেরেশতা আত্মীয়তার পক্ষ হয়ে ঐ ঘোষণা দিচ্ছে এবং আল্লাহ তা কবুল করছেন। আর আত্মীয়তা আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে। মূলকথা, আত্মীয়তার মূল্য যে অনেক বেশী এ হাদীস সে বিষয়েই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

উম্মু কুলসুম বিনতে ওকবা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلٰى ذِى الرَّحِمِ الكَاشِحْ.

'উত্তম দান-সদকাহ হচ্ছে, মনে শত্রুতা পোষণকারী আত্মীয়ের প্রতি দান করা।' (তাবরানী, ইবনু খোযাইমাহ, হাকেম)

সালমান বিন আ'মের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন,

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلٰى ذِى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

ফকীর-মিসকীনকে দান করলে একগুণ সওয়াব পাওয়া যায়, আর আত্মীয়কে দান করলে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায়। আর তা হচ্ছে সাদকাহ ও আত্মীয়তার সওয়াব।' (তিরমিযী এটাকে হাসান বলেছেন)

আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اِنَّكُمْ سَتَفْتَحُوْنَ مِصْرَ وَهِيَ اَرْضٌ يُسَمّٰى فِيْـهَا الْقِيْرَاطُ فَاسْتَوْصُوْا بِاَهْلِهَا خَيْرًا فَاِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَّرَحِمًا.

'তোমরা অচিরেই মিসর জয় করবে। আর মিসরে রয়েছে জমীন মাপার 'কীরাত' পদ্ধতি। মিসরের অধিবাসীদের কল্যাণ কামনা করবে ও ভাল উপদেশ দেবে। কেননা সেটা হচ্ছে, শ্বশুর এবং আত্মীয়তার ভূখণ্ড।' (মুসলিম)

এ হাদীসে শ্বশুরের সম্পর্ক বলতে মিসরের অধিবাসী মারিয়া কিবতিয়ার কথা বলা হয়েছে যার গর্ভ থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) ছেলে ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেছেন। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বলে হযরত ইসমাইল (আ)-এর মা

www.amarboi.org

হাজারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, তিনিও মিসরের বাসিন্দা ছিলেন।

আবদুল্লাহ বিন আ'মর বিন আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئْ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِىْ قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.

'সমান সম্পর্ক রক্ষাকারী আত্মীয়তার অধিকার পূরণকারী নয়, বরং সে ব্যক্তি আত্মীয়তার অধিকার পূরণকারী, যার সাথে আত্মীয়রা সম্পর্ক ছিন্ন করার পর সে নিজে ঐ সম্পর্ক রক্ষা করেছে।' (বোখারী)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এমন আত্মীয় আছে, যার সাথে আমি সম্পর্ক রক্ষা করি, কিন্তু তারা তা ছিন্ন করে, আমি তাদের কল্যাণ করি, কিন্তু তারা আমার ক্ষতি করে, আমি তাদের সুখের স্বপ্ন দেখি আর তারা আমাকে উপেক্ষা করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি যা বললে যদি তাই হয় তাহলে, তুমি যেন তাদের প্রতি জ্বলন্ত কয়লা নিক্ষেপ করলে। তুমি যতদিন এরূপ করবে, একজন ফেরেশতা ততদিন তোমার পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী হিসেবে থাকবে।' (মুসলিম)

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَالَّذِيْنَ يَنْقَضُوْنَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُوْلٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ.

'যারা আল্লাহর সাথে কৃত দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, আল্লাহ যে সম্পর্ক রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, সে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং জমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে, তাদের জন্যই রয়েছে অভিশাপ এবং কঠিন আজাব।' (সূরা রা'দ : ২৫)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ ـ فَقَالَتْ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِبِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ قَالَ نَعَمْ، اَمَا تَرْضَيْنَ اَنْ اَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ وَاَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ بَلٰى، قَالَ فَذَاكَ لَكِ ـ ثُمَّ قَالَ

www.amarboi.org

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَئُوْا اِنْ شِئْتُمْ : فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ - اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ.

'আল্লাহ্ সৃষ্টি জগত সৃষ্টির পর 'রাহেম' বা আত্মীয়তা দাঁড়িয়ে বলে, এটা কি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী থেকে আশ্রয়ের স্থান? আল্লাহ্ বলেন, 'হাঁ'। তিনি বলেন, তুমি কি তাতে সন্তুষ্ট যে, যে তোমার সাথে সম্পর্ক অব্যাহত রাখে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক রাখবো; আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো? আত্মীয়তা উত্তরে বলে, 'হাঁ'। তখন আল্লাহ্ বলেন, এটাই তোমার জন্য মঞ্জুর করা হল। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এই আয়াতটি পড়ে দেখ; তোমরা কর্তৃত্ব লাভ করলে কি জমীনে সম্ভবতঃ অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে? এরাই হল তারা যাদের ওপর আল্লাহ্ অভিশাপ দিয়েছেন, অতঃপর তাদেরকে বধির করেছেন এবং তাদের চোখগুলোকে অন্ধ করে দিয়েছেন।' (বোখারী, মুসলিম)

'আত্মীয়তার' দাঁড়ানো এবং কথা বলার অর্থ বিভিন্ন রকম হতে পারে।

১. হয় তা উদাহরণের আকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. না হয়, একজন ফেরেশতা আত্মীয়তার পক্ষ হয়ে কথা বলেছে।

৩. আর না হয়, আল্লাহ্ আত্মীয়তার জন্য একটি বিশেষ আকৃতি দান করেছেন যা কথা বলতে সক্ষম। সকল বিষয় আল্লাহ্র জ্ঞানের ওপর সমর্পিত। হাদীসের শেষে উল্লেখিত আয়াতের মর্ম হল, তোমরা যদি আল্লাহ্র দীন থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহ্কে ভয় করে তার আদেশ নিষেধ না মান, তাহলে এর ফলশ্রুতিস্বরূপ তোমরা জমীনে অশান্তি সৃষ্টি করবে সাধারণভাবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে বিশেষভাবে। আর তার শাস্তি হবে আল্লাহ্র অভিশাপ। অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে তাঁর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন এবং তোমাদেরকে বধির বানিয়ে দেবেন। ফলে কোরআন এবং ওয়াজ থেকে তোমরা কোন উপকার পাবে না। তোমাদেরকে আল্লাহ্ অন্ধ করে দেবেন। তোমরা আল্লাহ্র আয়াত দেখেও তা থেকে উপকৃত হতে পারবে না। অর্থাৎ

www.amarboi.org

একজন অন্ধ ও বধিরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন।

আবু মোহাম্মদ জোবায়ের বিন মোতয়ে'ম থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে যাবে না।' (বোখারী, মুসলিম)

বেহেশতে না যাবার দু'টো অর্থ আছে। ১. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ফরজ একথা অবিশ্বাস করলে কখনও বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। তবে যদি মোমেন হিসেবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে মারা যায় তাহলে, দোজখের প্রয়োজনীয় পরিমাণ শাস্তি ভোগের আগে বেহেশতে যাবে না।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি,

اِنَّ اَعْمَالَ بَنِىْ اٰدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيْسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلاَ يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ.

'প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দিন শেষে অর্থাৎ জুমার রাত্রে আদম সন্তানের আমল (আল্লাহর কাছে) পেশ করা হয়। তবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর আমল কবুল করা হয় না। (আহমদ, বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য)

আবু বাকরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَا مِنْ ذَنْبٍ اَجْدَرُ اَنْ يُعَجِّلَ اللّٰهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْبَغْىِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ.

'বিদ্রোহ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার চাইতে বান্দাহর অন্য কোন গুণাহ এমন নেই, যার কারণে আল্লাহ তার পরকালের সঞ্চয়ের সাথে বান্দাহকে দুনিয়াতে দ্রুত শাস্তি দিতে পারেন।' (ইবনু মাজাহ, তিরমিযী)

অর্থাৎ পরকালের পুঁজি এবং অন্যান্য নেক আমল থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ ন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, আল্লাহ এ অপরাধে দুনিয়ায় তাদেরকে দ্রুত শাস্তি দেন এবং তাদের ওপর গযব নাজিল করেন। অর্থাৎ এ দুটো মারাত্মক অপরাধ। বৃহস্পতিবার রাত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক

www.amarboi.org

ছিন্নকারীর পেশ করা আমল যেখানে কবুল হয় না, এর চাইতে আর বড় দুর্ভাগ্য কি হতে পারে? তাই আমাদের উচিত, আত্মীয়তার সম্পর্ক অব্যাহত রাখা।

ইয়াতীমের যত্ন

নাবালেগ অবস্থায় যার বাবা মারা যায় তাকে ইয়াতীম বলা হয়। বালেগ হয়ে গেলে তাকে আর ইয়াতীম বলা যায় না। ইয়াতীম বললেও সেটা পরোক্ষভাবে বলা হয়, বাস্তবে সে ইয়াতীম নয়।

কুরতুবী মাওয়ারদীর বরাত দিয়ে বলেছেন, যে আদম সন্তানের মা মারা যায় তাকে ইয়াতীম বলে। কিন্তু কুরতুবীর মতে, মানুষের বাবা মারা গেলে তাকে ইয়াতীম বলা হয়। আর পশুর মা মারা গেলে সে পশুকে ইয়াতীম বলা হয়।[১]

কেউ যদি ছোটকালে নিজের মা-বাপ দু'জনকেই হারায় তার দুঃখ আরও অনেক বেশী। বিশেষ করে দুগ্ধপোষ্য শিশু যদি মা-বাবা দু'জনকে বা একজনকে হারায় তাহলে, তার অবস্থা অত্যন্ত করুণ হয়।

নিকটাত্মীয়ের ওপর ইয়াতীমের যত্ন নেয়া ফরজ। একজন আত্মীয় ঐ দায়িত্ব পালন করলে অন্যদের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যায়। যদি নিকট আত্মীয়রা সে দায়িত্ব পালন না করে কিংবা তারা ইয়াতিমের সাথে খারাপ আচরণ করে তাহলে, পরিস্থিতির দাবী পূরণের জন্য অন্য আত্মীয়দেরকে হস্তক্ষেপ করতে হবে। তবে কেউ দায়িত্ব পালন না করলে হস্তক্ষেপের জন্য দেশের শাসককে তা অবহিত করতে হবে। শাসক খারাপ আচরণকারী আত্মীয়কে শাস্তি দেবে কিংবা অন্য কোন ব্যক্তিকে ইয়াতীমের অভিভাবক নিয়োগ করবে। কেননা, ইয়াতীমের দায়িত্বভার গ্রহণ গোটা উম্মতের ওপর ফরজে কেফায়া। তবে একজন দায়িত্ব পালন করলে অন্যদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।

ইয়াতীমের যত্ন বলতে অন্যান্যদের মত লালন-পালন এবং শিক্ষা দীক্ষা দান করা বুঝায়। শিক্ষা বলতে সাধারণ শিক্ষা কিংবা পেশাগত শিক্ষা সব কিছুকেই বুঝায়। গরীব হলে জীবন ধারণের জন্য পেশা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং ধনী হলে উচ্চ শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করতে হবে।

তাদের সম্পদের হেফাজত ও তা বৃদ্ধির চেষ্টা করা এবং তার অপচয় না করাও ইয়াতীমের যত্নের অন্তর্ভুক্ত। ইয়াতীম সন্তানকে তার সম্পদ দিয়ে ব্যবসার

---

১. তাফসীরে কুরতুবী, ২য় খণ্ড, ১৪ পৃঃ সংক্ষেপিত।

www.amarboi.org

উপযোগী মনে করলে তাকে তা করার সুযোগ দিতে হবে। অভিভাবক গরীব হলে তার জন্য ইয়াতীমের সম্পদের হেফাজতের জন্য যুক্তিসঙ্গত পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয। কেননা, সে মুহূর্তে ইয়াতীমের সম্পদের হেফাজতের কারণে সে নিজে কামাই-রোজগারের সুযোগ পায় না।

ইয়াতীমের সম্পদ নিজেদের সম্পদের সাথে মিশানোর বিরুদ্ধে কোরআনের হুঁশিয়ারী উচ্চারণকারী আয়াত নাজিলের পর সাহাবায়ে কেরাম ইয়াতীমের সম্পদ নিজেদের সম্পদ থেকে পৃথক করে রাখতেন এবং তারা ইয়াতীমদেরকে নিজ সন্তান থেকে আলাদা করে খাওয়াতেন। তা অভিভাবক এবং ইয়াতীম বাচ্চাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাদের কষ্ট লাঘবের জন্য এবং ইয়াতীমের সম্পদের সাথে নিজেদের সম্পদ মিশানোকে জায়েয করে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন,

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامَى ـ قُلْ اِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ، وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لاَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

'তারা আপনাকে ইয়াতিমদের সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, তাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে গুছিয়ে দেয়া উত্তম, আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজেদের সাথে মিলিয়ে নাও, তাহলে মনে করবে তারা তোমাদের ভাই। বস্তুত অমঙ্গলকামী এবং মঙ্গলকামীদের আল্লাহ জানেন। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তোমাদের ওপর জটিলতা আরোপ করতে পারতেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ।' (সূরা বাকারা : ২২০)

কোরআন অভিভাবকদেরকে দু'টো বিষয়ে কঠোরভাবে সাবধান করে দিয়েছে।
১. অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সকল সম্পদ কিংবা আংশিক সম্পদ আত্মসাত করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا.

www.amarboi.org

'যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করে, তারা নিজ পেটসমূহে আগুন হজম করে এবং শীঘ্রই তারা দোজখে প্রবেশ করবে।' (সূরা নিসা : ১০)

২. ইয়াতীমের ভাল মালের সাথে নিজের খারাপ মাল বিনিময় করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন,

وَاٰتُوا الْيَتَامٰى اَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُوْا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ، اِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ـ

'তোমরা ইয়াতীমদেরকে তাদের মাল দিয়ে দাও এবং খারাপ মালকে ভাল মালের সাথে বিনিময় করো না। নিজেদের মালের সাথে মিলিয়ে তাদের মাল খেয়ো না। নিশ্চয়ই এটা বড় মন্দ কাজ।' (সূরা নিসা : ২)

কোরআন এবং হাদীস ইয়াতীমের যত্নের ওপর কত বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে তা মানুষের কাছে অচিন্তনীয়। ইসলাম ইয়াতীমকে যত গুরুত্ব দিয়েছে, অভাবী অন্য কোন নিকটাত্মীয়কে ততটুকু গুরুত্ব দেয়নি। ইসলাম যেন সকল মুসলমানকে ইয়াতীমের অধিকার পূরণের জন্য নিয়োজিত করেছে। ইসলাম বলেছে, ইয়াতীমের প্রতি যত্ন নেয়া আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়। এর মাধ্যমে বিরাট সওয়াব পাওয়া যায়। ইসলাম তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন, উত্তম প্রতিপালন, হাসিমুখে কথা বলা এবং তাদের মাথায় হাত বুলানোর জন্য উৎসাহিত করে।

ঈদ বা বিভিন্ন আনন্দ উৎসবের সময় তাদের খোঁজ-খবর বেশী নিতে হবে। ইয়াতীম যাতে পিতৃ হারানোর পর নিজ আত্মীয়দের মধ্যে তার প্রতি বাপের মত দয়ালু অভিভাবকের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে। সে যেন অন্য সন্তানদেরকে নিজ বাপের সাথে চলতে দেখে সংকীর্ণবোধ না করে কিংবা দুঃখ-বেদনা অনুভব না করে। সেও যেন অভিভাবককে পিতার মত মনে করে তার স্নেহ ও মমতায় উদ্বেলিত হয়ে উঠে। ইয়াতীম যদি মেয়ে হয় তাহলে সে যেন একাধিক মহিলাকে তার মায়ের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেখতে পায়। সকল মানুষের মধ্যে খুশী প্রবর্তন করা, সমাজের লোকের মধ্যে সৌভাগ্যের স্পিরিট প্রসারিত করা এবং সমাজের দুর্বল ও বঞ্চিতদের প্রতি যথাসম্ভব যত্ন ও সহমর্মিতা এবং আর্থিক ও নৈতিক

www.amarboi.org

সমর্থন দেয়ার লক্ষ্যে ইসলামের কর্মসূচী এক ও অভিন্ন। আমরা কোরআন ও হাদীসের ওপর বিশেষভাবে মনোযোগ দিলে দেখতে পাবো একজন অনাত্মীয় ইয়াতীমের প্রতি ইসলাম যদি এত বেশী সম্মান, শ্রদ্ধা ও আদর-যত্নের নির্দেশ দেয় তাহলে, নিকটাত্মীয় ইয়াতীমের অধিকার আরও কতইনা বেশী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ؟ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ؟ فَكُّ رَقَبَةٍ اَوْ اِطْعَامٌ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ مَسْغَبَةٍ يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ.

'সে দীনের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। আপনি জানেন, সে ঘাঁটি কি? তা হচ্ছে, দাস মুক্তি অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান ইয়াতীম আত্মীয়কে অথবা ধূলা-ধূসরিত মিসকীনকে।' (সূরা বালাদ : ১১-১৬)

এ আয়াতে ইয়াতীমের কথাও উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ.

'আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই (আল্লাহর) মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য।' (সূরা বাকারাহ : ১৭৭)

এ আয়াতেও মিসকীনের কথা উল্লেখ আছে।

আল্লাহ আরও বলেন,

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ؟ قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ.

'আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা খরচ করবে? আপনি বলে দিন- যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর, তাহবে পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, ইয়াতীম-অনাথদের জন্য, অসহায়দের জন্য এবং মুসাফিরের জন্য।' (সূরা বাকারা : ২১৫)

এ আয়াতেও পরিষ্কারভাবে ইয়াতীমের প্রতি দানের কথা উল্লেখ আছে। কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় ইয়াতীম সম্পর্কে আরও উল্লেখ রয়েছে।

www.amarboi.org

এখন আমরা শেখ আল-মোনজেরীর লেখা 'আত্তারগীব ওয়াত তারহীব' গ্রন্থ থেকে এ বিষয়ে কিছু হাদীস উল্লেখ করবো :

সাহল বিন সা'দ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّـةِ هكَـذَا وَاَشَـارَ بِالسَّـبَّابَةِ وَالْوُسْـطٰى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا.

'আমি এবং ইয়াতীমের যত্নকারী বেহেশতে এভাবে থাকবো- এ বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যাঙ্গুলের প্রতি ইঙ্গিত দেন এবং ঐ দু'আঙ্গুলকে ফাঁক করেন।' (বোখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী)

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَنْ قَبَضَ يَتِيْمًا مِنْ بَيْنَ مُسْلِمِيْنَ اِلٰى طَعَامِهٖ وَشَرَابِهٖ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّـةَ اَلْبَتَّةَ اِلاَّ اَنْ يَّعْمَلَ ذَنْبًا لاَ يُغْفَرُ.

'যে ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্য থেকে কোন ইয়াতীমকে নিজ খাবার ও পানীয়ের প্রতি টেনে আনে, আল্লাহ তাকে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যদি না সে ক্ষমার অযোগ্য কোন গুণাহ করে।' (তিরমিযী, হাদীসটি হাসান-সহীহ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন ইয়াতীমকে খাওয়ায় ও পান করায়, আল্লাহ তাকে অবশ্যই বেহেশত দেবেন, যদি না সে মোশরেক হয়।

আবু উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَنْ مَسَحَ عَلٰى رَاْسِ يَتِيْمٍ لَمْ يَمْسَحْهُ اِلاَّ لِلّٰهِ كَـانَ لَـهُ فِـى كُـلِّ شَـعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ وَمَنْ اَحْسَنَ اِلٰى يَتِيْمَةٍ اَوْ يَتِيْـمٍ عِنْـدَهُ كُنْـتُ اَنَا وَهُوَ فِى الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَفَرَّقَ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى.

'কেউ যদি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কোন ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলায়, যে পরিমাণ চুল হাতে লাগবে সে ঐ পরিমাণ সওয়াব পাবে। যে ব্যক্তি তার নিকট প্রতিপালিত কোন ইয়াতীম ছেলে বা মেয়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করে,

www.amarboi.org

আমিও সে বেহেশতে এভাবে থাকবো- এই বলে তিনি তাঁর তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীকে ফাঁক করে দেখান।' (আহমদ)

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে নিজ অন্তরের কঠোরতার বিষয়ে আলোচনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

اِمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيْمِ وَاطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ.

'তুমি ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকীনকে খাবার দাও।' (আহমদ)

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اَلسَّاعِيْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنَ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَاَحْسِبُهُ قَالَ : وَكَالْقَائِمِ لَايَفْتَرُ وَكَالصَّائِمِ لَايُفْطِرُ.

'বিধবা ও মিসকীনের খেদমতকারী আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদের সমতুল্য। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা তিনি একথাও বলেছেন, সে ব্যক্তি ঐ নামাজীর মত যে সর্বদা নামাজ পড়ে এবং যে সর্বদা রোজা রাখে।' (বোখারী, মুসলিম)

বিধবার কোলেও ইয়াতীম শিশু থাকতে পারে। বিধবা এবং ইয়াতীম উপার্জনের দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্বল। তাই তাদের প্রতি সেবা দান প্রয়োজন। ইয়াতীমসহ কোন বিধবার সেবা দ্বিগুন সওয়াবের কারণ অথচ লোকেরা এ সকল বিষয় থেকে উদাসীন।

প্রতিবেশীর অধিকার

বস্তুবাদী সভ্যতা মানুষের বহু আবেগ-অনুভূতি কেড়ে নিয়েছে। আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতায় কোন মহৎ গুণের স্থান নেই। এ সভ্যতা মানুষের জীবনকে যন্ত্রের মত বধির বানিয়ে দিয়েছে এবং তাদের আবেগ কেড়ে নিয়েছে। বস্তুবাদী সভ্যতা বহু দেশে ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের মত বহু মানবাধিকারকে মিটিয়ে দিয়েছে। যেমন মাতা-পিতার অধিকার, আত্মীয়ের অধিকার ও প্রতিবেশীর অধিকার ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে, ইসলাম সে অধিকারকে লালন করে। কোরআন ও হাদীস প্রতিবেশীর অধিকারের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে। কোরআন প্রতিবেশীর অধিকারকে আল্লাহর অধিকার, মাতা-পিতার অধিকার ও আত্মীয়তার অধিকারের পাশাপাশি স্থান দিয়েছে। হাদীসে এসেছে, জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)কে

www.amarboi.org

প্রতিবেশীর ব্যাপারে অব্যাহত নসীহত করতে থাকেন। প্রতিবেশীর ব্যাপারে এত তীব্র তাকিদের কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) ধারণা করেছিলেন যে, প্রতিবেশীকে হয়তো ওয়ারিশ বানিয়ে দেয়া হতে পারে।

হাদীসে আরও এসেছে, যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর অধিকার পূরণ করে না কিংবা তাদেরকে কষ্ট দেয়, সে কবীরা গুণাহ করে। প্রতিবেশীর অধিকার পূরণ করা শরীয়তের অন্যতম ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْجَارِ ذِىْ الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ؟ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا.

'আর আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটাত্মীয় প্রতিবেশী, সাধারণ প্রতিবেশী, সহপাঠি, অসহায় মুসাফির এবং নিজ দাস-দাসীর সাথেও সদয় ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক ও গর্বিতজনকে পছন্দ করেন না।' (সূরা নিসা : ৩৬)

আল্লামা কুরতুবী বলেছেন, 'আল-জার-জিল-কোরবা' বলতে নিকটাত্মীয় প্রতিবেশী এবং 'আল-জার-আল জুনুব' বলতে 'অপরিচিত প্রতিবেশীকে' বুঝানো হয়েছে। এটা ইবনে আব্বাসের মত। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, নওফ শামী বলেছেন, প্রথমোক্তটা দ্বারা 'মুসলিম প্রতিবেশী' আর দ্বিতীয়টা দ্বারা ইহুদী-খ্রষ্টান প্রতিবেশীকে বুঝানো হয়েছে। (তাফসীরে কুরতুবী-৫ম খণ্ড, ১৮৩ পৃঃ)

ইবনে ওমার এবং আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

'জিবরীল আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অব্যাহত নসীহত করতে থাকায় আমি ধারণা করলাম যে, প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ বানানো হতে পারে।' (বোখারী, মুসলিম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

www.amarboi.org

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَايُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْكُتْ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে সে যেন নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে সে যেন নিজ মেহমানের সম্মান করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে সে যেন কথা বললে ভাল কথা বলে, নচেত চুপ থাকে।' (বোখারী, মুসলিম)

আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

خَيْرُ الْاَصْحَابِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ.

'আল্লাহর নিকট সে সাথী সর্বোত্তম যে নিজ সাথীর কাছে সর্বোত্তম; আর আল্লাহর কাছে সে প্রতিবেশী সর্বোত্তম যে নিজ প্রতিবেশীর কাছে সর্বোত্তম।' (তিরমিযী এটাকে হাসান গরীব হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনে খোযাইমা, ইবনু হিব্বান এবং হাকেম এটাকে মুসলিমের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ বলেছেন)

নাফে' বিন হারেস থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِئُ وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ.

'ভাল প্রতিবেশী লাভ করা, ভাল যানবাহন এবং প্রশস্ত বাসস্থান ব্যক্তির জন্য সৌভাগ্যের বিষয়।' (আহমদ)

প্রতিবেশীকে কষ্টদানের সাজা

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ، قِيْلَ مَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : الَّذِىْ لَايُؤْمِنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

www.amarboi.org

'আল্লাহর শপথ! সে মোমেন নয়, আল্লাহর শপথ! সে মোমেন নয়, আল্লাহর কসম, সে মোমেন নয়। প্রশ্ন করা হল, কে মোমেন নয়? তিনি উত্তরে বলেন, যার প্রতিবেশী তার মন্দ ও ক্ষতি থেকে নিরাপদ নয়।' (আহমদ, বোখারী, মুসলিম)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اَلْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوْءَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ: لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَبْدٌ لاَيُأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

'সেই ব্যক্তি মোমেন, যার কাছে লোকেরা নিরাপদ। সেই ব্যক্তি মুসলিম, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ। সেই ব্যক্তি মুহাজির, যে খারাপ জিনিস ত্যাগ করে। আমার প্রাণ যার হাতে– সেই সত্তার শপথ করে বলছি, সে বান্দাহ বেহেশতে যেতে পারবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়।' (আহমদ, আবু ইয়ালী এবং বাজ্জার। আহমদের সনদ ভাল)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে তাঁর প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বললেন,

اِذْهَبْ فَاصْبِرْ فَاَتَاهُ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا، فَقَالَ: اِذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِى الطَّرِيْقِ فَفَعَلَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّوْنَ وَيَسْأَلُوْنَهُ فَيُخْبِرُهُمْ خَبْرَ جَارِهٖ فَجَعَلُوْا يَلْعَنُوْنَهُ (فَعَلَ اللّٰهُ بِهٖ وَفَعَلَ وَبَعْضُهُمْ يَدْعُوْ عَلَيْهِ) فَجَاءَ اِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ: اِرْجِعْ فَاِنَّكَ لَنْ تَرَى مِنِّىْ شَيْئًا تَكْرَهُهُ -

'যাও এবং ধৈর্য ধারণ কর। লোকটি তাঁর কাছে দুই কি তিনবার আসল। তারপর তিনি বললেন, যাও তোমার জিনিসপত্র রাস্তায় ফেলে দাও। সে এরূপ করল। পথিকরা ঐ পথে যাওয়ার সময় তাকে জিজ্ঞেস করায় সে তার প্রতিবেশীর আচরণ সম্পর্কে বলল। তারা তার প্রতিবেশীকে অভিশাপ এবং গাল-মন্দ করতে লাগল। কেউ বদ দো'আ করতে থাকল। তারপর প্রতিবেশী তার কাছে এসে

www.amarboi.org

বলল, যাও তুমি আমার কাছ থেকে আর কখনও অপছন্দনীয় কোন জিনিস দেখতে পাবে না।' (আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল!

إِنَّ فُلاَنَـةً تُكْـثِرُ مِـنْ صَلاَتِـهَا وَصَدَقَتِـهَا وَصِيَامِـهَا غَـيْرَ انَّـهَا تُـؤْذِىْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِىَ فِـى النَّـارِ قَـالَ: يَارَسُـوْلَ اللهِ فَـإِنَّ فُلاَنَـةً يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَلاَتِهَا وَانَّهَا تَتَصَدَّقُ بِـالْاَثْوَارِ مِـنَ الْاَقِـطِ وَلاَ تُؤْذِىْ جِيْرَانَهَا، قَالَ: هِىَ فِى الْجَنَّةِ.

'অমুক স্ত্রীলোক বেশী বেশী নামাজ পড়ে, দান-সদকা করে ও রোজা রাখে কিন্তু তার প্রতিবেশী তার মুখ থেকে নিরাপদ নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সে জাহান্নামী। তারপর লোকটি বলল, অমুক স্ত্রীলোক নামাজ-রোজা কম করে এবং সামান্য পনির টুকরা দান-সদকা করে। কিন্তু প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সে বেহেশতে যাবে।' (আহমদ, বাজ্জার, ইবনু হিব্বান, হাকেম)

উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা আমরা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া, তাদের অকল্যাণ কামনা করা এবং তাদের ক্ষতি করার বিপদ সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। প্রতিবেশীর মধ্যে নিন্দা, চোগলখুরী, অভিশাপ ও গালি-গালাজের অস্তিত্ব রয়েছে। প্রতিবেশী বাসস্থান, কর্মস্থল কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেখানেই হোক না কেন তারা সবাই প্রতিবেশী। যে ব্যক্তি কারুর সাথে প্রতিদিন দীর্ঘ সময় ধরে এক সাথে থাকে তাকেই প্রতিবেশী বলে। এক প্রতিবেশীর উপর অন্য প্রতিবেশীর বিরাট অধিকার রয়েছে।

এক হাদীসে আছে, যে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, তার দ্বিগুন আজাব হবে। কেননা, তা হচ্ছে কষ্ট, খেয়ানত এবং প্রতিবেশীর সেবাকে অস্বীকার করার নামান্তর। প্রতিবেশীই প্রথম ঘরে আগুন লাগলে অন্য প্রতিবেশীর চীৎকার শুনে এবং প্রতিবেশীর দুঃখ-কষ্টে একাত্মতা বোধ করে। তাই রাতের অন্ধকারেও দৌড়ে আসে সাহায্য করার জন্য। গ্রীষ্মের গরম ও শীতের ঠাণ্ডা তাকে বিরত রাখে না। প্রতিবেশীর কাছে সাহায্য চাইলে তা পাওয়া যায়। প্রতিবেশীর ছত্রছায়ায় নিজ স্ত্রীকে নিরাপদ মনে করা হয় এবং সম্পদ ও ঘর-বাড়ীর

www.amarboi.org

নিরাপত্তাও বোধ করা হয়। এটা প্রতিবেশীর প্রতি বিশ্বাস বা আমানত। প্রতিবেশীর খেয়ানত অপ্রতিবেশীর খেয়ানতের চাইতে দশগুণ বেশী মারাত্মক।

মেকদাদ বিন আসওয়াদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে বলেন,

مَاتَقُوْلُوْنَ فِى الزِّنَا؟ قَالُوْا: حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَهُوَ حَرَامٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَنْ يَّزْنِىَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ اَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ اَنْ يَّزْنِىَ بِاِمْرَأَةِ جَارِهٖ قَالَ: مَاتَقُوْلُوْنَ فِى السَّرِقَةِ؟ قَالُوْا حَرَّمَهَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَهِىَ حَرَامٌ قَالَ: لاَنْ يَّسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ اَبْيَاتٍ اَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ اَنْ يَّسْرِقَ مِنْ جَارِهٖ -

'যেনা সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য কি? তারা বলেন, এটা হারাম। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কেয়ামত পর্যন্ত তা হারাম করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ১০জন মহিলার সাথে যেনা করা (শাস্তির দিক থেকে) প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যেনা করা অপেক্ষা সহজতর। তারপর তিনি চুরি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তারা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) তা হারাম করেছেন। তাই তা হারাম। তিনি বলেন, অন্য ১০টি ঘরে চুরি করা প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করা অপেক্ষা সহজতর।' (আহমদ, তাবরানী)

প্রতিবেশীর শ্রেণী বিভাগ ও সীমানা

ওলামায়ে কেরাম বলেন, প্রতিবেশী তিন প্রকার :

১. এক অধিকার বিশিষ্ট প্রতিবেশী ২. দুই অধিকার বিশিষ্ট প্রতিবেশী ও ৩. তিন অধিকার বিশিষ্ট প্রতিবেশী। তিন অধিকার বিশিষ্ট প্রতিবেশী হল, মুসলিম আত্মীয় প্রতিবেশী। তাতে প্রতিবেশী, মুসলিম ও আত্মীয়তার তিন গুণ অধিকার যোগ হয়েছে। আর দুই অধিকার বিশিষ্ট প্রতিবেশী হল, মুসলিম প্রতিবেশী। তার মধ্যে প্রতিবেশী ও মুসলিম হওয়ার অধিকার পাওয়া যায়। আর এক অধিকার বিশিষ্ট প্রতিবেশী হল, মোশরেক প্রতিবেশী। এ মর্মে একটি দুর্বল হাদীসও রয়েছে। তবে এ শ্রেণী বিভাগ মুসলমানের অধিকার, আত্মীয়ের অধিকার ও

www.amarboi.org

প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কিত কোরআন ও হাদীসের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এ শ্রেণী বিভাগ যুক্তিসঙ্গতও বটে। প্রতিবেশী কাফের-মোশরেক হলেও তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে হবে এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া যাবে না।

ইবনু হাজার আসকালানী বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা ফাতহুল বারীতে লিখেছেন, প্রতিবেশী বলতে, মুসলিম-কাফের, আবেদ-ফাসেক, শত্রু-বন্ধু, পরিচিত-অপরিচিত, উপকারী-অপকারী, আত্মীয়-অনাত্মীয় এবং নিকটবর্তী ও দূরবর্তী ঘরের বাসিন্দাদেরকে বুঝায়।

তবে পার্থক্য এতটুকু যে, তাদের মধ্যে মর্যাদার ব্যবধান থাকবে। কেউ কারুর চাইতে উত্তম হবে। যার মধ্যে প্রথমোক্ত শ্রেণীর সকল গুণাবলী পাওয়া যাবে সেটাই হবে ১ম শ্রেণীর মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত। ২য় ও ৩য় পর্যায়ে আসবে পরবর্তী মর্যাদার অধিকারীরা। প্রথম গুণ হল, মুসলমান হওয়া, ইবাদত ও বন্ধুত্ব, একই দেশবাসী হওয়া, উপকারী ব্যক্তি, নিকটাত্মীয় এবং নিকটবর্তী ঘরের অধিবাসী।

ইবনু আবি জামরাহ বলেছেন, প্রতিবেশীর ভাল ও মন্দ হওয়ার ওপর তাদের অধিকার নির্ভর করে। প্রতিবেশী ভাল হলে তার কল্যাণ কামনা করবে, নেক উপদেশ দেবে, হেদায়েতের জন্য দোয়া করবে এবং তার ক্ষতি করা যাবে না। আর প্রতিবেশী খারাপ হলেও তাকে কষ্ট দেয়া যাবে না এবং তার কল্যাণের মোকাবেলায় অকল্যাণ করা যাবে না, তাকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে, তার কাছে ইসলামের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং বিনম্রতার সাথে তাকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে হবে। যদি তাতে উপকার হয় ভাল, আর যদি উপকার না হয়, তাহলে, তাকে শিক্ষাদানের জন্য বয়কট করতে হবে এবং বয়কটের কারণও তাকে জানিয়ে দিতে হবে। যদি তা উপকারী হয়।[১]

প্রতিবেশীর সীমানা সম্পর্কে মতভেদ আছে। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَهُوَ جَارٌ 'যে ব্যক্তি আওয়াজ শুনে সে প্রতিবেশী।' অর্থাৎ যে পর্যন্ত মাইক ব্যতীত আজানের আওয়াজ শুনা যাবে সে সীমানার সকল লোক প্রতিবেশী।

কেউ কেউ বলেছেন, যারা একই জামায়াতে ফজরের নামাজ পড়ে তারা প্রতিবেশী। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। চতুর্দিকে চল্লিশ ঘর পর্যন্ত

---

১. ফাতহুল বারী, ১০ম খণ্ড, ৩৭০ পৃঃ।

www.amarboi.org

প্রতিবেশী। ইমাম আওজাঈর মতও তাই। বোখারী আল আদাবুল মোফরাদ গ্রন্থে হযরত হাসান থেকেও অনুরূপ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। তাবরানী এক দুর্বল হাদীসে তা বর্ণনা করেছেন। ইবনে শিহাবের মতে, ডান ও বামে এবং আগে ও পিছে চল্লিশ ঘর প্রতিবেশী। সম্ভবতঃ তিনি চার দিকে দশ ঘর করে প্রতিবেশীর শ্রেণী বিভাগ করতে চেয়েছেন।

প্রতিবেশী যত নিকটবর্তী হবে তার অধিকারও ততবেশী হবে। বোখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে, আমি কার কাছে উপহার পাঠাবো? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যার ঘরের দরজা তোমার অধিকতর নিকটবর্তী তার কাছে পাঠাবে।

আর এ হাদীসের আলোকে একদল আলেম আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, اَلْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى এর দ্বারা 'যার ঘর নিকটবর্তী' সে প্রতিবেশী এবং وَالْجَارِ الْجُنُبِ দ্বারা 'যার ঘর দূরবর্তী' সে প্রতিবেশীকে বুঝানো হয়েছে। আর এ কারণে তারা অন্যের কাছে প্রতিবেশীর বিক্রিত সম্পত্তির ওপর সমান মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে অন্য প্রতিবেশীর অধিকার রয়েছে বলে দলীল পেশ করেন। তারা নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমেও উক্ত অধিকারের সপক্ষে দলীল দেন, اَلْجَارُ اَحَقُّ بِصَقَبِهٖ 'প্রতিবেশী PREEMTION এর অধিকারী।'

প্রতিবেশীকে সম্মানের পদ্ধতি

প্রতিবেশীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। এটা নির্ভর করে প্রতিবেশীর পার্থক্য, উপলক্ষ, পরিস্থিতি, বিপদ-আপদসহ দাতা প্রতিবেশীর সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা, সুখ-দুঃখ, আত্মীয়তা ইত্যাদি বিষয়ের উপর। প্রতিবেশীর প্রতি ব্যাপক ভিত্তিক সম্মানের মধ্যে যে সকল জিনিস অন্তর্ভুক্ত তা হচ্ছে, তার কল্যাণ কামনা, তার জন্য কল্যাণকর কিছু করা এবং তার যে কোন কষ্ট দূর করার চেষ্টা করা।

মুসলিম শরীফে আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

يَا اَبَا ذَرٍّ اِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَاَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ.

'হে আবু যর! যখন শুরবা বা সুপ রান্না করবে, তখন তাতে পানি বেশী করে দেবে এবং তোমার প্রতিবেশীকে দান করবে।' বোখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

www.amarboi.org

يَانِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَتَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ.

'হে মুসলিম রমণীরা! কোন প্রতিবেশী যেন অন্য কোন প্রতিবেশীকে ঘৃণা না করে এবং ভেড়ার একটি ক্ষুর হলেও যেন দান করে।'

ইবনু হাজার বলেন, হাদীসের অর্থ হল প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশীকে সামান্য জিনিষ উপহার দেয়াকেও যেন তুচ্ছ মনে না করে। এ হাদীস ভালবাসা ও বন্ধুতার প্রতি ইঙ্গিত। অর্থাৎ মহিলা প্রতিবেশীরা সামান্য উপহারের বিনিময়ে হলেও যেন অন্য প্রতিবেশী মহিলাকে ভালবাসে।

হাদীসে মহিলাদেরকে সম্বোধন করার লক্ষ্য হল, তারাই ভালবাসা ও রাগের উৎস এবং এ দু'বিষয়ে দ্রুত প্রতিক্রিয়া প্রকাশকারিণী। আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

مَا اٰمَنَ بِیْ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلٰی جَنْبِهِ.

'সে ব্যক্তি আমার ওপর ঈমান আনেনি যে নিজে পেট পুরে খায়, অথচ তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে।' (তাবরানী, বাজ্জার, হাদীসের সনদ ভাল)

মোজাহিদ বলেন, 'আমি আবদুল্লাহ বিন ওমারের কাছে ছিলাম। তাঁর দাস একটি ভেড়ার চামড়া খুলছিল। তিনি বলেন, হে গোলাম! চামড়া খোলা হয়ে গেলে, প্রথমে আমাদের প্রতিবেশী ইহুদীকে গোশত দেবে। তিনি কয়েকবার একথা বলেন। আনাস বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, আপনি তা আর কত বলবেন? তখন আবদুল্লাহ বিন ওমার বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অব্যাহতভাবে উপদেশ দিয়ে আসছিলেন এবং আমরা আশংকা করেছিলাম যে, তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ বানিয়ে দেবেন।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

ইমাম গাজালী (র) এহইয়াউল উলুমুদ্দীন গ্রন্থে এবং ইবনু হাজার ও আল্লামা কুরতুবীর মতে, প্রতিবেশীর অধিকারগুলো নিম্নরূপ : সালাম দেয়া, দীর্ঘ আলোচনা না করা, তার অবস্থা সম্পর্কে বেশী বেশী প্রশ্ন না করা, কেননা তাতে সে কুণ্ঠাবোধ করতে পারে, অসুখের সময় সেবা ও পরিচর্যা করা, বিপদে দুঃখ প্রকাশ করা, শোকে অংশগ্রহণ করা, আনন্দে সন্তোষ প্রকাশ করা, খুশীতে শরীক হওয়া, পদস্খলন উপেক্ষা করা, ঘরের উপর থেকে তাদের গোপন বিষয় জানার চেষ্টা না করা, বিপদের সময় তাদের ওপর সমস্যা সৃষ্টি না করা, তাদের ঘরের

www.amarboi.org

সামনে পানি না ফেলা, তাদের ঘরের রাস্তা সংকীর্ণ না করা, তার প্রকাশিত দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা, তার অনুপস্থিতিতে তার বাড়ী-ঘরের প্রতি খেয়াল রাখা, তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে তা না শুনা, তার স্ত্রীর প্রতি না তাকানো, তার সন্তানদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ কথা বলা এবং তারা দীনের ব্যাপারে যা জানেনা তা শিক্ষা দেয়া। এছাড়াও সাধারণ মুসলমানদের যে অধিকার রয়েছে তাদেরও সে একই অধিকার প্রযোজ্য। প্রতিবেশী অভাবী, বিধবা, ইয়াতীম কিংবা বয়স্ক হলে তার অধিকার সে অনুপাতে আরো বেড়ে যায়।

চাকরের অধিকার

পৃথিবীতে প্রথমদিকে চাকর বলতে দাস-দাসীকে বুঝানো হত। তখন পৃথিবীতে যুদ্ধের কারণে দাস-দাসী বেশী ছিল। বিশেষ করে মুসলমানের সাথে কাফেরদের যুদ্ধের ফলে ঐ দাস-দাসীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। দাস প্রথার যুগ শেষে বর্তমানে সকল চাকর চাকরানী স্বাধীন। ইসলাম দাস কিংবা চাকরকে যে অধিকার দিয়েছে আজকের যুগের স্বাধীন লোকদের পক্ষেও তা ভোগ করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ প্রতিবেশীর অনুরূপ চাকর-বাকরের সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহও (সা) তাদের সাথে ভাল ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে সুখ-সম্পদ, খাবার-দাবার, পোশাক-আশাকে সমান অংশগ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে মারা, কষ্ট দেয়া কিংবা বঞ্চিত করা থেকে বারণ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, তাদের ওপর অত্যাচার করলে কেয়ামতের দিন মালিকদেরকে আজাব দেয়া হবে। তিনি মালিক ও মনিবদেরকে বলেছেন, তারা যেন চাকর-বাকরের সাথে গর্ব-অহংকার না করে এবং কথা-বার্তায় তাদের প্রতি মায়া-মহব্বত প্রকাশ করে।

মা'রুর বিন সুয়েদ থেকে বর্ণিত। আমি হযরত আবু যরকে (মদীনা থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে অবস্থিত) রাবাজা গ্রামে দেখতে পেলাম। তাঁর পরনে ছিল একটা মোটা চাদর এবং তাঁর গোলামের উপরও ছিল অনুরূপ আরেকটা মোটা চাদর। সমাজের লোকেরা বলল, হে আবু যর! আপনি যদি গোলামের চাদরটাসহ পরতেন আপনাকে খুব সুন্দর মানাত এবং গোলামকে অন্য একটা চাদর দিতে পারতেন। তখন আবু যর বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে (গোলামকে) এই বলে গালি দিয়েছিলাম, যে তার মা অনারব। সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে

www.amarboi.org

গিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আবু যরকে বলেন, হে আবু যর! তোমার মধ্যে জাহেলিয়াত আছে। সে তোমার ভাই। আল্লাহ তাদের উপর (গোলামের) তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। খাপ না খেলে তাকে বিক্রী করে ফেল এবং আল্লাহর কোন সৃষ্টিকে কষ্ট দিবে না।' (আবু দাউদ)

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণনাটি এরূপ : 'তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। আল্লাহ যদি কাউকে কারো অধীন করেন, সে যেন নিজে যা খায় তাকেও তা খাওয়ায় এবং নিজে যা পরে তাকেও তা পরায়, তাকে যেন সাধ্যের বাইরে কাজ না দেয়, যদি দেয় তাহলে ঐ কাজে যেন তাকে সাহায্য করে।'

হাদীসটি নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, আবু যর গোলামটিকে শুধু 'তার মা আরবী নয়' এতটুকু কথাই বলেছিলেন। কিন্তু এটা গোলামের কাছে অসম্মানজনক মনে হওয়ায় সে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে অভিযোগ করে। রাসূলুল্লাহ (সা) এই বলে বিচার করেন যে, আবু যরের মধ্যে মূর্খতা যুগের প্রভাব তখনও বিদ্যমান। মূর্খতা যুগে, মনিবেরা গোলামদেরকে ঘৃণা করত যেন তারা মানুষই নয়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) আবু যরকে বুঝালেন যে, তারা গোলাম হলেও তোমার দীনি ভাই। তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার কর। নচেত বিক্রী করে দাও। আর তাদেরকে রাখলে নিজেদের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে তাদের খাবার ও পোশাক দেবে। ওলামায়ে কেরাম হাদীসের এই অর্থই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আবু যর গোলামকে একই খাবার ও পোশাক দিয়ে অক্ষরে অক্ষরে হাদীসটির ওপর আমল করেছেন। মুআওয়িআহ বিন সুয়েদ বিন মোকরেন থেকে বর্ণিত। আমি আমাদের এক গোলামকে চপেটাঘাত করেছিলাম। আমার বাপ আমাকে এবং গোলামকে ডেকে পাঠান। তিনি গোলামকে বলেন, তুমি তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নাও। আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সময় বনি মোকরেনের ৭ ব্যক্তি ছিলাম এবং আমাদের ১টির বেশী গোলাম ছিল না। আমাদের এক ব্যক্তি ঐ গোলামটিকে চপেটাঘাত করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তাকে মুক্ত করে দাও। তারা বলল, আমাদের এটি ব্যতীত আর কোন চাকর নেই। তিনি বলেন, তাকে প্রয়োজন পর্যন্ত কাজে লাগাও, প্রয়োজন শেষ হলে তাদেরকে মুক্ত করে দাও।' (মুসলিম)

www.amarboi.org

তাঁর বাপ প্রতিশোধের হুকুম দিয়েছিলেন। নতুবা রাসূলুল্লাহর (সা) অনুকরণে তাকে মুক্ত করে দেয়া দরকার ছিল। আফসুস, আজকাল আমরা চাকরদের ওপর নির্যাতন, তাদেরকে অভুক্ত রাখা, আগুনে পোড়ানো এবং মাথায় আঘাত করে মেরে ফেলার মত আচরণের কথাও শুনতে পাই। অথচ তারা স্বাধীন, দাস নয়, এমনকি তারা নিকটাত্মীয়ও হতে পারে।

আবু মাসউদ আল-বদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার দাসকে বেত্রাঘাত করেছিলাম্ তখন পেছন থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পাই, 'হে আবু মাসউদ, জেনে রাখ।' আমি রাগ মিশ্রিত আওয়াজটি কার তা বুঝতে পারলাম না। আওয়াজ দানকারী আমার নিকটবর্তী হলে দেখলাম, তিনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ (সা)। তিনি বলেন, হে আবু মাসউদ! জেনে রাখ,

إِنَّ اللّٰهَ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلٰى هٰذَا الْغُلَامِ فَقُلْتُ يٰارَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَقَالَ اَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ اَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ.

'তুমি এ দাসের উপর যতটুকু শক্তিশালী আল্লাহ তোমার ওপর তা অপেক্ষা আরও বেশী শক্তিশালী। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে আল্লাহর ওয়াস্তে স্বাধীন। তিনি বলেন, তুমি যদি তা না করতে, তাহলে তোমাকে দোজখের আগুন স্পর্শ করত।' (মুসলিম)

আবদুল্লাহ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা)-এর কাছে এক ব্যক্তি আসল এবং জিজ্ঞেস করল,

يٰارَسُوْلَ اللّٰهِ كَمْ اَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ؟ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

হে আল্লাহর রাসূল, 'চাকরকে কতবার মাফ করবো? তিনি বলেন, দিনে ৭০ বার।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

مَنْ ضَرَبَ سَوْطًا ظُلْمًا اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'যে ব্যক্তি কাউকে অন্যায়ভাবে বেত্রাঘাত করে, কেয়ামতের দিন তার বদলা নেয়া হবে।' (বাজ্জার, তাবরানী)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

www.amarboi.org

لَايَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ عَبْدِىْ وَاَمَتِىْ، كُلُّكُمْ عَبِيْدُ اللهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ اِمَاءُ اللهِ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِىْ وَجَارِيَتِىْ وَفَتَاىَ وَفَتَاتِىْ.

'তোমরা একথা বলনা, আমার আবদ ও আমার দাস-দাসী। তোমাদের প্রত্যেক নারী ও পুরুষ আল্লাহর দাস-দাসী। তবে তোমরা এভাবে বল, আমার ছোট ছেলেটি, মেয়েটি কিংবা আমার যুবক ও যুবতী।' (মুসলিম)

ইসলাম চাকর-চাকরানীর প্রতি যথেষ্ট অনুকম্পা প্রদর্শন করেছে। ইসলাম চাকরের খাবার ও পোষাক মনিবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে এবং তাদেরকে দাস-দাসী ডাকার পরিবর্তে তাদের মানবিক অনুভূতি বিবেচনা করে তাদেরকে যুবক, যুবতী ইত্যাদি ডাকার নির্দেশ দিয়েছে। তাদের শক্তি ও সামর্থের বাইরে কাজ না দেয়ার এবং দিলে সাহায্য করার আদেশ করেছে। কেউ তাদেরকে বিনা দোষে মারলে এর ক্ষতিপূরণ হল সে দাসকে মুক্ত করে দেয়া। কেননা, তারা হচ্ছে দীনি ভাই। তাদেরকে আল্লাহ কিছু সময়ের জন্য মনিবের অধীন রেখেছেন মাত্র।

আজকের সভ্য সমাজে মনিবরা চাকরদের কাছ থেকে কঠোর শ্রম আদায় করে এবং সেখানে তাদের নিজেদের স্বার্থ চিন্তা ছাড়া চাকরের কল্যাণের কোন চিন্তা থাকে না। ফলে চাকরদের স্বাস্থ্যহানী, রোগ-শোক ও দুঃখ-যাতনার শেষ নেই। তাদের খাওয়া-পরা ও মনিবের চাইতে বহুগুণে নিকৃষ্ট। তারা শীত ও গরমে পোষাকের কারণে কষ্ট পায়। তারা আজ চাকরের সাথে যে কঠোর ব্যবহার করে তার করুণ পরিণতি এ দুনিয়াতেই হয়তো ভোগ করতে পারে। বিচিত্র নয় তারা কিংবা তাদের সন্তানরাও চাকর হতে পারে। তখন তাদের ভাগ্যও অভিন্ন হতে পারে।

মনিবের জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) এ হাদীসটাই যথেষ্ট যে, مَنْ لَمْ يَرْحَمْ لَايُرْحَمْ 'যে দয়া করে না সে দয়া পায় না।'

www.amarboi.org

ইসলামের সাধারণ অধিকার

ইসলামের সাধারণ অধিকার সকল মানুষের প্রতি প্রযোজ্য। কাফের-মুসলমান, শত্রু-বন্ধু, শান্তি স্থাপনকারী, যুদ্ধকারী, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ ও শাসক-শাসিত যেই হোকনা কেন। এমনকি তাতে পরিবার, প্রতিবেশী, নিকটাত্মীয় চাকর ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের সাধারণ অধিকারগুলো পূরণ করা হলে, সমাজে আমরা দেখতে পাবো সুখী পরিবারসহ সুখী প্রতিবেশী, আত্মীয় ও চাকর নকর। আগের অধ্যায়টিকে পাঠকারীদের জন্য শরীরের প্রধান অংশ-মাথার সাথে তুলনা করা চলে। আগের অধ্যায়ে শরীরের তথা ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন রোগ-শোক ও ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং সেগুলোর চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনার পর বক্ষমান অধ্যায়ে তার বৃহত্তম গণ্ডি সমাজের অধিকার পূরণের মাধ্যমে গোটা শরীর তথা সমাজকে সুস্থ্য ও নিষ্কলুষ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

১. ভ্রাতৃত্ব : দীনি ভ্রাতৃত্ব সর্বাধিক মহান ভ্রাতৃত্ব। এটা এমন এক সামাজিক সম্পর্ক যার সাথে অন্য কোন বন্ধনের তুলনা চলে না। এমনকি একই দীনের অনুসারী না হলে পিতার সাথে সন্তানের, ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের এবং স্বামীর সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক দীনি ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের তুলনায় দুর্বল। আর দীনের কারণেই এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে, সন্তান বাপের বিরুদ্ধে এবং স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে লড়াই করে। দীনি ভ্রাতৃত্ব বলতে বুঝায়, মুসলমান নিজ প্রতিপালকের প্রতি গভীর ঈমান রাখবে, তাঁর শরীয়তের প্রতি দ্রুত আত্মসমর্পণ করবে, রবের সাথে মজবুত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করবে, আল্লাহ যা ভালবাসেন তা ভালবাসবে, তিনি যা অপসন্দ করেন, তা অপসন্দ করবে, নিজ প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখবে, কারুর সাথে তাঁর শরীক করবে না এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর পিতা ও সন্তান প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। সে আল্লাহর একজন গোলাম হবে, তাঁর ভালবাসার শিকলে আবদ্ধ হবে, তাঁর নির্ধারিত সীমান্তে অবস্থান করবে এবং সকল বিষয়ে তাঁর কাছে বিনীতি থাকবে। সে আল্লাহর ভালবাসার ভিত্তিতে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা পোষণকারী অন্যান্য লোকদেরকে ভালবাসবে এবং প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে ঈমান ও ইসলামের আকর্ষণীয় বাগান দেখতে পাবে।

পরিচয়ের ভিত্তিতে মুসলমানের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ছড়িয়ে পড়ে। দীনের সম্পর্ক মুসলমানের মধ্যে এমন, যেমন- সূর্যের আলো চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের ঐক্যের কারণ। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান রাখে এবং তাঁকে একনিষ্ঠভাবে

www.amarboi.org

ভালবাসে, সে অন্যান্য সকল মোমেনকে অবশ্যই ভালবাসবে। এ জন্য কোরআন মজিদ মোমেনদের ভ্রাতৃত্বকে ঈমানের স্বাভাবিক দাবী হিসেবে উল্লেখ করেছে। আল্লাহ কোরআনে মোমেনদের প্রতি শুধু ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের নির্দেশই দেননি। বরং তিনি আরো বলিষ্ঠভাবে বলেছেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ 'মোমেনরা পরস্পর ভাই ভাই।' (সূরা হুজুরাত : ১০)

আরবী ভাষার নিয়ম অনুযায়ী এখানে 'হাসার' হয়েছে। এর সঠিক অর্থ হল হল : 'মোমেন মোমেনের ভাই ছাড়া আর কিছু নয়।' ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক দুর্বল হলে তা ঈমানী দুর্বলতা এবং ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সবল হলে তা ঈমানী সবলতার পরিচায়ক।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, الْمُسْلِمُ اَخُوْ الْمُسْلِم 'মুসলমান মুসলমানের ভাই।' তিনি আরও বলেছেন, وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا 'আল্লাহর বান্দাহগণ! তোমরা পরস্পর পরস্পরের ভাই হয়ে যাও।' অর্থাৎ হে বান্দাহরা! তোমরা অন্তরের পরিশুদ্ধি ও ঈমানী বলিষ্ঠতার মাধ্যমে তোমাদের ভাইদের অধিকার আদায়ের বিষয়ে আগ্রহী হও।

ভ্রাতৃত্বের দাবী হল, তুমি তোমার মোমেন ভাইয়ের ঈমান, ইবাদত, রবের প্রতি আনুগত্য, স্রষ্টার প্রতি আত্মসমর্পণ এবং আল্লাহর রাস্তায় তাঁর আচরণকে ভালবাসবে। অনুরূপভাবে তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ-অপছন্দ করবে, তোমার ভাইয়ের জন্যও তা করবে এবং ইসলাম তার যে অধিকার তোমার ওপর নির্ধারণ করেছে তা তুমি পূরণ করবে।

এর দ্বারাই রক্ত ও বংশের সাথে ঈমান ও ইসলামের সম্পর্কের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ ঈমানের সম্পর্ক রক্তের সম্পর্কের চাইতেও অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তিশালী। এটা হচ্ছে, স্থায়ী সম্পর্ক যা ধ্বংস হওয়ার মত নয়। ব্যক্তি মারা গেলেও সে সম্পর্ক অব্যাহত থাকে। এটা হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর কাছে মানুষের মর্যাদার প্রতীক। এ ভ্রাতৃত্বই সৌভাগ্য, সার্বভৌমত্ব, সমান ও ইজ্জতের ভিত্তির ঐক্য। এটা মানুষের অন্তরে আলোর ঝলক এবং এটা ছাড়া অন্ধকার ও গোমরাহী ছড়িয়ে পড়বে। ঈমানের মাধ্যমে চিন্তা, আচরণ ও লেনদেন পরিবর্তিত হয়। আর এ জন্যই আল্লাহর নিম্নোক্ত বক্তব্যে বিস্ময়ের কিছু নেই,

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ

www.amarboi.org

وَلَوْ كَانُوْا اٰبَائَهُمْ اَوْ اَبْنَائَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ، اُوْلٰئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ.

'যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে। তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা।' (সূরা মোজাদালাহ ঃ ২২)

সত্যিকার ঈমানী ভ্রাতৃত্ব যদি পরিবার, সমাজ ও জাতির মধ্যে বিস্তার লাভ করে, তাহলে তা সমাজে সুদূর প্রসারী সামাজিক বিপ্লব ও পরিবর্তন সাধন করবে। সে কারণেই আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতে মোমেনদের মধ্যে পরস্পরের হিতাকাংখী-ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের অনুগ্রহের কথা এবং ঈমানের আগে ভ্রাতৃত্বের নেয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন। মূলতঃ ঈমান হচ্ছে মূল আর ভ্রাতৃত্ব হচ্ছে শাখা। আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا.

'তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহর সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে, তারপর তিনি তোমাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই হয়ে গেলে। তোমরা আগুনের গর্তের পাশে উপনীত হয়েছিলে, তিনি তোমাদেরকে সেখান থেকে রক্ষা করেছেন।' (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

কোরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে; আরব সমাজে মূলতঃ শত্রুতা ছিল এবং শত্রুর আগুনের মধ্যে তারা বাস করত। তারপর কোরআন নাযিল হল। যারা কোরআন, আল্লাহ, তাঁর কিতাব, রাসূল এবং পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা শত্রু থেকে বন্ধুতে পরিণত হয়েছে, যোদ্ধারা ভাইয়ে পরিণত হয়েছে, কৃপণরা নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়েছে।

ইসলামে প্রথম পর্যায়ে উত্তরাধিকার, রক্তের সম্পর্কের উপর নয় বরং দীনি

www.amarboi.org

ভ্রাতৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে, মুসলমানরা নিজের কাছে এক দীনার, দেরহাম পরিমাণ সম্পদ থাকলে সেটাকে নিজের অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য ত্যাগ করত এবং তাতে নিজের অগ্রাধিকার স্বীকার করতনা। বরং তারা তাদের নির্যাতিত দেশত্যাগী অন্যান্য মুসলামানদের উদ্দেশ্যে তা ব্যয় করত। তারা নিজের ভোগের চাইতে অন্যের অগ্রাধিকার দিত এবং নিজের কলিজার টুকরা-নিকটাত্মীয়কে পালনের চাইতে দীনি ভাইদের প্রতিপালনে তা ব্যয় করত। আরব সমাজের এই পরিবর্তনকে আল্লাহ নিজের একক কৃতিত্ব হিসেবে উল্লেখ করেন। কেননা কোন সৃষ্টির পক্ষেই ঐরূপ সমঝোতা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, তারা সে জন্য যত কলা-কৌশল বুদ্ধি-প্রজ্ঞা এবং সুন্দর লেন-দেনই আঞ্জাম দিক না কেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

'তিনিই (আল্লাহ) তাদের মনে ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর সকল কিছু ব্যয় করেও আপনার পক্ষে তাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আল্লাহই তাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি শক্তিবান ও বিজ্ঞ।' (সূরা আনফাল : ৬৩)

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রকারভেদসমূহ

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রকারভেদ অনেক।

১. মুসলিম ভাই হয়তো রক্ত ও বংশীয় সম্পর্কের ভাই হতে পারে। তখন অপর ভাইয়ের ওপর তার দ্বিগুণ অধিকার স্থাপিত হবে।

২. কোন সময় কোন মুসলমান সফরে, অফিসে, ছাত্রতে কিংবা কোন কোম্পানীতে চাকুরীর কারণে ভাই হতে পারে।

৩. কোন সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, আল্লাহর প্রতি ভালবাসা কিংবা তাঁর রাস্তায় সহযোগিতার কারণেও একে অপরের ভাই হতে পারে।

www.amarboi.org

৪. জেহাদের সাথী, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কোন কাজ করার কারণে কিংবা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাথীও ভাই হতে পারে।

৫. স্বদেশ কিংবা পাড়ার অধিবাসী হিসেবে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হতে পারে।

এভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ইসলামী সম্পর্ক কোন কোন সময় অন্য সম্পর্কের সাথে মিলে জোরদার হয় এবং এর অধিকার ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। একটা আরেকটা অপেক্ষা শক্তিশালী হয়। কোন সময় শুধু ইসলামী সম্পর্কই থাকে। তাতে অন্য কোন সম্পর্ক যোগ হয় না।

তিন ধরনের ভ্রাতৃত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো হচ্ছে,

১. সাধারণ ইসলামী ভ্রাতৃত্ব যাতে অন্য কোন সম্পর্ক নেই।

২. আল্লাহর রাস্তায় সাহচর্যের ভ্রাতৃত্ব।

৩. আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করার লক্ষ্যে জেহাদী ভ্রাতৃত্ব। এটা হচ্ছে, বিশেষ যৌথ লক্ষ্যে পৌঁছার উদ্দেশ্যে কাজ করার নিমিত্ত ভ্রাতৃত্ব।

এ সকল ভ্রাতৃত্বের অধিকার সম্পর্কে জানা দরকার।

সাধারণ ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অধিকার

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের কতগুলো অধিকার রয়েছে। এর মধ্যে কোনটা ফরজ এবং কোনটা সুন্নাত। কিন্তু ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে কিংবা তা জোরদার করার বিষয়ে এবং ইসলামের আঙ্গিনায় সম্মানজনক জীবন যাপনের জন্য উভয় ধরনের ভ্রাতৃত্বের প্রভাব কার্যকর রয়েছে। কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহতে বিশ্বাসী প্রতিটি লোকের উচিত, ভ্রাতৃত্বের অধিকারকে অস্বীকার না করা। তাদের জন্য ধ্বংস যাদের কুপ্রবৃত্তি তাদের অগ্রদূত, শয়তান নেতা এবং অহমিকা শাসক। মানুষ কখনও একই ধরনের জ্ঞান, উপলব্ধি, মেযাজ ও আচরণের অনুসারী নয়। মুসলমানের উচিত, নিজ দিগন্তকে প্রসারিত করা, বিজ্ঞতা বাড়ানো এবং যা আমল করে, বলে ও লিখে তা সুক্ষ্মভাবে করা, নতুবা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করবে। সে ব্যক্তির জন্যও ধ্বংস যে নিরপরাধ লোকের দোষ খুঁজে বেড়ায়, সঠিক লোকের ত্রুটি তালাশ করে এবং নির্দোষ লোকের দোষ বের করার চেষ্টা করে। মুসলমানরা নিজেদের মতভেদের কারণে যদি ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বকে ধ্বংস করে দেয় তাহলে, মা, বাপ, ভাই-বোন ও অন্যান্যদের সাথে কোন আত্মীয়তা কিংবা সম্পর্ক সংরক্ষিত থাকবে না।

www.amarboi.org

আমাদের প্রতিটি আচরণ যেন আল্লাহর দীন অনুযায়ী হয় এবং তা যেন কুপ্রবৃত্তির অনুরূপ না হয়।

ইসলামে যেমন ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের মূলনীতি আছে, তেমনি রয়েছে শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণ। এগুলো আমাদের জানতে হবে।

সকল মুসলমানের কল্যাণের আকাংখা করা

ইসলামী আইন, কাজ ও তার মাধ্যমের সাথে আ'কীদা ও লক্ষ্যের ভারসাম্য এবং সামঞ্জস্য বিধান করে। ফলে, আ'কীদা আমলের মধ্যে এবং আমল আকীদার মধ্যে একাকার হয়ে যায়। মাধ্যম ও লক্ষ্যের মধ্যেও গভীর সংযোগ বিদ্যমান থাকে যেন একটা আরেকটার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ইসলামী আকীদার ভিত্তি হল, আল্লাহর একত্ববাদ। তাই এর প্রতি ঈমান পোষণ করাকে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ইসলামের সকল কাজ ও আমলকে এই একত্ববাদের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাছাড়াও ইসলামের সকল আইনের লক্ষ্য হল, আল্লাহর একত্ববাদে পৌঁছা এবং এর ওপর আমল করা ও টিকে থাকা। কোন কোন সময় মাধ্যম ও লক্ষ্যকে পৃথক করা মুশকিল হয়ে যায়। যেমন, নামাজের মধ্যে জিক্‌র, তাসবীহ এবং আল্লাহর গুণ-গান করা ইত্যাদি।

মুসলমানের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠা ইসলামের বিশেষ লক্ষ্য। স্বয়ং কোরআন ও ঈমানের দাবীতে সত্যবাদীদের ঐক্যের বিষয়ে পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করেছে إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ 'মোমেনগণ পরস্পর ভাই ভাই।' (সূরা হুজুরাত : ১০)

রাসূলুল্লাহ (সা) মোমেনদেরকে একই শরীরের সাথে তুলনা করেছেন। শরীরের এক অঙ্গ অন্যান্য অঙ্গের স্বার্থে কাজ করে এবং এক অঙ্গ ব্যথিত হলে অন্যান্য সকল অঙ্গ ব্যথা-বেদনায় নিদ্রা ভঙ্গ করে।

নোমান বিন বাশীর থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى.

'বন্ধুত্ব, দয়া ও সহমর্মিতার ক্ষেত্রে মোমেনের উদাহরণ হল একটি শরীরের মত। যখন এর একটি অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন অন্যান্য সকল অঙ্গ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।' (বোখারী, মুসলিম)

www.amarboi.org

রাসূলুল্লাহ (সা) মোমেনদেরকে বিল্ডিংয়ের সাথে তুলনা করে বলেছেন, দালানের প্রতিটি ইট অপরটির সহায়ক ও সাহায্যকারী এবং এর ভিত্তিতেই তা টিকে থাকে। কোন ইট খারাপ বা দুর্বল হলে, কোন এক সময়ে তা অন্যান্য ইটগুলোর জন্য ক্ষতিকর হবে, যদি না তার উপযুক্ত প্রতিকার করা হয়। এ মর্মে আবু মূসা আশআরী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

'এক মোমেন আরেক মোমেনের জন্য ইমারতস্বরূপ, যার একাংশ অপরাংশকে শক্তিশালী করে।' (বোখারী, মুসলিম)

যদি মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হয় তাহলে, তা একই আকীদাভুক্ত উম্মাহর জন্য অবশ্য কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা, তারা একই আল্লাহর বান্দাহ, তাদের নবী এক, কেবলাহ এক এবং জীবন পদ্ধতিও এক। ফলে, বিশ্ব চরাচরের অন্যান্য মানুষ, জিন ও শয়তান হবে তাদের বিরোধী ফ্রন্ট। আর এ জন্যই সকল সামাজিক আইন এমন হওয়া উচিত, যেন তা এই ঐক্যের দিকে নিয়ে যায় এবং তাতে কম-বেশ হলে, তাকে যেন অপরাধ হিসেবে গণ্য করে। উম্মাহর ঐক্য যে সকল মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে সকল মুসলমানের কল্যাণ আকাংখা অন্যতম মূলনীতি।

মুসলমানের কল্যাণ কামনা ইসলামে ফরজ করা হয়েছে। এটা ঈমানের সত্যতা এবং পবিত্র ও বিশুদ্ধ আকীদার নিদর্শন। সেজন্য আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَيُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُحِبَّ لاَخِيْهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

'আমার প্রাণ যার হাতে, সেই সত্তার শপথ করে বলছি, কোন মোমেন সে পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যে পর্যন্ত সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা তার ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করবে।' (বোখারী ও মুসলিম)

হাদীসে সে ব্যক্তির ঈমানকে অস্বীকার করা হয়েছে যে নিজের জন্য যা পছন্দ করে অন্য ভাইয়ের জন্য তা পসন্দ করে না। পক্ষান্তরে, যে এ গুণ দ্বারা গুণান্বিত সে ঈমানের বাইরে নয়। তবে আল্লামা সানআনী বলেছেন, ওলামায়ে কেরাম এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মোমেন না হওয়ার অর্থ ঈমান পরিপূর্ণ না হওয়া, বরং তার ঈমান অসম্পূর্ণ। সে জন্য সে অপরাধী, কাফের নয়। এ

www.amarboi.org

ব্যাখ্যার ফলে এ হাদীসের সাথে অন্যান্য হাদীসের কোন বিরোধ থাকছে না।

আমরা এখানে ভাই বলতে দীনি ভাই বুঝাচ্ছি। কোন কোন আলেম বলেছেন, ভাই বলতে যে কোন মানুষ ভাইকেই বুঝায়। যদিও সে কাফের হোক না কেন। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, কাফের ব্যক্তির ইসলামে প্রবেশকে ভালবাসা। কেননা, ঈমান তার কাছে খুবই প্রিয়। তাই সে ঈমান আনার শর্তে তার অন্যান্য উপকারিতা কামনা করবে। কখনও অন্য মুসলমান ভাইয়ের জন্য নিজের অনুরূপ কল্যাণ কামনা কষ্টকর হয়। অনেকের পক্ষে তা সম্ভব হয়না। বিশেষ করে অসুস্থ আত্মার অধিকারীদের বেলায় তা প্রযোজ্য। ইবনু সালাহর মতে, ভাল ও সুস্থ আত্মার অধিকারীর জন্য তা খুবই সহজ। তাই নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হাদীসে خَيْرٌ অর্থাৎ 'অন্য ভাইয়ের জন্য কল্যাণ কামনা' শব্দের উল্লেখ এসেছে। হাদীসের অর্থ দাঁড়ায়, ব্যক্তির ঈমান সে পর্যন্ত পূর্ণ হয় না, যে পর্যন্ত না সে অন্য ভাইয়ের জন্য নিজের অনুরূপ কল্যাণ ও মঙ্গলের চিন্তা করে। অন্য একজন মোমেনের কল্যাণ চিন্তা করা অতি বেশী উঁচু মর্যাদা এবং আল্লাহর কাছে-সম্মানের বিষয়।

বর্তমান যুগে অন্য মুসলমানের জন্য নিজের অনুরূপ কল্যাণ চিন্তার অধিকারী লোক খুবই কম। বস্তুবাদী চিন্তা মানুষকে বেশী স্বার্থপর করে তুলেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবায়ে কেরামের গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকা সবার জন্য পথের দিশা।

তাবরানী ইবনু বোরাইদা আসলামী থেকে বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন আব্বাসকে (রা) গালি দিয়েছিল। তখন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) বলেন, আমার মধ্যে তিনটি অভ্যাস আছে। আমি আল্লাহর কোরআনের কোন আয়াতের অর্থ ও মর্ম বুঝতে পারলে আকাংখা পোষণ করি যদি সকল লোক তা বুঝত। আমি কোন মুসলিম শাসকের ন্যায় বিচারের খবর শুনে খুশী হই, যদিও তার কাছে কোন মোকদ্দমা নিয়ে যাওয়ার সুযোগ হয়তো আমার হবে না এবং আমি কোন মুসলমানের দেশে বৃষ্টির খবর পেলে আনন্দিত হই এবং সে জন্য অস্বস্তি বোধ করি না। (হায়াতুস সাহাবা, ২য় খন্ড, ৭৪৩ পৃঃ)

ইবনু আব্বাসের এ বক্তব্য থেকে কেবলমাত্র মুসলমানের কল্যাণ কামনাই ফুটে উঠেছে।

www.amarboi.org

দুর্বল ও মজলুমের সাহায্য করা

ভাল ও বিবেকবান মুসলমান পৃথিবীর সকল মুসলমানের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের আমেজ অনুভব করে এবং অন্য ভাইয়ের দুঃখ-কষ্টে প্রভাবিত হয়। ফলে ভ্রাতৃত্বের দাবী অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করে। আর এ কাজ করার জন্য তার ঈমান-আকীদা তাকে বাধ্য করে। আল্লাহর কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত ও আমাদেরকে একই কথা বলে,

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ.

'মোহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তিনিসহ তাঁর সাথীরা কাফেরদের ব্যাপারে বজ্র-কঠোর এবং নিজেদের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল ও দয়ালু।' (সূরা আল-ফাতহ : ২৯)

ইসলাম অন্য মুসলমান ভাইয়ের প্রতি যে দয়া প্রদর্শনের আহ্বান জানায় তার অনিবার্য দাবী হল প্রত্যেকেই একে অন্যের আশা-আকাংখায় অংশগ্রহণ করবে এবং একে অপরকে ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবে, হাত ধরে অন্যকে তার বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। ইসলাম সে জন্য দেশবাসী-নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ওপর শত্রুর আক্রমণের মুখে দেশের প্রতিরক্ষাকে ফরজ করেছে যদি কেবলমাত্র পুরুষের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা যথেষ্ট না হয়। আর এ জন্য ইসলাম যাদের সাহায্য করার শক্তি আছে, তাদের প্রতি সাহায্য করাকে ফরজ করে দিয়েছে। সে সাহায্য পানিডুবি, অগ্নিকাণ্ড, বন্য পশুর আক্রমণ, মানুষ জিন ও শয়তানের ক্ষতিসহ যে কোন বিপদই হোক না কেন। ইসলাম সাহায্যের বিষয়টাকে অস্পষ্ট রাখেনি, বরং তাকে স্পষ্ট করে দিয়েছে এবং সে জন্য অনুসরণীয় কিছু নিয়ম-নীতি চালু করেছে। তারা তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি দায়িত্ব পালন না করলে গুণাহগার হবে।

কারুর মাল চুরি কিংবা লুঠতরাজ হলে, মুসলিম শাসকের উচিত, মূল মালিকের কাছে তা ফেরত দেয়া, চোরের হাত কেটে শাস্তি দেয়া এবং লুঠকারীকে অপরাধ মোতাবেক উপযুক্ত শাস্তি দেয়া। যার ইজ্জত-সম্মানের ওপর আগ্রাসন হয়েছে, যাকে যেনা-ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া হয়েছে, সে অপবাদকারীর ওপর ইসলামের দণ্ডবিধি কার্যকর করা দরকার। ব্যভিচারকারীকে বেত্রাঘাত কিংবা নির্দয়ভাবে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে। যে ব্যক্তি ডাকাতি করে অন্যের ঘরে হানা দিয়ে তাদের অর্থ-সম্পদ কেড়ে নেয়, মানুষের জীবনের ওপর হুমকী সৃষ্টি করে তার শাস্তি হল, হত্যা, ফাঁসি কিংবা বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কাটা।

www.amarboi.org

ঋণভারে জর্জরিত ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা জায়েয। তার ঋণ পরিশোধ হয় এ পরিমাণ অর্থ তাকে দেয়া যায়। অনুরূপভাবে যে, ব্যক্তি অভাবী কিংবা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, তাদের প্রত্যেককে সাহায্য করা অন্য মুসলমান ভাইয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য। শত্রুর কাছে আটক বন্দীকে মুক্ত করা খুব বেশী প্রয়োজন। এ জন্য মুসলামনদেরকে আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে এবং প্রয়োজনে এ উদ্দেশ্যে সকল সম্পদ ব্যয় করতে হবে। আল্লামা কুরতুবী বলেছেন, বন্দী মুক্তির জন্য সাহায্য ফরজ। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) বন্দীমুক্ত করেছেন এবং তখন থেকে মুসলমানরা এর ওপর আমল করে আসছেন। আর এ কারণেই রাষ্ট্রের বায়তুল মাল থেকে বন্দী মুক্তির বিষয়ে ইজমা (মতৈক্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বায়তুলমালে অর্থ না থাকলে তা মুসলামানের ওপর ফরজ। একজন করলে অন্যের ওপর থেকে দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। (তাফসীরে কুরতুবী-২য় খণ্ড, ২২ পৃঃ)

কোন দেশে যদি কোন মুসলমানের ওপর বিপদ-আপদ আসে, দীনের কারণে নির্যাতিত হয়, আল্লাহর দীনের নিদর্শন কায়েমে যদি নিজে, পরিবার কিংবা দলের মোমেনরা বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে, অন্যান্য মুসলমানদের ওপর ফরজ হল তাদেরকে সাহায্য করা এবং যথাসাধ্য তাদের সাহায্যদানের চেষ্টা চালানো। তা না করলে তারা গুণাহগার হবে এবং একদল তা আদায় করলে অন্যদের ওপর থেকে তা রহিত হয়ে যাবে। যদি কোন মুসলামানকে শাস্তি দেয়া হয়, কারাবন্দী করা হয়, অন্যায়ভাবে তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয় কিংবা তার ইজ্জত-সম্মান নষ্ট করা হয়, তাহলে তা জানা মাত্র অন্যান্য মুসলমানের ওপর তার মুসলিম ভাইকে সাহায্য করা এবং তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা ওয়াজিব হয়ে যায়। সাধ্যমত সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। তা না করলে তারা গুণাহগার হবে। এপ্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَمَالَكُمْ لاَتُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا.

'আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না সে দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা!

www.amarboi.org

আমাদেরকে এ জনপদ থেকে নিস্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।' (সূরা নিসা : ৭৫)

আল্লামা কুরতুবী এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, এতে জেহাদের উৎসাহ দেয়া হয়েছে যেন অত্যাচারী কাফের মোশরেকের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করা যায়। আল্লাহ তাঁর দীনের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার জন্য এবং দুর্বল মোমেনদেরকে রক্ষার জন্য জেহাদ ফরজ করেছেন। যদি তাতে প্রাণহানিও ঘটে তবুও তা করতে হবে।

আল্লাহ আরও বলেন,

وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلاَّ عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ.

'আর যদি তারা ধর্মীয় বিষয়ে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগিতার চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মোকাবিলায় নয়।' (সূরা আনফাল : ৭২)

এখান থেকেই আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নির্যাতিত মুসলমানদের প্রতি অন্যান্য মুসলামানদের উদাসীনতা লক্ষ্য করি। এটা দুঃখজনক বিষয়। কিন্তু আরও বেশী দুঃখজনক হল, যখন তাদেরকে দীনের মধ্যেই ঠিকভাবে ফিরে আসার আহ্বান জানানো হয় তখনও তারা ঠিকভাবে ফিরে আসার জন্য তৈরি হয় না।

ইসলামের শত্রুরা অর্থাৎ ইহুদী, খ্রষ্টান ও কম্যুনিষ্টরা বহু মুসলিম দেশে মুসলামনদেরকে অবরোধ করে আছে এবং সে সকল দেশের জনগণকে অত্যাচার-নির্যাতন করে ধ্বংস করে দিচ্ছে। শত্রুরা মুসলিম সরকার ও শাসকদের মাধ্যমে তাদের ঐ ঘৃণ্য নীল-নকশা বাস্তবায়ন করছে। সে সকল শাসকদের অন্তর ইহুদী-খ্রীষ্টানের অন্তরের মতই। অথচ অন্যান্য মুসলমান তা দেখে চুপচাপ আছে এবং এ ব্যাপারে কোন ভূমিকা পালন করছে না। ঈমান ও ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণেই এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। নচেত রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনী এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাস দীর্ঘ ১৩শত শতাব্দী পর্যন্ত আমাদেরকে কেন এ ব্যাপারে উৎসাহিত করছে না যে, কোন শত্রু

www.amarboi.org

কোন মুসলিম শিশুকে হত্যা, কোন মহিলাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, কোন চুক্তি ভঙ্গ কিংবা ইসলাম ও মুসলমানকে অপমান করলে গোটা মুসলিম ভূখণ্ড জ্বলে উঠবে এবং যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিশোধের দাবী জানাবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, একজন মুসলমান অপর মুসলমানকে সর্বাবস্থায় সাহায্য করবে এবং সে জালেম হোক বা মজলুম হোক তাকে হাত ধরে টেনে নেবে। তিনি বলেন,

أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْمَظْلُوْمًا... فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَسُوْلَ اللهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوْمًا أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ظَالِمًا، كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهُ.

'তোমার ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে জালেম হোক কিংবা মজলুম হোক। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সে মজলুম (নির্যাতিত) হলে তাকে সাহায্য করবো এটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু সে জালেম-অত্যাচারী হলে কিভাবে সাহায্য করবো? তিনি বলেন, তাকে জুলুম-নির্যাতন চালানো থেকে বিরত রাখ ও বাধা দাও। আর এটা হল অত্যাচারীর প্রতি সাহায্য।' (বোখারী)

অন্যান্য অনেক হাদীসে মুসলিম ভাইয়ের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাতে তাদের ওপর জুলুম না করার কথাও রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

اَلْمُسْلِمُ أَخُوا الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ.

'মুসলমান একে অপরের ভাই। কেউ কারুর ওপর জুলুম করবে না, কেউ কাউকে শত্রুর কাছে সোপর্দ করবে না এবং যেখানে সাহায্যের দরকার সেখানে তাকে অপমান করবে না।'

হযরত ওমার বিন খাত্তাব (রা) বলেছেন, 'কাফেরের হাত থেকে একজন মুসলমানকে উদ্ধার করা আমার কাছে গোটা আরব দ্বীপ থেকে উত্তম।' (কানযুল উম্মাল : ইবনু আবি শায়বা)

মুসলমান ছাড়াও অমুসলমানের প্রতি সাহায্য করা ওয়াজিব, যদি তাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ না থাকে। কারো ওপর জুলুম করা জায়েয নেই। নিজের চাইতে অন্যকে সাহায্য করা ঈমানের সর্বাধিক বড় পরিচয়।

www.amarboi.org

সুপারিশ করা ও প্রয়োজন পূরণ করা

অনেক লোকের শক্তি সামর্থ কম, চিন্তা ও পদক্ষেপ সীমিত, প্রয়োজন তাকে অক্ষম করে দিয়েছে এবং তার কোন কৌশল জানা নেই। তার উদাহরণ হচ্ছে আল্লাহর এ বক্তব্যের অনুরূপ,

لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ.

তারা কোন কৌশল অবলম্বন করতে পারে না এবং পথও জানে না। (সূরা নিসা : ৯৮)

ঐ সকল অসহায় লোকের মধ্যে রয়েছে নারী, পুরুষ, শিশু, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, গরীব, যুবক এবং বৃদ্ধ। সমাজ তাদের অবস্থা জানে এবং লোকেরা তাদের অক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল; তাদের মধ্যে সর্বাধিক অক্ষম হলো ইয়াতীম, যার কোন সহায় ও তদারককারী নেই, সে বিধবা যার জন্য কোন উপার্জনকারী নেই এবং সে ব্যক্তিও যাকে দারিদ্র্য পোড়াকপাল করেছে এবং নিঃস্বতা পথের সাথী বানিয়ে দিয়েছে।

আল্লাহ যাকাতের মধ্যে তাদের পার্থিব ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা রেখেছেন। তা এমন ফরজ যে কোন মুসলমান উপযুক্ত লোককে দিতে অস্বীকার করতে পারে না। বরং তাই হলো বঞ্চিত প্রার্থনাকারীর অধিকার।

আল্লাহ সমাজের এমন প্রভাবশালী লোকের উপর সুপারিশ করাকে আরেকটি করণীয় হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন, যাদের কথা লোকেরা শোনে। তাদের উচিত তাদের অভাবী ভাইদের পক্ষে সুপারিশ করা এবং তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করার লক্ষ্যে সাধ্যমত সাহায্য সহযোগিতা করা। এ জাতীয় পার্থিব ও অপার্থিব সাহায্য করা সামর্থবান মুসলমানের উপর জরুরী। বিশেষ করে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অভাবী ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অন্য মুসলমান যদি তার সমাধান করার ক্ষমতা রাখে, তাহলে তার সমস্যা দূর করা কর্তব্য। কেননা দুঃস্থ মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করা ফরজ। যদি সবাই সে দুঃস্থ ব্যক্তিকে ত্যাগ করে, তাহলে সবাই গুণাহ্‌গার হবে। কিন্তু কোন লোক তাকে সাহায্য করে বিপদ থেকে উদ্ধার করলে, অবশিষ্টদের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। মূল উদ্দেশ্য হল, দুঃখ দূর করা। তা যেহেতু অর্জিত হয়েছে ফলে অন্যদের গুনাহও আর থাকবে না।

মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যা দূর করার চেষ্টা যে ফরজ তার প্রমাণ হলো :

- আল্লাহ্ ক্ষতি ও কষ্ট দূর করার লক্ষ্যে ন্যায় বিচারকে ফরজ করে দিয়েছেন।
- সমস্যা ও দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য যাকাতকে ফরজ করেছেন।

www.amarboi.org

- একই উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধি-বিধান দান করেছেন।

- ক্ষতি বন্ধের জন্য কষ্ট দেয়াকে হারাম করেছেন।

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, মুসলিম যুদ্ধবন্দীকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনে মুসলমানদের সকল সম্পদ ব্যয় করতে হবে। যদি এটা ফরজ হয়ে থাকে তাহলে প্রয়োজন, রোগ-শোক, অপমান ও বিপদ মুসীবতে বন্দী মুসলমানকে মুক্ত না করা কিভাবে যুক্তিসংগত হতে পারে?

আল্লাহ তিন কারণে নামাযীদের ধ্বংসের বিষয়ে আয়াত নাযিল করেছেন :

১. ওয়াক্ত চলে যাওয়া সত্ত্বেও তারা নামাযের বিষয়ে গাফেল।

২. তারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ভালো কাজ করে।

৩. তারা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও অভাবী লোকদেরকে সাহায্য করে না। এ প্রসংগে আল্লাহ বলেন :

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ -

সেই মুসল্লীদের জন্য ধ্বংস যারা নামাজ থেকে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করে এবং নিজ প্রয়োজনীয় জিনিস দানে বিরত থাকে।

এ আয়াতে উল্লেখিত 'মাউন' শব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, যে সকল নেক কাজে মানুষ পরস্পর লেন-দেন করে তাই 'মাউন'। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, ঘরের উপকারী সকল জিনিসকে 'মাউন' বলে। যেমন : কোদাল, কুড়াল, পাতিল, আগুন ইত্যাদি। আবু ওবায়েদ ও মোবাররাদ বলেছেন, জাহিলিয়াতে 'মাউন' বলতে উপকারী জিনিস বুঝাত। যেমন : কোদাল, কুড়াল, হাড়ি, পাতিল ও বালতি। এ সকল মতামত খুবই কাছাকাছি অর্থজ্ঞাপক। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, 'মাউন' শাস্তির যোগ্য। কোন মুসলমানের কাছে যদি উপকারী জিনিস থাকে এবং তার অপর ভাই এ জিনিসের মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও সে যদি তাকে না দেয়, তাহলে তার গুনাহ্ হবে।

আল্লাহ পরকালে কাফেরের আজাবের কারণ সম্পর্কে বলেছেন :

www.amarboi.org

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ -

সে মহান আল্লাহর উপর ঈমান আনে না এবং ফকীর মিসকীনের খাবারের বিষয়ে লোকদেরকে উৎসাহিত করে না।" (সূরা আল-হাককা : ৩৩, ৩৪)

আল্লাহ খাবার দানের বিষয়ে উৎসাহিত না করাকে তার প্রতি ঈমান না আনার পর্যায়ে উল্লেখ করেছেন। কোন মুসলমানের প্রয়োজন জানা সত্ত্বেও সে বিষয়ে উৎসাহিত না করা কিংবা নিজেও সাহায্য না করা নেতিবাচক বিষয়।

এ আয়াত শুধু খাদ্য দানের কথা ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে নয়। বরং বস্ত্রহীন লোক শীত ও গ্রীষ্মে শরীর ঢাকার মত কাপড় না থাকলে তাকেও সাহায্য দানের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, পোষাকের অভাবে গরম কিংবা ঠাণ্ডা তাকে ধ্বংস করবে। অনুরূপ আহত, অসুস্থ, অক্ষম ইত্যাদি লোককেও সাহায্য করতে হবে। আল্লাহ বলেন :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"তোমরা নেক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর এবং গুনাহ ও অন্যায়ের কাজে সহযোগিতা করো না।" (সূরা মায়েদা : ২)

রাসূলুল্লাহ (সা) অন্যের কল্যাণ সাধনের জন্য উৎসাহিত করেছেন এবং এর জন্য যে সওয়াব ও পুরস্কার রয়েছে তাও বর্ণনা করেছেন। এ মর্মে বর্ণিত হাদীসগুলোর অধ্যয়ন মোমেন ভাইয়ের প্রতি জীবন্ত অনুভূতি সৃষ্টি করে। এক মোমেন আরেক মোমেনের ভাই, একজন আরেকজনের সুখ-দুঃখে অংশগ্রহণ করে এবং তার বিপদ দূর করতে ও সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করে। ইসলাম ছাড়া এ গুণ বৈশিষ্ট্য আর কোথাও পাওয়া যাবে না। ইসলামে বিপদগ্রস্ত লোকের বিপদ দূর করা, অভাবগ্রস্ত লোকের অভাব দূর করা, অভাবীকে সাহায্য করা, গোপনীয়তা ও ত্রুটি ঢেকে রাখা, নিজে না পারলে এসব কাজের জন্য অন্য কারো সুপারিশের ব্যবস্থা করা, কোন বেকারকে কাজ জোগাড় করে দেয়া, কারো ঋণ থাকলে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করা, কারো ক্ষতি দূর করা এবং কেউ যেন ধোঁকা না খায় তা থেকে রক্ষা করা, দীনি ভাইয়ের পেরেশানী দূর করা ইত্যাদি কাজের জন্য সুপারিশ করা এবং মধ্যস্থতা করা প্রয়োজন। সুপারিশের অর্থ হল, অন্যের

www.amarboi.org

কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা। এ কথাই কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا. وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا.

'যে লোক সৎ কাজের জন্য কোন সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্য সে তার বোঝার একটি অংশ পাবে।' (সূরা নিসা : ৮৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্যের কল্যাণের চেষ্টা করবে, আল্লাহ্ তাকে তার প্রচেষ্টার জন্য পুরস্কার দেবেন। চাই সে চেষ্টা সফল হোক বা না হোক। আর কেউ যদি কারো ক্ষতি করার চেষ্টা করে তাহলে সে গুনাহ্গার হবে। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اِشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا وَيَقْضِى اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهٖ مَا اَحَبَّ.

'তোমরা সুপারিশ কর, পুরস্কৃত হবে; আর আল্লাহ যা পসন্দ করেন তা নিজ নবীর জবানীতে ফয়সালা দিয়ে থাকেন।' (বোখারী ও মুসলিম)

কল্যাণকে অন্যের কাছ পর্যন্ত পৌঁছানোর লক্ষ্যেই সুপারিশ করা হয়। এটা হচ্ছে, নেক ও তাকওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা এবং ইসলামের ভ্রাতৃত্বের অর্থকে বাস্তবায়নের আওতাভুক্ত। আল্লাহর সীমানার মধ্যেই সুপারিশ করতে হবে, সীমালংঘন করা যাবে না। যদি বিচারকের কাছে কোন বিষয় ফায়সালার জন্য যায়, সেখানে সুপারিশ করা হারাম হবে। (আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত) রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ اَخِيْهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ...الخ

www.amarboi.org

'যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন মোমেনের বিপদ দূর করে, আল্লাহ হাশরের দিন অনুরূপ তার একটি বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবী দায়গস্ত লোকের প্রতি সহজ আচরণ করে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার প্রতি সহজ ও সদয় আচরণ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মোমেনের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। বান্দাহ যে পর্যন্ত অন্য বান্দার সাহায্যে নিয়োজিত থাকে আল্লাহও ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ বান্দার সাহায্য করেন। যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণে বের হয়, আল্লাহ জান্নাতের দিকে তার পথকে সহজ করে দেন।' (মুসলিম)

আবদুল্লাহ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اَلْمُسْلِمُ اَخُوالْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهُ وَلَايُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِى حَاجَتِهِ...الخ

'মুসলমান মুসলমানের ভাই। এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ওপর জুলুম করে না এবং তাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে না; যে ব্যক্তি অন্য ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে আল্লাহও তার প্রয়োজন পূরণ করেন।' (বোখারী ও মুসলিম)

আলী বিন আবি তালিব (রা) বলেন,

لَاَنْ اَقْضِىَ حَاجَةَ مُسْلِمٍ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ مِلْءِ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّفِضَّةً -

'আমার কাছে দুনিয়া ভর্তি সোনা-রূপার চাইতে একজন মুসলমানের প্রয়োজন পূরণ করা অধিকতর প্রিয়।' (আল কাঞ্জ)

'একবার আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) মসজিদে নববীতে এতেকাফ করছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে তাকে সালাম করে বসেন।' ইবনে আব্বাস তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'হে অমুক! তোমাকে পেরেশান ও উৎকণ্ঠিত দেখা যাচ্ছে কেন? লোকটি বলল, হে আল্লাহর নবীর চাচাত ভাই! অমুকের কাছে আমি দায়গ্রস্ত, তাই পেরেশান আছি। তারপর তিনি এতেকাফ থেকে বেরিয়ে যান এবং বলেন, আমি এই কবরের বাসিন্দাকে (রাসূলুল্লাহ সা) বলতে শুনেছি- একথা বলার পর তাঁর চোখের পানি বের হয়- 'যে ব্যক্তি কোন ভাই-এর প্রয়োজন পূরণে বের হয় এবং তা পূরণ করে, তা তার ২০ বছরের এতেকাফের চাইতে উত্তম।'

তাঁরা এভাবে একে অপরের সহযোগিতা করেছেন'।

www.amarboi.org

মুসলমানের দোষ গোপন রাখা

চোখ অবনত রাখা এবং মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা এক নৈতিক মানবীয় গুণ এবং উন্নত সামাজিক আদব। যদি কোন ব্যক্তি অন্য কারো দোষ-ত্রুটি দেখে এবং তা লোকদের মধ্যে প্রকাশ করে, তাহলে সে সুস্থ মানুষ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। অনেক লোকই কল্পনা ও ধারণার ভিত্তিতে অন্য লোককে ব্যথা দিয়ে থাকে। কিছু লোকের অভ্যাস হল, লোকদের সত্য-মিথ্যা, দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করা এবং এর মাধ্যমে তাদেরকে ছোট করা ও তাদের সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করা। এ জাতীয় লোকেরা ইসলাম ও মুসলমানদের যে ক্ষতি করছে, তা যদি বুঝতে পারে, তাহলে তারা যা করে তা থেকে বিরত থাকতে পারত এবং নিজেরা যে ছিদ্রান্বেষণ করে তা থেকে তওবা করতে পারত।

যদি তারা দীন বুঝত, নিজেদের জিহ্বার বিপদ সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারত এবং নিজের অন্য ভাই সম্পর্কে প্রচারণার কুফল অনুভব করতে পারত, তাহলে অবশ্যই সে লজ্জিত হত এবং বিবেকের কষাঘাতে জর্জরিত হত। তারা যদি আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর আজাব থেকে বাঁচতে চায়, তাহলে কখনও মানুষের ইজ্জত-সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলত না এবং নিজের ভাই সম্পর্কে মন্দ প্রচারের মাধ্যমে আল্লাহর নিষিদ্ধ হারামকে হালাল মনে করত না। যে সকল লোক মোমেনদের মন্দ ও খারাপ কাজের প্রচার পসন্দ করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক আজাবের কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ -

'যারা পসন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জাননা।' (সূরা নূর : ১৯)

যারা অন্যকে অপমান করতে চায় এবং তাদের প্রতি লোকদের আস্থা নষ্ট করতে চায়, তারা লোকদেরকে অপসন্দীয় কষ্ট দিতে চায়। এ জন্য তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তির যোগ্য হবে। আল্লাহ বলেন,

www.amarboi.org

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ـ

'যারা বিনা অপরাধে মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।' (সূরা আহযাব : ৫৮)

তারা বলতে পারে, যারা অন্যায় করে ও ভুলের মধ্যে পা বাড়ায়, আমরা তাদেরকেই শুধু কষ্ট দেই। এদেরকে জিজ্ঞেস করা দরকার, কোন্ মানুষটি ভুল-ত্রুটিমুক্ত? নবী করিম (সা) বলেছেন, كُلُّ بَنِى اٰدَمَ خَطَّاءٌ

'সকল আদম সন্তান ভুল করে।'

তাহলে তারা কাকে কষ্ট দেবে?

ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে কেবলমাত্র আল্লাহর নবী-রাসূলগণই মুক্ত। নবী-রাসূল ছাড়া অবশিষ্ট সব লোকই যে কোন মুহূর্তে ভুল করতে পারে। ত্রুটি অন্বেষণকারীদের আমল বিচার করলে দেখা যাবে, তারা নিজেরাও বহু ত্রুটি করেন। তারা ভাল হলে কখনও অন্য মানুষের ছিদ্রান্বেষণ করতেন না।'

আকাঙ্ক্ষিত বিষয় হল, মুসলামানরা যেন অন্যের ত্রুটি গোপন রাখে, এমনকি ঘৃনিত ও অশ্লীল হলেও। তবে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে তা প্রকাশ করা যাবে।

(১) অশ্লীল কাজ যদি প্রকাশ্যে ও অহংকার সহকারে করে।

(২) প্রকাশ্যে লোকদের সামনে এবং তাদের জ্ঞাতসারেই যদি অশ্লীল কাজ করে।

(৩) অশ্লীল কাজ যদি সম্প্রসারিত হয় এবং যদি বাগাড়ম্বরতা সহকারে হয়।

(৪) জান-মাল ধ্বংসকারী কোন অশ্লীলতা হলে, তখন তা প্রকাশ করা ওয়াজিব।

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِى الدُّنْيَا اِلَّا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'কোন বান্দাহ দুনিয়ায় অন্য কোন বান্দার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখলে আল্লাহও কেয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।' (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেন :

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ.

www.amarboi.org

'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন।' (মুসলিম)

রাসূল (সা) আরও বলেছেন :

مَنْ رَاى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ اَحْيَا مَوْءُوْدَةً.

'যদি কোন ব্যক্তি কারো গোপন বিষয় দেখে তা প্রকাশ না করে, সে যেন জীবন্ত দাফন করা একটি মেয়ে সন্তানকে জীবিত করল।' (মুসলিম)

ইমাম নওয়ী (র) বলেছেন, উল্লেখিত হাদীসে গুণী লোকজনের ত্রুটি গোপন রাখাকে উত্তম বলা হয়েছে। বিশেষ করে যারা সাধারণত কষ্টদান ও গোলযোগ সৃষ্টিতে প্রসিদ্ধ নয়। তবে তাদের বিষয়টিও কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা ভাল, যদি এর মাধ্যমে তাদের কোন ক্ষতির আশংকা না থাকে। কেননা, এদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখলে তারা কষ্টদান, গোলযোগ ও নিষিদ্ধ কাজ করতে আগ্রহী হয়ে উঠবে এবং তা তাদেরকে অন্যদের মত অন্যায় ও গুনাহর কাজে প্রলুব্ধ করবে। এসব বিষয় হল, সংঘটিত ত্রুটির ব্যাপারে যা অতীত হয়ে গেছে। যদি বর্তমানে কোন অন্যায় ও ত্রুটি চলতে দেখে, তাহলে সাথে সাথে তা নিষেধ করতে হবে এবং বিরোধিতায় দেরী করা ঠিক হবে না। যদি বিরোধিতা করার মত ক্ষমতা না থাকে তাহলে, বিপর্যয় সৃষ্টির আশংকা না থাকলে, কর্তৃপক্ষের কাছে তা পেশ করতে হবে।

শেখ মাহদাওয়ী নিজ তাফসীরে লিখেছেন, কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরী করা জায়েয নেই। কোনক্রমে কেউ কারো ত্রুটি দেখে ফেললে তা গোপন রেখে নসীহত ও উপদেশ দিতে হবে এবং আল্লাহভীতি প্রদর্শন করতে হবে। (আল আদাবুশ শারীয়াহ-১ম খণ্ড, ২২৬ পৃঃ)

আবু দাউদ ও নাসাঈ ওকবা বিন আমেরের কর্মচারী জোখাইর আবুল হাইসান থেকে বর্ণনা করেছেন, জোখাইর ওকবাকে বলেন, আমাদের কিছু মদপানকারী প্রতিবেশী আছে। আমি তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য পুলিশ ডাকবো। তিনি বলেন, তা কর না বরং তাদেরকে নসীহত কর এবং হুমকী দাও। তিনি বলেন, আমি তাদেরকে নিষেধ করেছি, কিন্তু তারা বিরত হয় না। তাই আমি তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য পুলিশ ডাকতে চাই। ওকবা বলেন, এরূপ কর না। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি অন্য কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহও দুনিয়া এবং পরকালে তাদের দোষ গোপন রাখবেন।'

www.amarboi.org

হানাদ ও হারেস শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি ওমার বিন খাত্তাবের (রা) কাছে এসে বলল, আমি এক মেয়ে সন্তানকে জাহেলিয়াতের যুগে জীবন্ত দাফন করেছিলাম। কিন্তু তার মৃত্যুর পূর্বে আমরা তাকে কবর থেকে বের করে ফেলেছিলাম।' তারপর সে আমাদের সাথে মুসলমান হয়েছে। মুসলমান হওয়ার পর তার ওপর শরীয়তের শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে। তখন সে ছুরি দিয়ে নিজেকে জবেহ্ করার উদ্যোগ নেয়। আমরা তাকে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করি। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে গলার কিছু রগ কেটে ফেলেছে। আমরা তার চিকিৎসা করি। সে আরোগ্য লাভ করে। তারপর উত্তম তওবা করে। এখন এক সম্প্রদায় থেকে তার বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। আমি তাদেরকে তার অতীতের ঘটনাগুলো অবহিত করি। তখন ওমার বলেন, আল্লাহ্ যা গোপন রেখেছেন তুমি কি তা প্রকাশ করে দিতে চাও? আল্লাহ্র শপথ, তুমি যদি তার সম্পর্কে ঐ সকল কথা কাউকে বল, আমি তোমাকে শহরবাসীর উদ্দেশ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য শাস্তি দেব, বরং তাকে সতী-সাধ্বী নারীর মতই বিয়ে দিয়ে দাও।' (আল-কাঞ্জ)

যেনা-ব্যভিচারে সাক্ষীর সংখ্যা চারের কম হলে, যেনা সম্পর্কিত তথ্য গোপন রাখা ওয়াজিব। বিশেষ করে অপরাধী ব্যক্তি ছাড়া যদি অন্য কোন ব্যক্তি এর সাথে সংশ্লিষ্ট না থাকে, এমতাবস্থায় ঐ খারাপ খবরের প্রচার-প্রসার লজ্জা ও অপমানের বিষয় হবে। যদি ঐ গোপন তথ্য ফাঁস করে দিলে লোকদের মধ্যে বড় ধরনের বিশৃংখলা ও গোলযোগের আশংকা থাকে, যদি এর মাধ্যমে সমাজের উপকারী ব্যক্তির প্রতি লোকদের অনাস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে অথবা অপরাধী যদি নিজ অপরাধের বিষয়ে শরীয়তের ফয়সালা জানতে চায় এবং তা থেকে তওবাহ্ করতে চায়, তখন ঐ দোষ প্রকাশ করা যাবে না।

অনুরূপভাবে অপরাধ করে ফেলার পর তা প্রকাশ করা কিংবা কারো সাথে আলোচনা করা উচিত নয়। যদি কেউ নিজে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে কিংবা নিজের ওপর শাস্তি কার্যকর করার আহ্বান জানায় এবং বিচারকের কাছে নিজেই অপরাধ স্বীকার করে, তখন কেবল তা প্রকাশ করা জায়েয হবে। গুনাহ সম্পর্কে প্রচার করাও গুনাহ। কেননা, তা অন্য মানুষকেও গুনায় উদ্বুদ্ধ করে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

كُلُّ اُمَّتِىْ مُعَافًى اِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ وَاِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ
اَنْ يَّعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ

www.amarboi.org

اللّٰهُ فَيَقُوْلُ يَافُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللّٰهِ عَنْهُ -

'আমার উম্মতের প্রকাশকারীগণ ছাড়া অন্য সবাই ক্ষমাপ্রাপ্ত। যে ব্যক্তি রাত্রে কোন (খারাপ) কাজ করে যা আল্লাহ গোপন রেখেছেন, সে সকালে উঠে বলে, হে অমুক! আমি রাত্রে এটা-ওটা করেছি। যেখানে আল্লাহ রাত্রে তা গোপন রাখলেন, কিন্তু সে সকালে আল্লাহর গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়, ঐ ব্যক্তিও প্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত।' (বোখারী, মুসলিম)

হাদীসটির অর্থ হল, আল্লাহ গুনাহগারের গুনাহ ক্ষমা করেন এবং সে জন্য তাকে পাকড়াও করবেন না। তবে কেউ সে গুনাহ ফাঁস করলে কিংবা অন্য কারো কাছে বলে বেড়ালে তাকে ক্ষমা করবেন না।

ইমাম নববী (র) বলেছেন :

'যে ব্যক্তি নিজ গুনাহ ও বেদআত প্রকাশ করে তার সে গুনাহ কিংবা বেদআত অন্য কারো প্রকাশ করে দেয়া জায়েয আছে। কেননা, সে নিজেই নিজের দোষ প্রকাশ করেছে।'

ইবনে বাত্তাল বলেছেন, গুনাহর কাজ প্রকাশ করা কিংবা বলে বেড়ানো আল্লাহ, তাঁর রাসূলের এবং নেক মোমেনদের অধিকারকে হালকা করার নামান্তর। এটা তাদের প্রতি এক ধরনের বিরোধিতা। দোষ গোপন রাখার মাধ্যমে উপরোক্ত অধিকারকে নিরাপদ রাখা যায়। অপরাধ গুনাহগারকে অপমান করে। কেউ আল্লাহর অধিকার নষ্ট করতে পারে না। তিনি সর্বাধিক সম্মানিত দয়াশীল। তাঁর দয়া ক্রোধের ওপর বিজয়ী। তিনি যদি দুনিয়ায় কারো দোষ গোপন রাখেন, তাহলে পরকালে তা প্রকাশ করবেন না। যে ব্যক্তি নিজ গুনাহ ও দোষ প্রকাশ করে বেড়ায়, সে দুনিয়া ও আখেরাতে সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে, কারো দোষ প্রকাশ করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত, যদিও সে দোষ সত্য হোকনা কেন। (ফতহুল বারী, ১০ম খন্ড, ৪০৫ পৃঃ, সংক্ষেপিত)

ওয়াদা-অঙ্গীকার ও চুক্তি পূরণ করা

ওয়াদা-অঙ্গীকার বলতে বুঝায়, ওয়াদাকারীর কোন বিষয়ে নিজ প্রতিশ্রুতি পূরণ করা। আর চুক্তি পূরণের অর্থ হল, দুই পক্ষ কোন বিষয়ে অঙ্গীকার ও চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। চুক্তির ভিত্তি হল, ওয়াদা।

www.amarboi.org

এ দু'টোর মধ্যে পার্থক্য হল, ওয়াদা সাধারণত এক পক্ষ থেকে হয়, আর চুক্তি হয় দু'পক্ষের মধ্যে।

প্রতিশ্রুতি পূরণ করা মানবিক চরিত্র, সামাজিক দাবী এবং আল্লাহর নির্দেশ। কোরআন ও হাদীসে ওয়াদা ও চুক্তি পূরণের লক্ষ্যে বহু স্থানে তাকিদ এসেছে। আল্লাহ বলেন,

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُّمْ -

'তোমরা যখন কোন ওয়াদা-অঙ্গীকার কর, তা পূরণ কর।' (সূরা নাহল : ৯১)

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً -

তোমরা প্রতিশ্রুতি পূরণ কর। নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' (সূরা বনি ইসরাঈল : ৩৪)

ইবনুল জাওযী নিজ তাফসীর 'যাদুল মাসীরে' লিখেছেন, সেই অঙ্গীকার পূরণ করা ওয়াজিব যা করা উত্তম। কেউ অঙ্গীকার করলে তাকে তা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। আল্লামা যাজ্জাজ বলেছেন, আল্লাহর সকল আদেশ-নিষেধ অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ -

'হে মোমেনগণ! চুক্তি পূরণ কর।' (সূরা মায়েদা : ১)

ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ প্রমুখ বলেছেন : এখানে 'উকূদ' বলতে চুক্তি ও অঙ্গীকার বুঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর বলেছেন, এ অর্থের ব্যাপারে 'ইজমা' বা সকলের মতৈক্য রয়েছে। তিনি আরও বলেন, এ সকল চুক্তির মধ্যে কসমভিত্তিক চুক্তিসহ অন্যান্য চুক্তিও রয়েছে।

ইসলামে চুক্তি ও অঙ্গীকারের গুরুত্ব এ পর্যায়ে পৌছেছে যে, কোন সরকারের সাথে যদি শত্রুদের চুক্তি থাকে এবং তারা তা লংঘন করে, তাহলে তাদেরকে চুক্তির কার্যকারিতা শেষ হবার বিষয়টি জানিয়ে দিতে হবে। অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। শত্রুকে জানানোর আগে তার বিরুদ্ধে আক্রমণ করা যাবে না। যাতে করে তিনি চুক্তি ভঙ্গকারী হিসেবে বিবেচিত না হন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :

www.amarboi.org

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ.

'আপনি যদি কোন সম্প্রদায়ের কাছ থেকে চুক্তি ভঙ্গের আশংকা করেন, তাহলে চুক্তি তাদের দিকেই সমানভাবে নিক্ষেপ করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসঘাতককে পছন্দ করেন না। (সূরা আনফাল : ৫৮)

আল্লাহ ওয়াদা পূরণ করায় হযরত ইসমাঈল (আ)-এর প্রশংসা করে বলেছেন,

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِسْمَاعِيْلَ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلاً نَّبِيًّا.

'আপনি কোরআন থেকে ইসমাঈলের কথা উল্লেখ করুন। তিনি ছিলেন ওয়াদা পূরণকারী এবং নবী ও রাসূল।' (সূরা মরিয়ম : ৫৪)

শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতীত প্রতিশ্রুতি পূরণ না করা হারাম এবং তা বিশ্বাস ঘাতকতা হিসেবে বিবেচিত। আর তা কোন মুসলমানের জন্য শোভনীয় নয়।

ওয়াদা ও চুক্তি লংঘনের ধরন বহু। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, লোকদের মধ্যে তা ব্যাপক হারে ঘটে থাকে। যেমন-স্বামী স্ত্রীর অধিকার পূরণে অবহেলা করে কিংবা তাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত কাবিন নামার সুযোগের অসদ্ব্যবহার করে, তার ওপর জুলুম করে। তালাক শব্দ দ্বারা কিংবা বিচারক জুলুমের অবসানের লক্ষ্যে বিয়ে বাতিল করে দিতে পারেন। অনুরূপভাবে, কেউ কোন শ্রমিককে দিয়ে কাজ আদায় করার পর তার সাথে চুক্তিকৃত পারিশ্রমিক পরিশোধ করে না, অনেক বন্ধু অন্য বন্ধুর সাথে চুক্তি করে তা ভঙ্গ করে, অনেক ধনী ঋণ গ্রহীতা ঋণ দাতার ঋণ পরিশোধের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও তালবাহানা করে। নিম্নোক্ত হাদীস উপরোক্ত সকল ওয়াদা খেলাফ ও চুক্তিভঙ্গের বিরুদ্ধে সতর্ক ঘন্টা। আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন :

ثَلاَثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اَسْتَأْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ اَجْرَهُ.

'আমি হাশরের দিন তিন ব্যক্তির পক্ষ থেকে বাদী হব। ১. যে ব্যক্তি আমার নামে শপথ করে কোন বিষয়ে চুক্তি করার পর তা ভঙ্গ করে। ২. যে ব্যক্তি কোন

www.amarboi.org

স্বাধীন লোককে বিক্রি করে এর মূল্য খায় এবং ৩. যে ব্যক্তি কোন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করার পর তার থেকে কাজ আদায় করা সত্ত্বেও তার পারিশ্রমিক না দেয়।' (বোখারী, মুসলিম)

আল্লামা সানআনী বলেছেন, ওয়াদা খেলাফ, বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তিভঙ্গ সর্বসম্মতভাবে হারাম।

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ -

'যার আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই এবং সে ব্যক্তির দীনদারী নেই, যে ওয়াদা ও চুক্তিভঙ্গ করে।' (আহমদ, ইবনু হিব্বান, সুয়ূতী)

একদল আলেমের মতে, ওয়াদা যদি কোন নিষিদ্ধ বা হারাম বিষয় না হয় তাহলে, তা পূরণ করা ফরজ। অপরদিকে ইমাম শাফেঈ, আবু হানিফা এবং অধিকাংশ আলেমের মতে, তা মোস্তাহাব। তাদের দলীল হল, ওয়াদা দান বা হেবার মত। অধিকাংশ আলেমের মতে, হস্তগত হওয়ার আগ পর্যন্ত হেবা বাধ্যতামূলক নয়। (আল-আজকার-ইমাম নববী-২৮২ পৃঃ সংক্ষেপিত)

এটা হল, সে ব্যক্তির জন্য যে পূরণ করার নিয়তে ওয়াদা করে। যে ব্যক্তি পূরণ না করার নিয়তে ওয়াদা করে, ইমাম গাজালীর মতে, সেটা হচ্ছে মুনাফেকী। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

ثَلاَثَةٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَاِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ، اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا ائْتُمِنَ خَانَ -

'যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি অভ্যাস আছে সে মুনাফিক যদিও সে নামাজ-রোজা করে এবং নিজেকে মুসলমান হিসেবে ভাবে। ১. যখন কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে; ২. যখন ওয়াদা করে, তা খেলাপ করে এবং ৩. যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, তখন খেয়ানত করে।' (বোখারী, মুসলিম)

ইমাম গাজালীর মতে, এ হাদীস সে ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য যে, পূরণ না করার নিয়তে কিংবা কোন ওজর ছাড়াই ওয়াদা পূরণ না করে। তবে, যে ব্যক্তি ওয়াদা পূরণের নিয়ত করে কিন্তু কোন ওজরের কারণে তা পূরণ করতে পারে না, সে

www.amarboi.org

মুনাফিক হবে না। ইমাম গাজালীর মতানুযায়ী,ওয়াদা পূরণ করা ফরজ। কেননা, তা পূরণের লক্ষ্যে হাদীস ও কোরআনের নির্দেশ পালন করলে অন্তরে প্রশান্তি আসবে। বিশেষ করে ওয়াদা যদি কোন দ্বীন ও সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হয়ে থাকে। যেমন, যদি কাউকে কোন নিষিদ্ধ কাজ দূর করার, কাউকে দ্বীনি শিক্ষা দেয়ার, কোন অভাবী লোককে সাহায্য করার কিংবা কাউকে তার জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় বিষয় পূরণ করার ওয়াদা করে, তখন তা পূরণ করা জরুরী।

দুর্বলের প্রতি দয়া, ছোটদের প্রতি মায়া এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন :

যে মুসলমানের বুঝ পরিপক্ক হয়েছে এবং ইসলামের মূলনীতি দ্বারা সত্যিকারভাবে প্রভাবিত হয়েছে, সে মুসলমানকে সকল আচরণে ইসলামী, মানবিক, লেন-দেনে দয়ালু ও সমাজ জীবনে বিনম্র দেখতে পাওয়া যায়। তিনি সকল কিছুকে ইসলামের মানদণ্ডে মাপেন যদিও কদাচিত বিবেক তার সাথে সাড়া না দেয় এবং সে কুপ্রবৃত্তির লোভ-লালসার বিরুদ্ধে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। সে ছোট, দুর্বল ও অভাবী মানুষের প্রতি দয়ার সাগর এবং আল্লাহর অভাবী সৃষ্টির প্রতি স্নেহ মমতার আধার। সে ব্যক্তি উত্তম, যার মধ্যে দয়ামায়ার এ গুণ বেশী। তার এহেন মানবতা ঈমানের আলোয় আলোকিত, ইসলামের মানব কল্যাণ ও দয়ার গুণে ভূষিত এবং রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্যের রসে সিঞ্চিত। কোরআন ও হাদীস সামাজিক আচরণের মূলনীতি নির্ধারণ করেছে। এর মধ্যে আছে দুর্বল, মিসকীন ও বিপদগ্রস্ত লোকের প্রতি দয়া, ছোটদের প্রতি স্নেহ-মায়া এবং বয়স, মর্যাদা ও ইসলামের দৃষ্টিতে যারা বড়, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন :

فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلاَ تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ ـ

'অতঃপর ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না এবং সাহায্যপ্রার্থীকে ধমক দেবেন না।' (সূরা দোহা : ৯-১০)

আল্লাহ্ আরও বলেন :

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ

www.amarboi.org

زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا.

'আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছে, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। (সূরা কাহাফ : ২৮)

ইবনে কাসীর এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন : 'আপনি তাদের সাথে বসুন, যারা আল্লাহর জিক্‌র করে, কলেমা পড়ে, হামদ তাসবীহ ও তাকবীর পাঠ করে, যারা সকাল-সন্ধ্যায় সর্বদা রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে সওয়াল করে, চাই তারা ধনী ও গরীব হোক কিংবা শক্তিশালী ও দুর্বল হোক।' এ আয়াতের শানে নুজুল সম্পর্কে বলা হয়েছে, কোরাইশ বংশের গণ্য-মান্য ব্যক্তিরা শুধুমাত্র তাদের সাথে বসার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছিল, তিনি যেন বেলাল, আম্মার, সোহাইব, খাব্বাব এবং ইবনে মাসউদের মত অসহায় গরীব-দুর্বল মানুষের সাথে না১৯১১৯০ন্ডতন। বরং তাদেরকে নিয়ে পৃথকভাবে বসার আহ্বান জানালে আল্লাহ নিজ নবীকে তা করতে নিষেধ করেন।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اَلسَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَاَحْسَبُهُ قَالَ : وَكَالْقَائِمِ الَّذِىْ لَايَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ الَّذِىْ لَايُفْطِرُ.

'বিধবা ও মিসকীনের সাহায্যকারী আল্লাহর পথের মুজাহিদের ন্যায়। রাবী বলেন, আমার ধারণা তিনি এও বলেছেন, ঐ ব্যক্তি সে নামাজীর মত যে সর্বদা নামাজ পড়ে, কিন্তু ক্লান্ত হয় না এবং সে রোজাদারের মত যিনি কখনও রোজা ভংগ করেন না।' (বোখারী ও মুসলিম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

www.amarboi.org

بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى اِلَيْهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ.

'সেই বিয়ে অনুষ্ঠানের খাবার কতইনা নিকৃষ্ট যে অনুষ্ঠানে শুধু ধনীদের দাওয়াত দেয়া হয় এবং গরীবদেরকে বাদ দেয়া হয়।' (বোখারী, মুসলিম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) আলীর (রা) ছেলে হাসানকে চুমু খান। সেখানে আকরা' বিন হাবেস উপস্থিত ছিলেন। আকরা' বলেন, আমার ১০জন সন্তান আছে। আমি কখনও তাদেরকে চুমু খাইনি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দিকে তাকান এবং বলেন, مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ 'যে ব্যক্তি দয়া করে না, সে দয়া পায় না।' (বোখারী, মুসলিম)

আবু কাতাদাহ হারেস বিন রেবঈ' থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'আমি যখন নামাজে দাঁড়াই, তখন তা দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছা করি। কিন্তু যখন আমি শিশুদের কান্না শুনতে পাই, তখন নামাজ সংক্ষেপ করি যেন সন্তানের মায়েদের কষ্ট না হয়।' (বোখারী)

রাসূলুল্লাহ (সা) নামাজের মধ্যে শিশু উমামাকে কাঁধে রেখে নামাজ পড়তেন। উমামা তাঁর কন্যা যয়নবের মেয়ে সন্তান ছিল।

রাসূলুল্লাহর (সা) নাতীদ্বয় হাসান-হোসেন, তিনি সাজদায় গেলে তারা তাঁর পিঠে আরোহণ করত। তারা যেন বিরক্ত না হয় সেজন্য তিনি দীর্ঘ সাজদায় থাকতেন এবং তিনি তখন অন্যান্য মুসল্লীদের ইমামতি করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) সফর থেকে মদীনা ফিরে আসলে শিশুরা দৌড়ে তাঁর কাছে আসত। তিনি তখন তাদেরকে সামনে এবং পেছনে সওয়ারীতে আরোহণ করাতেন।

কোন কোন সময় মহিলারা শিশুকে বরকতপূর্ণ দোয়ার জন্য নিয়ে আসলে তিনি তাদেরকে কোলে নিতেন। শিশুরা কোলে প্রস্রাব করে দিলে মায়েরা অস্বস্তিবোধ করত এবং অনুরোধ জানাত, যেন তিনি তাদেরকে কাপড় দিয়ে দেন, তারা ধুয়ে দেবে। কিন্তু তিনি তাদেরকে কাপড় না দিয়ে তাতে পানির ছিঁটা দিতেন। এভাবে তিনি মায়ের দায়িত্ব হালকা করে দিতেন।

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) শিশু, মা, গরীব, মিসকীন ও দুর্বল মোমেনদের প্রতি দয়ালু ছিলেন। কেউ রাসূলের জীবনী পড়লে দেখতে পাবে, তাঁর চরিত্র ও ব্যবহার কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের অনুরূপ :

www.amarboi.org

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ الرَّحِيْمُ.

'তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল এসেছেন। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মোমেনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াময়।'

আল্লাহ তাঁকে মনোনীত করেছেন, প্রতিপালন করেছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি তাঁর চরিত্রকে পরিপূর্ণ করেছেন, তাঁকে গোটা বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন আর বিশ্বের সকল মানুষকে তাঁর জীবনের সকল আচরণ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

বড় এবং জ্ঞানী-গুণীদেরকে সম্মান করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সবার চাইতে অগ্রগামী। এ ব্যাপারে এতটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি ছোটদেরকে স্নেহ ও বড়দেরকে সম্মান না করলে তাদের বিষয়ে দায়মুক্ত এবং তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। তিনি তাদের কোন মর্যাদাই দেননি।

তিনি বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيْرِنَا.

'সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয় যে, ছোটদেরকে স্নেহ এবং বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়।' (ইমাম নববীর মতে, হাদীসটি সহীহ। আবু দাউদ ও তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী এটাকে হাসান-সহীহ হাদীস বলেছেন)

রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কেরামের এহেন আচরণ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন যেন প্রত্যেক জ্ঞানী-গুণী ও বয়স্ক লোককে সম্মান করা হয়। এটা রাষ্ট্রের বৃহত্তর নেতৃত্ব থেকে শুরু করে ছোট দায়িত্ব এবং নামাজের ইমামতিসহ সামাজিক আচরণ পর্যন্ত বিস্তৃত।

রাসূলুল্লাহ (সা) গুরুত্বপূর্ণ কাজে আবু বকর (রা) কে সামনে রাখতেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বলেছেন, কাউকে বন্ধু বানালে তিনি আবু বকরকেই বন্ধু বানাতেন। তাঁর অসুস্থতার সময় আবু বকরকে নামাজের ইমামতি দিয়েছিলেন। তিনি যখন নামাজে ওমারের আওয়াজ শুনলেন তখন বারবার একথা বলতে লাগলেন, 'আল্লাহ এবং মোমেনগণ তা গ্রহণ করবেন না।' অথচ ওমার আবু বকরের (রা) অনুপস্থিতিতেই নামাজ পড়িয়েছিলেন। একবার আবু বকর (রা)

www.amarboi.org

অনুপস্থিত থাকায় রাসূলুল্লাহ (সা) বেলাল (রা)কে নামাজ পড়াবার আদেশ দেন। তিনি নিজে গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। এছাড়াও তিনি তাঁর সরাসরি পেছনে জ্ঞানী-গুণী লোকদেরকে দাঁড়ানোর জন্য উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন :

لِيَلِيَنِى مِنْكُمْ أُولُوا الْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ -

'আমার পেছনে দাঁড়াবে জ্ঞানী-গুণী লোকেরা, তারপর অপেক্ষাকৃত কম জ্ঞানী-গুণীরা, এরপর অপেক্ষাকৃত আরও কম জ্ঞানী লোকেরা'।

রাসূলুল্লাহ (সা) নামাজের ইমামতির ব্যাপারে বলেছেন :

يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَءُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ كَانُوْا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنْ كَانُوْا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلَايُؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِىْ سُلْطَانِهِ وَلَايَقْعُدْ فِيْ بَيْتِهِ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ -

'সেই ব্যক্তিই সম্প্রদায়ের ইমামতি করবে, যে আল্লাহর কিতাব-কোরআন অধিকতর ভাল পড়তে পারে। কেরাআতে সমান সমান হলে, হাদীস সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানী-ব্যক্তি ইমামতি করবে। হাদীসে সমান হলে, আগে হিজরতকারী ব্যক্তি ইমামতি করবে। হিজরতে বরাবর হলে, অধিকতর বয়স্ক ব্যক্তি ইমামতি করবে। কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীন স্থানে ইমামতি করবে না এবং অনুমতি ব্যতীত কারো ঘরের আসবাবপত্রে বসবে না।' (মুসলিম)

এই হাদীসে জ্ঞানী-গুণী লোকের মর্যাদা এবং অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে গিয়ে বসা কিংবা ইমামতি করতে নিষেধ করা হয়েছে।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত। আবদুর রহমান বিন সাহল এবং মাসউদের দুই সন্তান, মোহাইসা ও হোআইসা এ তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এক হত্যা মামলার ব্যাপারে যান। আবদুর রহমান ছিল বয়সে ছোট। সে কথা বলা শুরু করলে রাসূলুল্লাহর (সা) বলেন, كَبِّرْ كَبِّرْ 'বড়রা কথা বলুক।' তখন তিনি চুপ হয়ে যান। পরে বয়স্ক দু'ব্যক্তি কথা বলেন।'

www.amarboi.org

আবদুল্লাহ বিন ওমার থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

أَرَانِيْ فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَاءَنِيْ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ، فَقِيْلَ لِيْ كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا.

'আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি মেসওয়াক করছি। আমার কাছে দু'ব্যক্তি আসল। একজন বয়সে অন্যজন থেকে বড়। আমি ছোট ব্যক্তিটিকে মেসওয়াকটি দিলাম। তখন আমাকে বলা হল, বয়স্ক লোকটিকে মেসওয়াকটি দিন। তখন আমি বয়স্ক লোকটিকে মেসওয়াকটি দিলাম।' (মুসলিম)

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ওহোদ দিবসে শহীদানে ওহোদের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তিকে একত্র করে জিজ্ঞেস করেছেন, তাদের মধ্যে কে অধিকতর কোরআন শিখেছে? যে ব্যক্তির প্রতি অধিক কোরআন শিক্ষার ইঙ্গিত দেয়া হত, তাঁকেই তিনি আগে কবরে শোয়াতেন। (বোখারী)

আবু সাঈদ সামরা বিন জুনদাব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সময়ে বালক ছিলাম এবং তাঁর কাছে কোরআন মুখস্থ করতাম। কিন্তু আমার থেকে বয়স্ক লোকদের কারণে আমি কথা বলা থেকে বিরত থাকতাম।' (বোখারী, মুসলিম) অর্থাৎ বাল্যকালে, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে কোরআন, হাদীস ও দ্বীন শিক্ষা গ্রহণ করে ফতোয়া দেয়ার যোগ্যতা সত্ত্বেও বয়স্ক লোকদের সামনে মুখ খুলতেন না। এটা তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য। অন্যথায়, ওয়াজিব জ্ঞানের কথা অবশ্যই মুখ খুলে বলতে হবে।

আমরা জানি যে, মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে উত্তম আদব শিক্ষা দিয়েছেন। তাই মানবিক লেন-দেন ও আচরণে রুচির ব্যবহার অন্যতম ইসলামী নীতি। যে ব্যক্তি এ তওফীক থেকে বঞ্চিত, সে কেবল এই মানবিক রুচিবোধ থেকে দূরে অবস্থান করতে পারে।

অনেক আলেম দ্বীনের ব্যাপারে কঠোর। কিন্তু দ্বীন তার এই কঠোরতা থেকে মুক্ত। বয়সে ছোট বহু লোক বয়স্ক মুরুব্বীদেরকে অজ্ঞতাবশতঃ কষ্ট দেয়, আর বলে, আমি সত্য কথা বলছি, কিংবা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহর পুনর্জীবনের জন্য কাজ করছি। কিন্তু সে জানে না, হয়তো সে একটা সুন্নাতকে পুনর্জীবিত

www.amarboi.org

করতে গিয়ে আরেকটা ওয়াজিবকে হত্যা করেছে কিংবা সে কোন মোস্তাহাব পালনের ওপর কঠোরতা আরোপ করেছে। অথচ নিজে কোন হারামের মধ্যে ডুবে আছে।

কত লোক নামধারী মুসলমানদেরকে দেখে এ দ্বীন থেকে সরে গেছে এবং কত লোক কঠোরতা প্রদর্শনকারীদেরকে দেখে এই দ্বীনকে ঘৃণা করেছে! আল্লাহ মুসলমানদেরকে উপযুক্ত বুঝ-জ্ঞান, রুচি ও আদব-শিষ্টাচারের তওফীক দিন। আমীন।

এখন আমরা এমন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যে সম্পর্কে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকম চিন্তাধারা বিদ্যমান। সেগুলো হল :

১. প্রবেশকারী ও আগন্তুকের সম্মানে দাঁড়ানো

এ বিষয়ে বহু বক্তব্য আছে এবং বিভিন্ন পরিবেশ ও ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে তাতে অনেক মতভেদ আছে।

মানুষ যদি বিষয়টিকে সহজভাবে কিংবা অকৃত্রিমভাবে গ্রহণ করত, তাহলে তারা কোন সমস্যার সম্মুখীন হত না। যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও অনুরূপ শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু লোকেরা উল্টো কঠোরতা অবলম্বনসহ এমন সব বিষয় গ্রহণ করেছে, যা মোটেই সম্মানিত নয়। এরপর সেগুলোর শরীয়তসম্মত যুক্তি ও কারণ প্রদর্শনের চেষ্টা করেছে কিংবা এ বিষয়ে শরীয়তের হুকুম কি তা জানার উদ্যোগ নিয়েছে। এ বিষয়ে বড় বড় মনীষীদের অনেকেই কলম ধরেছেন। যেমন, ইবনে হাজার আসকালানী, ইবনুল হাজ্জ, ইমাম নববী, খাত্তাবী, ইবনুল কাইয়্যেম, ইবনে মোফলেহ আল-মাকদেসী এবং ইমাম গাজালী (র) প্রমুখ। তাদের কথার সারাংশ হল, অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়ে যেমন মতৈক্য আছে, তেমনি মতভেদও আছে।

নিষিদ্ধ দাঁড়ানো

পাপী, জালেম ও শক্তিধরদের সম্মানে দাঁড়ানো সর্বসম্মতভাবে নিষিদ্ধ। চাই তারা প্রবেশ করুক, বা বিদায় নিক অথবা তাদের বসা অবস্থায় তাদের চারপাশে অন্যদের দাঁড়িয়ে থাকার মুহূর্তে দাঁড়ানো জায়েয নেই। অনুরূপভাবে, যে অহংকারবশতঃ অন্যের দাঁড়ানোর মাধ্যমে সম্মান কামনা করে, অথবা যার জন্য দাঁড়ালে পরে তা তার গর্বের কারণ হবার আশংকা থাকে, সে সকল ব্যক্তির জন্যও দাঁড়ানো যাবে না।

www.amarboi.org

ইবনে কাইয়্যেম এ সকল অবস্থায় দাঁড়ানোকে হারাম বলেছেন। আর ইমাম গাজালীর মতে, তা মাকরূহ। তবে শর্ত হল, যদি না দাঁড়ানোর ফলে মারাত্মক ক্ষতি না হয়। কিন্তু যদি না দাঁড়ানোর কারণে শত্রুতা, ষড়যন্ত্র, সম্পর্কচ্ছেদ, জুলুম-নির্যাতন এবং শাস্তির আশংকা থাকে, তখন দাঁড়ানো জায়েয। কেউ কেউ এ জাতীয় মুহূর্তে দাঁড়ানোকে ওয়াজিবও বলেছেন। যেমন, এজ্জু বিন আবদুস সালাম প্রমুখ।

নিষিদ্ধ দাঁড়ানোর পক্ষে প্রমাণ হচ্ছে :

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েছি। তিনি বসে নামাজ পড়িয়েছেন। আবু বকর (রা) মোকাব্বের হিসেবে লোকদের উদ্দেশ্যে বড় করে তাকবীর বলেছেন। তখন তিনি আমাদের দিকে তাকান। আমরা তখন দাঁড়ানো ছিলাম। তারপর তিনি আমাদেরকে বসতে ইশারা দেন, আমরা বসে বসে তাঁর সাথে নামাজ পড়ি। তিনি সালাম ফিরিয়ে বলেন, তোমরা প্রথমে পারস্য ও রোমবাসীদের মত করছিলে, তারা তাদের বাদশাহদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত, আর বাদশাহরা বসে থাকত। তোমরা এরূপ করো না।' (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে বসা অবস্থায় তাঁর পেছনে সাহাবায়ে কেরামের দাঁড়িয়ে থাকাকে পছন্দ করেননি। শুধু তাই নয়, তিনি পারস্য ও রোমবাসীদের সাথে সাহাবায়ে কেরামের সাদৃশ্যকেও অপছন্দ করেছেন। জানা কথা যে, পারস্য ও রোমবাসীরা নামাজ কিংবা কোন উপাসনা ছাড়াই এরূপ করত। রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কেরামকে ঐ রকম নিকৃষ্ট ধরনের দাঁড়ানো থেকে বারণ করেছেন। সকল মুসলমানই সম্মানিত। শাসক তাদেরই এক ব্যক্তি যার প্রতি ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। এ কারণে তিনি অন্যদেরকে অপমান কিংবা লাঞ্ছনার অধিকার রাখেন না।

আবু মাজলাম থেকে বর্ণিত। মুয়াবিয়া (রা) আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের এবং ইবনে আমেরের কাছে গেলেন। ইবনে আ'মের দাঁড়িয়ে গেল এবং আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের বসে থাকলেন। তখন মুয়াবিয়া (রা) ইবনে আমেরকে বলেন, বসুন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি,

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالِ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

www.amarboi.org

'কোন ব্যক্তি যদি একথা পছন্দ করে যে, অন্য লোকেরা তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাক, সে যেন দোজখে নিজের ঠিকানা লিখে রাখে।' (তিরমিযী)

প্রথম হাদীস বসা লোকের জন্য দাঁড়ানো এবং দ্বিতীয় হাদীস অন্যরা দাঁড়িয়ে কাউকে সম্মান করুক এ বিষয়টিকে নিষেধ করেছে। আর তা কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো যে হারাম তার প্রমাণ। কেননা, মাকরূহ বিষয়ে আজাব হবে না।

এ দুটো হাদীসে প্রবেশকারী কিংবা আগন্তুকের সম্মানে দাঁড়ানোকে নিষেধ করা হয়নি। তা সত্ত্বেও ওলামায়ে কেরামের মতে, জালেম, পাপী ও শক্তিধর লোকেরা অপমান, তিরস্কার ও বয়কটের যোগ্য। তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করা জায়েয নেই। তবে তাদের পক্ষ থেকে ক্ষতি, বিপদ কিংবা কঠোর দুর্যোগের আশংকা থাকলে তা থেকে বাঁচার জন্য সম্মান প্রদর্শন করা যেতে পারে।

বৈধ দাঁড়ানো

যে দাঁড়ানো বৈধ কিংবা মুস্তাহাব-তবে মোস্তাহাব হবার সম্ভাবনাই অধিক- তা হল : অভিনন্দন জানানো, শোক প্রকাশ করা, আলিঙ্গন করা, মোসাফাহা করা, বৈঠকে স্থান করে দেয়া এবং রোগীকে সাহায্য করার জন্য দাঁড়ানো ইত্যাদি। ইবনুল মোফলেহ বলেছেন : কোন উপকার ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো মোস্তাহাব। যেমন, বাইআতের সময় মাকাল বিন ইয়াসার রাসূলুল্লাহর (সা) মাথার ওপর থেকে গাছের একটি ডাল ওপরে তুলে ধরেছিলেন কিংবা আবু বকর (রা) তাঁকে দাঁড়িয়ে ছায়া দিচ্ছিলেন।

ইমাম মালেক (র)কে স্বামীর প্রতি অত্যধিক সম্মান প্রদর্শনকারিণী এক স্ত্রী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় যে, সেই স্ত্রী স্বামীর সাথে সাক্ষাত করেন, তার কাপড় খুলে দেন এবং স্বামী বসার আগ পর্যন্ত নিজে বসেন না। তখন ইমাম মালেক জবাব দেন, সাক্ষাত করার মধ্যে কোন ত্রুটি নেই। তবে স্বামীর বসার আগ পর্যন্ত স্ত্রীর দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। কেননা, এতটা জালেমদের কাজ। ওমার বিন আবদুল আযীয (র) তা অপছন্দ করেছেন। (ফাতহুল বারী, ১১ খণ্ড, ৪৩ পৃঃ)

ওলামায়ে কেরাম বৈধ দাঁড়ানোর পক্ষে কিছু দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে :

বোখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে, নবী (সা) যখন বনি কোরাইজার ব্যাপারে হযরত সা'দ বিন মোআ'জকে শালিস নিযুক্ত করেন, তখন তিনি আহত ছিলেন এবং গাধার ওপর আরোহণ করে তাদের কাছে আসেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

www.amarboi.org

قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ.

‘তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানে দাঁড়াও।’

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, যখন আল্লাহ্ কা'ব বিন মালেকের তওবা কবুল করলেন এবং নবী (সা) বিষয়টি লোকদেরকে জানিয়ে দিলেন, তখন লোকেরা কা'ব ও তাঁর দুই সাথীকে সুসংবাদ জানানোর জন্য যান। এক ব্যক্তি ঘোড়ায় আরোহণ করে রওনা দেন আর অন্য এক ব্যক্তি পাহাড়ের ওপর ওঠেন। তার আওয়াজ অশ্বারোহীর আগেই দ্রুত পৌঁছে গেল। তিনি কা'বকে আল্লাহর কাছে তাঁর তওবা কবুলের সুসংবাদ দিলেন। কা'ব বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গেলাম। লোকেরা দলে দলে আমার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং অভিনন্দন জানালেন। তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ আপনার তওবা কবুল করায় মোবারকবাদ, আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে বসা। তাঁর পাশে আরও একজন বসা। তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ দ্রুত দাঁড়িয়ে আমার সাথে হাত মিলালেন এবং অভিনন্দন জানালেন। আল্লাহর শপথ, তিনি ছাড়া মোহাজিরদের মধ্যে আর কেউ আমার জন্য দাঁড়ায়নি। কাব কখনও তালহার এ মহানুভবতা ভুলতে পারেননি।

আয়েশা বিনতে তালহা উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা) বলেন আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কথাবার্তা ও চুপ থাকার বিষয়ে ফাতেমার চাইতে অন্য কাউকে অধিকতর সদৃশ পাইনি। ফাতেমা (রা) যখন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে যেতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়িয়ে যেতেন, তার হাত ধরে তাকে চুমু খেতেন এবং তাকে নিজ আসনে বসাতেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ফাতেমার কাছে যেতেন, ফাতেমা দাঁড়াতেন, রাসূলুল্লাহর (সা) হাত ধরে তাকে চুমু খেতেন এবং তাকে নিজ আসনে বসাতেন। (তিরমিযী, নাসাঈ) হাদীসের সনদ সহীহ্। তবে তিরমিযী এ সনদকে গরীব বলেছেন)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘যায়েদ বিন হারেস মদীনা প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আমার ঘরে ছিলেন। তিনি দরজায় আওয়াজ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) খালি গায়ে কাপড় টেনে টেনে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। আল্লাহর কসম, আমি তাঁকে এর আগে ও পরে আর কখনও খালি গায়ে দেখিনি। তিনি তার সাথে আলিঙ্গন করলেন এবং চুমু খেলেন। (তিরমিযী এটাকে হাসান হাদীস বলেছেন।)

www.amarboi.org

তাঁরা নিম্নোক্ত ঘটনার মাধ্যমেও প্রমাণ পেশ করেন যে, যখন একরামা বিন আবু জাহল মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে আসেন, তখন তিনি খুশীতে চাদরবিহীন অবস্থায় তার দিকে দৌড়ে যান।

আরেক ঘটনা হল, জাফর বিন আবি তালেব ইথিওপিয়া থেকে আসলে নবী (সা) তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, "আমি জানি না, আমি জা'ফরের আগমনে বেশী খুশী, না খায়বারের বিজয়ে।"

উপরোক্ত প্রমাণসমূহ বৈধ ও ভাল দাঁড়ানোর পক্ষে যুক্তি। অনুরূপভাবে, হাত মিলানোর উদ্দেশ্যেও দাঁড়ানো যায়। দীনের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা আরোপ করায় ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই।

মতবিরোধপূর্ণ দাঁড়ানো

ন্যায়পরায়ণ নেতা, মাতা-পিতা, আলেম, বুজুর্গ লোক, সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যক্তিসহ যারা সম্মান ও মর্যাদার যোগ্য, তাদের প্রবেশ ও প্রস্থান এবং দেখা মাত্র দাঁড়ানো জায়েয। কেউ কেউ এটাকে মোস্তাহাবও বলেছেন। একদলের মতে তা মাকরূহ। যারা একে জায়েয বা মোস্তাহাব বলেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আবু জাকারিয়া নাওয়াঈ, আবু দাউদ, ইবনু কোতাইবা, বায়হাকী, খাত্তাবী, মুসলিম, আবু যারআ', আবু বকর বিন আবু আ'সেম, খাতীব, আবু মোহাম্মদ বাগাওয়ী, হাফেজ আবু মুসা মাদীনী, ইবনু আবদিল বার, ইবনু বাত্তাল, তাবারী ও বোখারী প্রমুখ।

যারা এ জাতীয় দাঁড়ানোর বিরোধিতা করেছেন। তারা হলেন, ইমাম মালেক, ইবনু হাজার এবং ইবনুল হাজ্জ। ইমাম আহমদের এক বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি এর বিরোধিতা করেছেন। তবে আরেক বর্ণনা মোতাবেক তিনি এর সাথে একমত। অনুরূপভাবে ইবনুল কাইয়েমও তা নিষেধ করেছেন।

কেউ কেউ শুধু মাতা-পিতা এবং শিক্ষকের জন্য ছাত্রের দাঁড়ানোকে জায়েয বলেছেন। অবশ্য এখানে শুধু সম্মানের অর্থে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে। হাত মিলানো এবং কোলাকুলির জন্য দাঁড়ানোকে নিষেধ করা হয়নি। যারা দাঁড়ানোকে জায়েয কিংবা মোস্তাহাব বলেছেন, তাদের আরও কিছু প্রমাণ হল :

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا -

অর্থ : 'সে ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করেনা এবং আমাদের বড়দের অধিকার সম্পর্কে জানে না।'

www.amarboi.org

আবু দাউদ আবু হোরায়রা (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। 'নবী (সা) আমাদের সাথে কথা বলতেন। তিনি দাঁড়ালে আমরা দাঁড়াতাম এবং তিনি প্রবেশ করেছেন বলে আমরা দেখতে পেতাম।'

ইমাম মুসলিম সা'দ বিন মোআ'জের উদ্দেশ্যে নবী (সা)-এর বাণী উল্লেখ করে বলেছেন :

قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ.

'তোমরা তোমাদের নেতাদের উদ্দেশ্যে দাঁড়াও।'

'আমি কারো উদ্দেশ্যে কাউকে দাঁড়ানোর পক্ষে এর চাইতে অধিকতর বিশুদ্ধ হাদীস দ্বিতীয়টা আছে বলে জানি না।

ইবনু বাত্তাল বলেছেন, উল্লেখিত হাদীস মহানবীর পক্ষ থেকে মুসলমানদের মধ্যে বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ, তাঁর দরবারে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বৈধতা অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামসহ বড়দের প্রতি সকলকে সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। ইবনু বাত্তাল এ প্রসঙ্গে ফাতেমার (রা) জন্য নবী (সা) এবং নবী (সা)-এর জন্য ফাতেমার দাঁড়ানোর প্রমাণ পেশ করেছেন।

খাত্তাবী সা'দ বিন মোআ'জের হাদীস দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেন। তিনি বলেন, তাতে উল্লেখিত 'সাইয়েদ' শব্দ ভাল ও জ্ঞানী-গুণী লোকের অর্থে প্রয়োগ করা জায়েয আছে। এর ভিত্তিতে তিনি বলেন, জ্ঞানী প্রেসিডেন্ট বা চেয়ারম্যান, ন্যায়পরায়ণ বিচারক এবং শিক্ষকের জন্য ছাত্রের দাঁড়ানো মোস্তাহাব। তবে উল্লেখিত গুণের লোক ছাড়া অন্য কারো জন্য দাঁড়ানোকে তিনি মাকরূহ বলেছেন।

আবুল মা'আলী হযরত মুয়াবিয়া (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বরাত দিয়ে বলেন, আলেম এবং সমাজের সম্মানিত লোকদের জন্য দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন মোস্তাহাব।

ইবনু আবদুল বার বলেছেন : কওমের সম্মানিত ব্যক্তি, আলেম কিংবা সদ্ব্যবহারের যোগ্য ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে সম্মান জানানো জায়েয। আর যদি প্রেসিডেন্ট কাউকে তার উদ্দেশ্যে দাঁড়াতে বলে, কিংবা কেউ দাঁড়ালে তিনি খুশী হন, তাহলে, অনুরূপ দাঁড়ানো জায়েয নেই। অর্থাৎ প্রেসিডেন্টের লোকদের দাঁড়ানোকে ভালবাসা কিংবা সে জন্য নির্দেশ দেয়া জায়েয নেই।

www.amarboi.org

ইবনু তামীম বলেছেন, ন্যায়পরায়ণ নেতা, মা-বাপ, জ্ঞানী-গুণী ও সম্ভ্রান্ত লোকদের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো মোস্তাহাব নয়। তিনি পাপী লোকদের জন্য দাঁড়ানোকে মাকরূহ বলেছেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের ভাতিজা তাঁকে লোকদের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোর বিষয়ে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, সন্তান নিজ পিতা ও মাতার জন্য ছাড়া কেউ যেন অন্য কারো সম্মানে না দাঁড়ায়।

যারা সাধারণতঃ দাঁড়ানোকে মাকরূহ মনে করেন কিংবা মাতা-পিতা ছাড়া অন্য কারো জন্য দাঁড়ানোকে মাকরূহ বলেন। তাদের দলীল হল, হযরত আনাস বিন মালেকের নিম্নোক্ত বর্ণনা :

তিনি বলেন :

لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَكَانُوْا اِذَا رَاَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَّةٍ لِذٰلِكَ -

'সাহাবায়ে কেরামের কাছে আল্লাহর রাসূলের চাইতে অধিকতর প্রিয় ব্যক্তি অন্য কেউ ছিলেন না। তাঁরা যখন তাঁকে দেখতেন তখন দাঁড়াতেন না। কারণ, তিনি দাঁড়ানোকে পছন্দ করতেন না।'(আহমদ, তিরমিযী)

তাঁরা প্রমাণ হিসেবে আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অসুস্থ্যাবস্থায় বসে নামাজ পড়ানোর সময় সাহাবায়ে কেরামকেও বসে নামাজ পড়ার নির্দেশ দেন। রোম ও পারস্য সম্রাটের সাথে তুল্য না হবার জন্য তিনি তাদেরকে বসে পড়ার নির্দেশ দেন।

ইবনুল কাসেম লিখেছেন, কোন সম্মানিত ও ফকীহর উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো জায়েয কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে ইমাম মালেক বলেছেন, আমি তা অপছন্দ করি।

ইবনুল জাওযী না দাঁড়ানোর পক্ষে মত দিয়েছেন। তবে না দাঁড়ানো যদি নিজের অপমানিত হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে তিনি দাঁড়ানোর কথা বলেছেন। এ ছিল অতীতের বুজুর্গানে দীনের পদ্ধতি।

শেখ তাকিউদ্দীন 'ফাতাওয়া মিসরিয়ায়' লিখেছেন, নিয়মিত ও বারবার দেখা-সাক্ষাতের সময় না দাঁড়ানো উচিত। হাঁ, যদি লোকদের দাঁড়ানো অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় কিংবা দাঁড়ানোকে যদি সম্মানের মাপকাঠি মনে করে, তাহলে, দাঁড়াতে কোন অসুবিধে নেই। শত্রুতা ও গোলযোগ থেকে বাঁচার জন্য গোলযোগ

www.amarboi.org

সৃষ্টিকারী বিষয় থেকে দূরে থাকাও উত্তম। তা সত্ত্বেও সুন্নাহর উপর আমল করার চেষ্টা করা জরুরী।

ওলামায়ে কেরামের মতের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, আগন্তুকের সম্মানে দাঁড়ানো জায়েয নেই, শুধুমাত্র মাতা-পিতা ছাড়া। আমাদের জন্য এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত নীতিই গ্রহণযোগ্য।

২. হাত, মাথা ও অন্যান্য অঙ্গে চুমু খাওয়া

সফওয়ান বিন আছ্‌চাল থেকে বর্ণিত। এক ইহুদী আরেক ইহুদীকে বলল, চল, আমরা এ নবীর কাছে যাই। তার সঙ্গী বলল : 'নবী বলো না। তিনি যদি শুনেন, তাহলে খুশীতে আটখানা হয়ে যাবেন। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে আসে এবং তাঁকে ৯টি সুস্পষ্ট নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।

তিনি উত্তরে বলেন : তোমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, চুরি করো না, যেনা-ব্যভিচার করো না, কাউকে শরীয়তের অধিকার ব্যতীত হত্যা করো না যা আল্লাহ হারাম করেছেন। কোন নিরপরাধ মানুষকে হত্যার জন্য শাসকের কাছে নিয়ে যেয়ো না। যাদু করো না, সুদ খেয়ো না, সতী নারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিও না, যুদ্ধের দিন ময়দান থেকে পালিয়ে যেয়ো না, আর তোমরা, বিশেষ করে ইহুদীরা শনিবারের বিষয়ে সীমালংঘন করো না। বর্ণনাকারী বলেন, তারা রাসূলুল্লাহর (সা) হাত পায়ে চুমু খেল এবং সাক্ষ্য দিল যে, নিঃসন্দেহে আপনি নবী। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তাহলে, কেন তোমরা অনুসরণ করো না? তারা জবাব দিল, হযরত দাউদ (আ) আল্লাহর কাছে নিজ বংশ থেকে নবীর ধারা অব্যাহত রাখার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। আমাদের আশংকা হয়, আমরা যদি আপনার অনুসরণ করি, তাহলে, ইহুদীরা আমাদেরকে হত্যা করবে।' (আহমদ, নাসাঈ, তিরমিযী)

উম্মে আবান বিনতে ওয়াজে' বিন যারে নিজ দাদা যারে' থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আবদুল কায়েসের প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা যখন মদীনায় আসলাম তখন সওয়ারী থেকে দ্রুত পৌঁছে নবী (সা)-এর হাত-পায়ে চুমু খেলাম। (আবু দাউদ)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। 'যায়েদ বিন হারেস মদীনা আসেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমার ঘরে ছিলেন। তিনি দরজায় এসে আওয়াজ দেন।

www.amarboi.org

রাসূলুল্লাহ (সা) কাপড় চেঁচিয়ে উঠেন। তাঁর সাথে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁকে চুমু খান।' (তিরমিযী)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সা) হাসান বিন আলীকে চুমু খান।' (বোখারী, মুসলিম)

আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নিজ কন্যা ফাতেমাকে চুমু খেয়েছেন।

ওসাইদ বিন হোদাইর আনসারী থেকে বর্ণিত। তিনি যখন লোকদের মধ্যে কথা বলছিলেন, তখন সেখানে মোজাহ উপস্থিত ছিলেন। মোজাহ লোকদেরকে হাসাচ্ছিলেন। নবী (সা) তার কোমরে লাঠি দিয়ে খোঁচা দেন। মোজাহ বলেন, সবর করুন, আমি কথা শেষ করি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমার বিষয় থেকে তোমার জন্য আলোচনা কর। মোজাহ বলেন; আপনার শরীরে জামা আছে, আমার শরীরে জামা নেই। তখন নবী (রা) নিজের জামা উপরে তুললেন। মোজাহ তাঁর সাথে কোলাকুলি করলেন এবং তাঁর শরীরে চুমু খেতে লাগলেন। মোজাহ বলেন : আমি এটাই ইচ্ছা করেছিলাম।' (আবু দাউদ)

তিরমিযী আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, হাদীসটি হাসান। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো ভাই-বন্ধু সাক্ষাত করতে আসলে তাকে কি ঝুঁকে সম্মান দেখাতে হবে? তিনি জবাবে বলেন, 'না'। সে জিজ্ঞেস করল : তাকে কি জড়িয়ে ধরে চুমু দেবে? তিনি বলেন : 'না'। তিনি প্রশ্ন করেন। তাহলে কি তার হাত ধরে মোসাফাহা করবে? তিনি উত্তরে বলেন, 'হাঁ'।

আবদুল্লাহ বিন ওমার থেকে বর্ণিত। তাঁরা মুতার যুদ্ধ থেকে পালিয়ে এসে বলেন, আমরা হলাম ভাগুড়ে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : 'বরং তোমরা কৌশল গ্রহণকারী; আমরা নিঃসন্দেহে মোমেনদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন, আমরা তাঁর হাতে চুমু দিলাম।' (আল আদবুল মোফরাদ এবং আবু দাউদ)

উল্লেখিত হাদীসগুলো জ্ঞানী-গুণী লোকদের এবং মা-বাপের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কোলাকুলি এবং হাত ও মাথায় চুমু খাওয়া যে জায়েয তা প্রমাণ করে। তবে দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে তা করা জায়েয নেই।

মারওয়াজী বলেছেন, আমি আবু আবদুল্লাহকে (আহমদ বিন হাম্বল) হাতে চুমু খাওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করলাম, তিনি জবাবে বলেন, যদি দ্বীনদারীর দৃষ্টিকোণ থেকে হয়, তাহলে তা জায়েয আছে। আবু ওবায়দা (রা) ওমার বিন খাত্তাবের (রা) হাতে চুমু খেয়েছেন। আর যদি দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে হয় তাহলে, জায়েয নেই। তবে কারো তলোয়ার কিংবা বেতের ভয় থাকলে তখন করা যাবে।

www.amarboi.org

তামীম বিন সালামা তাবেয়ী বলেছেন, চুমু খাওয়া সুন্নাহ। মোহান্না বিন ইয়াহইয়া বলেন, আমি দেখেছি আবু আবদুল্লার মুখ, মাথা ও গালে বহু লোকে চুমু খায়, তিনি কিছু বলেন না। আমি দেখেছি, তিনি কাউকে নিষেধ করেন না এবং তা অপছন্দও করেন না।

আবদুল্লাহ বিন আহমদ বলেছেন, আমি বহু আলেম, ফকীহ, মোহাদ্দেস এবং বনু হাশেম, কোরাইশ ও আনসারকে আমার পিতার হাত ও মাথায় চুমু খেতে দেখেছি।

কোন কোন আলেম হাত, মাথা ও কপালে চুমু খাওয়াকে জায়েয বলেছেন এবং কোন কোন আলেম এটাকে মাকরূহ বলেছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং কিছু সংখ্যক শাফেঈ এটাকে জায়েয বলেছেন। আর ইমাম মালেক ইবনু আবদুল বার এবং সোলায়মান বিন সোরাদ প্রমুখ এটাকে মাকরূহ বলেছেন। তাদের দলীল হলো হযরত আনাসের উল্লেখিত হাদীস। যারা জায়েয বলেন, তাদের প্রমাণই বেশি, আর তা হল, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সম্মানের উদ্দেশ্যে। সেক্ষেত্রে শুধু চুমু নয় বরং কোলাকুলিও জায়েয, তবে কোন আলেম চুমুর উদ্দেশ্যে যদি নিজ হাত বাড়িয়ে দেন, তা সেটা মারাত্মক ধরনের অপছন্দনীয় কাজ। ইবনু আবদুল বার এবং সোলায়মান বিন সোরাদ হাতের এ চুমুকে ছোট সাজদা বলে অভিহিত করেছেন। দুনিয়ার উদ্দেশ্যে হলে তাতে আল্লাহর অবমাননা হয়। এ জন্য তারা চুমু খাওয়াকেও নিষেধ করেন।

হযরত আলী (রা) বলেন, পিতাকে চুমু দেয়া ইবাদত, সন্তানকে চুমু দেয়া রহম, স্ত্রীকে চুমু দেয়া যৌন কামনা এবং কোন ভাইকে চুমু দেয়া দ্বীনদারী।

হাসান বসরী বলেছেন : ন্যায়পরায়ণ নেতার হাতে চুমু খাওয়া আনুগত্য ও ইবাদত। ইবনুল জাওযী বলেছেন, জালেমের হাতে চুমু খাওয়া গুনাহ। তিনি হাদীস বর্ণনাকারীদের গুণাবলী উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন : 'ছাত্রের উচিত, আলেমের প্রতি অধিক বিনয় প্রকাশ করা এবং নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করা। তাঁর মতে, আলেমের হাতে চুমু খাওয়া বিনয়ের অন্তর্ভুক্ত। সুফিয়ান বিন ওয়াইনাহ এবং ফোসাইল বিন আয়াদ এ দু'জনের মধ্যে একজন হোসাইন বিন আ'লী জা'ফীর হাত এবং অন্যজন তাঁর পায়ে চুমু খেয়েছেন।

কোলাকুলি

এসহাক বিন ইবরাহীম কোলাকুলি সম্পর্কে বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহকে (আহমদ বিন হাম্বল) লোকজনের একজনের সাথে অন্যজনের কোলাকুলি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় উত্তরে বলতে শুনেছি, হ্যাঁ, আবু দারদা কোলাকুলি করেছেন।

www.amarboi.org

ইমাম শা'বী (রা) বলেন, হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীরা যখন পরস্পর সাক্ষাত করতেন তখন হাত মিলাতেন এবং সফর থেকে আসলে একে অন্যের সাথে কোলাকুলি করতেন।' এ হাদীসের সনদ ভাল।

শেখ ওয়াজিহ উদ্দিন আবুল মাআলী হেদায়াহ কিতাবের ব্যাখ্যায় বলেছেন : আগন্তুকের সাথে দেখা করা, কোলাকুলি করা ও সালাম দেয়া মোস্তাহাব।

'আদাবুশ শারীয়াহ' গ্রন্থের লেখক বলেছেন : মুখে চুমু খাওয়া মাকরূহ। কেননা, তা সম্মানের উদ্দেশ্যে কমই করা হয়ে থাকে।

সুফিয়ান বিন ওয়াইনাহ ইমাম মালেকের কাছে যান। মালেক তাঁর সাথে হাত মিলান এবং বলেন; কোলাকুলি বেদ'আত না হলে, আমি আপনার সাথে কোলাকুলি করতাম। সুফিয়ান বলেন; আমার এবং আপনার চেয়ে যিনি উত্তম সে মহান ব্যক্তি মহানবী (সা) ইথিওপিয়া থেকে আগত জাফরের সাথে কোলাকুলি করেছেন।

ইমাম মালেক বলেন, এটা জাফরের সাথে বিশেষ ধরনের আচরণ। সুফিয়ান বলেন, না, তা সাধারণ আচরণ। আমরা যদি ভাল ও নেককার হই, তাহলে জাফরের সাথে যা বিশেষ বা সাধারণ আচরণ সেটা আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। (এবদা-শেখ আলী মাহফুজ পৃঃ ৪১৯)

মুহরাম স্ত্রীলোককে চুমু খাওয়া

বোখারী শরীফে নবী (সা)-এর হিজরতের ঘটনায় উল্লেখ আছে যে, আবু বকর (রা) আ'যেব থেকে একটি উট কিনেন। তিনি তার উপর নিজ ছেলে বারাকে নিজের সাথে আরোহণ করান। বারা বলেন : আমি আবু বকরের সাথে তাঁর পরিবারে প্রবেশ করি। তখন তাঁর কন্যা আয়েশা জ্বরে শুয়ে আছেন। আমি দেখলাম, আবু বকর (রা) আয়েশার গালে চুমু খান এবং জিজ্ঞেস করেন : হে কন্যা, কেমন আছ? (আহমদ, মুসলিম) তখন হযরত আয়েশা কম বয়স্কা ছিলেন।

নবী (সা) হযরত ফাতেমাকে চুমু খেয়েছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন ব্যক্তি কি তার বোনকে চুমু দিতে পারে? তখন তিনি উত্তরে বলেন : খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা) নিজ বোনকে চুমু দিয়েছেন।

ইবনু মোফলেহ বলেছেন : এই মাসআলাটি মোহরাম আত্মীয়ার সাথে হাত মিলানোর পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ তা জায়েয।

ইসহাক বিন রাহওয়াই বলেছেন : মুখে কখনও চুমু খাওয়া যাবে না, বরং কপাল ও মাথায় চুমু খেতে হবে।

www.amarboi.org

ইমাম নববী 'আজকার' গ্রন্থে লিখেছেন : নিজের ছোট ছেলে ও ভাইয়ের গালে চুমু খাওয়া এবং অন্যদের গাল ছাড়া এর চার পাশে দয়া, ভালবাসা, স্নেহ ও আত্মীয়তার কারণে চুমু খাওয়া সুন্নাহ। এ বিষয়ে অনেক সহীহ ও মশহুর হাদীস বর্ণিত আছে। সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক এবং বন্ধু বান্ধবসহ অন্যান্যদের ছোট শিশুকেও চুমু খাওয়া সমানভাবেই গুনাহ। যৌন কামনাসহকারে চুমু খাওয়া সর্বসম্মতভাবে হারাম। চুমুদানকারী বাপ হলেও তা হারাম। নিকটত্মীয় থেকে হোক কিংবা দূরাত্মীয় হোক, যৌন কামনাসহকারে তাদের প্রতি নজর করাও হারাম। বৃদ্ধা মুহরাম স্ত্রীলোকের মাথা কিংবা দুই চোখের মাঝখানে চুমু খাওয়ার বিষয়টি প্রতির্ষ্ঠিত ব্যাপার। অনেকের মতে, গালে চুমু খাওয়া নিষিদ্ধ। হাঁ, যদি মা হয় কিংবা কন্যা সন্তান হয়, তাহলে জায়েয হতে পারে।

৩. ঝুঁকে প্রবেশ কিংবা সাক্ষাত করা

ইমাম নববী তাঁর 'আজকার' গ্রন্থে লিখেছেন, সর্বাবস্থায় সবার জন্য মাথা ঝুঁকানো মাকরূহ। হযরত আনাস থেকে বর্ণিত হাদীস তার প্রমাণ। এর বিপরীতে কোন দলীল নেই। তাই তা নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে। কেউ লোকজনের অধিক অধিক ঝুঁকার কারণে নিজের পাণ্ডিত্ব ও যোগ্যতার ব্যাপারে ধোঁকায় না পড়ে। অনুসরণ কেবলমাত্র নবীকেই (সা) করতে হবে। আল্লাহ বলেছেন, 'আর রাসূল তোমাদের জন্য যা এনেছেন, وَمَاآتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ তাকে গ্রহণ কর।' (সূরা হাশর : ৭)

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيْمٌ -

'যারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।' (সূরা নূর-৬৩)

কোন কোন আলেম এভাবে ঝুঁকে যাওয়াকে জায়েয বলেছেন। তাদের জবাব আগেই দেয়া হয়েছে। অগ্রাধিকারযোগ্য মত অনুযায়ী তা মাকরূহ। তবে কোন জালেমের জুলুমের ভয় কিংবা কোন গোলযোগ সৃষ্টির আশংকা থাকলে, তখনই কেবল তা জায়েয হতে পারে। বৃহত্তম ক্ষতি থেকে ছোট ক্ষতি স্বীকার করার নীতি অনুযায়ীই এ ফয়সালা দেয়া যায়।

www.amarboi.org

৪. চলাচল, প্রবেশ করা ও বের হবার সময় বড়দের অগ্রাধিকার দান

নবী করীম (সা) বলেছেন :

لَيْسَ مِنَّا لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفُ شَرَفَ كَبِيْرِنَا.

'সেই ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে ছোটদেরকে স্নেহ এবং বড়দের শ্রদ্ধা করতে জানে না।' অর্থাৎ সেই ব্যক্তি উত্তম পথ ও পদ্ধতির অনুসরণকারী নয়। এটা মাকরূহ থেকে হারাম হবার পর্যায়ে পড়ে।

মুসলিম ও আবু দাউদ হোজায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কোন খাবার মজলিশে হাজির হলে, তিনি না খাওয়া পর্যন্ত আমরা খেতাম না।'

বড়দেরকে সম্মান প্রদর্শন করা অতীতের নেক লোকদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সম্মান প্রদর্শন হল সামাজিক প্রথা ও মানবিক রুচিবোধের ফসল। নিজে সম্মানিত হলে অন্যকেও সম্মান করবে। আর এভাবেই সুন্নাহর আলোকে পরবর্তী বংশধর গড়ে উঠবে।

বড়দেরকে সম্মান প্রদর্শনের বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে, তা যেন শরীয়তের অন্য কোন আদেশ বা নীতির সাথে সংঘর্ষমুখর না হয়। যেমন, পানি পান করার ক্ষেত্রে ডানদিকের ব্যক্তিকে আগে দিতে হবে। বাঁয়ে বড় কিংবা বুজুর্গ কোন লোক থাকলে তাকে দেয়া যাবে না। তবে, চলার সময়, ঘরে প্রবেশ কিংবা বের হবার সময়, খানা শুরু কিংবা কর্তৃপক্ষের কাছে কথা বলার ক্ষেত্রে আগে বড়দেরকে সুযোগ দেয়া মোস্তাহাব।

আবদুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বল বলেন, আমি আমার পিতা আহমদ বিন হাম্বলকে দেখেছি, কোরাইশ বংশের বয়স্ক কিংবা ছোট বালক অথবা অন্য যেই আসুক, তিনি তাদের আগে মসজিদ থেকে বের হতেন না। তারা বেরিয়ে গেলে তিনি পরে বের হতেন।

মারওয়াজী বলেছেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল নিজ ভাই ও তাঁর চাইতে বয়সে যারা বড়, তাদেরকে খুব বেশী সম্মান করতেন। একবার তাঁর কাছে আবু হাম্মাম গাধায় আরোহণ করে আসেন। তিনি গাধার লাগাম ধরে তাঁকে নামান। আমি দেখেছি, তিনি তাঁর চাইতে বয়সে বড় অন্যান্য লোকদের সাথেও অনুরূপ আচরণ করতেন। ইমাম আহমদ খুব সূক্ষ্মভাবে সুন্নাতের অনুসরণ করতেন। তিনি অবশ্যই পাপী ও মন্দ লোকদেরকে সম্মান প্রদর্শন করতেন না।

www.amarboi.org

মারওয়াজী আরও বলেন, ইমাম আহমদকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিম্নোক্ত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এটাকে যথার্থ হাদীস হিসেবে অভিহিত করেন :

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

اِذَا اَتَاكُمْ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَاكْرِمُوْهُ.

'তোমাদের কাছে কোন সম্প্রদায়ের সম্মানিত লোক আসলে তাকে সম্মান কর।'

ইমাম আহমদ বলেন, হাঁ, এই হাদীসের মর্মানুযায়ী আ'মল করতে হবে। তাঁকে প্রশ্ন করা হল, এক্ষেত্রে কি ভাল ও মন্দ সমান হবে? তিনি বলেন, 'না।' আমি বললাম, সম্প্রদায়ের মন্দ লোক হলে কি তাকে সম্মান করতে হবে? তিনি উত্তরে বলেন, 'না।'

মারওয়াজী আরও বলেন, আমি আরও দেখেছি, ইমাম আহমদের কাছে বনি হাশেমের একজন বালক এবং ইবরাহীম সায়লান এক সাথে এসেছেন। তিনি বালকটিকে আগে বাড়িয়ে দিলেন।

মারওয়াজী বলেন[১], আমি মসজিদে বনি যোবায়ের গোত্রের এক কম বয়স্ক ব্যক্তিকে দেখলাম। দেখলাম যে ইমাম আহমদ তাকে আগে বের হবার জন্য বললেন। কিন্তু যুবকটি আগে বের হতে চাচ্ছে না। ইমাম আহমদও আগে বের হতে অস্বীকৃতি জানাতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত যুবকটিই আগে বের হল।

সালাম ও তার হুকুম

কোরআন, হাদীস ও এজমাউ'ল উম্মাহ দ্বারা সালাম প্রমাণিত।

আল্লাহ বলেন :

فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ. تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدَ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً.

'অতঃপর তোমরা যখন ঘরে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম দেবে। এটা হচ্ছে আল্লাহর কাছ থেকে বরকতময় ও পবিত্র দো'আ ও অভিনন্দন।' (সূরা নূর : ৬১)

মহান আল্লাহ আরও বলেন :

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا ـ

---

১. আল-আদাবুল শরীয়াহ-শেখ মারওয়াজী- ১ম খণ্ড, ৪৬৯ পৃঃ

www.amarboi.org

'আর যদি কেউ তোমাদেরকে দো'আ অভিনন্দন জানায়, তাহলে, তার চাইতে উত্তম দো'আ অথবা তারই মত সমান দো'আ-অভিনন্দন ফিরিয়ে বল।'

(সূরা নিসা : ৮৬)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَ اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِشِ -

'এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের ৫টি অধিকার রয়েছে : সালামের জবাবদান, রোগীর সেবা, জানাযায় অংশগ্রহণ, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির জবাব দেয়া।' (বোখারী, মুসলিম)

সালাম হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে মোমেন বান্দাহর জন্য হযরত আদম (আ) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত বিধিবদ্ধ অভিনন্দন ও দো'আর পদ্ধতি। আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ আদম (আ)কে সৃষ্টির পর বলেন, তুমি ঐ সকল বসে থাকা একদল ফেরেশতার কাছে গিয়ে তাদেরকে সালাম কর এবং তারা জবাবে কি বলে তা শুন। নিশ্চয়ই সেটাই হবে তোমার ও তোমার সন্তানদের সালাম ও দো'আর পদ্ধতি।

তিনি বলেন : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ

তারা উত্তরে বলেন : اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

ফেরেশতারা জবাবে 'ওয়া রাহমাতুল্লাহ' শব্দটি যোগ করেন। (বোখারী-মুসলিম)

সে কারণেই ফেরেশতারা যখন ইবরাহীম (আ)-এর কাছে প্রবেশ করেন, তারা তাঁকে সালাম দেন এবং তিনি তাদের সালামের জবাব দেন।

আল্লাহ বলেন : 'তোমার কাছে কি ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের কাহিনী পৌঁছেছে, যখন তারা তাঁর কাছে প্রবেশ করল ও সালাম দিল এবং তিনিও তাদের সালামের জবাব দিলেন?' (সূরা আজ জুররিয়াত : ২৪-২৫)

www.amarboi.org

সালামের ফজীলত

আবদুল্লাহ বিন আম'র বিন আস থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন কাজ উত্তম? তিনি উত্তরে বলেন, 'মানুষকে খানা খাওয়াবে এবং চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দেবে।' (বোখারী, মুসলিম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, 'তোমরা ঈমান আনা ছাড়া বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসা ছাড়া ঈমান হবে না। আমি কি তোমাদেরকে ভালাবাসা সৃষ্টিকারী একটি বিষয়ের সন্ধান দেবো? তোমরা নিজেদের মধ্যে ব্যাপক সালামের প্রচলন কর।' (মুসলিম)

আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি :

يَاَيُّهَا النَّاسُ، اَفْشُوا السَّلَامَ، وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الاَرْحَامَ وَصَلُّوْا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

'হে লোকেরা! ব্যাপক হারে সালামের প্রচলন কর, লোকদেরকে খাবার দাও, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর, লোকেরা যখন ঘুমে, তখন নামাজ পড়, (তাহলে) শান্তির সাথে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী-হাদীসটি হাসান সহীহ)

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমার (রা) বাজারে যেতেন কিন্তু কিছু কিনতেন না। তাঁকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, আমি শুধু সালাম দেয়ার উদ্দেশ্যেই বাজারে আসি এবং যার সাথে সাক্ষাত হয়, তাকে সালাম দেই। এ বর্ণনার সনদ বিশুদ্ধ।

সালামের পদ্ধতি

এ ব্যাপারে দারেমী, আবু দাউদ এবং তিরমিযীতে এমরান বিন হোসাইন থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর কাছে এসে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম।' নবী (সা) সালামের জবাব দেন। লোকটি বসে পড়ল। নবী (সা) বলেন, 'দশ'। তারপর আরেক ব্যক্তি এসে বলল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'। নবী (সা) সালামের জবাব দেন। লোকটি বসে পড়ল। তিনি বলেন, 'বিশ'। তারপর আরেক ব্যক্তি এসে বলল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তিনি তাঁর সালামের জবাব দেন। লোকটি বসে পড়ল। তিনি বলেন, 'ত্রিশ'।

www.amarboi.org

আবু দাউদের বর্ণনায় 'ওয়া মাগফেরাতুহু' যোগ করা হয়েছে। হাদীসটি দুর্বল। অনুরূপভাবে, যে হাদীসে 'ওয়া মাগফেরাতুহু ওয়া রেদওয়ানুহু' বর্ণিত হয়েছে সে হাদীসটিও দুর্বল।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, সালামের নিম্নতম বাক্য হল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম', মধ্যম বাক্য হল, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' এবং পরিপূর্ণ বাক্য হল, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।'

একজন হোক বা একাধিক ব্যক্তি হোক, সবার জন্য সালামের বহুবচন ভিত্তিক বাক্য 'আসসালামু আলাইকুম' ব্যবহার করতে হবে। কেউ যদি 'আসসালামু আলাইকা' কিংবা 'সালামুন আলাইকা' অর্থাৎ এক বচন ভিত্তিক সালামের বাক্য ব্যবহার করে তাহলেও তা জায়েয।

সালামের নিম্নতম জবাব হচ্ছে, 'ওয়া আলাইকুস সালাম।' কিংবা 'ওয়া আলাইকাস সালাম'। 'ওয়াও' বাদ দিয়ে শুধু 'আলাইকুমুস সালাম' বলাও জায়েয। কেউ যদি জওয়াবে 'সালাম' শব্দ বাদ দিয়ে শুধু 'ওয়া আলাইকা' কিংবা 'ওয়া আলাইকুম' বলে, তাও জায়েয বলে অধিকাংশ আলেমের মত।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে, নবী (সা) উবাই বিন কা'বের কাছে গেলেন। তখন উবাই নামাজ পড়ছিলেন। তিনি বলেন, হে উবাই! উবাই দেখলেন কিন্তু কোন জবাব দিলেন না। উবাই সংক্ষেপে নামাজ শেষ করে নবী (সা)-এর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ!' তিনি জবাবে বলেন : 'ওয়া আ'লাইকা।' তিনি জিজ্ঞেস করেন, আমি যখন তোমাকে ডাকলাম, তোমাকে কোন জিনিস জবাব দানে বিরত রেখেছে?

বোখারী এবং মুসলিমে বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় দেখা যায়, নবী (সা) আবু যর (রা)-এর প্রতিও অনুরূপ জবাব দিয়েছেন।

'ওয়া' ব্যতীত শুধু 'আলাইকা' কিংবা 'আ'লাইকুম' বললে তাতে সালামের জবাব হবে না বলে অধিকাংশের মত। তবে অল্প সংখ্যকের মতে, তাতে সালামের জবাব হবে। অধিকাংশ আলেম-এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সা) তা কেবলমাত্র জিম্মীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। মুসলমানকে জিম্মীর সাথে তুলনা করা যায় না।

লোক বেশী হলে এবং একবার সালাম দিলে তা শুনা না গেলে দু'বার কিংবা তিনবার সালাম দেয়া মোস্তাহাব। ওলামায়ে কেরাম নবী করিমের (সা) কোন কোন সময়ের তিনবার সালামকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন।

যাদেরকে সালাম দেয়া হয়, তারা যেন ভাল করে শুনতে পায় সে জন্য বড় করে সালাম দেয়া মোস্তাহাব। আর যদি একই জায়গায় জাগ্রত লোকের সাথে নিদ্রিত

www.amarboi.org

লোকও থাকে তখন নিদ্রিতের প্রতি খেয়ালের লক্ষ্যে ছোট আওয়াজে সালাম দেয়া সুন্নত।

মুসলিম শরীফে মেকদাদ থেকে এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত, আমরা নবী করিম (সা)-এর জন্য তাঁর দুধের অংশ তুলে রাখতাম। তিনি রাত্রে আসতেন এবং এমনভাবে সালাম দিতেন যে, জাগ্রতরা শুনত এবং নিদ্রিতরা জাগত না।'

সালাম ও জবাবের ব্যাপারে কিছু মাসআলা

ইমাম নববী (র) তার 'আল-আজকার' কিতাবের ২২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, সালাম দেয়া সুন্নাহ, ওয়াজিব নয়। এটা হচ্ছে সুন্নাতে কেফায়াহ। একদল মুসলমানের মধ্য থেকে একজন সালাম দিলেই চলে, যদিও সবারই সালাম দেয়া উত্তম।

সালামের জবাবদানকারী ব্যক্তি একজন হলে তাকেই জবাব দিতে হবে। আর একাধিক হলে একজনের জবাবই যথেষ্ট। সবারই উত্তর দেয়া উত্তম। কেউ উত্তর না দিলে সবাই গুণাহগার হবে। তাদের পক্ষ থেকে অন্য কেউ সালামের জবাব দিলে তাদের দায়িত্ব আদায় হবে না। তাদের কর্তব্য হল সালামের জবাব দেয়া। অন্যথায় তারা গুণাহগার হবে।

ইবনু আ'বদুল বার বলেছেন, ইরাকবাসীরা যাদের উপর সালাম দেয়া হয় সে দলের প্রত্যেক সদস্যের উপর জবাব দান করাকে ফরজ হিসেবে বিবেচনা করেন। (আল-আদাবুশ শারঈয়াহ)

অধিকাংশ আলেমের মতে, সালাম দেয়া সুন্নাহ। কেউ কেউ এটাকে ওয়াজিব বলেছেন। সালামের জবাব দেয়াকে সবাই ওয়াজিব বলেছেন। তাদের মধ্যে শুধুমাত্র মতভেদ হল, জবাবের বাক্যটি কি হবে। অধিকাংশের মতে, রহমত ও বরকতের উল্লেখ ছাড়া সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট : 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম'। যদিও সালামদাতা 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু' বলেন। কেউ কেউ বলেছেন, সালামের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দ অনুযায়ী উত্তর হতে হবে। সালাম দানকারী যদি 'আসসালামু আলাইকুম' বলেন তাহলে উত্তরে শুধু 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' বলতে হবে। কেউ যদি 'ওয়া রাহমাতুল্লাহ' কিংবা 'ওয়া বারাকাতুহু' যোগ করে, তাহলে, উত্তরেও সে পরিমাণ বাড়িয়ে বলতে হবে। এ মর্মে দলীল হচ্ছে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত :

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا.

'আর তোমাদেরকে যদি কেউ সালাম দেয়, তাহলে, তোমরাও তার প্রতি সালাম দাও, তার চাইতে উত্তম অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল।' (সূরা নিসা : ৮৬)

www.amarboi.org

সমান সমান সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব। তবে উত্তম হল, সুন্দরতম উপায়ে উত্তর দেয়া। আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ তাই।

সালাম দেয়ার পর অনতিবিলম্বে উত্তর দেয়া শর্ত কিংবা দূতের মাধ্যমে উত্তর পৌছানো জরুরী। কেউ দেরী করে সালামের উত্তর দিলে তাকে উত্তর ধরা যাবে না। বিনা ওজরে অনতিবিলম্বে জওয়াব না দেয়ার জন্য সে গুনাহগার হবে।

কেউ যদি কাউকে পর্দা কিংবা দেয়ালের আড়াল থেকে সালাম দেয়, কিংবা চিঠিতে সালাম দেয় অথবা দূত পাঠিয়ে সালাম পৌছায়, তাহলে, সালাম পাওয়ার সাথে সাথে উত্তর দেয়া ওয়াজিব, না হয় সে গুণাহগার হবে।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেন, 'এই হচ্ছেন জিবরীল, তিনি তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। আয়েশা বলেন, 'আমি জবাব দিলাম ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'

কোন বধির ব্যক্তিকে সালাম দেয়ার সময় সালামের বাক্য উচ্চারণ করার সাথে সাথে হাত দিয়ে ইশারা করতে হবে। তাহলে, সে জবাব দিতে পারবে। অনুরূপভাবে, কোন বধির লোক সালাম দিলে সালামের উত্তর দেয়ার সময় হাত দিয়ে ইশারা করতে হবে যেন সে বুঝে যে, তার সালামের উত্তর দেয়া হয়েছে।

কোন বালকের প্রতি সালাম দিলে তার পক্ষে জওয়াব দেয়া ওয়াজিব নয়। কেননা বালকের উপর শরীয়তের আদেশ-নিষেধ বর্তায় না। আদব ও শিক্ষার জন্য তার পক্ষে সালামের জওয়াব দেয়া উত্তম। কোন বালক অন্য কোন বয়স্ক ব্যক্তিকে সালাম দিলে এর জবাব দেয়া ওয়াজিব। উল্লেখিত আয়াত হচ্ছে, তার প্রমাণ।

কেউ যদি যে দলে বালক আছে সে দলকে সালাম দেয় এবং বালক ব্যতীত আর কেউ সালামের উত্তর না দেয়, তাহলে, বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী, সকলেই গুণাহগার হবে। কেননা, বালক প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের মত ফরজ-ওয়াজিবের যোগ্য নয়।

কেউ কাউকে সালাম দেয়ার পর যদি অল্প পরেই আবার তার দেখা পায় তাহলে, তাকে ২য় ও ৩য় বার সালাম দেয়া সুন্নাত। অনুরূপভাবে, যদি দু'য়ের মধ্যে কোন গাছ, দেয়াল কিংবা বড় পাথর আড়াল হয় তাহলেও পুনরায় সালাম দিতে হবে।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে নামাজ খারাপভাবে আদায়কারী ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, 'ঐ ব্যক্তি এসে নামাজ পড়েছে, তারপর নবী (সা)-এর নিকট এসে সালাম দিয়েছে। নবী (সা) তার সালামের জবাব দেন। তিনি বলেন, ফিরে যাও, তুমি নামাজ পড়নি। সে ফিরে গিয়ে নামাজ আদায় করেছে। তারপর নবী (সা)-এর কাছে এসে তাঁকে সালাম দিয়েছে। এভাবে সে তিনবার করেছে।' (বোখারী, মুসলিম)

www.amarboi.org

আবু হোরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) বলেছেন :

اَذَا لَقِىَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَاِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ اَوْ جِدَارٌ اَوْ حَجَرٌ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ.

'তোমাদের কেউ নিজ ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত হলে, তাকে সালাম দেবে। যদি দু'জনের মধ্যে কোন গাছ, দেয়াল কিংবা পাথর অন্তরায় হয় তাহলে, পুনরায় তাকে সালাম দেবে।' (আবু দাউদ)

যদি দু'ব্যক্তির পরস্পরের সাথে সাক্ষাত হয় এবং একে অপরকে একই সময়ে সালাম দেয় কিংবা একের পর অন্য সালাম দেয়, এক্ষেত্রে কাজী হোসাইন এবং তাঁর সাথী আবু সা'দ মোতাওয়াল্লী বলেন, তাদের প্রত্যেককে প্রথম সালাম দানকারী হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং উভয়ের ওপর পরস্পরের সালামের জওয়াব দেয়া ওয়াজিব।

আল্লামা আশ-শাসী বলেছেন, যদি একের পর অন্যজন সালাম দেয় তাহলে, ২য় ব্যক্তির সালাম প্রথম ব্যক্তির জন্য জওয়াব হবে। আর যদি একই সময়ে দু'জনে সালাম দেয় তাহলে, কোন জওয়াব লাগবে না। ইমাম নববী বলেছেন, আল্লামা আশ-শাসীর এ বক্তব্যই যথার্থ।

কেউ কারো সাথে সাক্ষাত করলে প্রথম ব্যক্তি যদি 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' বলে, তাহলে আর জওয়াব দেয়া লাগবে না। যদি 'ওয়া' বাদ দিয়ে শুধু 'আলাইকাস সালাম' কিংবা 'আলাইকুমুস সালাম' বলে তাহলে, তার জওয়াব দিতে হবে। তবে তাকে সতর্ক করে দিতে হবে যে তার এই সালাম সুন্নত পদ্ধতির খেলাফ।

জাবের বিন সোলাইম থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসে বললাম, 'আলাইকাস সালাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, 'আলাইকাস সালাম' এরূপ বলো না! কেননা, 'আলাইকাস সালাম' মৃতদের জন্য ব্যবহৃত হয়।' তিরমিযী এটাকে সহীহ্ হাদীস বলেছেন।'

ইমাম নববী তাঁর 'আজকার' গ্রন্থের ২২৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, এভাবে সালাম দেয়া মাকরূহ। কেউ এভাবে সালাম দিলে কিন্তু জওয়াব দেয়া ওয়াজিব। কেননা, সেটা সালামই।

কথা শুরুর আগে সালাম দেয়া সুন্নাত। সহীহ্ হাদীস এবং সলফে সালেহীনদের কার্যক্রমই তার প্রমাণ। যে প্রথমে সালাম দেয় সে অধিকতর সওয়াব পায়। হাদীসে এসেছে :

www.amarboi.org

وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ.

'দু'জনের মধ্যে প্রথমে সালাম দানকারী ব্যক্তিই উত্তম।' এটা সহীহ হাদীস।

যে সকল অবস্থায় সালাম দেয়া মাকরূহ

যে সকল অবস্থায় সালাম দেয়া মাকরূহ সেগুলো হচ্ছে, পেশাব-পায়খানা, স্ত্রী সহবাস কিংবা স্বামী-স্ত্রীর নির্জন বাস অথবা তারা বিশেষ কোন বিষয়ে ব্যস্ত থাকলে এমতাবস্থায় তাদেরকে সালাম দেয়া। ঘুমন্ত ব্যক্তি কিংবা তন্দ্রাগ্রস্থ ব্যক্তিকে সালাম দেয়া। গোসলখানায় কিংবা পায়খানার মধ্যে অথবা নোংরা ময়লা কূপে থাকা অবস্থায় সালাম দেয়া। কোরআন তেলাওয়াতকারীর প্রতি সালাম দেয়া। ইমাম আবুল হাসান ওয়াহেদী বলেছেন, তেলাওয়াতের মধ্যে ব্যস্ত থাকলে সালাম না দেয়া উত্তম। তাকে সালাম দিলে সে ইশারায় উত্তর দিলে যথেষ্ট হবে। ইমাম নববীর মতে, কোরআন তেলাওয়াতকারীকে সালাম দেয়া যাবে এবং কোরআনের পাঠককে উচ্চস্বরে জওয়াব দিতে হবে।

অনুরূপভাবে দো'আয় ব্যস্ত লোকের প্রতি সালাম এবং জওয়াবেরও একই হুকুম।

কেউ কেউ মুসল্লীদেরকে সালাম দেয়া জায়েয বলেছেন। এমতাবস্থায় মুসল্লী ইশারার মাধ্যমে জবাব দেবে। যেমনটি নবী (সা) করেছেন। কেউ কেউ এটাকে মাকরূহ বলেছেন। নামাজরত অবস্থায় কথার মাধ্যমে জওয়াব দেয়া হারাম। শব্দের উচ্চারণের মাধ্যমে সালাম দিলে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। তবে শর্ত হল, এ বিষয়টি তার জানা থাকা চাই। না জানলে নামাজ বাতিল হবে না।

মোআজ্জিনকে সালাম দেয়া মাকরূহ। তবে সালাম দিলে শব্দের উচ্চারণ সহকারে জওয়াব দিতে হবে। কেননা, এটা তার জন্য সহজ এবং এর মাধ্যমে আজান বরবাদ হবে না।

নারী-পুরুষের সালাম বিনিময়

কোন মুসলমান প্রকাশ্য ফাসেকী ও বেদআ'তে জড়িত না হলে, অপর মুসলমান তাকে সালাম দেবে। অনুরূপ মহিলারাও মহিলাদেরকে সালাম দেবে। মহিলারা নিজ নিজ মোহরাম পুরুষদেরকে সালাম দেবে। মুহরাম পুরুষরা সালাম দিলে মহিলারা সালামের উত্তর দেবে। তাদের পরস্পর পরস্পরকে সালাম দিলে, সালামের জওয়াব দেয়া ওয়াজিব।

অমুহরাম বৃদ্ধা মহিলাকে সালাম দেয়া জায়েয। অনুরূপভাবে, পুরুষের সাথে সাক্ষাতে অভ্যস্ত যুবতীকেও সালাম দেয়া জায়েয। শর্ত হল, ঐ সালাম দানের মাধ্যমে যেন কোন ফেতনা সৃষ্টির আশংকা না থাকে। ফেতনার আশংকা থাকলে সুন্দরী যুবতীকে সালাম দেয়া জায়েয নেই। এমনকি সালাম দিলেও সে জওয়াব

www.amarboi.org

পাওয়ার যোগ্য নয়। যুবতীর পক্ষে তার সালামের জওয়াব দেয়া নাজায়েয। ঐ যুবতীও কাউকে সালাম দিলে সে সালামের জওয়াব দেয়া জায়েয নেই।

একদল মহিলা একদল পুরুষের উপর এবং একদল পুরুষও একদল মহিলার উপর সালাম দিতে পারে। এখানে দল বলতে একাধিক ব্যক্তি বুঝানো হয়েছে। ফেতনার আশংকা না থাকলে একজন পুরুষ একদল মহিলা এবং একজন মহিলা একদল পুরুষের উপর সালাম দিতে পারে।

আসমা বিনতে ইয়াযীদ বলেছেন :

مَرَّ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا -

রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের একদল মহিলাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন এবং আমাদের উপর সালাম দেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ্) তিরমিযী এটাকে হাদীসে হাসান বলেছেন।

সহল বিন সা'দ বলেন, এক বৃদ্ধা পালং শাকের ডাটা পাতিলে রান্না করতেন এবং যবের দানা পিষে তাতে মিশাতেন। আমরা জুমআর নামাজ শেষে তার কাছে গিয়ে সালাম দিতাম এবং তিনি আমাদেরকে তা খেতে দিতেন। (বোখারী)

উম্মে হানি বিনতে আবি তালিব বলেন : আমি "মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা) এর কাছে আসলাম। তিনি তখন গোসল করছিলেন এবং ফাতেমা তাঁকে আড়াল করে রেখেছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দেই। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'কে'? আমি বললাম, উম্মে হানি বিনতে আবি তালিব। তিনি বলেন, স্বাগতম, উম্মে হানি। তারপর তিনি গোসল শেষে নামাজ পড়েন.......।' (মুসলিম)

মুসলমি শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলা হয়েছে, এ ঘটনা প্রমাণ করে, পুরুষের ওপর অমুহরাম মহিলার মোহরাম পুরুষের উপস্থিতিতে সালাম দেয়া জায়েয। যে ব্যক্তি কোন উপাধি দ্বারা সুপরিচিত, তাকে সে উপাধি ধরে ডাকা জায়েয। যেমন, উম্মে হানী একটি উপাধি। অজু এবং গোসলের সময় কথা বলা জায়েয এবং সালাম দেয়াও জায়েয। অনুরূপভাবে, মুহরাম মহিলার সামনে সতর ঢাকা অবস্থায় পুরুষের গোসল করা জায়েয এবং মুহরাম মহিলার কাপড় কিংবা অন্য কিছু দিয়ে মুহরাম পুরুষের পর্দা করাও জায়েয।

নবী করিম (সা)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর ও ওমর (রা) উম্মে আইমানকে দেখতে যেতেন এবং তাঁকে সালাম দিতেন।

www.amarboi.org

ইহুদী-খৃষ্টানকে সালাম দেয়া

তাদেরকে সালাম দেয়ার ব্যাপারে বিশেষ হুকুম রয়েছে। ইহুদী ও খৃষ্টানরা হয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হবে, না হয়, তাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধি কিংবা মুসলিম দেশে বাস করার বিষয়ে কোন সমঝোতা ও চুক্তি থাকবে, তারা ইসলামী শাসনের অধীন জিম্মী হিসেবে বাস করবে এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করবে।

প্রথম দলের সাথে অর্থাৎ যুদ্ধরত ইহুদী-খৃষ্টানের ওপর সালাম দেয়া জায়েয নেই এবং তাদের সালামের জওয়াব দেয়াও জায়েয নেই। সালাম হচ্ছে ভালবাসার প্রতীক বা প্রমাণ। তাদের সাথে আমাদের কোন বন্ধুত্ব নেই। যদি তাদের সাথে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি কিংবা এমনিতেই কোন সন্ধি থাকে, অথবা তারা আমাদের জিম্মায় ও প্রতিশ্রুতির আওতায় থাকে তাহলে, ওলামায়ে কেরামের মত হল, আমরা যেন তাদেরকে প্রথমে সালাম না দেই। অধিকাংশ আলেমের মতে, প্রথমে মুসলমানের পক্ষ থেকে সালাম দেয়া হারাম কিংবা কমপক্ষে মাকরূহ। এর বিপরীত রায়ের পক্ষে দলীল-প্রমাণ নেই বলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়ে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটিই হচ্ছে দলীল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

لاَتَبْدَءُوا الْيَهُوْدَ وَلاَ النَّصَارٰى بِالسَّلاَمِ.

'ইহুদী এবং খৃষ্টানদেরকে প্রথমে সালাম দেবে না।' (মুসলিম)

প্রথমে সালাম দেয়ার অর্থ ঐ ব্যক্তির প্রতি সম্মান এবং ভালবাসা ও দয়া প্রদর্শন করা। তাদের সাথে এ জাতীয় কোন কিছু করা জায়েয নেই। কেননা, মুসলমানের শত্রুতাই তাদের মূল লক্ষ্য। মুসলমানরা তাদের কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা, হিংসা ও ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কোন কিছুই আশা করতে পারে না। অতীত ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতিই তার উত্তম সাক্ষী। তারা সালাম দিলে মুসলমানদের উচিত, শুধুমাত্র 'আলাইকুম' কিংবা 'ওয়া আলাইকুম' বলা।

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আহলে কিতাব যদি তোমাদেরকে সালাম দেয় তাহলে তোমরা জওয়াবে বল 'ওয়া আলাইকুম'। (বোখারী)

তারা বলেছেন, কোন জিম্মী বা চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে প্রয়োজনে অভিনন্দন জানাতে চাইলে এ জাতীয় বাক্য বলা যায়, 'আল্লাহ তোমাকে হেদায়েত দিন;

www.amarboi.org

আল্লাহ তোমার শুভ সকাল করুক; তোমার শুভ সকাল, সৌভাগ্য ও আনন্দ হোক, ইত্যাদি। তাদের সাথে 'শুভ সকাল', 'শুভ সন্ধ্যা', 'শুভ দিন' ও 'শুভ রাত' ইত্যাদি শব্দ বিনিময় করা যায়। তাদের প্রতিবাদের আশংকা না থাকলে, এ সকল কথাও না বলা উত্তম। তারা এ সকল শব্দ ও বাক্য দিয়ে কোন মুসলমানকে স্বাগত জানালে মুসলমানও অনুরূপ উত্তর দেবে।

যে দলে মুসলমান ও কাফের আছে, সে দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় শুধু মুসলমানকে লক্ষ্য করেই সালাম দিতে হবে। এ মর্মে উসামা বিন যায়েদ থেকে বর্ণিত।

اِنَّ النَّبِىَّ (ص) مَرَّ عَلٰى مَجْلِسٍ فِيْهِ اَخْلَاطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةِ الْاَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

'নবী (সা) এমন এক মজলিশের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন যেখানে ছিল মুসলমান, প্রতিমা পূজারী, মোশরেক এবং ইহুদী। তিনি তাদেরকে সালাম দেন।' (বোখারী, মুসলিম)

কোন মোশরেকের কাছে চিঠি লিখলে, তাতে এবং অমুসলমানদেরকে সালাম দিতে হলে, এভাবে সালাম দেয়া দরকার,

سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى .

'হেদায়াতের অনুসারীর ওপর সালাম।' রাসূলুল্লাহ (সা) রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে চিঠি লেখার সময় এভাবে সালাম দিয়েছেন।

বেদ'আতী ও কবীরা গুনাহকারীর প্রতি সালাম

ইমাম নববী (র) তাঁর 'আজকার' গ্রন্থের ২২৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, যে লোক বেদ'আতী, বড় গুনাহ করে এবং তাওবা করে বিশুদ্ধ হয় না, তাকে সালাম দেয়া এবং তার সালামের উত্তর দেয়া উচিত নয়। ইমাম বোখারীসহ অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের মত হচ্ছে এটাই। ইমাম আবু আবদুল্লাহ বোখারীর দলীল হল, বোখারী ও মুসলিমে কা'ব বিন মালেকসহ তাঁর দুই সাথী সম্পর্কিত বর্ণিত হাদীস। কা'ব বলেন, 'নবী (সা) লোকদেরকে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে আসতাম, তাঁকে সালাম দিতাম এবং

www.amarboi.org

দেখতাম যে তিনি সালামের উত্তর দিচ্ছেন কিনা ও তাঁর দুই ঠোঁট মোবারক নড়ছে কিনা।'

এছাড়াও আবদুল্লাহ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'তোমরা মদ পানকারীদেরকে সালাম দিও না।'

আমার মতে, বাধ্য হলে, জালেমকেও সালাম দেয়া যায়। অর্থাৎ কোন জালেমের কাছে প্রবেশের পর যদি সালাম না দিলে দীন-দুনিয়ার ক্ষতির আশংকা থাকে, তাহলে তাকে সালাম দেয়া যেতে পারে। ইমাম আবু বকর আ'রবী বলেছেন, ওলামায়ে কেরামের মতে, জালেমদেরকে এ নিয়তে সালাম দেয়া যায় যে, 'সালাম' শব্দটি আল্লাহর একটি নাম এবং এর অর্থ হল, 'আল্লাহ তোমাদের পর্যবেক্ষক'।

ইমাম নববী (র) 'শরহে মুসলিমে' সালাম শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন, সালাম আল্লাহর একটি নাম। এ দৃষ্টিকোণ থেকে 'আসসালামু আলাইকুমে'র অর্থ দাঁড়ায়, 'তোমরা আল্লাহর হেফাজতে থাক'। এ রকম বলার রীতি প্রচলিত আছে। যেমন, বলা হয়ে থাকে, 'আল্লাহ তোমার সাথে আছেন ইত্যাদি। কারো মতে, সালাম অর্থ শান্তি। অর্থ তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক'। উভয় অর্থের দৃষ্টিতে সালাম হচ্ছে, ভয় থেকে আল্লাহর হেফাজত কিংবা শান্তির দো'আ।

শিশুদের প্রতি সালাম দান

শিশুদেরকে ইসলামের সালাম ও অভিনন্দন পদ্ধতি শিক্ষা দানের লক্ষ্যে তাদেরকে সালাম দেয়া সুন্নাত। এর মাধ্যমে তাদের মনে দয়া ও ভালবাসা সৃষ্টি হবে। বোখারী ও মুসলিম শরীফে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। 'নবী (সা) শিশুদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে সালাম দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, নবী (সা) এ কাজ করতেন।'

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে, 'নবী (সা) বালকদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদের প্রতি সালাম দিয়েছেন।'

বোখারী ও মুসলিমের একই সনদে আবু দাউদেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে।

সালামের আদব

ক. চলন্ত ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে সালাম দেবে। বসে থাকা ব্যক্তি ছোট হোক কিংবা বড় হোক অথবা কম হোক বা বেশী হোক, তাতে কিছু যায় আসে

www.amarboi.org

না। অনুরূপভাবে, ঘরে প্রবেশকারী ব্যক্তি ঘরের লোকদেরকে সালাম দেবে। রাস্তায় যদি দু'জনের সাক্ষাত হয় তাহলে, যানবাহনে সওয়ার ব্যক্তি পায়ে চলা লোককে সালাম দেবে, অল্প লোক বেশী লোককে এবং ছোট বড়কে সালাম দেবে।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ.

'সওয়ার ব্যক্তি পায়ে চলা ব্যক্তিকে, চলন্ত ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে এবং স্বল্প লোক বেশী লোককে সালাম দেবে এটাই সালামের সুন্নাত পদ্ধতি। এর ব্যতিক্রম হলেও তা জায়েয হবে। তবে সুন্নাতের খেলাফ হবে।

খ. একদল মানুষের অংশ বিশেষকে সালাম দেয়া মাকরূহ। কেননা, সালামের লক্ষ্য হল সম্প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি করা। তাই অংশ বিশেষকে সালাম দেয়া অন্যদের প্রতি সম্প্রীতি বিস্তার না করার নামান্তর। কোন কোন সময় তা শত্রুতারও জন্ম দিতে পারে।

গ. যে সকল স্থানে মানুষ বেশী থাকে, যেমন, বাজার কিংবা রাস্তা সে সকল স্থানে কিছু সংখ্যক লোকের প্রতি সালাম দানের পক্ষে কাজী আল-মাওয়ারদী মত প্রকাশ করেছেন। কেননা, যত লোকের সাথে দেখা হবে, তাদের সকলকে সালাম দিতে গেলে অন্যান্য সকল কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।

ঘ. আবু সা'দ মোতাওয়াল্লী বলেছেন, একদল লোক একজন লোককে সালাম দিলে এবং সে সবাইর উদ্দেশ্যে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' বললে, ওয়াজিব জবাবের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। যেমন করে, কারো জানাযা একবার পড়া হয়ে গেলে অন্যদের ওপর থেকে ওয়াজিব দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়।

ঙ. মাওয়ারদী বলেছেন, কোন ব্যক্তি কম সংখ্যা বিশিষ্ট দলের কাছে গেলে, তাদেরকে একবার সালাম দিলেই যথেষ্ট হবে। হাঁ, যদি মসজিদ কিংবা কোন অনুষ্ঠানে লোকেরা এক জায়গায় না থেকে ছড়িয়ে থাকে, তাহলে, প্রবেশ করে প্রথমেই যাকে পাওয়া যায় তাকে সালাম দিতে হবে। এতে করে সবার প্রতি সালামের সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। আর যারা শুনবে, তাদের ওপর সালামের জওয়াব দেয়া ওয়াজিব হবে এবং অন্যরা আর গুনাহগার হবে না। এরপর অন্যদের কাছে গিয়ে বসে পড়লে সালামের সুন্নত পুরো হয়ে যাবে। তবে, অন্যদেরকেও সালাম দিলে সেটা উত্তম হবে। অন্য এক

www.amarboi.org

মত অনুযায়ী, অন্যদের কাছে বসার কারণে তাদেরকেও সালাম দেয়া সুন্নাত।

চ. ঘরে ঢুকে সালাম দেয়া উত্তম, যদিও তাতে কেউ না থাকে। তখন এভাবে সালাম দিতে হবে,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ.

'আমাদের ওপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাহদের ওপর সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক।' (ইবনু আবি শায়বা ইবনে ওমর থেকে উত্তম সনদে তা বর্ণনা করেছেন।)

ছ কেউ কোন দলে বসার পর যদি বিদায় নিতে চায় তাহলে, দলের অন্যান্যদের উপর সালাম দেয়া সুন্নাহ।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اِذَا انْتَهٰى اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيُسَلِّمْ؛ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّقُوْمَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْاُوْلٰى بِاَحَقَّ مِنَ الْاٰخِرَةِ.

'তোমাদের মধ্যে কেউ মসজিদে পৌছলে যেন সালাম দেয় এবং বেরিয়ে আসতে চাইলেও যেন সালাম দেয়। প্রথম বারের সালাম দ্বিতীয়বারের সালাম অপেক্ষা উত্তম নয়।' (আবু দাউদ, তিরমিযী) আর্থাৎ সব সালামই সমান। পরেরটা অপেক্ষা আগেরটা উত্তম নয়।

জ. কেউ যদি এমন কোন লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে এবং ধারণা করে যে, সালাম দিলে সে বা তারা অহংকার, উপেক্ষা কিংবা অন্য কোন কারণে জবাব দেবে না, এমতাবস্থায়ও সালাম দিতে হবে এবং এ ধারণার কারণে সালাম বন্ধ রাখা যাবে না। কেননা, পথ অতিক্রমকারীকে সালাম দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সালামের উত্তর অর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়নি। এমনও হতে পারে, তার এ ধারণা ভুল। আর যদি সালামের উত্তর না দেয়, তাহলে তাকে সতর্ক করে দিতে হবে যে, উত্তর না দেয়া গুনাহ। (ইমাম নববীর 'আজকার' কিতাব থেকে সংক্ষেপিত)

সালামের ক্ষেত্রে বর্জনীয় বেদ'আত

এটা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, সালাম মুসলমানের অভিবাদন পদ্ধতি। ইসলাম ছোট-বড় সকল কিছু বর্ণনা করেছে। উদাসীন মুসলমানের মত সালাম ত্যাগ করা, দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের মত সালাম না দেয়া কিংবা ফাসেক, খৃষ্টান ও ইহুদীদের

www.amarboi.org

অনুকরণে সালাম ত্যাগ করা এবং এর বিপরীত বিকল্প অভিবাদন পদ্ধতি গ্রহণ করা নিতান্তই ভুল এবং সত্য থেকে বিচ্যুতি। বরং তা সেই বেদআত যা থেকে মহানবী (সা) আমাদেরকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইসলামী শরীয়াহ বহির্ভূত অভিবাদন পদ্ধতি হচ্ছে, শুভ সকাল, শুভ সন্ধ্যা, শুভ দিন, শুভ রাত ইত্যাদি। তাই কোন মুসলমানের উচিত নয়, এগুলোকে অভিবাদন পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা। সালাম দেয়ার পর একজন মুসলমান নিম্নোক্ত কথাগুলো জিজ্ঞেস করতে পারে। 'কেমন আছেন?' 'আপনার অবস্থা কি?' 'সবকিছুতে আপনার প্রশান্তি হোক' ইত্যাদি।

উচ্চারণ ব্যতীত শুধু ইশারার মাধ্যমে সালাম দেয়া বেদ'আত। অনেকে এভাবে করেন। হাঁ, কেউ যদি দূর থেকে মুখে সালাম উচ্চারণ করা সত্ত্বেও সালাম শুনতে না পায়, তখন হাত দিয়ে ইশারা করা জায়েয আছে। তখন ইশারা হবে সালামের প্রমাণ, সালামের বিকল্প নয়। জওয়াবের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য।

অনুমতি গ্রহণের হুকুম

ইসলাম অনুমতি গ্রহণের বিধান জারী করে ছোট-বড় সকল মানবিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক, বন্ধন ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করে মুসলিম সমাজকে নেক ও তাকওয়ার উপর ভিত্তিশীল সমাজ গঠনে উদ্বুদ্ধ করে।

অনুমতি গ্রহণের বিষয়ে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত হচ্ছে দলীল :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ....وَمَا تَكْتُمُوْنَ.

'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্য অনেক পবিত্রতা রয়েছে এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ তা ভালভাবে জানেন। যে গৃহে কেউ বাস করে না, যাতে তোমাদের সামগ্রী আছে এমন গৃহে প্রবেশ করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই এবং আল্লাহ জানেন তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর।' (সূরা নূর : ২৭-২৯)

এ আয়াতগুলো একজন মুসলমানকে তার ঘর ব্যতীত অন্য স্থানে প্রবেশের আদব-কায়দা শিক্ষা দেয় যদি তা সাধারণ কোন স্থানে না হয়। এক্ষেত্রে হাদীস

www.amarboi.org

আরও সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করেছে। কারো কাছে প্রবেশের বিধি-নিষেধ গুলো নিম্নরূপ :

১. অনুমতি ব্যতীত কারো বাড়ীতে প্রবেশ করা হারাম। কোরআন উল্লেখিত আয়াতে পরিষ্কার তা নিষেধ করেছে। কেননা, ঘর-বাড়ী মানুষের মালিকানায় আছে। তাই তা থেকে উপকৃত হওয়ার বিষয়টি তার বিশেষ মালিকানাধীন বিষয়। ভাড়ায় থাকলে কেবল ঘর থেকে উপকৃত হয়। মালিকানা হোক আর ভাড়াই হোক, সর্বাবস্থায় অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করলে মালিকানার অধিকার লংঘন হয়। আর এটা হারাম।

২. বাড়ীর মালিক থেকে তিনবার অনুমতি চাইতে হবে। অনুমতি না পেলে ফিরে যেতে হবে। নবী (সা) বলেছেন :

اَلْاِسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ، فَاِنْ اُذِنَ لَكَ وَاِلاَّ فَارْجِعْ.

'অনুমতি তিনবার চাইতে হবে। অনুমতি দিলে প্রবেশ করবে, আর না দিলে ফিরে যাবে।' (বোখারী, মুসলিম)

৩. অনুমতি পাবার আগে কারো ঘরে নজর করা যাবে না এবং এ জন্য কারো ঘরের দরজা বরাবর দাঁড়াবে না। দরজার ডানে কিংবা বাঁয়ে দাঁড়াতে হবে। কেননা, হাদীসের মধ্যে এসেছে :

اِنَّمَا جُعِلَ الاِسْتِئْذَانُ مِنْ اَجْلِ الْبَصَرِ .

'দেখার জন্যই অনুমতির নিয়ম চালু হয়েছে।'

৪. অনুমতি চাওয়ার পর যদি জিজ্ঞেস করা হয়, 'আপনি কে?' তখন উত্তরে 'আমি' বলা মাকরূহ। কেননা, 'আমি' শব্দ দ্বারা অনুমতি প্রার্থনাকারীকে বুঝা যায় না। আর এটা হচ্ছে, অহংকারীদের লক্ষণ। বরং উত্তরে নিজের নাম বা প্রসিদ্ধ কোন উপাধির কথা উল্লেখ করতে হবে। একদল বর্ণনাকারী হযরত জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন, 'আমি নবী করিম (সা)-এর কাছে আমার বাপের ঋণের বিষয়ে আসলাম এবং দরজায় আওয়াজ দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কে? আমি বললাম, 'আমি।' তিনি বললেন, আমি, আমি! তিনি যেন এ উত্তরকে অপছন্দ করলেন।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত। আবু বকর সিদ্দিক (রা) নবী করিম (সা)-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কে? তিনি বলেন, আমি আবু বকর। হযরত ওমার এবং ওসমান (রা)ও অনুরূপ করেছেন। উম্মে হানি

www.amarboi.org

বিনতে আবু তালিব রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে অনুমতি চাইলে তিনি জিজ্ঞেস করেন কে? তিনি বলেন, আমি উম্মে হানি। এ রকম উদাহরণ আরও অনেক। মানুষের উচিত এমনভাবে নাম বলা যেন পরিচয় বুঝা যায় এবং বিনয় সহকারে তা করতে হবে।

৫. রিবঈয়া বিন খিরাস থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনি আ'মের গোত্রের এক লোক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী (সা)-এর ঘরে তাঁর কাছে অনুমতি চান এবং বলেন, আমি কি প্রবেশ করবো? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ খাদেমকে বলেন, যাও, তাকে অনুমতির পদ্ধতি শিক্ষা দাও। তাকে বল, 'আসসালামু আলাইকুম' বল এবং জিজ্ঞেস কর, আমি কি প্রবেশ করতে পারি? লোকটি তা শুনে বলেন, আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করতে পারি? তারপর নবী (সা) তাকে অনুমতি দেন ও সে প্রবেশ করে।' (আবু দাউদ)

এই হাদীসে সালাম দানের আগে অনুমতি প্রার্থনা করা হয়েছে। আর কোরআনের আয়াতে সালামের আগে অনুমতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে ওলামায়ে কেরাম মতভেদ পোষণ করেন, প্রথমে কোনটি হবে? প্রথমে কি সালাম দেবে এবং পরে অনুমতি চাবে, না এর বিপরীত করবে? ইমাম নববী (র) বলেছেন, অনুমতি চাওয়ার আগে সালাম দেয়াই বিশুদ্ধ পদ্ধতি। অন্য আরেক মত অনুযায়ী আগে অনুমতি চাওয়াই উত্তম। তৃতীয় মত অনুযায়ী, পরিস্থিতি অনুযায়ী তা নির্ধারিত হবে। যেমন, ঘরের মালিককে যদি দেখা যায়, তাহলে প্রথমে তাকে সালাম দিয়ে পরে অনুমতি চাইতে হবে। আর যদি তাকে দেখতে না পাওয়া যায়, তাহলে প্রথম অনুমতি চাওয়া ও পরে সালাম দিতে হবে। আজ-কালকের পরিস্থিতি হচ্ছে, লোকেরা এসে দরজায় আওয়াজ দেয় কিংবা কলিং বেল বাজায়। তখন ঘরের মালিক কিংবা চাকর বেরিয়ে আসে। এমতাবস্থায় তাদেরকে সালাম দিয়ে পরে অনুমতি চাইতে হবে। সামান্য দেরী করে প্রবেশ করা উচিত, যেন ঘরের মালিক নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়ার সময় পায়। কোন সময় মালিক আওয়াজ শুনা মাত্রই বলে, অনুগ্রহ করে প্রবেশ করুন। অথচ তিনি নিজেকে প্রস্তুত করার সময়টুকু পাননি। একটু সময় পেলে প্রস্তুতি নিতে সুবিধে।

৬. মা-বোন ও অন্যান্য মুহরাম আত্মীয়াদের কাছে প্রবেশের সময়ও অনুমতি নিতে হবে যেন তাদের খোলা অঙ্গের প্রতি নজর না পড়ে কিংবা অপছন্দনীয় অবস্থায় তাদের কাছে পৌঁছা থেকে বাঁচা যায়। ইবনু মাসুদ (রা) বলেছেন, তোমাদের উচিত, তোমাদের মা-বোনদের কাছে প্রবেশের আগে অনুমতি নেয়া।

www.amarboi.org

তাউস বলেছেন, আমি মুহরাম আত্মীয়ার সতর দেখার চাইতে অন্য কোন কিছুকে এত বেশী অপছন্দ করি না।

৭. স্ত্রীর যে অবস্থা স্বামীর কাছে অপছন্দনীয়, স্বামীর উচিত, স্ত্রীকে তা শিক্ষা দেয়া। আবদুল্লাহ বিন মাসউদের স্ত্রী যয়নাব থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ কোন কাজ সেরে ঘরে ফিরে আসলে দরজায় পৌঁছে গলায় শব্দ করতেন যেন আমরা তার অপছন্দনীয় কোন পরিস্থিতিতে না থাকি।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি ঘরে প্রবেশ করলে আগে জোরে কথা বলতেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন, কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে, মোস্তাহাব হল গলায় আওয়াজ দিয়ে কিংবা জুতার শব্দ করে নিজের উপস্থিতির খবর দেয়া।

মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ (সা) স্বামীদেরকে নিষেধ করেছেন, তারা যেন স্ত্রীদের বিরুদ্ধে আকস্মিক অপবাদ ও খেয়ানতের অভিযোগ না আনে।

৮. কোন মুসলমান অন্য মুসলমানের ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার পর মালিক যদি অনুমতি না দেয় এবং ওজর পেশ করে যে, তিনি ব্যস্ত কিংবা ঘরে প্রবেশের মত অবস্থা নেই অথবা অন্য কোন কারণ, চাই তা উল্লেখ করুক বা না করুক, সর্বাবস্থায় সেই ওজর গ্রহণ করা জরুরী এবং কোন রাগ, ক্ষোভ অথবা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছাড়াই ফিরে আসা মনের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতার অনুকূল। আর এটা কোরআনে বর্ণিত আয়াতে দয়া-মায়া ও ক্ষমার স্পিরিটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ বলেন :

وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْلَمُوْنَ عَلِيْمٌ.

'যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তাহলে তোমরা ফিরে যাবে। এটা তোমাদের জন্য বিশুদ্ধতম। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।' (সূরা নূর : ২৮)

'ফিরে যাও' এ বাক্য ছাড়াও যদি অন্য কোন বাক্য দ্বারা ফিরে যাওয়ার অর্থ বুঝায় তাহলেও ফিরে আসতে হবে।

www.amarboi.org

৯. যদি কারো এমন ঘর থাকে যাতে সাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার রয়েছে, যেমন, গেষ্ট হাউজ, মুসাফিরখানা, সরাইখানা ইত্যাদি, তাতে মালিক থাক বা না থাক, সেখানে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা যাবে। তবে শর্ত হল, তাতে সাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার ঘোষিত হতে হবে। অনুরূপভাবে, বাজার, দোকান-পাট, কল-কারখানা, প্রদর্শনী, যাদুঘর ও পাঠাগারসহ বিভিন্ন স্থানে প্রবেশের জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ বলেছেন :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ.

'যে ঘরে কেউ বাস করে না, যাতে তোমাদের সামগ্রী আছে এমন ঘরে প্রবেশে তোমাদের গুণাহ হবে না এবং আল্লাহ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর।' (সূরা নূর : ২৯)

আল্লাহ আরো বলেন :

'হে মোমেনগণ! তোমাদের দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের নামাজের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা কাপড় খুলে রাখ এবং এশার নামাজের পর। এ তিন সময় তোমাদের শরীর খোলার সময়। এ সময়ের পর তোমাদের ও তাদের জন্য কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।' (সূরা নূর : ৫৮)

ইবনু কাসীর তাঁর তাফসীরে বলেন, এই আয়াতে আত্মীয়দেরকে পরস্পরের অনুমতি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সূরা নূরের প্রথম দিকের আয়াতে অনাত্মীয়দের পরস্পরের অনুমতির কথা বলা হয়েছে।

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ মোমেনদেরকে আদেশ করেছেন যেন তাদের দাস-দাসী ও নাবালেগ শিশুরা তিন সময়ে তাদের কাছে প্রবেশের অনুমতি চায়।

১. ফজরের নামাজের আগে। কেননা, তখন লোকেরা তাদের বিছানায় শোয়া থাকে।

২. দুপুরে বিশ্রামের সময় যখন সকল কাপড় খুলে ফেলে এবং আচ্ছাদন ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট না রাখে। কিংবা শুধু মোটা ও ভারী পোষাক খুলে ফেলে।

www.amarboi.org

৩. এশার নামাজের পর। এটা ঘুমের সময়। এ সময় দাস-দাসী এবং ছোট শিশুদেরকে প্রবেশের জন্য অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হতে পারে এ সময় কক্ষবাসীরা এমন অবস্থায় থাকতে পারে যা অত্যন্ত বিব্রতকর ও আপত্তিকর। এই তিন সময় ছাড়া অন্য সময়গুলোতে তারা বিনা অনুমমিতে প্রবেশ করতে পারে। কেননা, তাদের কাজের প্রকৃতিই হচ্ছে, কক্ষ থেকে কক্ষে ঘোরাফেরা করা।

বালক যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তাহলে তাকে সর্বাবস্থায় প্রবেশের অনুমতি নিতে হবে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, বড় আত্মীয়রা পরস্পর পরস্পরের অনুমতি নেবে। চাই আত্মীয় মা-বাপ হোক বা ভাই-বোন হোক। যারা বলেন, উপরোক্ত আয়াত দু'টো রহিত হয়ে গেছে, এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোন শক্তিশালী দলীল নেই। দাস-দাসী ও চাকর-চাকরানীদের মধ্যে পার্থক্য আছে। দাস-দাসীর সাথে মুহরাম আত্মীয়ের মত আচরণ করা হয়। কিন্তু বর্তমান যুগের চাকর-চাকরানীরা অমুহরাম। তাদের সাথে পূর্ণ পর্দা রক্ষা করতে হবে। চাকর-চাকরানীর ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করলে এর কুফল অনেক বেশী। তারা যদি অমুসলমান হয় তাহলে কুফলের পরিমাণ আরো অনেক বেশী হবে।

আয়াতে যে শিশুর অনুমতির নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে শিশুকে সে যা করে তা বুঝার ক্ষমতা নারী-পুরুষের সতর সম্পর্কে উপলব্ধিবোধ এবং ভাল-মন্দ পার্থক্যকারী হতে হবে। সে যেন তা বর্ণনা করার যোগ্যতা অর্জনকারী হয়। তবে, যে শিশু এ পর্যায়ে পৌছেনি, যে কোন সময়ে তার প্রবেশ ও প্রস্থানে দোষ নেই। এমনকি মা-বাপের কক্ষে ঘুমানোও তার জন্য নিষিদ্ধ নয়। আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, পার্থক্যবোধকারী শিশু, মাতা-পিতার কক্ষে বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়া ঘুমুতে পারে না। বর্তমান যুগে ঘরের প্রত্যেক কক্ষে পরিবারের বিভিন্নজন থাকে। দরজা বন্ধ থাকলে বুঝা যাবে যে প্রবেশের অনুমতি নেই এবং খোলা থাকলে বুঝা যাবে প্রবেশের অনুমতি আছে।

ইসলাম মানব জীবনকে দয়া-মায়া সহকারে এবং কঠোরতা ও সংকীর্ণতাকে প্রত্যাহার করে অতুলনীয় উন্নত আদব শিষ্টাচারের ভিত্তিতে সুসংগঠিত করে। আমরা ইসলামের সকল নিয়ম মেনে চললে, মানুষের সামনে সর্বোচ্চ শিষ্টাচার ও ভদ্রতা, উত্তম শৃংখলা ও সর্বোৎকৃষ্ট জীবন তুলে ধরতে পারি।

www.amarboi.org

হাঁচির জবাব

আরবীতে হাঁচির জবাবকে شمت কিংবা سمت বলে। অর্থ হল, বরকত ও কল্যাণের দো'আ করা। অর্থাৎ আল্লাহ যেন তাকে হাঁচিপূর্ব প্রশান্তি, সম্মান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আরাম ফিরিয়ে দেন। মূলতঃ হাঁচির জবাবে হাঁচিদাতার জন্য দয়া, রহমত এবং বরকত কামনা করা হয়।

জাহেলীয়াতের দৃষ্টিভঙ্গী

জাহেলিয়াত যুগে লোকেরা হাঁচিদানকারীকে অশুভ বিবেচনা করত। তাদের প্রিয়জন হাঁচি দিলে বলত, عُمْراً وَشَبَاباً 'তোমার বয়স ও যৌবন কল্যাণময় হোক।' আর অপ্রিয় লোক হাঁচি দিলে বলত, وَرْيًا وَقُحَابًا অর্থাৎ 'তোমার ধ্বংসাত্মক কলিজায় রোগ ও সর্দি-কাশি হোক।' এর দ্বারা আন্দাজ করা যায় তারা হাঁচিকে কত অশুভ বিবেচনা করত। ইসলামের আগমন এবং মহানবী (সা) কর্তৃক জাহেলিয়াতের গোমরাহী ও মিথ্যাচারকে বাতিল ঘোষণার পর তিনি নিজ উম্মতকে অশুভ বিষয় ভাবা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেন। বরং তিনি হাঁচিদানকারীর জন্য দো'আর পদ্ধতি চালু করেন। তিনি হাঁচিদানকারীর জন্য সংশোধন, দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দিয়ে বলেন, হাঁচি শুনলে বলবে,

يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ وَيَهْدِيكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

হাঁচি সংক্রান্ত ইসলামের হুকুমগুলো হচ্ছে–

১. আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاوُبُ فَاِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللّٰهَ كَانَ حَقًّا عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ اَنْ يَّقُوْلَ لَهُ، يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَاَمَّا التَّثَاوُبُ فَاِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ.

"আল্লাহর কাছে হাঁচি পছন্দনীয় এবং হাই তোলা অপছন্দনীয়। তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করলে অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ বললে, যে মুসলমান

www.amarboi.org

তা শুনবে তার জন্য 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বলা কর্তব্য হয়ে যায়। আর হাই শয়তানের কাছ থেকে আসে। তোমাদের কারো হাই আসলে সাধ্যমত তা প্রতিরোধের চেষ্টা করবে। তোমাদের কেউ হাই তুললে শয়তান তাকে দেখে হাসে।" (বোখারী)

আল্লাহর কাছে হাঁচি যে পছন্দনীয়, এ হাদীস তার প্রমাণ। কেননা, এর ফলে মাথা হালকা হয় এবং উপলব্ধি শক্তি স্পষ্ট হয়, যা হাঁচিদাতাকে নেক ও আনুগত্যের কাজে উদ্বুদ্ধ করে। হাই তোলা এজন্য অপছন্দনীয় যে, তা ব্যক্তিকে আনুগত্য থেকে দূরে রাখে এবং তার মধ্যে উদাসীনতা সৃষ্টি করে। আর শয়তান তাতে খুশী হয়।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী ফাতহুল বারীতে লিখেছেন, যে হাঁচি সর্দি উদ্ভূত নয়, তা প্রশংসিত।

ওলামায়ে কেরাম হাঁচির জওয়াবের বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেন।

অধিকাংশ জাহেরী মতাবলম্বী মালেকী মাজহাবের ইবনু মোজাইয়েন এবং ইমাম ইবনুল কাইয়্যেমের মতে, উল্লেখিত হাদীস অনুযায়ী হাঁচিদাতার জওয়াব দেয়া ফরজে আইন, যদি সে হাঁচিদাতার আলহামদুলিল্লাহ শুনে। অন্য একদলের মতে, হাঁচির জবাব দেয়া ফরজে কেফায়া। একজন জবাব দিলে অন্যদের দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। এটা হচ্ছে, আবুল ওয়ালিদ বিন রুশদ এবং মালেকী মাজহাবের অনুসারী ইবনুল আ'রাবীর মত। হানাফী এবং অধিকাংশ হাম্বলী মাজহাবের অনুসারীদেরও একই মত। ইবনু দাকীক আল-ঈদ এটাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি বলেন, হাঁচির জওয়াব দানের জন্য সাধারণভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা হচ্ছে, ফরজে কেফায়াহ যা সকলকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কিছু লোকের কাজ দ্বারা অন্যদের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে।

আবদুল ওহাব এবং মালেকী মাজহাবের অন্য এক দলের মতে, হাঁচির জবাব দেয়া মোস্তাহাব। দলের পক্ষ থেকে একজন জবাব দিলেই যথেষ্ট। এটা শাফেঈ মাজহাবেরও বক্তব্য।

২. হাঁচিদাতার কি বলা মোস্তাহাব?

ইমাম নববী 'আজকার' কিতাবে বলেছেন, হাঁচিদাতার জন্য 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা মোস্তাহাব। যদি কেউ 'আলহামদুলিল্লাহে রাব্বীল আ'লামীন' কিংবা

www.amarboi.org

'আলহামদুলিল্লাহ আ'লা কুল্লি হাল' বলে, সেটা উত্তম। আবু দাউদসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে সে যেন বলে, আলহামদুলিল্লাহ আ'লা কুল্লি হাল।'

ইমাম আহমদ এবং নাসাঈ সালেম বিন ওবায়েদ থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে সে যেন বলে, 'আলহামদুলিল্লাহ আ'লা কুল্লীহাল' কিংবা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বীল আলামীন।'

হাঁচিদাতার জন্য মোস্তাহাব হচ্ছে, 'আলহামদুলিল্লাহ' জোরে বলা যাতে অন্যরা শুনে এবং জওয়াব দিতে পারে। অনুরূপভাবে, হাঁচির সময় মুখে হাত বা কাপড় দেয়াও মোস্তাহাব। এর ফলে, হাঁচির আওয়াজ ক্ষীণ হবে। এ মর্মে আবু হোরায়রা (রা) বলেন, 'নবী (সা) হাঁচি দিলে মুখে হাত বা কাপড় দিতেন এবং এর মাধ্যমে আওয়াজ ছোট কিংবা বন্ধ করতেন। (বর্ণনাকারীর সন্দেহ যে, তিনি ছোট বলেছেন না বন্ধ বলেছেন)। তিরমিযী এটাকে হাদীসে হাসান বলেছেন।

৩. হাঁচির জবাব কে পেতে পারে?

যে ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে শুনা যায় মত আওয়াজে আলহামদুলিল্লাহ বলে না, তাকে জবাব দেয়া যায় না। আবু মূসা আশআরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা কেউ হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে তার জওয়াব দাও। আর হামদ না বললে তার জবাব দেবে না।' (মুসলিম)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি নবী (সা)-এর কাছে হাঁচি দিল। তিনি একজনের হাঁচির জওয়াব দিলেন। কিন্তু অন্যজনের জবাব দিলেন না। তিনি যার জবাব দেননি সে বলল, অমুক হাঁচি দিয়েছে, তিনি জবাব দিলেন। আর আমি হাঁচি দিয়েছি তিনি জবাব দেননি। তখন নবী (সা) বলেন, সে আল্লাহর হামদ করেছে। কিন্তু তুমি তা করনি।' (আহমদ, বোখারী, মুসলিম)

হাঁচিদাতা যদি আল্লাহর হামদ ছাড়া অন্য কিছু বলে তাহলে তার জওয়াব দেয়া যাবে না।

শিশু, নওমুসলিম এবং মূর্খদেরকে হাঁচির জবাব শিক্ষা দেয়া দরকার। জিম্মী নাগরিকের হাঁচির জওয়াব দেয়া জরুরী নয়। তারা যদি আল্লাহর হামদ বলে, তথাপি তাদের উত্তর দেয়া মোস্তাহাব নয়। তবে তাদেরকে এরূপ বলা জায়েয আছে যে, 'ইয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলেহ বালাকুম'।

www.amarboi.org

আবু মূসা আশআরী থেকে বর্ণিত। ইহুদীরা রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে কৃত্রিম হাঁচির চেষ্টা চালাত যেন তিনি তাদের জন্য 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে রহমতের দো'আ করেন। কিন্তু তিনি বলতেন, 'ইয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলেহ বালাকুম'। (আবু দাউদ, তিরমিযী। তিরমিযী এটাকে হাদীসে হাসান বলেছেন)।

নামাজ পড়া অবস্থায় হাঁচিদাতার হামদ শুনে জওয়াব দেয়া যাবে না। কেননা, নামাজ ঐ কাজের স্থান নয়। কেউ একাধিক হাঁচি দিলে তিনবার পর্যন্ত জবাব দেয়া সুন্নাত। এরপর হাঁচি দিলে তার সর্দি হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে এবং তার আরোগ্য লাভের জন্য দো'আ করতে হবে।

সালাম বিন আকওরা থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর কাছে হাঁচি দিল। আমি নিজে তা দেখেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'। সে ২য় ও ৩য় বারও হাঁচি দিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'ইয়ারহামুকাল্লাহ', এ ব্যক্তির সর্দি লেগেছে'। (আবু দাউদ, তিরমিযী এটাকে হাসান হাদীস বলেছেন)

৪. হাঁচিদাতার প্রতি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' কিংবা 'রাহেমাকুল্লাহ' বলে জওয়াব দেয়া যেতে পারে।

৫. জবাবদানকারীর প্রতি হাঁচিদাতা বলবেন, 'ইয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলেহ বালাকুম।' অর্থ 'আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং তোমাদের সংশোধন করুন।' কিংবা বলবেন, 'ইয়াগফেরুল্লাহ লানা ওয়া লাকুম'। ইমাম মালেক ও শাফেঈ'র মতে, এ দু'টোর যেকোন একটা নির্বাচন করতে হবে।

৬. সুন্নতের উপর আমলের বরকত

ইবনু হাজার আসকালানী 'ফাতহুল বারী'তে উল্লেখ করেছেন, ইবনে আবদুল বার আবু দাউদ থেকে ভাল সনদসহকারে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ নৌকাতে আরোহণ করেন। তিনি এক হাঁচিদাতাকে কূলে হাঁচি দিয়ে আল্লাহর হামদ বলতে শুনলেন। তিনি এক দেরহাম দিয়ে একটি নৌকা ভাড়া করে হাঁচিদাতার কাছে আসেন এবং তাকে জবাব দিয়ে ফিরে যান। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, তার দো'আ হয়তো কবুল হতে পারে। তারা শুয়ে পড়লে এক ব্যক্তি নৌকার আরোহীদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকল যে, আবু দাউদ এক দেরহামের বিনিময়ে বেহেশত কিনে নিয়েছে।'

www.amarboi.org

৭. নামাজে হাঁচি দিলে কারো মতে তাকে মনে মনে শব্দহীন হামদ বলতে হবে। অন্যদের মতে, শব্দের উচ্চারণ এমন হতে হবে যেন নিজে শুনতে পায়। আরেক মত অনুযায়ী, মনে মনে কিংবা শব্দের উচ্চারণ কোনটাই করা যাবে না। অর্থাৎ হামদ বলবে না।

৮. হাই আসার সময় সাধ্যমত হাই প্রতিরোধ করা সুন্নাত। এ মর্মে ইতিপূর্বে একটি সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 'যদি তা প্রতিরোধ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে মুখের উপর হাত রাখতে হবে। এমনকি নামাজের মধ্যেও।

মুসলিম শরীফে আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন:

اِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلٰى فَمِهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ.

'তোমাদের কারো হাই আসলে সে যেন হাত দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখে। কেননা শয়তান মুখে ঢুকে পড়ে।'

সহীহ হাদীসে আরো এসেছে, হাই তোলার সময় হা--হা--বললে শয়তান হাসে।

কসমের বাস্তবায়ন

কেউ কোন বিষয়ে কসম করলে তাকে সে কসম পূর্ণ করার ব্যাপারে সহযোগিতা করা দরকার। অর্থাৎ কোন মুসলমান যদি কোন কাজ করা বা না করার জন্য কসম খায়, তাহলে অন্য মুসলমান ভাইয়ের জন্য সুন্নত পদ্ধতি হল, তাকে কসম ভাঙ্গার কবলে পড়া থেকে রক্ষা করা। বরং তার কসম পূর্ণ বা বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করা দরকার।

কিন্তু বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যার বিষয়ে আলোচনা করবেন বলে কসম করেছিলেন। নবী (সা) তাঁকে বলেন, 'কসম খেয়োনা।' তাঁর কসম পূর্ণ করা হয়নি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কসম পূর্ণ করতে দেয়া জরুরী নয়। এক্ষেত্রে যে হাদীসটি দলীল হিসেবে পেশ করা হয় তাহল :

اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ اَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَاِبْرَارِ الْقَسَمِ اَوِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَاِجَابَةِ الدَّاعِىْ وَاِفْشَاءِ السَّلَامِ.

www.amarboi.org

রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে ৭টি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে ১. রোগীর সেবা ২. জানাযায় অংশগ্রহণ ৩. হাঁচিদাতার হাঁচির জওয়াব দান ৪. কসম পূরণ কিংবা কসমকারীর কসম পূর্ণ করতে দেয়া ৫. নির্যাতিত মানুষের সাহায্য ৬. দাওয়াত দানকারীর আমন্ত্রণ গ্রহণ এবং ৭. সালামের প্রসার করা।' (বোখারী, মুসলিম)

মুসলমানের উচিত, অন্য ভাইয়ের সাথে সদয় ও নরমভাবে চলা। কোন মুসলমান কসম খেলে তাকে কসম ভাঙ্গার মত পরিস্থিতিতে ফেলা ঠিক নয়। কসমে কষ্ট রয়েছে। তাই কসম করার আগে চিন্তা করা উচিত।

মুসলমানের প্রতি নসীহত করা

ইমাম মুসলিম তামিম দারী থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) বলেছেন :

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.

'দীন হচ্ছে নসীহত বা হিতাকাঙ্ক্ষার উপদেশ। আমরা প্রশ্ন করলাম, কার উদ্দেশ্যে এ নসীহত! তিনি বললেন, আল্লাহ, তাঁর রাসূল, কিতাব, মুসলমানের নেতা ও সাধারণ মুসলমানের উদ্দেশ্যে।

ইমাম মুসলিম জারীর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'আমি নবী (সা)-এর কাছে শুনা ও আনুগত্যের বাইয়াত গ্রহণ করেছি। তিনি আমাকে আমার সাধ্যমত শিক্ষা দেন এবং সকল মুসলমানের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষা বা উপদেশের নির্দেশ দেন।'

ইমাম নববী বলেছেন, এটা এক মহান হাদীস এবং এর উপর ইসলামের পরিচয় নির্ভরশীল।

আল্লামা খাত্তাবী বলেছেন, 'নসীহত' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এর অর্থ হল, নসীহত বা উপদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তির কল্যাণ কামনা। বলা হয় যে, এটি একটি সংক্ষিপ্ত শব্দ অথচ ব্যাপক অর্থ প্রকাশকারী। আরবী ভাষায় দো'জাহানের উন্নতি ও কল্যাণের এমন দ্বিতীয় ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ আর নেই।

কেউ বলেছেন, নসীহত শব্দটি আরবীতে কাপড় সেলাইর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তারা হিতাকাঙ্ক্ষী উপদেশদানকারীকে সেলাইর মাধ্যমে কাপড়ের ত্রুটি দূরকারীর সাথে তুলনা করে বলেছেন, এ ব্যক্তিও উপদেশের মাধ্যমে অন্যের ত্রুটির

www.amarboi.org

সংশোধন ও কল্যাণ কামনা করেন। কেউ কেউ বলেছেন, নসীহত শব্দটি মৌচাক থেকে মধুকে পরিষ্কার করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তারা উপদেশদানকারীর ধোঁকা ও প্রবঞ্চনামুক্ত কথাকে মধুকে মোমমুক্ত করার সাথে তুলনা করেছেন।

এ সকল অর্থের ভিত্তিতে ইমাম নববী বলেছেন, দীনের খুঁটি ও ভিত্তি হচ্ছে নসীহত বা হিতাকাঙ্ক্ষা। যেমনি বলা হয়ে থাকে, আরাফাতে অবস্থানই হজ্জ অর্থাৎ হজ্জের মূল রুকন।

আল্লাহর উদ্দেশ্যে নসীহতের অর্থ হল, তাঁর প্রতি সঠিক ঈমান, তাঁর সাথে শিরক না করা এবং তাঁকে সকল ত্রুটি বিচ্যুতির উর্ধ্বে মনে করা, তাঁর নাম ও গুণাবলীতে কুফরী না করা, তাঁকে সকল পূর্ণতা ও উজ্জ্বলতার প্রতীক বিবেচনা করা, তাঁর আনুগত্য করা, গুনাহ থেকে দূরে থাকা, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসা এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কারণে কারো প্রতি রাগ করা, আল্লাহর আনুগত্যকারীদের সাথে বন্ধুতা এবং গুনাহগারদের বিদ্বেষ পোষণ, তাঁর সাথে কুফরকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, তাঁর নেয়ামতের স্বীকৃতি ও শুকরিয়া আদায় করা, সকল বিষয়ে আন্তরিকতা ও এখলাস পোষণ করা, আল্লাহর সকল গুণাবলীকে সামনে রেখে প্রার্থনা করা এবং এ সকল বিষয়ে লোকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার বিষয়ে আগ্রহ পোষণ করা। ইমাম নববী ইমাম খাত্তাবীর উপরোক্ত বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। ইমাম খাত্তাবী আরো বলেছেন, আল্লাহর উদ্দেশ্যে নসীহতের অর্থ মূলতঃ বান্দার নিজের নসীহতকেই বুঝায়। অন্যথায়, আল্লাহ বান্দার নসীহতের মুখাপেক্ষী নয়, বরং এর উর্ধ্বে। আল্লাহর কিতাব বা কোরআনের উদ্দেশ্যে নসীহতের বা হিতাকাঙ্ক্ষার অর্থ হল : একথা বিশ্বাস করা যে, এটা আল্লাহর কিতাব-এর সাথে মানুষের কথার কোন তুলনা হয় না। একে সম্মান করা, উপযুক্তভাবে তেলাওয়াত করা, সুন্দরভাবে পাঠ করা এবং বিনয়ের সাথে অধ্যয়ন করা, প্রতিটি অক্ষরের মাখরাজ ও ধ্বনি ঠিকমত উচ্চারণ করা, অপব্যাখ্যাকারী ও বিকৃতকারীদের মোকাবিলা করা, কোরআনে বর্ণিত বিষয়গুলোকে বিশ্বাস করা, এর হুকুম ও বিধান মেনে চলা, এর জ্ঞান ও উদাহরণ বোঝা, শিক্ষা গ্রহণ করা, এর অলৌকিক বিষয়সমূহে চিন্তা-গবেষণা করা, এর হেকমত অনুযায়ী আমল করা এবং মোতাশাবেহ বা অবোধগম্য বিষয়গুলো বিশ্বাস করা।

রাসূলুল্লাহর (সা) উদ্দেশ্যে নসীহতের বা হিতাকাঙ্ক্ষার অর্থ হল : তাঁর নবুওতের উপর এবং তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সেগুলোকে বিশ্বাস করা, তাঁর আদেশ-নিষেধের আনুগত্য করা, তাঁর শত্রুদের প্রতি শত্রুতা পোষণ এবং বন্ধুদের

www.amarboi.org

প্রতি বন্ধুতা পোষণ, তাঁর অধিকারকে বড় মনে করা এবং সম্মান করা, তাঁর পদ্ধতি ও সুন্নাতকে জীবিত করা, তাঁর দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়া, তাঁর শরীয়ত প্রসারিত করা, শরীয়াহর বিরুদ্ধে আনীত অপবাদ অস্বীকার করা, এগুলো বুঝার চেষ্টা করা, এর প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়া. এগুলো শিখা ও শিখানোর ব্যাপারে আগ্রহ থাকা, এগুলোকে সম্মান ও শ্রেষ্ঠ মনে করা, এগুলো পড়ার সময় তাদের রক্ষা এবং এলেম ব্যতীত এগুলো সম্পর্কে কথা না বলা; শরীয়তের আলেমদেরকে সম্মান করা এবং নবী (সা) এর চরিত্র গ্রহণ করা, শিষ্টাচার গ্রহণ করা, তাঁর পরিবার-পরিজনকে ভালবাসা, সুন্নাতের ব্যাপারে কেউ বেদআত করলে তা থেকে দূরে থাকা কিংবা কেউ সাহাবায়ে কেরামকে গালি-গালাজ করলে তা থেকেও দূরে অবস্থান করা।

মুসলমানদের নেতা বা ইমামের (রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এবং দলীয় ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ) জন্য হিতাকাঙ্ক্ষা বা নসীহতের অর্থ হল, সত্যের বিষয়ে তাদের সহযোগিতা এবং ঐ বিষয়ে তাদের আনুগত্য করা, তাদেরকে সত্যের উপর অটল থাকার জন্য বলা। নম্রতা ও ভদ্রতার সাথে তাদেরকে উপদেশ দেয়া। তারা যেসব বিষয়ে বিশেষ করে মুসলমানদের অধিকারের বিষয়ে উদাসীন, সে সব বিষয়ে তাদেরকে সজাগ করা, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা, তাদের আনুগত্যের ব্যাপারে লোকদেরকে উৎসাহিত করা। শর্ত হল, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর হালাল-হারাম অনুযায়ী চলেন।

তাদের হিতাকাঙ্ক্ষার মধ্যে রয়েছে, তাদের পেছনে নামাজ পড়া। জেহাদ করা, তাদের কাছে যাকাত আদায় করা, কোন খারাপ পরিস্থিতিতে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ না করা, তাদের মিথ্যা প্রশংসা না করা এবং তাদের কল্যাণের জন্য দো'আ করা। মুসলমানের দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোন নেতা, খলীফা, আমীর সবার জন্য এ শুভাকাঙ্ক্ষা প্রযোজ্য।

ইমাম ও শাসক ব্যতীত সাধারণ মুসলমানদের প্রতি নসীহতের অর্থ হলো, তাদের দুনিয়া আখেরাতের পথ বাতলানো। তাদেরকে কষ্ট না দেয়া, তাদের গোপনীয়তা ঢেকে রাখা। তাদের প্রয়োজন পূরণ করা, তাদেরকে ক্ষতি থেকে বাঁচানো। তাদের উপকার করা, ভদ্রভাবে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ করা, তাদেরকে ভালবাসা, বড়দেরকে শ্রদ্ধা করা, ছোটদেরকে স্নেহ করা, তাদেরকে ভাল উপদেশ দেয়া, তাদেরকে ধোঁকা না দেয়া, হিংসা না করা ও

www.amarboi.org

দীনের যে সকল বিষয়ে তারা অজ্ঞ, সে সকল বিষয়ে জ্ঞান দান করা, নিজের জন্য যা পছন্দ করে তাদের জন্যও তা পছন্দ করা, আর নিজের জন্য যা অপছন্দ করে, অন্যের জন্যও তা অপছন্দ করা এবং তাদের ইজ্জত সম্মান ও সম্পদের হেফাজত করা।

ইবনু বাত্তাল বলেছেন, নসীহত ফরজে কেফায়া। একজন করলে অন্যজনের উপর থেকে তা আদায় হয়ে যায়, সামর্থ অনুযায়ী নসীহত করা জরুরী।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেছেন, জিম্মীকে নসীহত করার দায়িত্ব মোমেনের নয়। মুসলমানকে কেবল মুসলমানের প্রতিই নসীহত করবে। হাদীসে এসেছে :

اَلنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ 'সকল মুসলমানের উদ্দেশ্যেই নসীহত।'

কোন মুসলমানের চাওয়া ছাড়াই কি আরেক মুসলমান তাকে নসীহত করতে পারে, না কি নসীহত চাইলে তখন নসীহত করা যায়? এক্ষেত্রে দু'টো মত আছে, এক হচ্ছে, না চাইলেও নসীহত করা যায়। দুই হচ্ছে, চাইলে কেবল নসীহত করা যায়। হাদীসে এসেছে, মুসলমানের উপর মুসলমানের ৫টি অধিকার আছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে : নসীহত চাইলে নসীহত করতে হবে।

যদি মুসলমানরা তাদের অন্য ভাইদের প্রতি নিজ কর্তব্য উপলব্ধি করতো, যদি আল্লাহর দ্বীনের প্রতি নিজেদেরকে নিবেদিত করতো, জাহেলিয়াতের অভ্যাস ও আচরণ ত্যাগ করতো, স্বার্থপরতা ও সুবিধাবাদ থেকে দূরে থাকত, তাহলে আজকে তারা যে অবস্থায় আছে তার চেয়ে আরো ভাল থাকতো। তাদের সারি মজবুত হতো এবং তাদের দল বিজয়ী হতো।

খাবার দাওয়াত গ্রহণ করা

কোন মুসলমান অন্য কোন মুসলমান ভাইকে দাওয়াত দিলে, তার উচিত অন্য ভাইয়ের সন্তুষ্টি, মনোতৃপ্তি, তার আগ্রহের প্রতি সম্মান এবং তার প্রতি ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ সে দাওয়াত কবুল করা, যদি না কোন শরীয়ত সম্মত ওজর বা বাধা থাকে।

কাজী আয়াদ এবং নববী বলেছেন, ৮ প্রকার খাবার অনুষ্ঠানে সাধারণত দাওয়াত দেয়া হয় :

১. খতনা উপলক্ষে ২, আকীকা ৩. সন্তান প্রসবের পূর্ব মুহূর্তে নারীর কষ্ট মুক্তির লক্ষে ৪. মুসাফিরের সফর থেকে আগমন উপলক্ষে ৫. নতুন বাড়ি তৈরীর পর ৬. বিপদের সময় বিপদ মুক্তির লক্ষ্যে ৭. বিনা প্রয়োজনে খাবার দান এবং ৮.

www.amarboi.org

বিয়ের পর ওলীমা। এ সকল খাবার বৈধ। কারো মতে বিয়ের ওলীমা ছাড়া আর কোন খাবার ওয়াজিব নয়।

খাবার দাওয়াত কবুল করার হুকুম

বিয়ের ওলীমার দাওয়াত কবুল করা অধিকাংশ আলেমের দৃষ্টিতে ফরজ। একদল আলেম বলেছেন, তা ফরজে আইন। আর অন্য একদলের মতে তা ফরজে কেফায়া। এটা স্পষ্ট যে, যদি দাওয়াত সাধারণ হয় এবং বিশেষভাবে না হয়, তাহলে সে দাওয়াত কবুল করা ফরজে কেফায়া। আর যদি একজন একজন করে বিশেষভাবে দাওয়াত দেয়া হয়। তাহলে সে দাওয়াত কবুল করা ফরজে আইন।

কিছু হাম্বলী, শাফেঈ এবং মালেকী মাজহাবের আলেম লাখামীর দৃষ্টিতে বিয়ের ওলীমার দাওয়াত গ্রহণ করা মোস্তাহাব।

আল্লামা শাওকানী 'নাইলুল আওতার' গ্রন্থে লিখেছেন, হাদীসে এ দাওয়াতে অংশগ্রহণের নির্দেশ দ্বারা তাকে ওয়াজিব করা হয়েছে এবং তাতে অংশগ্রহণ না করাকে গুনাহ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর দ্বারা তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ওমার (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

أَجِيْبُوْا هٰذِهِ الدَّعْوَةَ اِذَا دُعِيْتُمْ لَهَا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَيَأْتِيْهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

"তোমাদেরকে তাতে আমন্ত্রণ জানালে তা গ্রহণ কর। ইবনে ওমার বিয়ের ওলীমা বা অন্য খাবার দাওয়াতে রোজা অবস্থায়ও হাজির হতেন।" (বোখারী, মুসলিম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে :

وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ.

"যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করে না, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানী করে।" (মুসলিম)

বিয়ের ওলীমা ছাড়া অন্য ওলীমায় বা খাবার দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা অধিকাংশের মতে সুন্নাত। মালেকী, হানাফী, হাম্বলী মাজহাবসহ শাফেঈ

www.amarboi.org

মাযহাবের অধিকাংশ আলেমের মত তাই। আল্লামা সারাখশীর মতে, এর উপর উম্মাহর ইজমা বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত। এটা অবশ্য কিছুটা তার বাড়াবাড়ি এবং তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, কিছু সংখ্যক শাফেঈ মতের অনুসারীর দৃষ্টিতে তা ওয়াজিব। ইবনু আবদুল বার বসরার বিচারপতি ওবায়দুল্লাহ বিন হাসান আম্বরীর বরাত দিয়ে তা উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজমের মতে, এটা হল, অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের মত। আল্লামা শাওকানীসহ আরো যারা বিয়ে কিংবা অন্য যে কোন দাওয়াত কবুল করাকে ওয়াজিব মনে করেন, তাদের দলীল হচ্ছে উল্লেখিত হাদীসদ্বয়। তাদের আরও দলীল আছে, যা আমরা পরে আলোচনা করব।

দাওয়াত দানকারী যদি বালেগ, স্বাধীন ও বুদ্ধি-বিবেচনার অধিকারী হয়, শুধু ধনীদেরকেই দাওয়াত না দিয়ে থাকে, যদি ১ম দিনই ওলীমার জন্য নির্দিষ্ট করে, যদি সেখানে কষ্ট পাওয়ার মত খারাপ কোন বিষয় না থাকে অথবা নিজের কোন ওজর না থাকে তাহলে সে দাওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজিব।

মন্দ দাওয়াত

গরীবদেরকে বাদ দিয়ে শুধু ধনীদেরকে দাওয়াত দিলে সে দাওয়াত হবে মন্দ দাওয়াত। তা আরো বেশী মন্দ হবে, যদি কোন ফকীর গেলে তাকে বাধা দেয়া হয়, ইয়াতীমকে তাড়িয়ে দেয়া হয় এবং অভাবী বঞ্চিত লোককে ঘৃণা ও তিরস্কার করা হয়।

এ ধরনের ঘটনা আজকাল প্রায়ই ঘটছে। যাদের কোন দ্বীনদারী কিংবা চরিত্র নেই, তারাই এসব করছে।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "সেই খাবার নিকৃষ্ট যাতে গরীবদেরকে বাদ দিয়ে শুধু ধনীদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়। যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করে না, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানী করে।" (বোখারী, মুসলিম)

আরেক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "সেটাই নিকৃষ্ট খাবার যাতে আগত অভাবী লোকদেরকে বাধা দেয়া হয় এবং কেবলমাত্র ধনীদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়। যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করে না সে আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানী করে।" (মুসলিম)

www.amarboi.org

রোজাদারকে ওলীমার দাওয়াত দেয়ার হুকুম

ইমাম আহমদ, মুসলিম ও আবু দাউদ জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "তোমাদের কাউকে খাবার দাওয়াত দেয়া হলে সে যেন দাওয়াত কবুল করে। ইচ্ছা হলে খাবে আর ইচ্ছা না হলে খাবে না।"

তারা আবু হোরায়রা (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন, "তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেয়া হলে তা কবুল করবে। রোজাদার হলে মেজবানের জন্য দো'আ করবে। আর রোজা না রাখলে খানা খাবে।"

এ সকল হাদীস থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা জানতে পারা যায়। সেগুলো হল :

১. ওলীমা যা খাবার দাওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজিব। তবে, খানা খাওয়া ওয়াজিব নয়। সেটা বিয়ের দাওয়াত কিংবা অন্য যে কোন খাবারই হোক না কেন। ইমাম নববী খাবার খাওয়াকে ওয়াজিব বলেছেন। আহলুজ জাহেরও এটাকে অগ্রাধিকার দেন। সম্ভবতঃ তারা এক্ষেত্রে 'যদি তোমরা রোজা না রাখ, তাহলে খাও' এই হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

২. কাউকে খাবার দাওয়াতের আমন্ত্রণ জানানো হলে, সে রোজাদার হলে, অবশ্যই মেজবানকে নিজের রোজার কথা জানিয়ে দেবে। সে ছেড়ে দিলে তো কথা নেই। কিন্তু যদি না ছাড়ে, তাহলে খাবার অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে মেজবানের জন্য দো'আ করবে। তার জন্য খানা খাওয়া ওয়াজিব নয়। হাঁ, যদি না খেলে মেজবান কষ্ট পায়, তাহলে খেতে হবে। কেউ কেউ বলেছেন, নফল রোজা ভাংগা এবং খাবার খাওয়া উত্তম।

৩. ইসলাম অন্য মুসলমান ভাইয়ের সন্তুষ্টি, তার উপহার গ্রহণ, উত্তম আচরণ এবং তাকে কষ্ট না দেয়ার কি চমৎকার ব্যবস্থাই না করেছে।

যে দাওয়াতে গুনাহর কাজ আছে তা গ্রহণের ব্যাপারে হুকুম

মুসলিম শরীফে আবু সাঈ'দ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

www.amarboi.org

'তোমাদের মধ্যে কেউ মন্দ কাজ দেখলে সে যেন হাত (শক্তি) দিয়ে তা বন্ধ করে, যদি তা না পারে তাহলে বাক শক্তি দিয়ে তা প্রতিরোধ করে। তাও সম্ভব না হলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে। আর তা হচ্ছে, দুর্বল ঈমান।'

হযরত আলী (রা) বলেন, আমি খানা তৈরী করে রাসূলুল্লাহ (সা)কে দাওয়াত দেই। তিনি এসে ঘরে ছবি দেখে ফিরে যান। (ইবনে মাজাহ) শাওকানীও তাঁর নাইলুল আওতার গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন।

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلٰى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান রাখে সে যেন ঐ দাওয়াতে অংশ না নেয় যে দাওয়াতে মদ পান করানো হয়।' (আহমদ, নাসাঈ, তিরমিযী, হাকেমী, তিরমিযী এটাকে হাদীসে হাসান বলেছেন)

এ হাদীসগুলো যে নিমন্ত্রণে মন্দ রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করে। কেননা, এগুলোতে অংশগ্রহণের অর্থ হল, এগুলোর প্রতি সন্তুষ্টির প্রকাশ।

এ বিষয়ে মাজহাবগুলোর দৃষ্টিভঙ্গী হল, খাবার অনুষ্ঠানে হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয় থাকলে এবং তা দূর করতে সক্ষম হলে তাতে অংশগ্রহণ জায়েয আছে। আর যদি তা দূর করতে সক্ষম না হয়, তাহলে ফিরে আসতে হবে। আর যদি তাতে মাকরূহ তানযীহি থাকে, তাহলে ইচ্ছা করলে যেতে পারে আর ইচ্ছা করলে নাও যেতে পারে। আর যদি এমন খেলা-ধূলা থাকে, যার হালাল ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ আছে, তাহলে তাতে অংশগ্রহণ জায়েয, তবে অংশগ্রহণ না করা উত্তম। হানাফী মাজহাব এবং শাফেঈ মাজহাবেরও একটি মত হল, যদি খাবার অনুষ্ঠানে মদ পানের মত হারাম বিষয় থাকে এবং আমন্ত্রণ গ্রহণকারী যদি তার অনুসারী না হয়, তাহলে সে দাওয়াতে যেতে পারে। আর আমন্ত্রণ গ্রহণকারী যদি নিজেই এর অনুসরণকারী হয়, তাহলে তার সেখানে বসা ও খাওয়া জায়েয নেই। এটা হচ্ছে দাওয়াতে অংশ গ্রহণের পর তা জানতে পারলে। যদি দাওয়াতে আসার আগেই জানতে পারে, তাহলে সে যেন তাতে অংশ না নেয় এবং দাওয়াত কবুল না করে।

আলোচনার সারমর্ম হল, ব্যক্তি যদি দাওয়াতে আসার আগে মন্দ সম্পর্কে জানতে পারে, তাহলে যেন তাতে হাজির না হয়। কিন্তু না জেনে হাজির হয়ে গেলে এবং

www.amarboi.org

মন্দ দূর করতে সক্ষম না হলে তার উচিত চলে যাওয়া এবং মন্দ কাজের স্থানে অপেক্ষা না করা। শর্ত হল, তাতে যেন নিজের প্রাণের উপর কোন আশংকা সৃষ্টি না হয়।'

ইবনুল জাওযী বলেছেন, খাবার হারাম হলে দাওয়াত কবুল করা যাবে না। অনুরূপভাবে তাতে মন্দ ও গুনাহর কাজ থাকলেও না। দাওয়াত দানকারী জালেম, ফাসেক, বেদআতী এবং দাওয়াতের বিষয়ে অহংকারী হলে অথবা সে অনুষ্ঠানে অন্য কোন বেদআতী বেদআত সম্পর্কে আলোচনা করলেও তাতে যাওয়া যাবে না। তবে প্রতিরোধ করতে পারলে যাবে।

শেখ তকিউদ্দিন তাঁর ফতোয়ায় উল্লেখ করেছেন, বেনামাজীকে সালাম দেয়া যাবে না এবং তার দাওয়াতও কবুল করা যাবে না। ইমাম আহমদের মতে, দাওয়াত দানকারী নেক হলে এবং কোন মন্দ না দেখলে সে দাওয়াত কবুল করা যাবে।

মারওয়াযী বলেছেন, আমি আবু আবদুল্লাহকে (ইমাম আহমদ বিন হাম্বল) জিজ্ঞেস করলাম, কেউ যদি দাওয়াত খেতে গিয়ে ঘরের পর্দায় ছবি দেখে তাহলে কি করবে? তিনি বলেন, এর দিকে তাকাবে না। তখন আমি বললাম, আমি দেখে ফেলেছি, এখন কি করবো? আমি কি তা ছিঁড়ে ফেলবো? তিনি উত্তরে বলেন, তুমি লোকদের জিনিস ছিঁড়ে ফেলবে? তবে সম্ভব হলে, তা খুলে ফেল। (আল আদাবুশ শরীয়াহ, ১ম খণ্ড, ৩৩২ পৃঃ)

খাওয়ার আদব

মানুষ একাকীই থাক আর অন্যের সাথেই থাক, সে জন্য কিছু আদব ও নিয়ম-নীতি রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে খাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তির জন্য কিছু সাধারণ নিয়ম-কানুন আছে। সেগুলো হচ্ছে,

১. **বিস্‌মিল্লাহ বলা** : হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ، فَاِنْ نَسِىَ فِىْ اَوَّلِهٖ فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى اَوَّلِهٖ وَاٰخِرِهٖ.

'তোমাদের কেউ খাবার খেতে শুরু করলে প্রথমে যেন বিস্‌মিল্লাহ বলে। প্রথমে বলতে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র যেন বলে, 'বিস্‌মিল্লাহি আ'লা আউয়ালিহী ওয়া আখেরিহী'। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

www.amarboi.org

এ হাদীস নির্দেশ দেয় যেন, প্রথমে খাবারে হাত দেয়া মাত্রই বিস্‌মিল্লাহ্ বলা হয়। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিস্‌মিল্লাহ্ বলতে ভুলে গেলে এমনকি সর্বশেষ লোকমার আগেও তার ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা আছে। আর তা হচ্ছে, একথা বলা, 'বিস্‌মিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখেরাহু' অথবা 'বিস্‌মিল্লাহি ফি আউয়ালিহী ওয়া আখেরিহী' কিংবা 'বিস্‌মিল্লাহি আ'লা আউয়ালিহি ওয়া আখেরিহী' বলা। এ তিন রকম বর্ণনা হাদীসে এসেছে।

অন্যদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে জোরে বিস্‌মিল্লাহ্ বলা মোস্তাহাব।

বিস্‌মিল্লাহ্ বলা সুন্নাত। কেউ কেউ এটাকে ওয়াজিব বলেছেন। ইবনুল কাইয়্যেম এটাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। বিস্‌মিল্লাহ্ বলার উদ্দেশ্য হল, শয়তানকে খাবারে অংশগ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত করা। মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ الَّذِىْ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ.

'যে খাবারে বিস্‌মিল্লাহ্ বলা হয়নি, নিশ্চয়ই শয়তান তাকে হালাল মনে করে।'

হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা)কে বলতে শুনেছেন :

اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِه وَعِنْدَ طَعَامِه قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيْتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ وَاِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهِ تَعَالٰى عِنْدَ دُخُوْلِه قَالَ الشَّيْطَانُ اَدْرَكْتُمُ الْبَيْتَ فَاِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ طَعَامِه قَالَ اَدْرَكْتُمُ الْبَيْتَ وَالْعِشَاءَ.

'ব্যক্তি যখন ঘরে প্রবেশ করে এবং প্রবেশ ও খাবার সময় আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন শয়তান বলে, আজ তোমাদের এ ঘরে রাত্রি যাপন ও রাতের খাবারের সুযোগ নেই। কিন্তু কেউ ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহকে স্মরণ না করলে শয়তান বলে, তোমরা আজ এ ঘরে রাত যাপনের সুযোগ পেলে। আর খাবারের সময় আল্লাহকে স্মরণ না করলে শয়তান বলে, তোমরা রাত যাপন ও খাবার গ্রহণের উভয় সুযোগ পেলে।' (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ)

www.amarboi.org

আল্লামা শাওকানী বলেছেন, শয়তানের খাবারের বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করতে হবে। কেননা, শয়তানের দুই হাত, দুই পা আছে এবং তাদের মধ্যে নর-নারীও আছে। সে নিজ হাতে খায়, এ মত আগের ও পরের অধিকাংশ মোহাদ্দেসের।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে শয়তানের খাবারকে আসল অর্থে নয় বরং রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হল, খাবারে কোন বরকত হয় না এবং খাবার গ্রহণকারী ব্যক্তি খাদ্যের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করার শক্তি পায় না।

২. ডান হাতে খাবার খাওয়া : জাবের (রা) বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন,

لاَ تَأْكُلُوْا بِالشِّمَالِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ.

'তোমরা বাম হাতে খেয়ো না। নিঃসন্দেহে শয়তান বাম হাতে খায়।' (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) বাম হাতে খেতে নিষেধ করেছেন এবং ডান হাতে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি না ডান হাতে খেতে কোন ওজর থাকে। ওজর থাকলে জায়েয আছে এবং তাতে দোষের কিছু নেই। যেমন, যদি কারো ডান হাতে রোগ, ঘা ইত্যাদি থাকে, তবে বাম হাতে খাওয়ার অভ্যাসকে ওজর হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। কেউ কেউ বাম হাতে লিখেন। এরপর তারা বাম হাতে খানা-পিনার ওজর পেশ করেন এবং সকল কাজ বাম হাতে করার বায়না ধরেন। এটাকে তাদের ওজর হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। কেননা তারা সহজেই ডান হাতে ঐ কাজ আঞ্জাম দিতে পারে।

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর কাছে বাম হাতে খেল। তখন তিনি বলেন, 'ডান হাতে খাও।' লোকটি বলল, আমি পারি না। নবী (সা) বলেন, তুমি পার। কিন্তু তোমার অহংকারই কেবলমাত্র তোমাকে নিষেধ করে। এরপর সে আর মুখ পর্যন্ত হাত তুলতে পারেনি।' নবী (সা) অহংকারবশতঃ শরীয়তের বিরোধিতা করায় তার জন্য বদদো'আ করায় সে আর তার হাত ব্যবহার করতে সক্ষম হয়নি।

৩. সামনে থেকে খাওয়া : এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اَلْبَرَكَةُ تَنْزِلُ فِىْ وَسَطِ الطَّعَامِ فَكُلُوْا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلاَ تَأْكُلُوْا مِنْ وَسَطِهِ.

www.amarboi.org

'খাদ্যের মাঝখানে বরকত নাজিল হয়। তোমরা পাত্রের দু'পাশ থেকে খাও, মাঝখান থেকে খেয়ো না।' (আহমদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)

ওমর বিন আবু সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর কোলে (তাঁর কাছে) লালিত-পালিত হয়েছি। খাওয়ার সময় আমার হাত পাত্রের সর্বত্র যেত। (পাত্রে পাঁচ জনের খাবার ছিল) তিনি আমাকে বলেন,

يَا غُلَامُ! سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ.

'হে বালক! বিস্‌মিল্লাহ বল, ডান হাতে খাও এবং তোমার পাশ থেকে খাও।' (বোখারী ও মুসলিম)

ওমার বিন আবু সালামা খাওয়ার সময় পাত্রের নির্দিষ্ট জায়গা থেকে না খেয়ে সারা পাত্র থেকেই খেতেন। এ সময় নবী (সা) তাঁকে খাওয়ার এ আদব শিক্ষা দেন। এ দুই হাদীসে খাদ্যের মাঝখান থেকে খাবার গ্রহণকে কিংবা নিজের পাশ থেকে না খাওয়াকে মাকরূহ করা হয়েছে। ইমাম শাফেঈসহ কিছু লোকের মতে এক পাত্রে খেতে বসলে মাঝখান থেকে কিংবা অন্যের সামনে থেকে খাওয়া হারাম। কেননা, মাঝখান থেকে কিংবা উপর থেকে খেলে খাবার গ্রহণকারীরা বরকত থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যের সামনে থেকে খাওয়া অন্যের উপর আগ্রাসন। অন্য ব্যক্তি এটা পছন্দ নাও করতে পারে। এটা হচ্ছে, রান্না করা বিভিন্ন তরকারি। কিন্তু খাবার যদি ফলমুল, খেজুর কিংবা অন্য এমন কিছু হয় যার একটা আরেকটা থেকে ভিন্ন এবং যাতে অন্যের কষ্টের কোন সম্ভাবনা না থাকে। তাহলে, অন্যের সামনে থেকেও খাওয়া যাবে। তবে যদি ভাগ করে দেয়া হয়ে থাকে, তখন অন্যের উপর আক্রমণ করা যাবে না। অন্যের অনুমতি ছাড়া তা খাওয়া হারাম হবে।

উপরোক্ত দলীলের ভিত্তিতে, ইমাম গাজালী রুটির মধ্যভাগ থেকে খাওয়াকে মাকরূহ বলেছেন। রুটি কম থাকলে তাকে ছোট ছোট টুকরা করতে হবে।

৪. বিনয় সহকারে খেতে বসা : আবু জোহাইফা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا.

'আমি হেলান দিয়ে খাই না।' মুসলিম ও নাসাঈ ছাড়া এক বিরাট সংখ্যক মোহাদ্দেসীনের দল এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। ইবনুল জাওযী হেলান দেয়ার অর্থ করেছেন, যে কোন একদিকে ঝুঁকে বসা। অতীতের বুজুর্গরা হেলান দিয়ে

www.amarboi.org

খাবার গ্রহণের ব্যাপারে মতভেদ পোষণ করেন। ইবনুল কাস বলেছেন, এটা নবুওতের বৈশিষ্ট্য। ইমাম বায়হাকী বলেছেন। নবীর জন্য যা মাকরূহ তা নবী নয় এমন লোকদের জন্যও মাকরূহ। তিনি আরও বলেন, ওজরের কারণে হেলান দিয়ে খাওয়া জায়েয। তিনি সলফে সালেহীনের একদলের কথা উল্লেখ করেছেন। যারা হেলান দিয়ে খাবার খেয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হল, প্রয়োজনে তা করা যায়।

আল্লামা শাওকানী বলেছেন, এ জাতীয় প্রয়োজনের বর্ণনায় আপত্তি আছে। অপরদিকে, ইবনু আবি শায়বা ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন এবং খালেদ বিন ওয়ালিদ, ওবায়দা সালমানী, মোহাম্মদ ইবনে সিরীন, আতা বিন ইয়াসার এবং যোহরী এটাকে সর্বাবস্থায় জায়েয বলেছেন।

খাবার জন্য বসার ক্ষেত্রে মোস্তাহাব পদ্ধতি হল, দুই হাঁটুকে তাশাহহুদের অধিবেশনের মত বিছিয়ে বসা কিংবা বাম পায়ের উপর বসে ডান পাকে খাড়া করে রাখা। হেলান দিয়ে বসাকে মাকরূহ গণ্য করার কারণ হল, বেশী খেয়ে ফেলার আশংকা। এটা মোটেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। কিন্তু হেলান দিয়ে খাওয়ার মধ্যে অহংকারের মনোভাব প্রকট যা অমুসলমানদের মধ্যে গর্ব-অহংকারের প্রকাশ। এ প্রসঙ্গে ইবনে মাজা এবং ভাল সনদ সহকারে তাবরানী বর্ণনা করেছেন, নবী (সা)-এর কাছে একটি ভাজা করা ভেড়া উপহার পাঠানো হল, তিনি দুই হাঁটু বিছিয়ে তা খেতে বসেন। তখন একজন বেদুইন তাঁকে প্রশ্ন করেন। এটা কি ধরনের বসা? তিনি উত্তরে বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَنِىْ عَبْدًا كَرِيْمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا عَنِيْدًا.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে সম্মানিত বান্দাহ হিসেবে তৈরী করেছেন, উদ্ধত ও অহংকারী হিসেবে নয়।'

ইবনে বাত্তাল বলেন, নবী (সা) আল্লাহর প্রতি বিনয়ের উদ্দেশ্যে ঐরূপ করে ছিলেন।

৫. খাদ্যের দোষ ত্রুটি না বলা : খাদ্যের দোষ-ত্রুটি বললে মেজবানের উপর, এমনকি বাবুর্চি এবং প্রস্তুতকারীর উপরও এর খারাপ প্রভাব পড়ে। মোমেনের বৈশিষ্ট্য হল, মানুষের প্রতি কষ্ট দেয়ার পরিবর্তে দরদী হওয়া। ইশারা ইঙ্গিতে ও কাউকে কষ্ট দেয়া যাবে না। এ বিষয়ে নবী (সা) আমাদেরকে উত্তম আদব শিক্ষা দিয়েছেন।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত–

www.amarboi.org

مَا عَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

'রাসূলুল্লাহ (সা) কখনও খাদ্যের দোষ-ত্রুটি বলতেন না। ইচ্ছা হলে খেতেন। আর পছন্দ না হলে খেতেন না।' (বোখারী, মুসলিম)

আপনার স্ত্রী কিংবা চাকর যদি খাবার নিয়ে আসে এবং আপনি তাতে কোন ত্রুটি দেখেন যা তৎক্ষণাৎ সংশোধন সম্ভব নয়, তখন রাগ বা জিজ্ঞাসাবাদ না করা ইসলামের উন্নত মহৎ চরিত্রের পরিচায়ক। তারপর সুযোগ মত উপদেশ দিতে হবে যেন তারা কষ্ট না পায়। হাঁ, যদি তাদের কষ্ট না হয় কিংবা তারা বিব্রতবোধ না করে, তাহলে, তাৎক্ষণিক সংশোধন করতে আপত্তি নেই। অন্য মুসলিম ভাইয়ের সাথে অনুরূপ ভাল আচরণ আরও বেশী প্রয়োজন।

৬. খাওয়ার সময় কথা বলা : নবী (সা) খাওয়ার সময় কথা বলেছেন বলে প্রমাণিত। তিনি সাথীদেরকে উপদেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে খাওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। সলফে সালেহীন খাওয়ার সময় ভাল কথা বলেছেন। নেক লোকদের কাহিনী বর্ণনা করেছেন এবং খাওয়ার সুন্নত পদ্ধতি আলোচনা করেছেন।

৭. তিন আঙ্গুলে খাওয়া মোস্তাহাব এবং সম্পূর্ণ খাবার খাওয়া : এ দু'টো বিষয় খাবারের গুরুত্বপূর্ণ আদব। কা'ব বিন মালেক তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَأْكُلُ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا.

'রাসূলুল্লাহ (সা) তিন আঙ্গুলে খেতেন এবং হাত মোছার আগে হাত চাটতেন।' (মুসলিম)

হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

اِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذًى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَيَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلاَيَمْسَحْ يَدَهُ

www.amarboi.org

بِالْمِنْدِيْلِ حَتّٰى يَلْعَقَ اَصَابِعَهُ فَاِنَّهُ لَايَدْرِىْ فِىْ اَىِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ.

'যদি তোমাদের কারো লোকমা নীচে পড়ে যায়, তা যেন তুলে নেয়। তারপর ময়লা পরিষ্কার করে তা যেন খেয়ে নেয় এবং কিছুতেই তা শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে। রুমাল দিয়ে হাত মোছার আগে যেন হাত চেটে নেয়। কেননা, সে জানে না, কোন খাবারটুকুতে বরকত রয়েছে।' (আহমদ, মুসলিম, তিরমিযী)

এ হাদীসে আকাঙ্ক্ষিত সুন্নতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে–

তিন আঙ্গুলে খাওয়া সুন্নত। এর চাইতে বেশী বা কম আঙ্গুলে খাওয়াও জায়েয। কাজী আয়াদ বলেছেন; এর চাইতে বেশী আঙ্গুলে খাওয়া মন্দ, বেআদবী ও লোকমা বড় করার প্রয়াস। কেননা, এরূপ করতে সে বাধ্য নয়। যদি খাবার পাতলা হয় এবং তিন আঙ্গুলে খাওয়া কষ্টকর হয়, তখন ৪র্থ কিংবা ৫ম আঙ্গুলের সাহায্য নিতে পারে। এক আঙ্গুলে খাওয়া মাকরূহ। আর দুই আঙ্গুলে খাওয়া অহংকার। ওলামায়ে কেরাম ইজতিহাদের ভিত্তিতে একথা বলেছেন। ইমাম শাফেঈ এবং ইবনুল বান্না থেকেও একথা বর্ণিত আছে।

এটা থেকে একথাও বুঝা যায় যে, ছোট লোকমা সুন্নত।

আঙ্গুল ধোয়া কিংবা মোছার আগে তা চেটে খাওয়া সুন্নত। এর কারণ হল, আঙ্গুলের মধ্যে বিদ্যমান খাবারে হয়তো বরকত রয়েছে। খাওয়ার সময় আঙ্গুল চাটার সুযোগ থাকে না। খাবারের শেষে তা চাটার সুযোগ হয়। এর দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, খাবারের মধ্যে কিংবা খাওয়া শেষ হবার আগে আঙ্গুল চাটা মাকরূহ। বিশেষ করে অন্যদের সাথে খেতে বসলে অনুরূপ করলে তা ঘৃণিত ও অসুন্দর দেখায়। প্রয়োজন ছাড়া এরূপ মন্দ অভ্যাসের কোন কারণ নেই। খাদ্য ফেলে দেয়া যাবে না। পাত্রে কিংবা লোকমার মধ্যে কোন কিছু থাকলে তা ফেলে দিয়ে বাকী খাবারটুকু খাওয়া সুন্নত। যেমন, যদি নীচে, কিংবা দস্তরখানে গোশত বা ভাত পড়ে যায়, তা তুলে পরিষ্কার করে খেতে হবে। পেয়ালা বা নীচে কিছু পড়ে থাকলে অপচয়কারী, সীমালংঘনকারী ও জালেমদের মত তা ফেলে দেয়া যাবে না। অনেক সময় ফেলে দেয়া খাবারের পরিমাণ এত হতে পারে যা কোন ব্যক্তি বা পরিবারের জন্য যথেষ্ট।

www.amarboi.org

চামুচ দিয়ে খেলে কোন দোষ নেই। তবে সেটা খাবার চামুচ হতে হবে। রান্নার চামুচ নয়। চামুচ যদি আঙ্গুল অপেক্ষা শরীয়তের আকাংখিত পরিচ্ছন্নতা, খাদ্যের সংরক্ষণ এবং লোকমা ছোট করার ক্ষেত্রে বেশী কার্যকর হয় তাহলে, তা দিয়ে খাওয়া সুন্নত বিরোধী হবে না। অনুরূপভাবে, কাঁটা চামুচ দিয়ে খাওয়াও সুন্নতের পরিপন্থী নয়। কিন্তু শর্ত হল, ডান হাতে খেতে হবে। বাম হাতে নয়।

৯. খাবারে শ্বাস ফেলা ও ফুঁ দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে : খাবারে শ্বাস ফেলা কিংবা ফুঁ দেয়া নোংরামী ও ক্ষতিকর এবং তা অভদ্র আচরণ। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। নবী (সা) খাবার পাত্রে শ্বাস ফেলা কিংবা ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। (বোখারী, মুসলিম)

১০. কম খাওয়া : বেশী খাবার গ্রহণ করা ঠিক নয়। বেশী খেলে বদহজম ও মোটা হওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। যার ফলে অনেক রোগ-শোক সৃষ্টি হয় এবং শরীর ভারী হয়ে যায়। অলসতা-অবসাদ দেখা দেয় এবং নড়াচড়া করা মুশকিল হয়ে পড়ে। এই মন্তব্য হচ্ছে, বর্তমান যুগের ডাক্তার ও চিকিৎসা সংস্থাগুলোর। এ কারণে আজকাল ওজন কম হলে কিংবা বেশী মোটা হওয়ার চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ক্লিনিক খোলা হয়েছে। এখান থেকেই আমরা নবী করিম (সা)-এর এই কথার রহস্য বুঝতে পারি।

مَا مَلَأَ ابْنُ اٰدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ، حَسْبُ ابْنِ اٰدَمَ اُكْلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَاِنْ كَانَ لَا مُحَالَةَ فَثُلُثٌ طَعَامٍ وَثُلُثٌ شَرَابٍ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ.

'আদম সন্তানের পেট ভর্তি করে খাওয়া অপেক্ষা অধিকতর মন্দ কাজ নেই। আদম সন্তানের টিকে থাকার জন্য কিছু খাবারই যথেষ্ট। যদি সে বেশী খেতেই চায়, তাহলে পেটের তিন ভাগের একভাগ খাদ্য, একভাগ পানি এবং অন্য এক ভাগ শ্বাস গ্রহণের জন্য খালি রাখা উচিত (নাসাঈ, ইবনু মাজাহ ও তিরমিযী। তিরমিযী এটাকে হাসান বলেছেন)

হাদীস খাবারের সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দেয়নি। বরং আদব ও সতর্কতা বর্ণনা করেছে। মানুষ যদি তৃপ্তিপূর্ণ করে খায় তাতেও দোষ নেই। হাসান বসরী বলেছেন, খাবারে কোন অপচয় নেই। অর্থাৎ তৃপ্তি সহকারে খেলে তাকে অপচয় বলা হয় না।

www.amarboi.org

কেউ যদি এত কম খায় যে, দুনিয়া-আখেরাতের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তাহলে সেটা ভুল হবে এবং দ্বীন না বুঝার কারণ হবে। আর তা হবে ইসলামের সুস্থ পদ্ধতির বিপরীত।

আল-আদাবুশ শরীয়াহর লেখক বলেছেন, 'যে পরিমাণ কম খাবার ও পানীয় গ্রহণ শরীরের জন্য ক্ষতিকর অথবা আল্লাহর অধিকার আদায়ে কিংবা প্রয়োজনীয় আয়-রোজগারে দুর্বলতা সৃষ্টি করে তা হারাম। শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গী বহির্ভূত হলে কমপক্ষে তা মাকরূহ হবে। সকল বিষয়ে মধ্যমপন্থা গ্রহণ করা উত্তম।

একদিন হযরত ওমার (রা) বক্তৃতায় বলেন। তোমরা উদর পূর্তি থেকে দূরে থাক। তা নামাজে অলসতা সৃষ্টি এবং শরীরের জন্য ক্ষতিকর। খাদ্য গ্রহণে তোমাদেরকে মিতব্যয়ী হতে হবে। এটা ক্ষতিকর নয়। বরং স্বাস্থ্যকর এবং ইবাদতের জন্য শক্তিবর্ধক। দ্বীনের উপর ভোগবাদীতাকে অগ্রাধিকার না দেয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি ধ্বংস হবে না।' (আল-আদাবুশ শারীআ'হ-৩য় খণ্ড, ২০১পৃঃ)

এক বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে :

اَلْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

'মোমেন খায় এক পেটে আর কাফের খায় সাত পেটে।' অর্থাৎ কাফের বেশী খায় এবং তা সত্ত্বেও তৃপ্ত হয় না। আর মোমেন অল্পে তুষ্ট এবং তাতেই আল্লাহ বরকত দেন। মানুষ তৃপ্তির অধিক খেলে কিংবা পেট ভরে খাওয়ার অনুভূতিসহ খাওয়া সারলে এটা তার জন্য ক্ষতিকর হবে। আর এটা হবে অপচয় এবং হারাম। আর ক্ষতি না হলে, কেউ কেউ একে মাকরূহ বলেছেন। কেউ কেউ একে জায়েযও বলেছেন। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আবু হোরায়রা (রা)কে এ পরিমাণ দুধ পান করান যে তিনি বলেন, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, আমার আর খাবার জায়গা নেই।

১১. খাওয়ার পরে হাত ধোয়া

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

مَنْ بَاتَ وَفِيْ يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَاَصَابَهُ شَيْئٌ فَلَا يَلُوْمَنَّ اِلاَّ نَفْسَهُ.

www.amarboi.org

'যে ব্যক্তি হাতে গোশতের চর্বির গন্ধসহ রাত যাপন করে এবং যদি তার কোন রোগ হয় (চর্ম কিংবা অন্য রোগ) তাহলে, সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দোষারোপ না করে।' (নাসাঈ ছাড়া অবশিষ্ট ৫টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে তা বর্ণিত হয়েছে)। খাওয়ার পর হাত ধোয়া মোস্তাহাব এ হাদীস তার প্রমাণ। বিশেষ করে খাবার চর্বিযুক্ত হলে। খাওয়ার আগে হাত ধোয়ার ব্যাপারে কোন বিশুদ্ধ হাদীস নেই। তাই ওলামায়ে কেরাম তা মোস্তাহাব কিনা এ বিষয়ে মতভেদ পোষণ করেন। তবে সামাজিকতা ও পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে তা উত্তম হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, শরীয়তে কোন জিনিস মোস্তাহাব হলে তা করলে সওয়াব পাওয়া যাবে। আর পছন্দনীয় সামাজিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে তা করলে তাতে সওয়াব পাওয়া যাবে না।

সাধারণ বিষয়গুলোতে ওলামায়ে কেরাম অনেক জিনিসকে মোস্তাহাব কিংবা মাকরূহ বলেছেন। এ ব্যাপারে তারা শরীয়ত প্রণেতার বরাত দিয়ে কিছু উল্লেখ করেননি। ফিকহ শাস্ত্রের নীতি নির্ধারকদের কাছে যে জিনিসের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় না সে জিনিসের ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য বলে তারা মত প্রকাশ করেছেন এবং শর্ত আরোপ করেছেন, তাকে যেন শরীয়তের মোস্তাহাব মনে করা না হয় এবং তা যেন সুন্নতের সাথে সংঘর্ষমুখর না হয়। ইসলাম যেহেতু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দ্বীন এবং সকল হুকুমের বিষয়ে পরিচ্ছন্নতাকে বিবেচনায় রেখেছে সেহেতু, এই দ্বীন পায়খানা থেকে, ধূলা-বালি থেকে কিংবা হাতের কাজ শেষে ফিরে আসার পর তার দু'হাতে ময়লা-আবর্জনাকে সমর্থন করতে পারে না। বিশেষ করে অন্যের সাথে খেতে বসলে, খাওয়ার আগে হাত পরিষ্কার না করলে, তারা এটাকে অপছন্দ করবে এবং তার থেকে দূরে সরে যাবে। এমনকি তারা খানা ত্যাগ করে চলেও যেতে পারে।

১২. খাওয়ার পর আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করা

খাওয়ার পর হাদীসে বর্ণিত যে কোন বাক্য দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করা সুন্নাত।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَامُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا.

'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, তাঁর জন্যই অনেক উত্তম ও বরকতপূর্ণ প্রশংসা। খাবার বরবাদ কিংবা পরিত্যাজ্য নয় এবং হে আমাদের রব, আমরা তা থেকে অমুখাপেক্ষীও নই।'

www.amarboi.org

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَفَانَا وَاَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِىٍّ وَلاَ مَكْفُوْرٍ.

'সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং যিনি আমাদেরকে পান করিয়েছেন যা বরবাদ ও অপ্রশংসিত নয়।'

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

'সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন।'

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلاَ قُوَّةٍ وَاَنَّ مَنْ قَالَهَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

'সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাকে খাইয়েছেন ও রিজক দিয়েছেন। তাতে আমার কোন শক্তি-সামর্থ্যের দখল ছিল না।' যে ব্যক্তি এটা বলবে, তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (আহমদ, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী)

৫. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যাকে আল্লাহ খাবার দিয়েছেন সে যেন খাবার শেষে বলে :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ.

'হে আল্লাহ আমাকে এতে বরকত দাও এবং এর চাইতে উত্তম খাওয়াও।' যে ব্যক্তিকে আল্লাহ দুধ পান করিয়েছেন, সে যেন বলে :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَاِنَّهُ لَيْسَ شَيْئٌ يُجْزِئُ مَكَانَ الشَّرَابِ وَالطَّعَامِ غَيْرَ اللَّبَنِ.

'হে আল্লাহ আমাদেরকে তাতে বরকত দাও এবং তা আরো বাড়িয়ে দাও। দুধ ছাড়া অন্য কিছু খানা-পিনার বিকল্প হতে পারে না।' (নাসাঈ ছাড়া অবশিষ্ট ৫টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে তা বর্ণিত হয়েছে)

কতিপয় জায়েয ও মাকরূহ বিষয়

ছুরি দিয়ে রুটি বা গোশত কেটে খেলে কোন অসুবিধে নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক ছুরি দিয়ে গোশত কেটে খাওয়ার প্রমাণ আছে। এ সম্পর্কে নিষেধ সংক্রান্ত হাদীস দুর্বল। টেবিলে খেতেও কোন দোষ নেই। তবে মাটির উপরে কিছু বিছিয়ে খাওয়াই উত্তম। হাতে খাওয়া সুন্নত।

www.amarboi.org

চামুচ কিংবা কাঁটা চামুচ দিয়ে খাওয়া জায়েয। তবে সেটা উত্তম নয়। চিকন আটা বা ময়দার তৈরি জিনিস খেতে কোন বাধা নেই। একাকী খেলে প্লেটের সর্বত্র থেকে খাওয়া যায়। জায়গার সংকীর্ণতা কিংবা কাজের কারণে হেঁটে ও দাঁড়িয়ে খাওয়া জায়েয। কোন ওজর না থাকলে বসে খাওয়া উত্তম। হযরত ইবনে ওমার থেকে বর্ণিত :

كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ.

'আমরা নবী (সা)-এর যুগে হাঁটা অবস্থায় খেতাম এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পান করতাম।' (আহমদ, তিরমিযী এটাকে সহীহ্ বলেছেন)

চলা কিংবা দাঁড়ানো অবস্থায় খাওয়ার ব্যাপারে নিষেধ বর্ণিত নেই। তবে দাঁড়িয়েও পান করতে নিষেধ করা হয়েছে। কোন ওজর থাকলে দাঁড়িয়েও পান করা যাবে।

রুটি সমান করার লক্ষ্যে প্লেটের নীচে রুটি রাখা, রুটি দিয়ে ছুরি ও আঙ্গুল মোছা এবং রুটির উপরে লবণদানী রাখা মাকরূহ। তবে, শুধু লবণ রাখা মাকরূহ নয়। রুটির ফুলা অংশ কিংবা উপরের দিক খাওয়া এবং অবশিষ্টাংশ রেখে দেয়া মাকরূহ। অনুরূপভাবে, বহু সংখ্যক খাবারে অভ্যস্ত হওয়া এবং নিজে একাকী খেলেও দ্রুত ও বেশী-বেশী করে খাওয়া মাকরূহ। পরিবার ও চাকর-বাকররা যে খাবার তৈরি করল তাদেরকে না দিয়ে নিজে বিশেষ কোন খাবার সাবাড় করে ফেলা মাকরূহ। অথচ সে জানে যে তারাও এ খাবার খেতে আগ্রহী। নবী (সা) আমরা যা খাই তা চাকরদেরকেও খাওয়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তাহলে স্ত্রী এবং সন্তানেরাতো আরো বেশী হকদার।'

স্বামী ও স্ত্রীর উপর ঘরের অবশিষ্টদের খাবারের প্রয়োজন বিবেচনা করা জরুরী। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তি তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জবাবদিহী করবে। বহু সন্তান বাপকে অপছন্দ করে। বহু স্ত্রী স্বামীর উপর রাগ। বহু চাকর-চাকরানী গৃহস্বামীর দ্রুত ও বেশী বেশী খাবারের ফলে এবং অন্যদের গুরুত্ব না দেয়ার কারণে তাদের উপর অসন্তুষ্ট।

খাবারের সামষ্টিক আদব-শিষ্টাচার

আমরা ইতিপূর্বে ব্যক্তিগতভাবে খাবারের পর্যায়ে যে সকল সুন্নত ও আদব-শিষ্টাচারের কথা আলোচনা করেছি। সেগুলোসহ অন্যের সাথে খাবারের বেলায়

www.amarboi.org

আরো কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। হতে পারে হয়তো নিজে মেহমান কিংবা মেজবান হবে। উভয় অবস্থাতেই নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত।

১. দাওয়াতের নির্দিষ্ট সময়ের আগে পৌঁছতে হবে

ইমাম গাজালী 'এহইয়াউল উলুম' গ্রন্থে লিখেছেন, হুবহু খাওয়ার সময় অপেক্ষমান দলের সাথে আকস্মিক হাজির হয়ে খাওয়ায় অংশগ্রহণ সুন্নত নয়। আল্লাহ তা নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰهُ.

'হে মোমেনগণ! তোমরা নবীর ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না এবং খাবার রান্নার অপেক্ষায় দেরী করে এসো না।' (সূরা আহযাব : ৫৩)

মুজাহিদ এবং কাতাদাহ প্রমুখ বলেছেন, অর্থাৎ ঠিক রান্না শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করো না এবং রান্না শেষ হওয়া মাত্র হাজির হয়ো না। আল্লাহর কাছে এটা অপছন্দনীয়।

এ আয়াতে বিনা দাওয়াতে হাজির হয়ে খানা খাওয়াকে হারাম করেছে। (ইবনে কাসীর-৩য় খণ্ড ৫০৫ পৃঃ) যে বা যারা খাওয়ার অনুষ্ঠানের অপেক্ষায় থাকে, খবর পেলে আকস্মিকভাবে গিয়ে হাজির হয় এবং মেজবানের অসন্তুষ্টি ও বিনা অনুমতিতে খানা খায়। এটা মোটেই জায়েয নেই। তবে সাধারণ আগন্তুক যে খাবার অনুষ্ঠানের অপেক্ষায় না থেকে এমনিতেই হঠাৎ করে হাজির হয়, তার সম্পর্কে ইমাম গাজালী বলেন, অনুমতি না নিয়ে তার খাওয়া জায়েয নেই। যদি তাকে মেজবান বলে : 'খাও', এতেও বিবেচ্য বিষয় আছে। যদি বুঝা যায় যে, ভালবাসা ও সন্তুষ্টি সহকারেই তাকে খেতে বলেছে, তাহলে খাবে। যদি লজ্জা-শরমে পড়ে তারা খেতে বলে থাকে তাহলে তার খাওয়া উচিত নয়। বরং অজুহাত খুঁজে না খাওয়ার চেষ্টা করবে। হাঁ, যদি ক্ষুধার্ত হয়, খাবারের জন্য কিছু না পায় এবং খাবার কিনে খাওয়ার মত সামর্থ্যও না থাকে, এমতাবস্থায় কিছু লোকের মতে, সে খেতে পারে এবং খাওয়ার সময় দেরী না করেই বসে যেতে পারে। তাদের দৃষ্টিতে এটা দূষণীয় নয়। তাদের প্রমাণ হল, একবার নবী (সা) হযরত আবু বকরকে সাথে নিয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাওয়ার উদ্দেশ্যে সাহাবী আবুল হাইসাম বিন আততাইয়েহান আনসারীর বাড়ীতে যান।

যদি কোন লোক কারো বাড়ীতে গিয়ে বাড়ীর মালিককে না পায়, কিন্তু সে বাড়ীর মালিকের সত্যবাদীতার বিষয়ে আস্থাবান এবং খেলে মালিক খুশী হবে বলে

www.amarboi.org

দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী, তাহলে সে বিনা অনুমতিতে খেতে পারে। এর দ্বারা বুঝা যায়, খাওয়ার অনুমতির অর্থ হল, মালিক বা মেজবানের সন্তুষ্টি। বিষয়টি বেশ প্রশস্ত। অনেক অনুপস্থিত মেজবান মেহমানের খাওয়াকে পছন্দ করেন। কোন কোন মেজবান খাওয়ার অনুমতি দেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কসম করে বলেন, তিনি তাতে সন্তুষ্ট নন। তার খাবার খাওয়া মাকরূহ। আল্লাহ বলেন,

أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ.

'যে ঘরের চাবি তোমাদের কাছে আছে। সে ঘরে কিংবা তোমাদের বন্ধুদের ঘরে খেতে কোন দোষ নেই।' (সূরা নূর : ৬০)

নবী (সা) একবার মহিলা সাহাবী বারীরার অনুপস্থিতিতে তার ঘরে প্রবেশ করে খাবার খান। সে খাবার ছিল যাকাতের। তারপর তিনি বলেন, 'এটা তার জন্য যাকাত, আর আমাদের জন্য হাদিয়া।' (বোখারী, মুসলিম)

মোহাম্মদ বিন ওয়াসে এবং সঙ্গীরা হাসান বসরীর ঘরে যেতেন এবং তার অনুমতি ছাড়াই যা পেতেন তা খেতেন। হাসান ঘরে প্রবেশ করে তা দেখে খুশী হতেন এবং বলতেন। আমরা এরূপ ছিলাম।

হাসান বসরীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে ব্যক্তি নিজ বন্ধুর ঘরে তার অনুপস্থিতিতে গিয়ে খায় সে ব্যক্তির হুকুম কি? তিনি জবাবে বলেন, 'আত্মা প্রশান্তি বোধ করলে এবং মন তৃপ্ত থাকলে তা হতে পারে'।

২. দাওয়াত দেয়া হয়নি এমন ব্যক্তিকে সাথে না আনা

দাওয়াত পায়নি এমন ব্যক্তিকে কোন খাবার অনুষ্ঠানে সাথে নিয়ে আসা জায়েয নেই। এরূপ হলে, আগে মেজবানের অনুমতি নিতে হবে। মেজবান অনুমতি দিলে সে খাবে, নচেত নয়। বিনা অনুমতিতে তার প্রবেশ ও খাওয়া হারাম।

আবু মাসউদ আনসারী বলেন, 'আবু শোয়াইব নামক জনৈক আনসারীর এক বালক দাস ছিল। তিনি তাকে পাঁচ ব্যক্তির খাবার তৈরির আদেশ দেন এবং বলেন, আমি পাঁচ জনের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)কেও দাওয়াত দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করছি। দাওয়াত দেয়া হয়নি এমন এক ব্যক্তি তাদের সাথে দরজা পর্যন্ত পৌছল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, সে আমাদের সাথে এসেছে। তুমি ইচ্ছা করলে তাকে অনুমতি দিতে পারে। আর তা না হয় সে ফিরে যাবে। আনসারী বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে অনুমতি দিচ্ছি। (বোখারী ও মুসলিম)

নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যদি বুঝতে পারে যে, যাকে দাওয়াত দেয়া হয়নি তাকে সাথে আনলে মেজবান সন্তুষ্ট ও খুশী হবে, তাহলে পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন নেই। এখানে আমরা সে ব্যক্তির ভুল বুঝতে পারি যাকে একাকী দাওয়াত দেয়া

www.amarboi.org

হয়েছে। অথচ, সে সাথে করে একজন বা একাধিক সন্তান নিয়ে এসেছে। হতে পারে মেজবানের এজন্য কোন প্রস্তুতি নেই। এভাবে প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ সন্তানদেরকে নিয়ে দাওয়াতে হাজির হয়, তাহলে, মেহমানের সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে। তখন এটা সমস্যার রূপ নেবে।

আল-আদাবুশ শরীয়াহ্ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১৯৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, মেহমান প্রচলিত নিয়মের বাইরে কিছু করতে পারবে না। তবে, মেজবানের আপত্তি না থাকলে পারবে।

৩. মেহ্মানের সাথে খোশগল্প করা

মেজবান কিংবা লোকজনের মধ্যে যার সুনাম ও সম্মান রয়েছে, লোকদের সাথে তার ভাল কথা আলোচনা করা মোস্তাহাব। হাদীসে মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের যে নির্দেশ এসেছে, এ আলোচনা তার অন্তর্ভুক্ত। উপযুক্ত খোশগল্পই করা উচিত। যার মধ্যে সংকোচ ও লজ্জাবোধ আছে তার সংকোচ দূর করার জন্য আগে তার সাথেই আলোচনা করা উচিত। এর ফলে, খাবার মজলিশে ভাল আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায় হবে। খাবার মজলিশে নেক লোকদের কাহিনী আলোচনা করা যেতে পারে। ত্যাগ, অল্পেতুষ্টি, জাহান্নাম কিংবা দোজখীদের বিষয় অথবা কেয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচনা করার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। খাওয়ার সময় এসব জিনিস আলোচনা করলে, এগুলোর প্রতি তাদের পলায়নপর মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে।

মেজবানের জন্য মেহমানকে খাওয়ার বিষয়ে এবং বিভিন্ন প্রকার খাবার গ্রহণে একবার, দু'বার, সর্বাধিক তিনবার পর্যন্ত উৎসাহিত করা লোভনীয়। তিনবারের বেশী নয়। এতবেশী যেন বলা না হয়, যেন তা তার ভাইয়ের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর লোকদেরকে নির্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণের ব্যবস্থা করা অন্যায় নয় এবং ফকীর-গরীবদের বসার স্থান পৃথক করাতেও কোন দোষ নেই। অন্যদের সাথে বসলে তারা হয় তো লজ্জায় খেতে চাইবে না।

৪. শিষ্টাচার এবং অংশগ্রহণকারী অন্যের অধিকার ও অনুভূতির প্রতি খেয়াল রাখা

খাবার গ্রহণকারী ব্যক্তিকে খাওয়ায় শিষ্টাচারী ও অল্পেতুষ্ট হতে হবে। চাই তিনি খাবারের মূল্যে অংশগ্রহণকারী হিসেবে খান কিংবা অন্য কোন ভাইয়ের বাসায় আমন্ত্রিত অন্য মেহমানের সাথে নিজেও আমন্ত্রিত হয়ে খান অথবা নিজের পরিবার, মা-বাপ ও ভাই-বোনদের সাথে খান। মুসলমানের চরিত্রে ত্যাগের মনোভাব থাকতে হবে। ভোগের মনোভাব নয়। নিজের প্রয়োজনের মত অন্যের

www.amarboi.org

প্রয়োজনের প্রতি তাকে খেয়াল রাখতে হবে। খাবারের মূল্যে অংশগ্রহণকারী হওয়া সত্ত্বেও তাতে সীমালঙ্ঘন করা হারাম। নবী (সা) এক লোকমায় একাধিক খেজুর মুখে দিতে নিষেধ করেছেন। কাজী আয়াদ বলেছেন, এ নিষেধের অর্থ হল, তা হারাম। অন্যদের মতে, মাকরূহ। ইমাম নববীর মতে, যদি খাবারের মূল্যে অংশগ্রহণ থাকে তাহলে, অন্যদের সন্তুষ্টি ব্যতীত একাধিক খেজুর এক লোকমায় খাওয়া হারাম। অন্যদের কথা ও ইঙ্গিতের মাধ্যমে তাদের সম্মতি সম্পর্কে জানা বা ধারণা পাওয়া যাবে। আর যদি খাবার অন্যদের হয় এবং পরিমাণ কম হয়, তাহলে তাদের সম্মতি শর্ত। আর যদি পরিমাণ বেশী হয় তাহলে, বেশী খাওয়া থেকে বিরত থাকা উত্তম। তারা খেজুর সম্পর্কে একথা বলেছেন। এ থেকে অন্যান্য খাবারের বিষয়ে মাসআলা গ্রহণ করা যায়।

মেজবানের উচিত, কোন একজন মেহমানকে একটি নির্দিষ্ট ভাল খাবার গ্রহণের সুযোগ না দেয়া এবং অন্য মেহমানদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করা। এর ফলে, তাদের মনে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হতে পারে। শুধুমাত্র মা-বাপ কিংবা অসুস্থ রোগীর নির্দিষ্ট খাবার ছাড়া অন্যদের বেলায় এ বৈষম্য করা যাবে না।

এর অর্থ এও নয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের মত একই প্রকার খাদ্য খাবে। বরং এ কথার লক্ষ্য হল, ইনসাফ ঠিক রাখতে হবে, অন্যদেরকে রাজী-খুশী রাখতে হবে এবং কাউকে কোন খাবার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এ বিষয়টির সার্বিক দিক বিবেচনা করলে দাঁড়ায়, অন্যদের মনোভাবের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। যদি তারা সম্মত ও সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে কোন অসুবিধে নেই। যদিও একজন সকলের খাবার খেয়ে ফেলে কিংবা উত্তম খাবার গ্রহণ করে।

বিশেষ কোন খাবার তালাশ না করা এবং মেজবান যে পরিমাণ খাবার দিয়েছে এর চাইতে বেশী না চাওয়া শিষ্টাচার। হাঁ, যদি আরো চাওয়াটা স্থানীয় নিয়ম হয়ে থাকে। কিংবা মেজবান খুশী হয় অথবা ওলীমার দাওয়াত হয়, তাহলে অধিক চাওয়া যায়।

পেশকৃত খাবার সবটুকুই খাবে, না, মেজবানের পরিবার ও সন্তানাদির জন্য কিছু রাখবে, এটা নির্ভর করে স্থানীয় অভ্যাস, পরিবেশ ও অবস্থার উপর।

সফর সঙ্গীর বেলায় উত্তম হল, প্রত্যেকেই কিছু অর্থ দেবে, একজন খাবার কিনে আনবে এবং সবাই মিলে খাবে। একজন অন্যজনের চাইতে কিছুটা বেশী খেলে কোন দোষ নেই। এটা ইমাম আহমদের মত। ইমাম শাফেঈসহ অন্যদেরও একই মত। তাদের মতে, অনুরূপ করা সুন্নাহ। (আল-আদাবুশ শারীয়াহ-৩য় খণ্ড, ১৯৯ পৃঃ)

অন্যের সামনে থেকে খাবার না খাওয়া এবং উত্তম ও সুস্বাদু খাবার বেছে বেছে না খাওয়া শিষ্টাচার। এর ফলে অন্যদেরকে সে খাবার থেকে বঞ্চিত করা হয়। খাদ্যের দুর্নাম করা জায়েয নেই কিংবা মেজবানের অথবা অন্য কোন মেহমানের

www.amarboi.org

দুর্নাম করাও জায়েয নেই। এটা অন্য ভাইয়ের প্রতি কষ্ট ও গীবত-নিন্দা।

অন্যান্য খাবার গ্রহণকারীদের মুখের প্রতি বেশী বেশী তাকানো আদব শিষ্টাচার বিরোধী। এর দ্বারা ধারণা হতে পারে যে, সে অন্যদের খাবার তদন্ত করছে। খানার মজলিশে মন্দ কথা বলা নিষেধ।

মুখ থেকে খাবার বের করে তা আগের প্লেটে রাখা কিংবা আরো খাবার যোগ করার উদ্দেশ্যে হাতে কিছু খাবার রেখে দেয়া মাকরূহ। নিয়ম হচ্ছে, প্রথমে হাতের খাবার খেয়ে ফেলতে হবে। যদি না খেতে চায়, তাহলে তা পেছনে কিংবা এমন জায়গায় ফেলতে হবে যেন, অন্যদের কাছে নোংরা মনে না হয়।

খাওয়ার মজলিশে লোকেরা দেখছে এমতাবস্থায় কফ বের করা, নাকের শ্লেষ্মা বের করা কিংবা থুথু ফেলা মাকরূহ। এটা লোকদের কাছে ঘৃণিত ও মন্দ মনে হবে। মুখে লোকমা ভর্তি অবস্থায় কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। এর ফলে মুখ থেকে খাবার প্লেটে কিংবা অন্যদের মুখে পড়তে পারে। হাত ভরে খাবার নিয়ে অংশ বিশেষ মুখে দেয়া এবং অবশিষ্টাংশ খাদ্যের প্লেটে রেখে দেয়া মাকরূহ। এটাও ঘৃণা এবং নোংরামীর উদ্রেক করে।

অন্যদের খাওয়া শেষ হবার আগে খাওয়ার মজলিশ থেকে উঠে যাওয়া মাকরূহ। এতে করে অন্যরা বিব্রতবোধ করতে পারে। ফলে তারা প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণের আগেই উঠে যেতে পারে। হাঁ, যদি তা স্থানীয় রীতি-নীতি হয় কিংবা অধিকাংশ লোক উঠে যায়। তাহলে, মাকরূহ হবে না।

খেজুর কিংবা বীচি ও খোসাযুক্ত ফল খাওয়ার পর বীচি ও খোসা প্লেটে নিক্ষেপ করা মাকরূহ। খাবার যতই কম হোক, রুটি যতই শক্ত ও মন্দ হোক এবং তরকারি যতই সস্তা কিংবা স্বল্প হোক, এটাকেই মেজবানের সামর্থ্য মনে করতে হবে। মেজবানের খাবারের প্রশংসা করা মোস্তাহাব। এর ফলে, তার মনে খুশী প্রবেশ করানো যাবে। এমনভাবে তা করতে হবে, তাতে কোন কৃত্রিমতা থাকবে না এবং মেজবানের সংকোচ লাঘবের চেষ্টার বহি:প্রকাশ ঘটবে না। তা না হয়, সে সংকোচ বোধ করবে এবং কষ্ট পাবে। মহানবীর (সা) সামনে যখন তরকারি হিসেবে সিরকা পেশ করা হল, তখন তিনি বলেন, 'সিরকা কতইনা উত্তম তরকারি।' এটি বিশুদ্ধ হাদীস। প্রত্যেকের খাবার প্লেট আলাদা হলে এবং তাতে প্রয়োজনীয় খাবার দিলে কোন দোষ নেই। বর্ণিত আছে, নবী করিম (সা)-এর দুপুরের খাবারের জন্য ৩টি রুটি আনা হল। তার সাথে ছিলেন জাবের। নবী (সা) একটি রুটি নিজের সামনে এবং একটি জাবেরের সামনে রাখলেন। অন্য একটি রুটিকে দুইভাগ করে অর্ধেক নিজের সামনে এবং বাঁকী অর্ধেক জাবেরের সামনে রাখেন।' (আহমদ, মুসলিম)

www.amarboi.org

৫. মেজবানের জন্য দো'আ করা

মেজবানের জন্য মেহমানের দো'আ করা মোস্তাহাব। নবী (সা) সা'দ বিন ওবাদার ঘরে খেয়ে তার জন্য দোআ' করেছেন।

তিনি বলেছেন,

اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ.

'রোজাদারগণ তোমার ঘরে ইফতার করুক, নেককার লোকেরা তোমার খানা গ্রহণ করুক এবং ফেরেশতারা তোমাদের উপর রহমতের দো'আ করুক।' (আবু দাউদ, সনদ সহীহ)

কেউ কেউ বলেছেন, এই দো'আ রমজানের ইফতারের সাথে সংশ্লিষ্ট, অন্য খাবারের সাথে নয়।

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল হাইসাম আততাইয়্যেহান নবী করীম (সা)-এর জন্য খাবার তৈরি করে তাঁকে এবং সাহাবায়ে কেরামকে দাওয়াত দেন। নবী (সা) খাবার শেষে বলেন,

اَثِيْبُوا اَخَاكُمْ قَالُوْا يٰارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا اِثَابَتُهُ؟ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اَذَا دُخِلَ بَيْتَهُ وَاُكِلَ طَعَامُهُ وَشُرِبَ شَرَابُهُ فَدَعَوْا لَهُ فَذٰلِكَ اِثَابَتُهُ.

'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের প্রতি সওয়াব পৌঁছাও। তাঁরা বলেন, আমরা কিভাবে সওয়াব পৌঁছাবো। হে রাসূলুল্লাহ! তিনি জওয়াবে বলেন, যখন কোন মেজবানের ঘরে প্রবেশ করা হয়, তার খাবার গ্রহণ করা হয় এবং পানীয় পান করা হয়, তখন তার জন্য দো'আ কর। এটাই তার প্রতি সওয়াব পৌঁছানো।' (আবু দাউদ)

আমেদী এবং একদল আলেমের মতে, কারো ঘরে খাবার খেলে তার জন্য দো'আ করা মোস্তাহাব। এক হাদীসে মশহুর এর সমর্থন দেয়। হাদীসটি হচ্ছে,

مَنْ اَسْدَى اِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَادْعُوْا لَهُ.

'যে তোমাদের উপকার করে, তোমরাও তার সমান উপকার কর। না পারলে তার জন্য দো'আ কর।'

www.amarboi.org

৬. খাওয়া শেষে বিনা কারণে দেরী না করা

আল্লাহ বলেন, فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلاَمُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ.

'যখন তোমরা খাওয়া শেষ কর তখন সরে যাও এবং গল্প-গুজবে লিপ্ত থেকে দেরী করো না।'

অর্থাৎ অন্যের বাড়ীতে খানা খাওয়ার পর বলে যাও। তোমরা কথা-বার্তায় ব্যস্ত থেকো না এবং দেরী করো না। এটা নবীর জন্য কষ্টকর। অনুরূপভাবে, তা সকল মুসলমানের জন্যও কষ্টকর এবং সময় বিনষ্টকারী। এর ফলে, পরিবারের লোকেরা খাওয়া পরবর্তী কাজে বাধাপ্রাপ্ত হয়। হাসান বসরী বলেছেন, এই আয়াতটি ভারী লোকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আল্লামা সুদ্দী বলেন, আল্লাহ কোরআন মজীদে ভাবী লোকদের আলোচনা উপরোক্ত আয়াতে করেছেন। ইবনুল জাওযী বলেছেন, খাওয়ার পর যদি বসার অনুমতি থাকে, তাহলে বসা জায়েয। আর যদি মেজবান এ ব্যাপারে আগ্রহী হন, তাহলে বসে থাকা মোস্তাহাব। বিশেষ করে মেজবান যদি বলে যে, বসুন এবং দুই ব্যক্তির মধ্যে সমঝোতা করে দিন কিংবা বসুন, গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আছে তাহলে বসা যায়।

ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, মেহমানের সাথে মেজবানের দরজা পর্যন্ত বেরিয়ে আসা মোস্তাহাব। এটা ইবনে আব্বাসের মত। ইমাম শা'বীও তাই বলেছেন। ইমাম আহমদ তাই করতেন।

পানীয় পান করার নিয়ম ও সুন্নত

নবী (সা) পানীয় পান করার কিছু নিয়ম-পদ্ধতি নিজ উম্মাহকে শিখিয়ে গেছেন। তাতে উন্নত রুচিবোধ, পূর্ণতা, স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা এবং সামাজিক অধিকারকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। সেই পদ্ধতিগুলো হল :

১. ডান হাতে পান করা

ইবনে ওমার থেকে বর্ণিত নবী (সা) বলেছেন,

لاَيَأْكُلُ اَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.

'তোমাদের কেউ যেন বাম হাতে না খায় ও পান না করে। কেননা, শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে।' (আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

এ প্রসঙ্গে খাবার গ্রহণ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

www.amarboi.org

২. বসে পান করা

বসে পান করাই সহজতর, স্বাস্থ্যসম্মত এবং শরীরের জন্য আরামপ্রদ। তা মাননসই ও শোভনীয়। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসে বসার উপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। কোন কোন হাদীসে দাঁড়িয়ে পান করার শিক্ষাস্বরূপ বমি করে পান করা জিনিস বের করে দেয়ার কথাও বলা হয়েছে। অন্য হাদীসে নবী (সা) এর দাঁড়িয়ে পান করার কথাও উল্লেখ আছে। কোন কোন সাহাবীও দাঁড়িয়ে পান করেছেন বলে বর্ণিত আছে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, দাঁড়িয়ে পান করা জায়েয আছে। এ সকল হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উত্তম পন্থা হল, বসে পান করা মোস্তাহাব এবং দাঁড়িয়ে পান করা মাকরূহ তানযীহি সহকারে জায়েয। শর্ত হল, বিনা ওজরে হতে হবে। এ প্রসঙ্গে হাদীসগুলো এবং ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য হচ্ছে নিম্নরূপ,

আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, نَهٰى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا.
দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।' (আহমদ, মুসলিম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্নিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

لَايَشْرَبَنَّ اَحَدُ مِّنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِىَ فَلْيَسْتَقِئْ.

'তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে, যে ভুলে যায়, সে যেন বমি করে দেয়।' (মুসলিম)

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (সা) দাঁড়িয়ে যমযমের পানি পান করেছেন।' (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আলী (রা) কুফার দাঁড়িয়ে পান করেন এবং বলেন, কিছু লোক দাঁড়িয়ে পান করাকে মাকরূহ মনে করে। (আহমদ ও বোখারী)

ইবনে ওমার থেকে বর্ণিত। 'আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) আমলে হাঁটা ও দাঁড়ানো অবস্থায় পান করতাম।' (আহমদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী)

মাজরী বলেছেন, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। অধিকাংশ আলেমের মতে, দাঁড়িয়ে পান করা জায়েয, মাকরূহ নয়। একদল এটাকে মাকরূহ বলেছেন। আমার মতে, নবী (সা)-এর দাঁড়িয়ে পান করা জায়েযের প্রমাণ এবং নিষিদ্ধমূলক হাদীসগুলো উত্তম পদ্ধতি তথা বসে পান করার জন্য উৎসাহ দানকারী। তবে দাঁড়িয়ে খাওয়া যে জায়েয, এর মধ্যে কোন মতভেদ নেই। কেউ কেউ বলেছেন,

www.amarboi.org

দাঁড়িয়ে পানি পান করলে পেটে এক প্রকার অসুখ দেখা দেয়। তাই নিষেধাজ্ঞা স্বাস্থ্যসুলভ, ইবাদতমূলক নয়।

কুরতুবী মাফহাম গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, দাঁড়িয়ে পান করা হারাম-এবিষয়ে কেউ জোর দেননি। যদিও জাহেরী সম্প্রদায়ের নীতির ভিত্তিতে তাকে হারাম বলার প্রচলন রয়েছে। জাহেরী সম্প্রদায়ের ইবনে হাজামের মতে, তা হারাম। তবে এ বিষয়ে অনেক হাদীস প্রমাণ করে যে, নবী (সা) দাঁড়িয়ে পান করেছেন। অনুরূপভাবে হযরত ওমার থেকেও দাঁড়িয়ে পান করার বর্ণনা রয়েছে। মোওআত্তা গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ওমার, ওসমান ও আলী (রা) দাঁড়িয়ে পান করেছেন। হযরত আয়শা ও সা'দের মতে, তাতে কোন দোষ নেই। তাবেঈদের একটি দল এ বিষয়ে অনুমতি দিয়েছেন। ওলামায়ে কেরামের দু'টো মত আছে। একটি হচ্ছে, নিষেধাজ্ঞার তুলনায় জায়েযের বিষয়টা অগ্রাধিকারযোগ্য। এটা হচ্ছে, আবু বকর আসরামের মত। তিনি আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, দাঁড়িয়ে পান করতে কোন দোষ নেই।

কুরতুবী বলেন, আবু হোরায়রা থেকে নিষেধাজ্ঞামূলক বর্ণনা প্রতিষ্ঠিত নয়। তা না হয়, তিনি একথা বলতেন না যে, 'তাতে কোন অসুবিধা নেই।' এছাড়াও তা নিষেধাজ্ঞামূলক হাদীসকে দুর্বল করে দিচ্ছে এবং দাঁড়িয়ে পান করলে বমি না করার বিষয়ে ওলামাদের ঐক্যমত রয়েছে।

২য় মতটি হচ্ছে, দাঁড়িয়ে পান না করার নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে গেছে। আসরাম এবং ইবনু শাহীনের মত এটাই। তাঁরা বলেন, নিষেধাজ্ঞামূলক হাদীস জায়েযমূলক হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। যার প্রমাণ হল, খোলাফায়ে রাশেদীন, অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈর দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে পান করা জায়েয।

ইবনু হাজম-এর বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন। তিনি দাবী করেছেন, জায়েযমূলক হাদীস নিষেধাজ্ঞামূলক হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। তিনি বলেন, নিষিদ্ধ হবার পর সেটাকে জায়েয বানানোর জন্য প্রমাণ দরকার। শুধুমাত্র ধারণা কিংবা সম্ভাবনা দ্বারা তা প্রমাণিত হতে পারে না।

কেউ কেউ জবাব দিয়েছেন, জায়েয সংক্রান্ত হাদীসগুলো নবী জীবনের শেষ দিকের হাদীস। তিনি বিদায় হজ্জের সময় দাঁড়িয়ে যমযমের পানি পান করেছেন। এটা তাঁর শেষ জীবনের কাজ এবং পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদার

www.amarboi.org

কার্যক্রমও এর সহায়ক। অন্য এক দল আলেমের মতে, নিষেধাজ্ঞামূলক হাদীসগুলোকে মাকরূহ তানযীহি এবং দাঁড়িয়ে পানি পান করা সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে জায়েযের জন্য বলে মন্তব্য করেছেন। এটা হচ্ছে আল্লামা খাত্তাবী, ইবনু বাত্তাল এবং নওয়ী প্রমুখের মত।

আল্লামা হাফেজ ইবনু হাজার ফাতহুল বারী গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, এটা হচ্ছে, সর্বোত্তম ও নিরাপদ মত। তাতে আর কোন প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। আসরাম সর্বশেষ এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, মাকরূহ প্রমাণিত হলে, এটাকে আদব ও নসীহতের পর্যায়ে বিবেচনা করতে হবে, হারামের পর্যায়ে নয়। তাবারী এটাকেই দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেছেন।

বিষয়টিকে দীর্ঘ আলোচনা করার লক্ষ্য হল, অনেকে না জেনে-না বুঝে ছোটকে বড় এবং তিলকে তাল করেন। বিশেষ করে, দাঁড়িয়ে পান করার বিরুদ্ধে খুবই খড়গহস্ত। মনে হয় যেন তারা কোন ফরজ লংঘন কিংবা গুনাহ কবীরাহ করেছে। দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে, মৌখিক দাবীর ভিত্তিতে নয়।

৩, ৪ : প্রথমে বিসমিল্লাহ এবং শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা

পান করার আগে বিসমিল্লাহ বলা এবং শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা সুন্নত। কেউ প্রত্যেকবার শুরুতে বিসমিল্লাহ এবং শেষে আলহামদুলিল্লাহ বললে সেটা হবে সর্বোত্তম। তবে শুধুমাত্র প্রথমবার শুরুতে বিসমিল্লাহ বললে এবং শেষে আলহামদু লিল্লাহ বললে সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। এ মর্মে তিরমিযী শরীফে ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لَاتَشْرَبُوْا نَفَسًا وَّاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيْرِ وَلٰكِنْ اِشْرَبُوْا مَثْنٰى وَثُلَاثَ

وَسَمُّوا اللّٰهَ اِذَا اَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَاحْمَدُوا اللّٰهَ اِذَا اَنْتُمْ رَفَعْتُمْ.

‘তোমরা উটের মত একই শ্বাসে পানি পান করো না, বরং দুই-দুই কিংবা তিন-তিন শ্বাসে পানি পান কর। আর পানি পান করার সময় আল্লাহর নামে অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলে শুরু কর এবং পান শেষে আলহামদুলিল্লাহ বল।’

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী ফাতহুল বারীতে হাদীসের সনদকে দুর্বল বলেছেন। তিনি আল্লামা তাবরানী কর্তৃক আওসাত গ্রন্থে ভাল সনদ সহকারে বর্ণিত আরেকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত।

www.amarboi.org

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَشْرَبُ فِىْ ثَلاَثَةِ اَنْفَاسٍ ،اَذَا اَدْنَى الْاِنَاءَ اِلَى فِيْهِ يُسَمِّى اللّٰهُ، فَاِذَا اَخَّرَهُ حَمِدَ اللّٰهُ، يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلاَثًا.

'নবী (সা) তিন শ্বাসে পানি পান করতেন। পান পাত্র মুখের কাছে নিয়ে বিসমিল্লাহ বলতেন এবং সরিয়ে নেয়ার পর আলহামদুলিল্লাহ বলতেন।' তিনি তিনবার এরূপ করতেন।'

এই হাদীসটি মূলতঃ ইবনু মাজায় বর্ণিত হয়েছে। তাবরানী এবং বাজ্জারে এর সহায়ক বর্ণনা রয়েছে। এই কারণে উপরে তিরমিজির হাদীসটি পেশ করা হল। এতে বিস্তারিত বর্ণনা আছে এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এর সহায়ক বর্ণনা আছে। ফলে এই হাদীসের অর্থ জোরদার হয়েছে।

৫. পান পাত্রের বাইরে তিনবার শ্বাস গ্রহণ

তিনবারে পান করা সুন্নত। কিছু পানি পান করে পান পাত্রকে মুখ থেকে সরিয়ে নিতে হবে এবং পান পাত্রের বাইরে প্রশ্বাস ফেলতে হবে। তারপর আবার পান করতে হবে এবং বাইরে প্রশ্বাস ছাড়তে হবে। এভাবে তিনবার করতে হবে। পান পাত্রের শ্বাস নেয়া কিংবা ফুঁ দেয়া মাকরূহ। পাত্রের পানীয় গরম হলে কিংবা তাতে ময়লা থাকলে, ফুঁ দিয়ে সরানো যাবে না। বরং ময়লা ফেলে দিতে হবে। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত।

اَنَّ النَّبِىَّ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ ثَلاَثًا.

'নবী (সা) তিনবার পাত্রের মধ্যে শ্বাস নিতেন। (বোখারী, মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

كَانَ يَتَنَفَّسُ فِى الشَّرَابِ ثَلاَثًا وَيَقُوْلُ: اِنَّهُ اَرْوٰى وَاَبْرَاُ وَاَمْرَاُ.

'নবী (সা) পান করার সময় পানীয়তে তিনবার শ্বাস নিতেন এবং বলতেন, এটা হচ্ছে অধিকতর তৃপ্তিদায়ক, পিপাসার কষ্ট দূরকারী এবং পেটের জন্য উপযোগী'।" (আহমদ, মুসলিম)

আবু কাতাদাহ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِىْ الْاَنَاءِ.

www.amarboi.org

'তোমাদের কেউ পানি পান করলে যেন পান পাত্রের মধ্যে শ্বাস না নেয়।' (বোখারী ও মুসলিম)

আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত। 'নবী (সা) পান পাত্রে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।' এক ব্যক্তি বলল, আমি পাত্রের ময়লা দেখতে পাচ্ছি। নবী (সা) বলেন, পানি ফেলে দিয়ে (ময়লাটুকু) দূর করে দাও।' (আহমদ; তিরমিযী এটাকে ছহীহ বলেছেন) শাওকানী আনাস কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে বলেছেন : কেউ কেউ এটাকে প্রকাশ্য অর্থেই গ্রহণ করেছেন। পান পাত্রে শ্বাস গ্রহণ যে জায়েয এই হাদীস তার প্রমাণ। কেউ কেউ বলেছেন, নবী (সা)-এর কোন জিনিসকে নোংরা মনে করা হত না। তাই এটা তাঁর জন্য জায়েয, অর্থাৎ ব্যতিক্রমধর্মী। আল্লামা কুরতুবী বলেছেন, আনাসের হাদীসকে এ অর্থে গ্রহণ করা ঠিক নয়। কেননা, হাদীসের শেষাংশে আছে, 'তা অধিকতর তৃপ্তিদায়ক, পিপাসার কষ্ট নিবারক ও পেটের জন্য উপযোগী।' এই তিনটি বিষয় কেবলমাত্র পান পাত্রের বাইরে শ্বাস গ্রহণের মাধ্যমেই সম্ভব। যদি পানির মধ্যে প্রশ্বাস ছাড়ে, তাহলে পূর্ণ তৃপ্তি ও আরাম পাওয়া যাবে না। ওলামায়ে কেরামের বেশীর ভাগ এই অর্থ হাদীসের অবশিষ্টাংশের মর্ম, আবু কাতাদার বর্ণিত হাদীসে পান পাত্রের শ্বাস ফেলতে নিষেধ, ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদীস এবং আবু সাঈদের বর্ণিত হাদীসের প্রেক্ষিতে উপরোক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন। পানি পাত্রের বাইরে শ্বাস ফেলা উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অংশ। এমনটি হতে পারেনা যে, নবী (সা) নিজে কোন কাজের আদেশ দিয়ে তা নিজে পালন করবেন না, যদিও তাকে নোংরা মনে না করা হোক।

ইমাম নববী আনাসের বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা এরূপ করেছেন যে, নবী (সা) পান পাত্র থেকে পান করার সময় তিনবার শ্বাস গ্রহণ করতেন, পানীয়ের মধ্যে শ্বাস ফেলতেন না।

পান পাত্রের প্রশ্বাস ছাড়াকে নিষিদ্ধ করার কারণ হল, যেন মুখ থেকে কোন থুথু বেরিয়ে পানিকে নোংরা করে না দেয় এবং অন্য লোকের জন্য পান করতে সমস্যা সৃষ্টি না করে কিংবা পানি অথবা পাত্রে কোন দুর্গন্ধ সৃষ্টি না করে।

এ আলোচনার ভিত্তিতে, পান পাত্রে প্রশ্বাস না ফেলে একই শ্বাসে পাত্রের পানি পান করা জায়েয আছে। এটা ওমার বিন আবদুল আযীয, সাঈ'দ বিন মুসাইয়েব, আ'তা, আবি রেবাহ এবং মালেক বিন আনাসের মত। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, ইকরামা এবং তাউসের মতে, তা মাকরূহ। তারা বলেন, এটা হচ্ছে, শয়তানের পান করা। তবে, খাদ্য ও পানীয়ের মধ্যে ফুঁ দেয়া মাকরূহ।

www.amarboi.org

৬. ছোট হলেও ডান দিক থেকে দিতে হবে

এ বিষয়ে মানুষ খুবই কম 'আমল করে। সুন্নত হল, কেউ এক দল লোকের সাথে দুধ বা পানি পান করলে এবং তা অন্যকে পান করার জন্য দিতে চাইলে ডান দিক থেকে দেয়া শুরু করতে হবে। যদিও ডানের ব্যক্তি ছোট কিংবা অনুল্লেখযোগ্য হোক না কেন। আনাস বিন মালেক থেকে বর্ণিত।

اِنَّ النَّبِىَّ اُتِىَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيْبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِيْنِه اَعْرَابِىٌّ وَعَنْ يَسَارِه أَبُوْ بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ اَعْطَى الْاَعْرَابِىَّ وَقَالَ: اَلاَيْمَنُ فَالْاَيْمَنُ.

'নবী (সা)-এর কাছে পানি মিশ্রিত দুধ আনা হল। তাঁর ডানে একজন বেদুঈন এবং বামে ছিলেন আবু বকর। নবী (সা) দুধ পান সেরে বেদুঈনকে দুধ পান করতে দিলেন এবং বললেন, ডান দিক থেকে, ডান দিক থেকে।' (নাসাঈ ছাড়া অন্যরা তা বর্ণনা করেছেন।)

সাহল বিন সা'দ থেকে বর্ণিত। নবী (সা)-এর জন্য পানি আনা হল। তাঁর ডানে ছিল এক বালক এবং বামে ছিলেন বয়স্ক লোকেরা। তিনি বালককে জিজ্ঞেস করেন, আমি আগে তাদেরকে দেয়ার ব্যাপারে তোমার অনুমতি চাই। বালকটি বলল, আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কাছ থেকে আমার অংশের উপর আর কাউকে অগ্রাধিকার দেবো না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তার হাতে পানির পাত্রটি দিলেন।' (বোখারী, মুসলিম)

আল্লামা শাওকানী বলেছেন, এই হাদীস ডানের লোকদের আগে পানীয় ও অন্যান্য জিনিস দেয়ার সপক্ষে প্রমাণ। অধিকাংশ আলেমের মতে, তা মোস্তাহাব। ইবনু হাজমের মতে, তা ওয়াজিব। যদিও আনাসের বর্ণিত হাদীসে দুধের কথা এবং সাহল বিন সা'দের বর্ণিত হাদীসে পানির কথা এসেছে, কিন্তু তা দুধসহ সকল জিনিসের বেলায়ই প্রযোজ্য। সবাই সমানভাবে বসলে তখন কেবল বড়দের আগে দিতে হবে।

৭. পান করানোকারী সবশেষে পান করবে

আবু কাতাদাহ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

سَاقِىَ الْقَوْمِ اٰخِرُهُمْ شُرْبًا.

'কোন দলকে পানি পান করানো ব্যক্তি হচ্ছে, সর্বশেষ পানকারী।' (ইবনু মাজাহ; তিরমিযী এটাকে সহীহ বলেছেন)

www.amarboi.org

আল্লামা শাওকানী বলেছেন, এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ মিলে যে, কোন দল বা সম্প্রদায়কে পানি পান করানোকারী ব্যক্তি সবশেষেই পান করবেন, যে পর্যন্ত না সর্বশেষ ব্যক্তির পান করা শেষ হয়। এর দ্বারা ইঙ্গিত মিলে যে, আল্লাহ যাকে মুসলমানের উপর ক্ষমতা দান করেন, তার কর্তব্য হল, নিজের উপকারের উপর অন্যের উপকারকে প্রাধান্য দেয়া। তার লক্ষ্য হবে তাদের সংশোধন, কল্যাণ সাধন, অকল্যাণ দূর করা এবং নিজের স্বার্থের উপর তাদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া।

অনুরূপভাবে, কেউ যদি ফল কেটে তা লোকদের মধ্যে বন্টন করে, তাহলে প্রথমে বয়স্ক ব্যক্তি কিংবা ডানদিকে উপবিষ্টদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। পরে যা অবশিষ্ট থাকবে, তা নিজে খাবে ও পান করবে।

৮. সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করা হারাম :

হোজায়ফা বিন ইয়ামান থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

لاَ تَشْرَبُوْا فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوْا فِىْ صِحَافِهِمَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ.

'তোমরা সোনা-রূপার প্লেটে পান করো না এবং বড় পেয়ালাতেওনা। এটা দুনিয়ায় তাদের (কাফেরদের) জন্য, আর পরকালে তোমাদের জন্য।' (বোখারী, মুসলিম)

এই হাদীস সোনা-রূপার প্লেট-পেয়ালায় পানাহার করতে নিষেধ করেছে এবং বলেছে, তা দুনিয়ায় মোশরেকরা ভোগ ব্যবহার করবে। আর পরকালে তারা দোজখের আজাব ভোগ করবে। পক্ষান্তরে, মোমেনগণ বেহেশতে তা উপভোগ করবে।

হাদীসে বর্ণিত 'সেহাফ' শব্দের অর্থ হল; এমন বড় পেয়ালা যাতে ৫ জনের খাবার সংকুলান হয়। আল্লামা সানআনী বলেছেন; এই হাদীসে সোনা-রূপার পাত্রে পানাহারকে হারাম করেছে। চাই সে পাত্র খাঁটি সোনার তৈরী কিংবা রূপা মিশ্রিত যাই হোক না কেন। কেননা, তাতো সোনা-রূপা মিশ্রিতই হল। ইমাম নববীর মতে, সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার নিষিদ্ধ হবার বিষয়ে ইজমা রয়েছে।

www.amarboi.org

তবে, তা হারাম হওয়ার কারণের বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এক দল আলেমের মতে, এতে গর্ব আহংকার প্রকাশ পায়। কেউ বলেছেন; সোনা-রূপা হওয়াই নিষিদ্ধ হবার মূল কারণ। সোনা-রূপার আস্তরযুক্ত পাত্রে পানাহারের বিষয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, যদি একটাকে অন্যটা থেকে পৃথক করা যায় তাহলে, তাতে পানাহার হারাম হবার বিষয়ে ইজমা রয়েছে। কেননা, সে মূলতঃ সোনা-রূপা ব্যবহারকারী। আর যদি পৃথক করা না যায় তাহলে তাতে পানাহার জায়েয আছে। তবে, পাত্রের গায়ে সোনা-রূপার নকশা খচিত থাকলে তাতে পানাহার যে জায়েয-এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে। উপরোক্ত আলোচনা হচ্ছে, সোনা-রূপার পাত্রে পানাহারের বিষয়ে সীমাবদ্ধ।

পানাহার ছাড়া সোনা-রূপার অন্যান্য ব্যবহারের বিষয়ে মতভেদ আছে। কারো মতে, অন্যান্য ব্যবহার হারাম নয়। কেননা, কেবলমাত্র পানাহারকেই হারাম করা হয়েছে। অন্যদের মতে, অন্যান্য সকল ব্যবহার হারাম হবার বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পরবর্তী যুগের কিছু আলেম মতভেদ পোষণ করে বলেছেন। নিষেধাজ্ঞা শুধু পানাহারের বিষয়েই এসেছে। অন্য বিষয়ে নয়। পানাহারের সাথে অন্যান্য সকল ব্যবহারকে কেয়াস করা হলে, তাতে কেয়াসের শর্তাবলী পূর্ণ হয় না। অন্যান্য ব্যবহারকে জায়েয বলেছেন, সেটাই ঠিক। কেননা, হাদীস সুস্পষ্টভাবে পানাহারকেই নিষিদ্ধ করেছে। অন্যান্য ব্যবহার হারাম হওয়ার বিষয়ে ইজমার দাবী যথার্থ নয়। রাসূলুল্লাহর (সা) বর্ণিত শব্দের পরিবর্তন মন্দ জিনিস। যেখানে আল্লাহর নবী শুধু পানাহারকে নিষেধ করেছেন। সেখানে অন্যান্য সকল ব্যবহার টেনে এনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা ঠিক নয়।

মণি-মুক্তা, ইয়াকুত পাথরসহ অন্যান্য মূল্যবান পাথরকেও কি সোনা-রূপার সাথে তুলনা করা হবে? এ বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে সোনা রূপার হুকুমের মত না হওয়াটাই সুস্পষ্ট। হারাম হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ ছাড়া মৌলিকভাবে বস্তু হালালই থাকে।

উম্মে সালামা বার্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন। 'যে সোনা-রূপার পাত্রে পানী পান করে, সে যেন নিজের পেটে আগুন গিলে।' (বোখারী, মুসলিম)

ইমাম মুসলিমের বর্ণিত হাদীসে এসেছে; 'যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করে।' এই হাদীস উপরে বর্ণিত তথ্যের সত্যায়ন করে এবং তাদের শাস্তি ঘোষণা করে যারা তাতে শুধুমাত্র পানাহার করে।

www.amarboi.org

৯. কাফেরের পাত্রে পানাহার জায়েয :

জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে জেহাদে যেতাম এবং মোশরেকদের পাত্র ও পানির পেয়ালা লাভ করতাম। আমরা তা ব্যবহার করতাম এবং তিনি এর বিরুদ্ধে কোন কিছু বলেননি।' (আহমদ, আবু দাউদ)

আবু সা'লামা বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আহলে কিতাবের ভূমিতে অবস্থান করি। আমরা কি তাদের পাত্রে খেতে পারি? তিনি উত্তরে বলেন, অন্য কোন পাত্র থাকলে আহলে কিতাবের পাত্রে খেও না। আর যদি অন্য কোন পাত্র না থাকে, তাহলে তা ধুয়ে তাতে খেতে পার।' (বোখারী, মুসলিম)

এই দুটো হাদীস মোশরেক, ইহুদী ও খৃষ্টানের পাত্রে ধোয়ার পর খাওয়া যে জায়েয তার প্রমাণ। কেননা, তারা তাতে শুকরের গোশত ও মদ পানাহার করত। তারা প্রায়ই অপবিত্রতা থেকে বিরত থাকত না। প্রথম হাদীস প্রমাণ দেয় যে, শিরক ও কুফরীর কারণে মোশরেকদের শরীর নাপাক নয়।

রোগী দেখা :

ফজীলত : রোগী দেখা মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের কর্তব্য। ইসলাম মুসলমানদেরকে এই কর্তব্য ও অধিকার পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। যাতে করে অসুস্থ মুসলমান ভাই অসুখের সময় অন্যান্য ভাইদের কাছ থেকে ভ্রাতৃত্বের স্পিরিট অনুভব করে। এর ফলে, তার দুঃখ-কষ্ট কমবে এবং হারিয়ে যাওয়া স্বাস্থ্য ও শক্তির আংশিক ক্ষতি পূরণ হবে। নেককার লোকেরা তার জন্য দো'আ করবে। কল্যাণের সুসংবাদ দেবে। তার অন্তরে আশা জাগরিত করবে। আল্লাহর ভালবাসা ও রহমতের অনুভূতিটা দ্বারা মন ভরে দেবে, তাকে আল্লাহর দাবী সম্পর্কে জানাবে। দ্বীনের অজ্ঞাত বিষয়ের ব্যাপারে জ্ঞান দান করবে। তাওবার প্রতি আহ্বান জানাবে। গুণাহ থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেবে এবং আল্লাহর রহমত, দয়া ও ক্ষমতার প্রতি আশ্রয়ের প্রতি দাওয়াত দেবে।

সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন :

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِيْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ جَنَاهَا.

www.amarboi.org

'কোন মুসলমান অপর কোন অসুস্থ মুসলমান ভাইকে দেখলে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত সে বেহেশতের 'খোরফার' মধ্যে অবস্থান করে। রাসূলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞেস করা হল, 'খোরফা' কি? তিনি বলেন, 'ফল পাড়া'।'

আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি নবী (সা)কে বলতে শুনেছি :

مَامِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً اِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُمْسِي وَاِنْ عَادَ عَشِيَّةً اِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ.

'কোন মুসলমান সকালে অন্য কোন অসুস্থ মুসলমান ভাইকে দেখলে সেখানে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাজার ফেরেশতা তার জন্য আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর কেউ যদি সন্ধ্যায় অপর কোন অসুস্থ্য মুসলমান ভাইকে দেখে, সকাল পর্যন্ত ৭০ হাজার ফেরেশতা তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। আর তার জন্য বেহেশতে রয়েছে একটি শরতকাল।' (তিরমিযী, তিনি এটাকে হাসানও গরীব হাদীস বলেছেন। হাকেমও অনুরূপ বলেছেন।)

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন; 'যে ব্যক্তি রোগী দেখে বসার আগ পর্যন্ত আল্লাহর রহমতের মধ্যে চলতে থাকে। বসে পড়লে রহমত তাকে ঘিরে ফেলে।' (মালেক, আহমদ, বাজ্জার, ইবনু হিব্বান, তাবরানী হাদীসের বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য এবং হাদীসটি সহীহ)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন;

مَنْ عَادَ مَرِيْضًا نَادَاهُ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً.

'যে রোগী দেখে আসমান থেকে একজন আহ্বানকারী আওয়াজ দিয়ে বলে, তুমি বেশ ভাল কাজ করেছ, তোমার চলা উত্তম, আর তুমি বেহেস্তের একটি ঘর নিয়ে নিয়েছ।' (তিরমিযী, তিনি এটাকে হাসান বলেছেন, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিববান)

হাদীসের অর্থ হল, আল্লাহ তোমার চলনে সন্তুষ্ট এবং বিনিময়ে তোমাকে বেহেস্তে একটি স্থান দিয়েছেন। আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ

www.amarboi.org

(সা) বলেছেন, 'কেয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন। হে বনি আদম, আমি অসুস্থ্য ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসনি। আদম সন্তান উত্তর দেবে, হে রব! আমি কিভাবে আপনাকে দেখব। আপনি তো বিশ্ব জগতের প্রতিপালক? আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দাহ্ অসুস্থ ছিল। তুমি তাকে দেখনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি তাকে দেখলে আমাকে তার কাছে পেতে। (অর্থাৎ আমার দয়ার রহমত ও করুণা পেতে)' হে ইবনে আদম! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে খাবার দাওনি। বান্দাহ্ বলবে, হে আমার রব! আমি আপনাকে কিভাবে খাওয়াব, আপনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক? আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি জানতে না, আমার বান্দাহ্ তোমার কাছে খাবার চেয়েছে, তুমি তাকে খাওয়ার দাওনি? তুমি কি জানতে না তাকে খাবার দিলে তুমি তা আমার কাছে পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। আদম সন্তান জবাবে বলবে, হে রব! আমি কিভাবে আপনাকে পানি পান করাব। আপনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক? আল্লাহ্ বলবেন, আমার অমুক বান্দাহ্ তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে পানি পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি তাকে পান করালে তা আমার কাছে পেতে? (মুসলিম)

রোগীর সেবার হুকুম :

বারা বিন আযেব (রা) থেকে বর্ণিত।

اَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاِتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَاِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَاِجَابَةِ الدَّاعِيْ وَاِفْشَاءِ السَّلَامِ.

'রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে রোগীর সেবা, জানাযায় অংশ গ্রহণ, হাঁচির জবাব, কসম পূর্ণ করা, মজলুমের সাহায্য, দাওয়াতকারীর দাওয়াত কবুল করা এবং সালামের প্রসার ঘটানোর নির্দেশ দিয়েছেন।' (বোখারী, মুসলিম)

আবু মূসা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন।

عُوْدُوْا الْمَرِيْضَ وَاَطْعِمُوْا الْجَائِعَ وَفُكُّوا الْعَانِىْ.

'রোগী দেখতে যাও, ক্ষুধার্তকে খাবার দাও এবং বন্দী মুক্ত করো।' (বোখারী)

www.amarboi.org

এ সকল হাদীস বাহ্যতঃ রোগী দেখাকে ফরজ করেছে। ইমাম বোখারীর মত তাই। তিনি বোখারী শরীফে 'রোগী দেখা ফরজ' শিরোনামে একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল্লামা দাউদী এবং ইবনু তাইমিয়া প্রমুখেরও একই মত। তাদের দৃষ্টিতে তা ফরজে কেফায়া। কেউ আঞ্জাম দিলে অন্যরা দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যায়।

অধিকাংশ আলেমের মতে, রোগী দেখা মোস্তাহাব। কোন সময়ে তা ফরজের পর্যায়ে পৌছাতে পারে। যেমন, যে নার্স রোগীর সেবার জন্য অপরিহার্য কিংবা যার অনুপস্থিতিও বিলম্ব রোগীর জন্য ক্ষতিকর ইত্যাদি। তাবারীর মতে, যার কল্যাণ প্রত্যাশিত তার জন্য রোগী দেখা জরুরী। বন্ধু ও নিকটতম প্রতিবেশীর মত লোকের জন্য সুন্নত। অন্যদের জন্য মোবাহ্। একবার দেখা করলে কর্তব্য শেষ হয়ে যায়।

রোগীর দেখা বলতে বুঝায়, রোগীর খোঁজ-খবর নেয়া, নরম ও সদয় কথা-বার্তা বলা ইত্যাদি। কোন কোন সময় এর মাধ্যমে তার তৎপরতা ফিরে আসতে পারে। শক্তি ও চিকিৎসা দ্রুত সম্পন্ন হতে পারে। উপযুক্ত সময় বুঝে সাক্ষাত করতে হবে।

রোগী দেখার আদব

এত লম্বা সময় পর্যন্ত রোগীর কাছে অপেক্ষা না করা, যাতে রোগী ক্লান্ত হয়ে উঠে, কিংবা কষ্ট পায় অথবা রোগীর পরিবারের কষ্ট হয়। তবে, প্রয়োজন থাকলে কিংবা রোগী ও তার পরিবার আগ্রহী হলে, দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে কোন আপত্তি নেই। রোগী আরাম এবং তাকে খুশী করার জন্য উত্তম হল, বার বার রোগীকে দেখতে যাওয়া। হাদীসে রোগী দেখার বিষয়কে زِيَارَة না বলে عِيَادَة বলা হয়েছে। অর্থাৎ বার বার রোগী দেখা।

রোগের শুরুতেই রোগী দেখা উচিত। কেননা, হাদীসে এসেছে, (وَاِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ) 'যখন অসুস্থ হবে, তখন দেখতে যাবে।' তিন দিন পর রোগী দেখার বিষয়ে যে হাদীসের উল্লেখ করা হয়, সে হাদীস দুর্বল কিংবা জাল।

এক দিন পরপর রোগী দেখতে যাওয়াই ভাল। অবস্থার প্রেক্ষিতে আরও দেরীতেও দেখতে যাওয়া যায়।

রোগীর গায়ে হাত রাখা এবং তার আরোগ্যের জন্য দো'আ করা মোস্তাহাব।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত।

www.amarboi.org

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ إِذَا عَادَ مَرِيْضًا مَسَحَهُ بِيَمِيْنِهِ وَقَالَ : اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ، لَاشِفَاءَ اِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.

'রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন রোগী দেখতে যেতেন, তখন ডান হাত দিয়ে রোগীর শরীর স্পর্শ করতেন এবং বলতেন; 'হে মানুষের রব! রোগ-শোক দূর করুন। আরোগ্য দিন। আপনি আরোগ্য দানকারী, আপনার আরোগ্য ছাড়া কোন আরোগ্য নেই। যা কোন রোগকে অবশিষ্ট রাখে না।' (বোখারী মুসলিম)

আবু দাউদ ও তিরমিযীতে বিশুদ্ধ সনদ সহকারে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত।

مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَحْضُرْ اَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَسْئَالُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَن يَّشْفِيْكَ إِلاَّ عَافَاهُ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرَضِ.

'যে ব্যক্তি এমন রোগী দেখতে যায় যার মৃত্যু সমাগত নয় এবং তার কাছে সাত বার নিম্নোক্ত দো'আটি পড়ে। আল্লাহ তাকে ঐ রোগ থেকে মুক্তি দেবেন।

اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيْكَ.

'আমি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাই। যিনি মহান আরশের প্রতিপালক, তিনি যেন আপনাকে সুস্থ করেন।'

রোগীকে নিম্নোক্ত কথা বলা মোস্তাহাব। لاَبَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ 'কোন অসুবিধা নেই। আল্লাহর ইচ্ছায় (রোগ-শোক থেকে) পবিত্র হবে।' নবী (সা) কোন রোগী দেখতে গেলে একথা বলতেন। (বোখারী)

মূলকথা, বরকতপূর্ণ লোক হলে হাদীসে বর্ণিত যে কোন একটি দো'আ করলেই চলে। ইবনু আকীল তাঁর 'ফুনুন' গ্রন্থে লিখেছেন। যদি আপনাকে আরোগ্যের জন্য রোগীর মাথায় হাত দিতে বলে, তাহলে আপনি তাকে নূতন করে তাওবা করাবেন। ফলে, আপনার ব্যাপারে তার ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

আপনি যা নন তা দেয়া কিংবা উপরোক্ত বিষয় অবজ্ঞা করা ঠিক নয়। তা না হয়, অন্তত অন্ধ হয়ে যায়, দোষ চাপা পড়ে এবং লোক দেখানোর মনোভাব

www.amarboi.org

জাগ্রত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, রোগীকে সুখবর দেয়া এবং আশা জাগ্রতকারী উদাহরণ, উপমা পেশ করা মোস্তাহাব। এর ফলে, সে যে কষ্টের মধ্যে আছে তার কিছুটা উপশম হবে। আল্লাহর রহমত এবং আরোগ্য লাভের বিষয়ে হতাশা ও নৈরাশ্য সৃষ্টিকারী কোন কিছুই আলোচনা করা যাবেনা। এমনকি ইশারা ইঙ্গিতেওনা। কেননা, এর ফলে তার দুঃখ-কষ্ট বাড়বে।

যদি একটা মৃত্যুর রোগ হয় এবং রোগীর মধ্যে তার ভাগ্য সম্পর্কে চরম ভীতি বিরাজ করে। তাহলে, তার সামনে তার কিছু নেক কাজের আলোচনা করা যায়। এতে করে আল্লাহর প্রতি তার সুধারণা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

ইবনু শোমাছাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আ'মর বিন আসের মৃত্যুকালীন সময়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে কাঁদছিলেন এবং দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর ছেলে তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে আমার পিতা! রাসূলুল্লাহ (সা) কি আপনাকে অমুক-অমুক বিষয়ে সুসংবাদ দেননি? তখন তিনি সামনের দিকে মুখ ফিরান এং বলেন, আমরা সর্বোত্তম যে প্রস্তুতি নিতে পারি তা হচ্ছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এ কথার সাক্ষ্য দেয়া। (মুসলিম)

অন্য বর্ণনায় হযরত ওমারের এবং হযরত আয়েশার ইন্তেকালের সময় ইবনে আব্বাসের সুখবর দানের কথা উল্লেখ আছে।

অসুস্থ ব্যক্তির কাছে দোয়া চাওয়া মোস্তাহাব। কেননা, রহমতের ফেরেশতারা তার কাছে অবস্থান করে। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রোগীর দো'আ ফেরেশতাদের দো'আর মত। ধৈর্যশীল রোগী বিশুদ্ধ মানসিক পরিস্থিতিতে বিরাজ করে এবং নিজের বর্তমান অবস্থার কারণে আল্লাহর নিকট অবস্থান করে বলে তার দো'আ কবুলের আশা করা যায়।

রোগীর কাছে কি বলা উচিত?

রোগীকে ধৈর্য, আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকা এবং রোগ যত কঠিনই হোক না কেন, মৃত্যু কামনা না করার জন্য উপদেশ দেয়া উচিত। নবী (সা) দুঃখের কারণে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করেছেন।

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন;

لاَ يَتَمَنَّيَنَّ احَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرِّ اَصَابَهُ فَاِنْ كَانَ لاَبُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ :
اَللّهُمَّ اَحْيِنِىْ مَاكَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِىْ وَتَوَفَّنِىْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِىْ.

www.amarboi.org

'তোমাদের কেউ যেন দুঃখ-কষ্টে পড়ে মৃত্যু কামনা না করে। যদি তাকে মৃত্যু চাইতেই হয়। তাহলে সে যেন এভাবে বলে; হে আল্লাহ্ যে পর্যন্ত আমার জীবন আমার জন্য উত্তম সে পর্যন্ত আমাকে জীবিত রাখুন এবং যখন মৃত্যু আমার জন্য উত্তম, তখন আমাকে মৃত্যু দান করুন।' (বোখারী, মুসলিম)

বিপদ-মুসীবতের কারণে মৃত্যু কামনা মাকরূহ। হাঁ, যদি দীনের মধ্যে ফেতনা-ফাসাদ জাতীয় কোন কিছুই আশংকা থাকে। তাহলে, তা মাকরূহ নয়। ইমাম নববী আজকার গ্রন্থে এ কথা লিখেছেন।

অনুরূপভাবে রোগীর পরিবারকে শরীয়ত মোতাবেক কাজ করার উপদেশ দেয়া উচিত। নচেত, তার মৃত্যুর পর তারা চীৎকার, হা-হুতাশ, বুকে-পিঠে চাপড়ানো ইত্যাকার অনৈসলামী কাজ করে বসবে। অনুরূপভাবে তাঁর কোন ঋণ থাকলে কিংবা অন্য কোন সামাজিক দায়-দায়িত্ব থাকলে, তা পূরণের জন্যও তাদেরকে বলা উচিত। হাদীসে এসেছে, ঋণ শহীদকে পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশে বাধা দেবে।

ইমাম নববী (র) 'আজকার' গ্রন্থের ১২৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন। জীবন সম্পর্কে নিরাশ ব্যক্তির জন্য মোস্তাহাব হল, বেশী বেশী জিকর ও কোরআন তেলাওয়াত করা, মন ও মুখ দিয়ে আল্লাহর শোকরগুজারী করা। সংশ্লিষ্ট লোকদের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া। আমানত ফেরত দেয়া। পরিবার-পরিজনের কাছে তাদের অধিকার সম্পর্কে ক্ষমা চাওয়া। সন্তানের মধ্যে উপযুক্ত কেউ না থাকলে অন্য কাউকে অসিয়ত করা। আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা। মনে মনে চিন্তা করা যে, নিজে আল্লাহর একজন নিকৃষ্ট সৃষ্টি। আল্লাহ্ তার আজাব ও আনুগত্যের মুখাপেক্ষী নন। নিজে আল্লাহর ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিনীত বান্দাহ এবং তিনি ছাড়া আর কারো কাছে ক্ষমা ও দয়া আশা করা যায় না।

তার একথাও স্মরণ করা উচিত যে, যে ব্যক্তি খালেস ও নির্ভেজাল মনে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে এবং এর উপর মৃত্যু বরণ করে, সে বেহেশতে যাবে। মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে সে যেন নবী (সা)-এর মত বলে;

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَالْحِقْنِىْ.

'হে আল্লাহ! আমাকে মৃত্যুর কষ্ট ও যাতনা থেকে বাঁচতে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা ও দয়া করুন এবং আমাকে আমার সর্বোচ্চ সাথীর সাথে মিলিত করুন।'

www.amarboi.org

মৃত্যুর মুখোমুখি ব্যক্তির কাছে কি বলা উচিত?

মৃত্যুর সম্মুখীন ব্যক্তি যিনি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়াই করছেন। তিনি যদি আল্লাহর জিকর থেকে বেখেয়াল থাকেন। তাহলে, তাকে কালেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তে বলা উচিত। খুব নরমভাবে তা পড়ার জন্য বলতে হবে। রোগী একবার বলার পর তা আর বলার দরকার নেই। হাঁ, রোগী যদি অন্য কথা বলে, তাহলে আবারও তাকে কালেমা পড়াতে হবে। এ কালেমা পড়ানো উত্তম। মৃত্যুর সম্মুখীন ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত হয়েছেন।

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ.

তোমরা তোমাদের মৃতদেরকে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' শিক্ষা দাও।' (বোখারী ছাড়া অন্য একজন হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

অনুরূপভাবে, মৃত্যু উপস্থিত ব্যক্তিকে কেবলামুখী করে চীৎ করে শুইয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ মুখ যেন কেবলামুখী থাকে কিংবা ডান কাতে শুইয়ে দিতে হবে। ইমাম আহমদ নিজ মুসনাদে উল্লেখ করেছেন, মৃত্যুর সময় ফাতেমা বিনতে রাসূলুল্লাহ কেবলামুখী হন এবং ডান হাত মাথার নীচে দেন। রূহ বেরিয়ে গেলে তার চোখ বন্ধ করে দিতে হবে। কেননা, রূহ বেরিয়ে গেলে চোখ উপরের দিকে তাকানো অবস্থায় খোলা থাকে। চোখ খোলা থাকলে দেখতে খারাপ দেখায়। ইমাম নববীর মতে, চোখ বন্ধ করে দেয়ার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে।

উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ (সা) যখন আবু সালামার কাছে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর চোখ ছিল খোলা। তিনি তাঁর চোখ বন্ধ করে দেন। রূহ যখন বেরিয়ে যায়, চোখ তাকে অনুসরণ করে।' (মুসলিম)

উপস্থিত ব্যক্তিদের ভাল বলা মোস্তাহাব। নিজের জন্য এবং অন্যের জন্য দো'আ করবে। কেননা, ফেরেশতারা উপস্থিত থাকে। দো'আ করলে তারা 'আমীন' বলেন।

উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

اَذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ اَوِ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤْمِنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ ـ

www.amarboi.org

'তোমরা যখন রোগী কিংবা মৃত্যু উপস্থিত ব্যক্তির কাছে যাও, তখন উত্তম কথা বলবে। তোমরা যা বল, ফেরেশতারা সে সম্পর্কে আমীন বলেন।' (মুসলিম)

অনুরূপভাবে, মৃতের পরিবারের কাছে এহেন অবস্থায় মহিলাদের বিভিন্ন গুনাহর কাজে জড়িত না হবার আহ্বান জানাতে হবে। যেমন, বুক চাপড়ানো, কাপড় ছেঁড়া এবং জাহেলিয়াতের দো'আ করা। তাদের কাছে এমতাবস্থায় যা বলা উচিত সে বিষয়ে বলতে হবে। যেমন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন, আল্লাহুম্মা আজেরনি ফি মুসীবাতি ওয়াখলেফলী খাইরাম মিনহা।'

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন। 'সে ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে, মুখ থাপড়ায়, বুকের কাপড় ছিঁড়ে এবং জাহেলিয়াতের দো'আ করে।' (বোখারী, মুসলিম) জাহেলিয়াতের দো'আর অর্থ হল, আল্লাহর ফয়সালায় অসন্তুষ্টি ও রাগ প্রকাশ করা।

আবু মূসা আশআরী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : 'আমি উচ্চস্বরে শোক প্রকাশকারিণী, বিপদের সময় মাথায় চুল মুণ্ডনকারিণী এবং মুসীবতের সময় কাপড় ছিন্নকারিণী মহিলা থেকে মুক্ত।' (বোখারী, মুসলিম)

সকল ওলামায়ে কেরামের মতে তা হারাম। অনুরূপভাবে, চুল ছেঁড়ে আওলাকেশী হওয়া, গালে-মুখে চড় থাপ্পড় লাগানো, মুখ চিমটানো এবং ধ্বংসের জন্য দো'আ করাও হারাম।

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) সজোরে মৃতের গুণ-কীর্তন প্রকাশকারিণীসহ মহিলা শ্রোতার উপর অভিশাপ দিয়েছেন।' (আবু দাউদ)

ইমাম নববী বলেছেন, বেশী জোরে কাঁদাকে আমাদের সাথীরা হারাম বলেছেন। জোরে না কেঁদে আস্তে কাঁদা নিষিদ্ধ নয়। নবী (সা) সা'দ বিন ওবাদাহ (রা)কে দেখতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন। তাঁর কাঁদা দেখে লোকেরাও কেঁদে দিল। তারপর তিনি বলেন, তোমরা কি শুননি, নিশ্চয়ই আল্লাহ চোখের অশ্রু এবং মনের পেরেশানীর জন্য আজাব দেবেন না। তিনি জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, আল্লাহ জিহ্বার জন্য আজাব দেবেন কিংবা রহম করবেন।' (বোখারী, মুসলিম)

যে সকল হাদীসে পরিবারের কান্নার কারণে মৃতের আজাবের কথা উল্লেখ আছে সেগুলোর বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা হল, যদি মৃত ব্যক্তি নিজে পরিবারের অন্যায় কাজের কারণ হয়, তাহলে সে আজাব পাবে। যেমন, অন্যায় কাজের অসিয়ত করা অথবা সে পরিবারের অন্যায় কাজ সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও মৃত্যুর পূর্বে তাদেরকে নিষেধ করেনি। (আল আজকার- নববী-১৩৪ পৃঃ)

www.amarboi.org

কাফের রোগী দেখতে যাওয়া

মুসলমানের পক্ষে অসুস্থ কাফের রোগী দেখতে যাওয়া জায়েয। তবে শর্ত হল, সে কাফের মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী নয় কিংবা যুদ্ধকারী শত্রু দেশের নাগরিক নয়। নবী (সা) নিজ অসুস্থ চাচা আবু তালেবকে দেখতে যান এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। এছাড়াও তিনি তাঁর চাকর অসুস্থ ইহুদী বালককে দেখতে যান এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ায় বালক নবীজীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। যাদের মুসলমান হবার সম্ভাবনা আছে, তাদেরকে দেখতে যাওয়া মোস্তাহাব।

বোখারী শরীফে ইবনুল মোসাইয়েব নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেন। আবু তালেব মৃত্যুর সম্মুখীন হলে নবী (সা) তাঁর কাছে যান। সেখানে আবু জাহল বসা ছিল। নবী (সা) বলেন : হে চাচা! আপনি 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলুন। আমি এর সাহায্যে আপনার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবো।'

উল্লেখ্য যে, কাফেরের জন্য কোন সুপারিশ হবে না। ইবনু হাজার আসকালানী 'ফতহুল বারীর' ৭ম খন্ডের ১৪৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : এ হাদীসে নিকটাত্মীয় মোশরেকের সাথে সাক্ষাত কিংবা অসুস্থাবস্থায় তাকে দেখতে যাওয়া জায়েয আছে। কঠোর রোগ শয্যায়, এমনকি ফেরেশতাকে দেখার মুহূর্তেও তাওবা কবুল হতে পারে।

আবু দাউদ এবং বোখারী আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। 'এক ইহুদী বালক অসুস্থ হলে নবী (সা) তাকে দেখতে যান ও তার মাথার কাছে বসেন। তিনি বালকটিকে বলেন : ইসলাম গ্রহণ কর। বালকটি নিজ শিয়রের কাছে বসা পিতার দিকে তাকায়। তার পিতা তাকে বলে, আবুল কাসেমের আনুগত্য কর। ছেলেটি মুসলমান হয়ে গেল। নবী (সা) একথা বলে দাঁড়ালেন যে, আল্লাহর প্রশংসা, যিনি তাকে আমার উছিলায় দোজখ থেকে রক্ষা করলেন।' অসুস্থ কাফের ব্যক্তি যদি আত্মীয়, প্রতিবেশী কিংবা অংশীদার হয়। তাহলে, তাকে দেখতে যাওয়া মোস্তাহাব।

অসুস্থ মহিলাকে দেখতে যাওয়া

কোন পুরুষের কোন অমুহরাম অসুস্থ মহিলাকে এবং কোন মহিলার কোন অমুহরাম পুরুষ রোগীকে দেখতে যাওয়া জায়েয আছে। ইমাম বোখারী বোখারী

www.amarboi.org

শরীফে এ শিরোনামে একটি অধ্যায়ের অবতারণা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, মহিলা সাহাবী উম্মে দারদা একজন অসুস্থ পুরুষ আনসার রোগীকে দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেন। আয়েশা বলেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরত করে আসেন, তখন আবু বকর ও বেলাল জ্বরে আক্রান্ত হন। আয়েশা বলেন, তিনি তখন তাদের কাছে প্রবেশ করেন এবং বলেন, হে পিতা! কেমন আছেন? হে বেলাল! কেমন আছেন? ইবনু হাজার মন্তব্য করেছেন, পর্দা রক্ষা করে এবং ফেতনার আশংকা না থাকলে মহিলার পক্ষে অসুস্থ পুরুষকে দেখতে যাওয়া জায়েয আছে।

আবু দাউদ 'মহিলা রোগী দেখা' নামক অধ্যায়ে উম্মে আ'লা থেকে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। উম্মে আলা বলেন, 'আমি অসুস্থ্য হলে নবী (সা) আমাকে দেখতে আসেন এবং বলেন, হে উম্মে আ'লা! সুসংবাদ। মুসলমানের রোগের মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহ দূর করে দেন, যেমন করে আগুন সোনা-রূপার মরিচা দূর করে।' আল-মোনজেরী এটাকে হাসান হাদীস বলেছেন।

জানাযার নামাজ ও মৃতের দাফন

এক মুসলমান ভাইয়ের উপর অন্য মৃত মুসলমানের জানাযার নামাজ ও দাফন-কাফন একটি অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য। এটা ফরজে কেফায়াহ। কিছু সংখ্যক লোক তা আদায় করলে অন্যদের জিম্মা থেকে আদায় হয়ে যায়। আর কেউ আদায় না করলে সবাই গুনাহগার হবে। জানাযার নামাজ পড়া, মৃতকে কবর পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যাওয়া এবং দাফন করা সবই এ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ যে পর্যন্ত না লাশ চোখের এবং পরিবার-পরিজনের নাগালের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। ইসলাম এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের যে সকল অধিকার বর্ণনা করেছে, তার মধ্যে মৃত ভাইয়ের জানাযা ও দাফন অন্যতম। আল্লামা সানআনী রাসূলুল্লাহ (সা) নিম্নোক্ত হাদীসের বরাত দিয়ে বলেছেন। পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানের জানাযায় অংশগ্রহণ ফরজ। হাদীসটি হচ্ছে–

إِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوهُ 'মরে গেলে মৃতের অনুসরণ কর।'

নবী (সা) জানাযার অনুসরণ ও জানাযার নামাযে অংশ গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি জানাযায় অধিক সংখ্যক মুসল্লীর উপস্থিতির জন্যও উৎসাহিত করেছেন।

www.amarboi.org

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتّٰى يُصَلِّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتّٰى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ.

'যে ব্যক্তি জানাযার নামাজে হাজির হয় ও নামাজ পড়ে, তার জন্য এক কীরাত রয়েছে। আর যে ব্যক্তি নামাজ পড়ার পর দাফন কাজে শরীক হয় তার জন্য দুই কীরাত রয়েছে। জিজ্ঞেস করা হল, দুই কীরাত কি? তিনি জবাবে বলেন, দু'টো বিশাল পাহাড়।' (বোখারী, মুসলিম)

ইমাম বোখারীর এক বর্ণনায় এসেছে :

مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتّٰى يُصَلِّى عَلَيْهَا وَيَفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَانَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الاَجْرِ بِقِرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ اُحُدٍ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ فَانَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ ـ

'কেউ কোন মুসলমানের জানাযায় ঈমান ও সওয়াবের নিয়তে অংশগ্রহণ করে নামাজ পড়লে এবং দাফন শেষে অবসর হলে দুই কীরাত সওয়াব পাবে। প্রত্যেক কীরাত ওহোদ পাহাড়ের সমান। আর কেউ দাফনে অংশ না নিয়ে শুধু নামাজ পড়ে ফিরে আসলে এক কীরাত সওয়াব পাবে।'

মৃতের জন্য নামাজ পড়া ফরজে কিফায়াহ হলেও মুসল্লীর সংখ্যা যত বেশী হবে ততই দো'আ কবুলের সম্ভাবনা বাড়বে এবং মৃত ব্যক্তি ঐ দো'আ দ্বারা উপকৃত হবে।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি :

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلٰى جَنَازَتِهِ اَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللّٰهُ فِيْهِ ـ

www.amarboi.org

'কোন মুসলমান মারা গেলে, আল্লাহর সাথে শিরক করে না এমন ৪০ ব্যক্তি তার জানাযার নামাজ পড়লে আল্লাহ্ মৃত ব্যক্তির জন্য তাদের সুপারিশ গ্রহণ করবেন।' (মুসলিম, আবু দাউদ)

মালেক বিন হোরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيُصَلِّىْ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوْفٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ اَوْجَبَ.

'কোন মুসলমান মারা গেলে যদি তিন কাতার পরিমাণ লোক তার জানাযার নামাজ পড়ে তাহলে, সে বেহেশতে প্রবেশের যোগ্য হবে।' (আবু দাউদ, তিরমিযী এটাকে হাসান হাদীস বলেছেন)

এ হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম মালেক জানাযার নামাজে আগত লোকদেরকে তিন সারিতে ভাগ করে দাঁড় করাতেন।

শোক প্রকাশ

বিপদাপদ, কারো মৃত্যু এবং অর্থ-সম্পদ ও ফল-ফসল নষ্ট হয়ে গেলে অন্য কাউকে সবর এবং ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়াকে শোক প্রকাশ বলা হয়। কোরআনের আয়াত, রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস, নেক লোকদের কাহিনী এবং বিজ্ঞ লোকদের বক্তব্য থেকে ধৈর্য ধারণ, সান্ত্বনা দান ও শোক প্রকাশ করতে হয়। শোক প্রকাশের লক্ষ্য হল, বিপদগ্রস্ত লোকের বিপদ লাঘব করা এবং তাকে আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকতে উদ্বুদ্ধ করা। এ কাজ 'নেক ও তাকওয়ার বিষয়ে সহযোগিতা' এবং 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধের পর্যায়ভুক্ত।

এছাড়াও তা নিম্নোক্ত দু'টো হাদীসের আওতাভুক্ত :

১. وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ.

'ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ বান্দাহর সাহায্য করেন, যতক্ষণ বান্দাহ তার ভাইয়ের সাহায্য করেন।'

২. مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

www.amarboi.org

'যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন মোমেনের একটি কষ্ট দূর করে। আল্লাহ্ পরকালে তার একটি কষ্ট দূর করবেন।

শোক প্রকাশের হুকুম

শোক প্রকাশ করা মোস্তাহাব। আত্মীয়-স্বজনের বিষয়ে শোক প্রকাশের তাকিদ রয়েছে। আর তাদের ব্যাপারেও তাকিদ রয়েছে যাদের ব্যাপারে শোক প্রকাশ না করলে তারা কষ্ট পায়। লাশ দাফনের আগে ও পরে শোক প্রকাশ করা মোস্তাহাব। বিপদ শুরুর পর থেকেই কিংবা কারো মৃত্যুর পরই শোক প্রকাশের সময় শুরু হয় এবং দাফনের পর তিনদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তিন দিনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা উল্লেখ করে কোন হাদীস নেই। ধারণার ভিত্তিতেই তিন দিনের সময় সীমা নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং তিন দিনের পর শোক প্রকাশকে মাকরূহ করা হয়েছে। শোক প্রকাশের লক্ষ্য হল, বিপদগ্রস্ত লোকের মনে সান্ত্বনা দেয়া। তিনদিন পর সাধারণতঃ মন শান্ত হয়ে আসে। তার পর দুঃখের আলোচনার নবায়ন ঠিক নয়। অধিকাংশ আলেমের এটাই মত। কারো মতে, যত দেরীই হোক না কেন, শোক প্রকাশের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু পছন্দসই বিষয় হল, তিন দিন পর যেন শোক প্রকাশ করা না হয়। হ্যাঁ, শোক প্রকাশকারী কিংবা শোক গ্রহণকারী যদি অনুপস্থিত থাকেন এবং তিনদিন পর উপস্থিত হন তাহলে করা যাবে।

মৃতের পরিবারের সকল সদস্য, তার বড় ও ছোট এবং নারী-পুরুষ সকল আত্মীয়ের কাছে শোক প্রকাশ করা মোস্তাহাব। তবে যুবতীদের কাছে শোক প্রকাশের ব্যাপারে ফেতনার আশংকা থাকলে তাদের কাছে শোক প্রকাশ করা যাবে না। সেক্ষেত্রে কেবল তাদের মুহ্‌রাম আত্মীয়রাই তাদের কাছে শোক প্রকাশ করবে। শোক প্রকাশ করতে গিয়ে বসা ঠিক নয়। তবে যদি বিপদগ্রস্ত লোকের প্রতি এ পদ্ধতিতেই শোক প্রকাশ করার ব্যবস্থা হয়, তাহলে বসে শোক প্রকাশ করতে হবে। কেননা, বসে বসে শোক প্রকাশ করা বেদ'আত। এর ফলে কষ্টের নবায়ন হয় এবং বিপদগ্রস্ত লোকের অসুবিধে হয়। যদি বসার মজলিশে হায়-হুতাশ, চীৎকার, রাগারাগি এবং ইয়াতীমের মাল খাওয়ার মত হারাম বিষয় থাকে, তাহলে তাতে বসা হারাম।

শোক প্রকাশের সুনির্দিষ্ট কোন বাক্য ও শব্দ নেই। যে শব্দ বা বাক্য দ্বারা শোক প্রকাশিত হয়, তা দিয়েই শোক প্রকাশ করতে হবে। অনেক আলেম নিম্নোক্ত বাক্যগুলোকে শোক প্রকাশের জন্য পছন্দ করেছেন।

www.amarboi.org

اَعْظَمَ اللّٰهُ اَجْرَكَ وَاَحْسَنَ عَزَاءَكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ -

'আল্লাহ আপনাকে মহান বিনিময় দান করুন, শোককে উত্তম করুন এবং আপনার মৃতকে মাফ করুন।' রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ কন্যা যয়নাবের প্রতি তার এক সন্তানের মৃত্যুতে নিম্নোক্ত ভাষায় শোক প্রকাশ করেন :

لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطٰى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.

'তিনি যা নিয়ে গেছেন সেটা তাঁরই, তিনি যা দেন সেটাও তাঁর। তাঁর কাছে সকল জিনিসের একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। তাই ধৈর্য ধারণ কর এবং সওয়াবের নিয়ত কর। (ইমাম নববীর 'আজকার' গ্রন্থ থেকে সংক্ষেপিত)

মৃতের আত্মীয়দের ঐ দিন ও রাতের খাবার তৈরি করে মৃতের পরিবারকে দেয়া মোস্তাহাব। এটা তাদের প্রতি সৌজন্য এবং বাস্তব সহানুভূতির প্রকাশক। হযরত জাফর বিন আবু তালিবের শাহাদাতের পর নবী (সা) বলেন : 'তোমরা জাফরের পরিবারের জন্য খাবার তৈরী কর। কেননা, তাদের কাছে এমন একটি বিষয় উপস্থিত যা তাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে।' (আবু দাউদ, তিরমিযী এটাকে সহীহ বলেছেন)

জানাযার সাথে চলন্ত ব্যক্তির করণীয়

জানাযার সাথে চলন্ত ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর মৃতের পরবর্তী অবস্থা, তার ভাগ্য বরণ এবং আমলের বিনিময় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা কিংবা আল্লাহর জিকর এবং মনে মনে কোরআন পাঠ করা মোস্তাহাব। জানা দরকার যে, অতীতের বুজুর্গ ব্যক্তিরা জানাযার সাথে চলার সময় চুপচাপ থাকতেন। এমতাবস্থায় বেহুদা কথাবার্তা কিংবা জোরে জিকর ও কোরআন তেলাওয়াত থেকে বিরত থাকতে হবে। অতীতের নেককারদের অনুসরণের মধ্যেই সকল কল্যাণ এবং পরবর্তীদের আবিষ্কৃত বেদআতের অনুসরণের মধ্যেই সকল অকল্যাণ রয়েছে।

www.amarboi.org

আতিথেয়তায় মুসলমানের অধিকার

এ বিষয়টি একমাত্র ইসলামী আদর্শেরই বিষয়বস্তু। বিষয়টি ইসলামের রুচিবোধ এবং উন্নত আদব-শিষ্টাচারের পরিচায়ক। ইসলাম বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং এর উপযুক্ত বিধান বর্ণনা করে। সকল সামাজিক ও নৈতিক বিষয়ে এটাই হচ্ছে ইসলামের বৈশিষ্ট্য। ইসলাম যে কোন বিষয়ে বিস্তারিত হুকুম সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। যার ইসলামী উন্নত রুচিবোধ আছে তিনি দেখতে পারেন যে, ইসলাম মেজবানের উপর মেহমানের অধিকারের বিষয়ে কি গুরুত্ব আরোপ করে এবং তিনি তার মধ্যে এবং আজকের লোকদের অবস্থার সাথে তুলনা করলে বুঝতে পারবেন যে ইসলামের সামাজিক আদবই সেরা ও উন্নত এবং ঐক্য ও অনুভূতি সৃষ্টিকারী আকীদার উপযোগী।

এখন আমরা ইসলামের দৃষ্টিতে মেহমানদারীর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, তাৎপর্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করবো।

আবু শোরাইহ আদাওয়ী থেকে বর্ণিত। নবী (সা) যখন নিম্নোক্ত হাদীস বলেন, তখন আমার দু'চোখ দেখেছে এবং দু'কান শুনেছে। তিনি বলেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالُوْا وَمَا جَائِزَتُهُ؟ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ قَالَ : الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ وَمَا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْكُتْ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে সে যেন নিজ মেহমানের জায়েযার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, জায়েযা কি? তিনি বলেন, এক দিন ও এক রাত মেহমানদারী করা। তিনি আরো বলেন : মেহমানদারী (সর্বোচ্চ) তিনদিন। এর পরেরটা সাদকাহ হিসেবে বিবেচিত হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে, সে যেন ভাল কথা বলে কিংবা চুপ করে থাকে।' (বোখারী, মুসলিম, অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ তিরমিযী এটাকে হাদীসে হাসান বলেছেন)

আবু শোরাইহ কা'বী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

www.amarboi.org

اَلضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَمَا اَنْفَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَثْوِىَ عِنْدَهُ حَتّٰى يُحْرِجَهُ.

'মেহমানদারী (সর্বোচ্চ) তিন দিন। মেহমানের আগমনের কারণে মেহমানদারীর হক (কমপক্ষে) ১ দিন ও ১ রাত। এরপর মেহমানের জন্য যা খরচ করা হবে সেটা হবে সাদকাহ্। মেহমানের পক্ষে মেজবান বিরক্ত হতে পারে এ পরিমাণ সময় থাকা জায়েয নেই।'

হাদীস দু'টোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

প্রথম হাদীসে বর্ণনাকারী 'নিজের দু'চোখে দেখা এবং দু'কানে শোনার'– একথা বলার উদ্দেশ্য হল, তিনি এ হাদীসের সত্যতা ও যথার্থতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত। 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান আনে'– এ কথার অর্থ হল, আল্লাহর প্রতি ও হাশরের দিনের প্রতি পূর্ণ ঈমান আনা। এটা উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য বলা হয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, যে মেহমানদারী করে না, তার ঈমান নেই।

মেহমানের 'জায়েযা' বলতে তার আগমনকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তার আগমনের কারণে কমপক্ষে ১ দিন ১ রাত মেহমানদারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তা তিনদিন পর্যন্ত সম্প্রসারিত।

দ্বিতীয় হাদীসের অর্থ হল, মেহমান যেন তিন দিনের বেশী না থাকে। যার ফলে মেজবানের কষ্ট ও বিরক্তি সৃষ্টি হতে পারে। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে। মেজবান যেন মেহমানের কারণে গুনাহর কাজে জড়িয়ে না পড়ে। কেননা, মেহমান দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করলে মেজবান তার নিন্দা, কিংবা তার সম্পর্কে নিজের মধ্যে খারাপ ধারণা সৃষ্টি অথবা নিজের কষ্ট হতে পারে।

দু'হাদীস থেকে গৃহীত হুকুম

১. দু'হাদীস এবং হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায় যে, এখানে মেহমান বলতে, শহর, গ্রাম ও মহল্লা অতিক্রমকারী মুসাফিরকে বুঝানো হয়েছে কিন্তু বেশী বেশী হাদীস পাঠকের কাছে মেহমান হচ্ছে, অন্যের কাছে আগমনকারী যে কোন ব্যক্তি। যদিও তারা একই শহরের অধিবাসী হোক না কেন। নবী (সা)

www.amarboi.org

সাথে আরো কিছু সাহাবীসহ অন্য এক আনসারী সাহাবীর বাড়ীতে আগমন করায় আনসারী সাহাবীটি আনন্দিত হয়ে বলে উঠল :

مَا اَحَدُ الْيَوْمَ اَكْرَمَ اَضْيَافًا مِنِّى.

'আজ আমার চাইতে কেউ সর্বাধিক সম্মানিত মেহমানের কারণে সৌভাগ্যবান নয়।'

কিন্তু এ আলোচনায় প্রথম ধরনের মেহমানের কথাই গ্রহণ করা হয়েছে। মেহমান দু'প্রকার।

ক. ব্যাপক অর্থের দিক থেকে কেউ কারো কাছে গেলে সে মেহমান হিসেবে বিবেচিত হবে।

খ. বিশেষ অর্থ হল, মুকীমের কাছে কোন মুসাফিরের আগমন। আল্লামা শাওকানী 'নাইলুল আওতার' গ্রন্থের ৮ম খন্ডের ১৬৩ পৃষ্ঠায় এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। মেহমান এক বা একাধিক কিংবা নারী-পুরুষ সব ধরনেরই হতে পারে।

২. মেহমানের সম্মান করার অর্থ হল, হাসি মুখে কথা বলা। উত্তম সাক্ষাত, ভাল কথা এবং আপ্যায়ন করা। অর্থাৎ সমাজের নিয়ম অনুযায়ী মেহমানদারী করতে হবে। তবে শর্ত হল, সে নিয়ম যেন ইসলাম বিরোধী না হয়।

৩. প্রথম দিন মেজবান সামর্থ্য অনুযায়ী মেহমানকে খাওয়াবে। দ্বিতীয় এবং ৩য় দিন তাই খাওয়াবে যা নিজে খায়। তৃতীয় দিনের পর মেহমানকে জানিয়ে দেবে যে তার এর চাইতে অধিক মেহমানদারীর সামর্থ্য নেই। ইচ্ছা করলে মেজবান মেহমানকে আরো অধিক থাকার সুযোগ দিতে পারেন এবং পরে যা খরচ করবেন তা সদকাহ হবে। মেহমানদারীর অধিকার হবে না।

৪. ইমাম নববী বলেছেন। মেহমানদারী সম্পর্কে ইসলামের তাকীদের বিষয়ে সকল মুসলমানের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি এর পর বলেছেন, ইমাম শাফেঈ, মালেক, আবু হানিফা এবং অধিকাংশ আলেমের মতে মেহমানদারী সুন্নাহ, ওয়াজিব নয়। কিন্তু ইমাম লাঈস ও আহমদের দৃষ্টিতে গ্রামবাসীর উপর ১ দিন ও ১ রাত মেহমানদারী ওয়াজিব, শহরবাসীর উপর নয়। কাজী শাওকানী মেহমানদারী ওয়াজিব হবার বিষয়টিকে বেছে নিয়েছেন। তাঁর প্রমাণগুলো হচ্ছে :

১. শরীয়ত মেহমানকে শাস্তিস্বরূপ মেজবানের কাছ থেকে প্রয়োজন পরিমাণ জিনিস কেড়ে নেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। এটা ওয়াজিব ছাড়া সম্ভব হতে পারে না। হাদীসটি হচ্ছে; আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন :

www.amarboi.org

اَيُّمَا ضَيفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَاصبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوْمًا فَلَهُ
اَن يَّأخُذَ بِقَدْرِقِرَاهُ وَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ-

'কোন সম্প্রদায়ের কাছে মেহমান আসার পর যদি মেহমান বঞ্চিত থাকে, তাহলে, সে মেহমানদারীর পরিমাণ (খাবার) কেড়ে নিতে পারে। এতে কোন গুনাহ্ হবে না।' (আহমদ, বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য)

হাদীসে কারো কাছে আগমনকারী যে মেহমানকে খাবার কিংবা প্রয়োজন পূরণের মত জিনিস দেয়া হয়নি, সে মেহমান মেজবানের সম্পদ থেকে প্রয়োজন পরিমাণ কেড়ে নিতে পারে, বেশী নিতে পারবে না।

অন্য এক সহীহ হাদীসে এসেছে, 'কোন ব্যক্তি যদি কোন সম্প্রদায়ের কাছে মেহমান হিসেবে আসে এবং সে যদি না খেয়ে থাকে, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হল তাকে সাহায্য করা। এমনকি সে মেজবানের ক্ষেত-খামার ও সম্পদ থেকে রাতের মেহমানদারী গ্রহণ করতে পারবে।'

ওকবা বিন আ'মের থেকে বর্ণিত।

قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تَبْعَثُنِىْ فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لاَ يَقْرُوْنَا فَمَا تَرٰى؟ فَقَالَ : اِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَاَمَرُوْا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِىْ لِلضَّيْفِ فَاَقْبَلُوْا وَاِنْ لَمْ يَفْعَلُوْا فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِىْ يَنْبَغِىْ لَهُمْ.

'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে বাইরে পাঠান। আমরা এমন সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছি যারা আমাদের মেহমানদারী করে না। এ বিষয়ে আপনার রায় কি? তিনি বলেন, তোমরা কোন সম্প্রদায়ের কাছে গেলে তারা যদি মেহমানের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস দানের নির্দেশ দেয়, তাহলে তা গ্রহণ কর। যদি তারা কিছু না করে তাহলে তাদের কাছ থেকে মেহমানের অধিকার আদায় করে নাও।' (বোখারী, মুসলিম)

এ সকল হাদীস একদিন ও এক রাতের জন্য মেহমানের অধিকার ওয়াজিবের প্রমাণ বহন করে। অধিকাংশ আলেমের বক্তব্যের পেছনে কোন দলীল নেই। ইমাম শাওকানী নবী (সা)-এর এ বক্তব্য দ্বারাও ওয়াজিবের পক্ষে কথা বলেন।

www.amarboi.org

এর অতিরিক্তটা হবে সদকাহ।' অর্থাৎ আগেরটা সদকাহ নয়। বরং ওয়াজিব। তিনি নবী (সা)-এর একথাও দলীল হিসেবে পেশ করেন।

لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

'প্রত্যেক মুসলমানের উপর মেহমানের (১ম) রাতের মেহমানদারী ওয়াজিব।'

অধিকাংশ আলেম বাইতুল মালের অস্তিত্বের কারণে মেহমানদারীর অপরিহার্যতা রহিত হয়ে গেছে বলে যে মন্তব্য করেন, আল্লামা শাওকানী তাকে প্রমাণহীন ও ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

আল্লামা মোবারকপুরী বলেছেন। 'আমার মতে মেহমানদারী ওয়াজিব এবং এটাই অগ্রাধিকারপূর্ণ মত।'

মজলিশের আদব

মজলিশ কয়েক প্রকার। ১. সাধারণ মজলিশ : বৈধ স্থানে সকলের জন্য উন্মুক্ত অনুষ্ঠানের মজলিশ। যেমন, মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জেয়াফত ইত্যাদি।

২. বিশেষ মজলিশ : যাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক লোককে আমন্ত্রণ জানানো হয়। যেমন, বিশেষ বিশেষ বন্ধুদের মজলিশ, অফিসের কর্মকর্তাদের মজলিশ, কোন প্রতিষ্ঠানের পরিষদ, কোম্পানীর মজলিশ এবং বিভিন্ন সংস্থার পরিষদ। এ সকল মজলিশের প্রত্যেকটির সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন রয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, এ সকল নিয়ম-কানুনের প্রতি যত্নবান হওয়া। এর ফলে, উন্নত রুচিবোধ, সুন্দর পদ্ধতি এবং প্রত্যেককে তার অধিকার দানের নীতিমালার ভিত্তিতে মুসলমানদের মধ্যকার বন্ধন সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এখন আমরা ঐ সকল আদব ও নীতিমালা আলোচনা করবো।

১. প্রবেশের নিয়ম-কানুন

যদি মজলিশের স্থান বিশেষ ধরনের হয়। যেমন, কোন ভাইয়ের বা নিজ মেজবানের বাসা বা বিশেষ কোন স্থান, তাহলে সেখানে প্রবেশের জন্য অনুমতি ও সালামের প্রয়োজন রয়েছে।

২-৩. অন্য প্রবেশকারীকে জায়গা দেয়া এবং কাজ শেষে উঠে আসা

যদি মজলিশের স্থান সংকীর্ণ হয়, তাহলে মজলিশে বসা লোকদের কাছে একে অপরের সাথে মিশে বসার অনুরোধ জানাতে হবে এবং অন্য আগমনকারীর জন্য

www.amarboi.org

জায়গা করে দিতে হবে। কেননা, আগন্তুকের প্রতি গুরুত্ব প্রদান না করলে সে বিরক্ত হবে। অপমান বোধ করবে এবং মনে দুঃখ পাবে। মুসলমানদের জন্য এর কোনটাই মানায় না। প্রবেশকারী যদি আমলকারী আলেম হয় কিংবা যোগ্য ও মর্যাদাসম্পন্ন লোক হয় এবং তার জন্য কেউ উঠে যদি জায়গা করে না দেয়। তাহলে, মজলিশের দায়িত্বশীল ব্যক্তির উচিত বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেয়া। যাতে করে আলেম ও বিশিষ্ট ব্যক্তির বসার ব্যবস্থা হয়। তবে তা করতে হবে প্রজ্ঞা ও কৌশলের সাথে যা কোন ফেতনা, ঘৃণা ও বিদ্বেষের জন্ম দেবে না।

এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেছেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ .

'হে মোমেনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়; মজলিশের স্থান প্রশস্ত করে দাও। তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দেবে। আল্লাহ তোমাদের জন্যও প্রশস্ত করে দেবেন। যখন বলা হয় উঠে যাও, তখন উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা সমুন্নত করে দেবেন। আল্লাহ খবর রাখেন যা তোমরা কর।' (সূরা মোজাদালা : ১১)

এ আয়াতে মজলিশের দু'টো আদবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমটা হচ্ছে জায়গা করে দেয়া, আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে কাজ শেষ হলে চলে যাওয়া। এটা হচ্ছে, বিশেষ মজলিশের ব্যাপার। তবে সাধারণ মজলিশের বিষয়টি আরো প্রসারিত। এতে বৈঠকের প্রকৃতি, উন্মুক্ত স্থানে আয়োজন ও বহু মানুষের প্রবেশাধিকারের কারণে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়। যেমন, মসজিদ, জেয়াফত, রাস্তায় জনগণের মজলিশ এবং পার্ক ইত্যাদি।

৪. কাউকে তুলে দিয়ে সে জায়গায় না বসা

এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ বিন ওমার কর্তৃক নবী (সা) থেকে বর্ণিত হাদীস হচ্ছে প্রমাণ। হাদীসটি হচ্ছে-

www.amarboi.org

نَهَى اَنْ يُّقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسُ فِيْهِ اٰخَرُ
وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا ـ

'নবী (সা) কোন ব্যক্তিকে মজলিশ থেকে তুলে সে স্থানে কাউকে বসতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, তবে তোমরা জায়গা বের করে দাও।

ইমাম বোখারী বলেছেন; ইবনে ওমার কোন লোককে তার আসন থেকে তুলে দিয়ে সে স্থানে বসাকে মাকরূহ মনে করতেন।

মুসলিম শরীফে হযরত জাবের থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে; 'জুমাবারে তোমাদের কেউ যেন কাউকে তুলে দিয়ে সে স্থানে নিজে না বসে। বরং সে যেন বলে, জায়গা করে দিন।' ইবনু আবু জামরাহ বলেছেন, এ আদেশটি সকল মজলিশের জন্য প্রযোজ্য।

মূলতঃ এটা মসজিদ এবং রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান ও জ্ঞানের আসরসহ প্রত্যেক বৈধ প্রবেশাধিকারযুক্ত আসরের জন্য নির্দিষ্ট। কিংবা তা বিশেষ কোন মজলিশের জন্যও প্রযোজ্য হতে পারে। যেমন, বিয়ের অলীমায় সমাজের গণ্যমান্য লোকদেরকে দাওয়াত দেয়া। কিন্তু অন্যান্য বিশেষ মজলিশ যেগুলোতে দাওয়াত দেয়া হয়নি এমন কাউকে ঘরের মালিকের তুলে দেয়ার অধিকার রাখে।

আবার এ আদেশ এত ব্যাপকও নয় যে, সকল লোক এর আওতায় অনুমতি পাবে। যেমন, পাগল কিংবা যে ব্যক্তি কাঁচা পেয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে আসে অথবা জ্ঞানের আসরে কোন বোকা কিংবা শাসকের দরবারে তার হাজির হওয়ার অধিকার নেই। তাদেরকে তুলে মজলিশ থেকে সরিয়ে দিতে হবে। কাউকে তুলে দেয়াকে এ জন্য নিষেধ করা হয়েছে। এর ফলে, কোন মুসলমানের অধিকারকে খাট করে দেখা হয়। যার ফলে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া বৈধ জিনিসে সকল মানুষের অধিকার সমান। যার আগে আসার কারণে নিজের অধিকার স্থাপিত হল, অন্যায়ভাবে তার সে অধিকার ছিনিয়ে নেয়া যায় না। বরং তা হারাম। (ফতহুল বারী ১১ খণ্ড, ৫৩ পৃঃ সংক্ষেপিত)

ইবনু আবু জামরাহর মতে, কাউকে বৈধ আসর থেকে তুলে দেয়া হারাম। অন্যদের মতে মাকরূহ।

ইবনু বাত্তাল বলেন, হাদীসে নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেছেন : এটা শুধু আদব-শিষ্টাচারের জন্য। নতুবা আলেমের মজলিশে বুঝ-জ্ঞানের অধিকারী লোকদেরই বসা উচিত। কেউ কেউ বলেছেন, এটা

www.amarboi.org

বাহ্যিকভাবেই হারাম। তাই কাউকে এ জাতীয় বৈধ প্রবেশাধিকারযুক্ত মজলিশ থেকে তুলে দেয়া জায়েয নেই। তারা ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসের বরাত দিয়ে বলেন :

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِّنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

'কেউ মজলিশ থেকে উঠে যাওয়ার পর পুনরায় ফিরে আসলে সে নিজ জায়গায় বসার অধিকতর অধিকারী।' তারা বলেছেন, ফিরে আসার পর যদি সাবেক জায়গায় বসার অধিক অধিকারী হয় তাহলে, উঠার আগেই সে অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইবনু ওমারের আমল দ্বারাও তার প্রমাণ মিলে। হাদীসের বর্ণনাকারী হিসেবে তিনি হাদীসের মর্ম ভাল করে জানেন। কুরতুবী মাফহাম গ্রন্থে বলেছেন : এ হাদীস মজলিশ থেকে উঠে যাওয়া ব্যক্তি তার সাবেক স্থানে বসার অগ্রাধিকারের পক্ষে বক্তব্যের সহায়ক। যারা বলেন, এ হাদীসের উদ্দেশ্য হল আদব শিক্ষা দেয়া। কেননা, স্থানটি ব্যক্তির বসার আগে বা পরে তার মালিকানাধীন ছিল না। তাদের এ বক্তব্য কোন প্রমাণ নয়। আমরা স্বীকার করি যে, এটার উপর তার মালিকানা নেই। কিন্তু প্রয়োজন পূরণের আগ পর্যন্ত স্থানটি তার সাথে সংশ্লিষ্ট। সে যেন এর উপকারিতার মালিক হয়ে গেছে এবং অন্য কেউ তাতে ভাগ বসাতে পারে না।

ইমাম নববী বলেছেন, আমাদের সাথীরা এ হাদীসকে সে সকল ব্যক্তির অধিকারের পক্ষে প্রয়োগ করেন, যে ব্যক্তি মসজিদ কিংবা সকলের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত স্থানে বসার পর পুনরায় ফিরে আসার নিয়তে উঠে যায়। যেমন, অজু কিংবা অন্য কোন কাজ তাহলে এর ফলে তার বসার অধিকার বাতিল হবে না। বরং সে তার স্থানে বসা ব্যক্তিকে উঠিয়ে দেবে এবং নিজে পুনরায় বসে পড়বে। যেহেতু হাদীসে এসেছে, 'সে ঐ স্থানের উপর অগ্রাধিকারী'। আমাদের অন্য সাথীদের মতে, তার স্থানে বসা ব্যক্তির উঠে যাওয়া মোস্তাহাব। আবার অন্য এক দলের মতে ওয়াজিব। এটাই অধিকতর বিশুদ্ধ। এক্ষেত্রে ইমাম মালেকের মাজহাব হল মোস্তাহাব। আমাদের (শাফেঈ' মাজহাবের) সঙ্গীরা বলেছেন, উঠে যাওয়া ব্যক্তি পুনরায় ফিরে আসলে শুধু ঐ ওয়াক্তের নামাজের জন্যই তার সাবেক স্থানে বসার অগ্রাধিকার স্বীকৃত। অন্য ওয়াক্তের জন্য নয়। তিনি আরও বলেন, উঠে যাওয়ার পর সে স্থানে জায়নামাজ বা অন্য কিছু রাখা না রাখার হুকুম একই।

www.amarboi.org

কাজী আ'য়াদ বলেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে শিক্ষাদান কিংবা ফতোয়ার কাজে অভ্যস্ত তার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেকের মতে, সে ব্যক্তি সম্পর্কে জানা থাকলে সে তার স্থানে বসার ওয়াজিব অগ্রাধিকারী। তিনি আরো বলেন, অধিকাংশ আলেমের মতে, এটা হচ্ছে উত্তম। ওয়াজিব অধিকার নয়। সম্ভবতঃ ইমাম মালেকের উদ্দেশ্যও তাই।

অনুরূপভাবে, তারা রাস্তা এবং বেচা-কেনার স্থানের বিষয়ে যা কারো মালিকানাধীন নয়-বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি ঐ জায়গায় বসার পর তার উদ্দেশ্য পূরণের আগ পর্যন্ত সেই অগ্রাধিকারী। বিরোধ অবসানের লক্ষ্যে মাওয়ারদী ইমাম মালেক থেকে এ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। কুরতুবী অধিকাংশ আলেমের মতের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেছেন, এটা ওয়াজিব অধিকার নয়। ইমাম নববী বলেছেন, আমাদের সাথীরা 'তোমাদের কেউ যেন কাউকে তার আসন থেকে তুলে না দেয়।' এই ব্যাপক ভিত্তিক হাদীসকে সে ব্যক্তির জন্য ব্যতিক্রম বলেছেন যে মসজিদের পরিচিত কোন অংশে ফতোয়া দেয়। কিংবা কোরআন ও জ্ঞান শিক্ষা দেয়। সে ব্যক্তি আগে আসা ও বসা কোন ব্যক্তিকে ঐ স্থান থেকে তুলে দিতে পারে। একই হুকুম রাস্তা কিংবা বাজারে আগে এসে স্থান দখলকারী ব্যক্তির জন্যও প্রযোজ্য। (ফাতহুল বারী : ১১ খণ্ড, ৫৪পৃঃ)

৫. মজলিশের খালি স্থানে বসা

প্রবেশকারীর জন্য সুন্নত পন্থা হল, খালি স্থানে বসা। স্থান খালি রেখে অন্যান্যদের সাথে ভীড় করে বসা জায়েয নেই। খালি জায়গায় বসলে কেউ তাকে বিরক্ত করবে না।

এটা সে মজলিশের জন্য প্রযোজ্য যে মজলিশে ঘরের মালিক কিংবা সমাবেশের ব্যবস্থাপকের পক্ষ থেকে বসার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম-কানুন নির্ধারিত নেই। হাঁ, যদি নির্ধারিত নিয়ম-কানুন থাকে, তাহলে ব্যবস্থাপক কিংবা নিমন্ত্রণকারী যেখানে বসতে বলেন, সেখানে বসতে হবে। আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে এ মর্মে জাবের বিন সামুরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমরা নবী (সা)-এর মজলিশে আসলে খালি জায়গায় বসতাম।'

৬. ফাঁক না থাকা সত্ত্বেও দু'জন বসা ব্যক্তির মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করা

মজলিশে আগমনকারী কিংবা বিদ্যমান ব্যক্তি অন্য দু'জন পাশাপাশি উপবিষ্ট লোকের মাঝে ফাঁক না থাকা সত্ত্বেও ফাঁক করে বসার চেষ্টা করা জায়েয নেই।

www.amarboi.org

হাঁ, ঐ দু'জনের অনুমতি সাপেক্ষে জায়েয হতে পারে। কেননা, এর মাধ্যমে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হয় এবং এ আচরণ সুস্থ রুচিবোধ ও আদবের পরিপন্থী। এ জন্য নবী (সা) বলেছেন :

لاَيَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ الاَّ بِاذْنِهِمَا.

'অনুমতি ছাড়া দু'ব্যক্তির মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করা কারো জন্য জায়েয নেই।' (আবু দাউদ, তিরমিযী এটাকে হাসান হাদীস বলেছেন) মসজিদসহ অন্যান্য সকল মজলিশের ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য।

৭. গোলাকার আসরের মাঝখানে না বসা

গোল টেবিল আসর বা গোলাকার আসরের মাঝখানে বসা জায়েয নেই। এটা অনভিপ্রেত এবং গোলাকার আসরের অন্যদের জন্য কষ্টদায়ক।

এ মর্মে বর্ণিত হাদীস একে হারাম করেছে।

তিরমিযী আবু মাজলায থেকে বর্ণনা করেছেন। 'এক ব্যক্তি গোলাকার আসরের মাঝখানে বসে পড়ল। তখন হযরত হোজায়ফা বলেন; যে ব্যক্তি গোলাকার আসরের মাঝখানে বসে, সে আল্লাহর রাসূলের ভাষায় অভিশপ্ত।' (তিরমিযী এটাকে হাসান সহীহ হাদীস বলেছেন)

৮. তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে দুই ব্যক্তির কানাকানি জায়েয নেই

এ বিষয়ে ইবনে ওমার থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اِذَا كَانُوْا ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ -

'তিন ব্যক্তির উপস্থিতিতে ৩য় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দুই ব্যক্তির যেন কানাকানি না করে।' (বোখারী, মুসলিম)

ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الاٰخَرِ حَتّٰى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ مِنْ اَجْلِ اَنَّ ذٰلِكَ يَحْزُنُهُ.

'তোমরা তিন ব্যক্তি থাকলে অন্যজনকে বাদ দিয়ে যেন দু'জন গোপনে কথা না বলে। যে পর্যন্ত না তোমরা আরো লোকের সাথে মিশ। কেননা, তা ৩য় ব্যক্তির জন্য কষ্টদায়ক।' (বোখারী, মুসলিম)

www.amarboi.org

হাদীস দু'টো থেকে কতগুলো হুকুম জানা গেল। (ক) মজলিশে ৩য় ব্যক্তির উপস্থিতিতে তাকে বাদ দিয়ে অন্য দু'জনের গোপন আলোচনা হারাম। নারী-পুরুষ সবার জন্য এ হুকুম কার্যকর। এতে ৩য় ব্যক্তি কষ্ট পায় এবং তার বিরুদ্ধে দু'জন কোন ষড়যন্ত্র করছে বলে ধারণা করে অথবা কোন খারাপ উদ্দেশ্যেই ঐ দু'জন তার কাছ থেকে বিষয়টি গোপন করেছে। (খ) মুসলমান ভাই-বোনের অনুভূতির হেফাজতের প্রতি ইসলামের আগ্রহ। (গ) ৪ জন কিংবা আরো বেশী লোক থাকলে দু'জনের গোপনে কথা বলা জায়েয। (ঘ) ৩য় ব্যক্তির সাথে ৪র্থ ব্যক্তি যদি দূরে থাকে, কিংবা উভয়ের মধ্যে বিরোধ থাকে, তখনও দু'জনের গোপনে কথা বলা জায়েয নেই। কেননা, এমতাবস্থায়ই কষ্টের কারণ বিদ্যমান থাকে। (ঙ) দু'ব্যক্তি ৩য় ব্যক্তির উপস্থিতিতে গোপনে কথা না বললেও ৩য় ব্যক্তি বুঝে না এমন ভাষায় কথা বলাও হারাম। (চ) এ হুকুম পূর্ব থেকে মওজুদ তিন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি দু'জনের গোপন আলোচনা চলাকালীন সময়ে ৩য় ব্যক্তি এসে হাজির হয়, তাহলে সে দু'ব্যক্তি গোপন আলোচনা অব্যাহত রাখতে পারবে। ৩য় ব্যক্তির উচিত চলে যাওয়া। তবে, ৩য় ব্যক্তির আসন সুনির্দিষ্ট হলে এবং এ ছাড়া আর কোন জায়গা না থাকলে তার চলে যাওয়ার দরকার নেই। সবাই যদি কোন ওলীমায় আমন্ত্রিত হয় অথবা বিশেষ কোন মজলিশ হয়, তখন ৩য় ব্যক্তির উপস্থিতিতে দু'জনের গোপন আলোচনা কিছুতেই জায়েয হতে পারে না। যেহেতু তার প্রবেশাধিকার স্বীকৃত। তাই তার উপস্থিতি ঐ দু'জনের জন্য কষ্টকর নয়। (ছ) আরেক ব্যক্তির অংশগ্রহণ না করার প্রেক্ষিতে দুইজনের অধিক লোকের সাথে গোপন আলোচনা জায়েয নেই। কেননা এর ফলে ঐ ব্যক্তি বেশি কষ্ট পাবে। (জ) এ হুকুম থেকে ব্যতিক্রম হচ্ছে, একলা থাকা ব্যক্তি যদি অন্যদেরকে গোপন আলোচনার অনুমতি দেয়, তাহলে তারা গোপন আলোচনা করতে পারবে। তার অনুমতি কষ্ট না পাওয়ার প্রমাণ। (ঝ) কষ্ট পাওয়ার প্রেক্ষিতে গোপন আলোচনা সফর এবং সফরবিহীন উভয় অবস্থায়ই হারাম। বেশীর ভাগ আলেমের মত এটাই।

কেউ কেউ বলেছেন, গোপন আলোচনা কেবল সফরের মধ্যেই না জায়েয। কুরতুবী বলেছেন, এটাকে সফরের সাথে সুনির্দিষ্ট করার পক্ষে কোন দলীল নেই। ইবনুল আরাবী বলেছেন, গোপন আলোচনা সফর ও সফরবিহীন উভয় অবস্থাতেই নিষিদ্ধ। এর কারণ হচ্ছে, কষ্ট পাওয়া। আর এটা সফর এবং সফরবিহীন উভয় অবস্থাতেই পাওয়া যায়। তাই উভয় অবস্থাতেই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে।

www.amarboi.org

৯. কথার আদব রক্ষা করা

নিজের ভাইয়ের কথার সময় চুপ থাকতে হবে এবং কথা বলার জন্য উপযুক্ত শব্দ বাছাই করতে হবে। নিজেকে অন্য ভাইয়ের সামনে বোকা-মূর্খ ও নিকৃষ্ট প্রমাণ করা ঠিক হবে না। নিষিদ্ধ বিতর্ক করা যাবে না। প্রত্যেকের উচিত মজলিশের সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের চেষ্টা করা। কেউ কারো ত্রুটি দেখলে তা যেন গোপন রাখে এবং প্রকাশ না করে। ছোটদেরকে স্নেহ এবং বড়দেরকে সম্মান করতে হবে এবং উপকারী ব্যক্তির জন্য দো'আ করতে হবে।

১০. মজলিশে আল্লাহর নাম স্মরণ করা

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسٍ لاَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ فِيْهِ اِلاَّ قَامُوْا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً.

'যে মজলিশে আল্লাহর জিকর বা স্মরণ করা হয়নি, সে মজলিশ থেকে কোন সম্প্রদায় মৃতগাধার দেহের মত উঠে এবং এ জন্য তাদেরকে দুঃখ করতে হবে।' (আবু দাউদ, সনদ বিশুদ্ধ)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন :

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوْا اللّٰهَ تَعَالَى فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَى نَبِيِّهِمْ فِيْهِ اِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ.

'যারা এমন মজলিশে বসে, যাতে আল্লাহকে স্মরণ করেনি এবং তাদের নবীর (সা) উপর দরূদ পড়েনি, এর ফলে তাদের ঘাটতি হবে বা আল্লাহর রোষানলে পড়বে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে আজাব দান কিংবা ক্ষমা করতে পারেন।' (তিরমিযী এটাকে হাসান হাদীস বলেছেন)

১১. মজলিশ থেকে উঠার সময় মজলিশের কাফ্ফারার স্মরণ

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : 'কেউ যদি এমন কোন মজলিশে বসে যাতে অর্থহীন ও বেহুদা কথা-বার্তা বেশী হয়। তারপর

www.amarboi.org

মজলিশ থেকে উঠার সময় নিম্নোক্ত দো'আ পড়ে। আল্লাহ তার এ মজলিশের সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন :

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

'হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তোমার কাছে গুনাহ মাফ চাই ও তওবা করি।' (তিরমিযী এটাকে হাসান হাদীস বলেছেন)

ইবনে ওমার (রা) থেকে নিম্নোক্ত দো'আ পড়ার বর্ণনাও এসেছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) খুব কমই কোন মজলিশ থেকে উঠার সময় এ দো'আ না পড়ে উঠেছেন।

اَللّٰهُمَّ اَقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهٖ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهٖ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا اَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِىْ دِيْنِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا.

'হে আল্লাহ আমাদের প্রতি আপনার ভয়-ভীতি বন্টন করুন যা আমাদের ও পাপের মধ্যে আড়াল হবে। আপনার আনুগত্য ও ইবাদতের তৌফিক দিন। যা আমাদেরকে বেহেশত পর্যন্ত পৌঁছাবে। আমাদেরকে এমন উঁচু মানের দৃঢ় ঈমান বিশ্বাস দান করুন। যার ফলে আপনি আমাদের উপর দুনিয়ার বিপদ-মুসীবত সহজতর করবেন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে যতদিন জীবিত রাখেন, ততদিন আমাদেরকে কান, চোখ ও শক্তি দ্বারা উপকৃত করুন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত

www.amarboi.org

পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত রাখুন। আমাদের উপর অত্যাচারকারীদের প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। শত্রুদের উপর আমাদেরকে বিজয় দান করুন। আমাদের দ্বীনের মধ্যে আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করবেন না। দুনিয়াকে আমাদের চরম চাওয়া-পাওয়া ও জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করবেন না। আমাদের প্রতি রহম করবে না- এমন কাউকে আমাদের উপর নিয়ন্ত্রণ দেবেন না।' (তিরমিযী এটা হাসান হাদীস বলেছেন)

১২. নেক ও দুর্বল মুসলমানদের সাথে বসার উপর গুরুত্ব আরোপ

মুসলমানের কর্তব্য হল নেক ও দ্বীনদার লোকের সাথে চলা, যার ফলে নিজের নেক আমল বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের সাথে উঠা-বসার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হবে। তিনি তাদের কথা-বার্তা ও কাজ-কর্মে দ্বীনের জাজ্বল্য ছবি দেখতে পাবেন। তাই তার উচিত গরীব, ফকীর, দুর্বল ও সমাজের অবহেলিত মানুষের সাথে বেশী উঠা-বসা করা। আপনি তাদের সাথে চললে নিজের বিনয় বাড়বে। মানসিক সৌজন্যবোধ সৃষ্টি হবে এবং নবী (সা)-এর যথার্থ অনুসরণ হবে এর মাধ্যমে আপনি তাদের মনে আনন্দ ঢুকাতে পারবেন এবং তাদের মধ্যে নিজের জীবনকে সহজ দেখতে পাবেন। আপনি তাদের সাথে কোন কৃত্রিমতা প্রদর্শন করবেন না। আপনি তাদের অবস্থা জেনে তাদেরকে সাহায্য করতে কিংবা লোকদেরকেও সাহায্যের জন্য উৎসাহিত করতে পারেন। নিজে নেক হলে, তিনি দুনিয়াদার, ধনী, বড়লোক ও বড় কর্মকর্তাদের সাথে চলার তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকবেন এবং তাদের সাথে উঠা-বসার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করবেন ও তাদের চিন্তাধারায় অন্ধকার ছেয়ে গেছে বলে উপলব্ধি করতে পারবেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি তাদের থেকে দূরে অবস্থান করবেন। যেমন সুস্থ লোক সংক্রামক রোগী থেকে দূরে থাকে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, তিনি যেন আমাদেরকে তাদের মজলিশ থেকে দূরে রাখেন। আপনি সে ব্যক্তিকে দেখে আশ্চর্য হবেন যিনি এলেম ও জ্ঞানের দাবী করা সত্ত্বেও দুনিয়াদার লোকদের সাথে গিয়ে মিশেন এবং তাদেরকে সাথী বানান। এটা হচ্ছে, তার দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর মুনাফেকী, লোক প্রদর্শন এবং মর্যাদা হানিকর। সে ইলমের মর্যাদাকে নষ্ট করেছে এবং এমন ব্যক্তির সঙ্গী হয়েছে যে কোন নেক লোকের শরীরের পশম হওয়ারও যোগ্য নয়।

অতীতে কোরাইশ নেতৃবৃন্দ মহানবী (সা)-এর কাছে দাবী জানায়, তিনি যেন তাদের জন্য গরীব দাস ও নিম্নবিত্ত মুক্ত মজলিশের ব্যবস্থা করেন। তাহলে তারা তাঁর মজলিশে বসে দ্বীনের দাওয়াত শুনবেন। নবী (সা) এ ব্যাপারে আল্লাহর

www.amarboi.org

আদেশের অপেক্ষা করেন। পরে কোরআন নাজিল হয় এবং তাঁকে নেক ও গরীব লোকদের সাথে বসার নির্দেশ দিয়ে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে নিষেধ করা হয়। কেননা তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সকাল-সন্ধ্যা তাদের রবের কাছে দো'আ করে। এ কারণে তাদের কাছে আল্লাহর আলো এসেছে, অন্তর উদ্ভাসিত হয়েছে এবং উর্ধজগতে তাদের জন্য বিশেষ দফতর খোলা হয়েছে। তাদের একজন কোটি কোটি নষ্ট অন্তর ও কাফেরের তুলনায় সফল যাদের জীবন কুফরীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং যারা আল্লাহর নিকৃষ্ট সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে।

এ বিষয়েই কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে :

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

'আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন। যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না।'

(সূরা কাহাফ : ২৮)

তারা হচ্ছে বেহেশতবাসী। মুসলমানের উচিত এ জাতীয় লোকের মজলিশে বসা। নবী (সা) বলেছেন :

اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْاَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ.

'আমি কি বেহেশতবাসী কারা সে বিষয়ে তোমাদেরকে বলবো না? এরপর বলেন, তারা হল দুর্বল-বিনীত লোক, লোকেরা যাকে দুর্বল মনে করে তুচ্ছ করে। কিন্তু তারা আল্লাহর নামে শপথ করে তা পূরণ করে।' (বোখারী, মুসলিম)

নবী (সা) আরো বলেন :

رُبَّ اَشْعَثَ اَغْبَرَ مَدْفُوْعٍ الْاَبْوَابِ لَوْاَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ.

'কোন কোন বেহেশতবাসী হচ্ছে, ধূলা-মলিন আওলাকেশী, মানুষের দরজা থেকে বিতাড়িত, তবে তারা আল্লাহর নামে শপথ করলে তা পূরণ করে।' (মুসলিম)

www.amarboi.org

নেক লোকদের সাক্ষাত ও তাদের মজলিশে অংশ গ্রহণের বিষয়ে হাদীসে উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحَ وَجَلِيْسِ السُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمُسْكِ اِمَّا اَنْ يُّحْذِيْكَ وَاِمَّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِاِمَّا اَنْ يُّحْرِقَ ثِيَابَكَ وَاِمَّااَنْ تَجِدَ مِنْهُ مُنْتِنَةً .

'নেক ও মন্দ লোকের সাহচর্যের উদাহরণ হল, সুঘ্রাণযুক্ত মেশক বহনকারী এবং কামারের হাঁপরের দুর্গন্ধের মত। মেশক বহনকারী হয় আপনাকে কিছু দিতে পারে কিংবা আপনি কিছু কিনতে পারেন অথবা আপনি কমপক্ষে কিছু সুঘ্রাণ হলেও পাবেন। পক্ষান্তরে কামারের হাঁপর, হয় আপনার কাপড় জ্বালাবে অথবা আপনি এর দুর্গন্ধ হলেও লাভ করবেন।' (বোখারী, মুসলিম)

ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত :

جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! كَيِّفَ تَقُوِّلُ فِىْ رَجُلٍ اَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ .

'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সে ব্যক্তির অবস্থা কি যে কোন সম্প্রদায়কে ভাল বেসেছে কিন্তু সে তাদের সাথে মিশত না? তিনি উত্তরে বলেন, ব্যক্তি যাকে ভালবাসে সে তার সাথেই থাকবে।' (বোখারী, মুসলিম)

নবী (সা) বলেন :

اَلاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارِفَ مِنْهَا اَئْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ.

www.amarboi.org

'আত্মা হচ্ছে নির্বাচিত সৈন্য। পরিচয় থাকলে পরস্পর ভালবাসার সূত্রে আবদ্ধ হয়। আর অপরিচিত হলে বিভিন্নতা দেখা দেয়।' (মুসলিম)

নবী (সা) আরো বলেন :

اَلرَّجُلُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُّخَالِلْ.

'প্রত্যেক ব্যক্তি তার বন্ধুর দ্বীনের উপর বলে বিবেচিত হবে। তোমাদের দেখা উচিত কার সাথে বন্ধুতা করছ।' (আবু দাউদ, তিরমিযী এটাকে সহীহ বলেছেন)

১৩. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং দুর্গন্ধ দূর করার উপর গুরুত্বারোপ

দুর্গন্ধ মজলিশের লোকদের জন্য কষ্টদায়ক ও ঘৃণার উদ্রেককারী। দুর্গন্ধের কারণে কেউ কেউ মজলিশ ত্যাগ করে। যেমন, ঘামের দুর্গন্ধ কিংবা দীর্ঘ সময় ব্যাপী গোসল ত্যাগকারীর শরীরের দুর্গন্ধ, কাঁচা পেঁয়াজ, রসুন ও মূলা খাওয়ার দুর্গন্ধ, কসাই কিংবা মেথর অথবা ময়লা পরিষ্কারকারীর শরীরের দুর্গন্ধ ইত্যাদি। এ জাতীয় লোকদের উচিত, মজলিশে না যাওয়া এবং দুর্গন্ধ দ্বারা লোকদেরকে কষ্ট না দেয়া। অনুরূপভাবে, যার মুখে দুর্গন্ধ কিংবা ক্ষত স্থানের দুর্গন্ধ কিংবা বিশেষ কোন রোগের কারণে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়েছে সেও যেন মজলিশে না যায়।

এ নিষেধের ভিত্তি হল, নবী (সা) কাঁচা পেঁয়াজ ও রসুন ভক্ষণকারীকে মসজিদ ও মজলিশ থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। নবী (সা) যখনই কোন ব্যক্তির কাঁচা পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ পেতেন, তখনই তাকে মসজিদ থেকে বের করে দিতেন। এ আচরণ প্রমাণ করে, দুর্গন্ধ সহকারে মানুষের সাথে মেলামেশা করা হারাম।

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন :

مَنْ اَكَلَ ثُوْمًا اَوْبَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا اَوْفَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا.

'যে ব্যক্তি কাঁচা রসুন-পেঁয়াজ খায়, সে যেন আমাদের থেকে কিংবা আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে।' (বোখারী, মুসলিম)

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে,

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَالْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا
فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَاذّٰى مِمَّا يَتَاذّٰى مِنْهُ بَنُوْ اٰدَمَ.

www.amarboi.org

'যে ব্যক্তি কাঁচা পেঁয়াজ, রসুন ও কোররাস (রসুনের পাতা জাতীয়) খায়, সে যেন আমাদের মসজিদে না আসে। আদম সন্তান যে সকল জিনিস দ্বারা কষ্ট পায়, ফেরেশতারাও সে সকল জিনিসের দ্বারা কষ্ট পায়।'

একবার হযরত ওমর ফারুক (রা) জুম'আর খোতবায় বলেন, 'হে লোকেরা! তোমরা যে দু'টো গাছের পেঁয়াজ ও রসুনের কাঁচা পাতা খাও সেগুলো নিকৃষ্ট। আমি নবী (সা)কে দেখেছি, তিনি মসজিদে কোন ব্যক্তির মুখে এ দু'জিনিসের দুর্গন্ধ দেখলে তাকে বাকী' গোরস্থানের দিকে বের করে দিতেন। কেউ তা খেতে চাইলে সে যেন রান্না করে খায়।' (মুসলিম)

১৪. সৌহার্দ্যপূর্ণ সাহচর্য ও বিনীত ব্যবহার

বন্ধুর উচিত অন্য বন্ধুর সাথে সুন্দর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করা। উত্তম ও বিনীত কথা-বার্তা বলা। কঠোরতা ও ঘৃণা উদ্রেককারী আচরণ পরিহার এবং ঝগড়া ও বিতর্ক এড়িয়ে চলা। খোশ মেজাজ ও সুন্দর বাক্য উচ্চারণের আগ্রহ পোষণ করতে হবে। এগুলো সবই শরীয়তের নির্দেশ। পরস্পরের মনকে নিকটতর ও প্রিয়তর করার ব্যাপারে শরীয়াহ লোকদেরকে উৎসাহিত করে। আল্লাহ্ বলেন :

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ.

'আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে, আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন-হৃদয় হতেন। তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেতো। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন। তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করুন এবং কাজ কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।' (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

নবী (সা) বলেছেন :

لَاتُحَقِّرْ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ اَنْ تَلْقٰى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ.

'কোন নেক কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যদিও সেটা তোমার ভাইয়ের সাথে খোশ মেজাজে এবং হাসিমুখের সাক্ষাতই হোক না কেন।' (মুসলিম)

নবী (সা) আরো বলেছেন : وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ.

'ভাল শব্দ উচ্চারণ করা সদকাহ।' (মুসলিম)

www.amarboi.org

রাস্তায় বসার আদব

শরীয়তের দৃষ্টিতে রাস্তায় বসা অনাকাংখিত। কেননা, তাতে পথ অতিক্রম-কারীদের অসুবিধা হয় এবং যারা বসেন তারা হারাম কাজে জড়িয়ে পড়তে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় নারীদের দিকে তাকানো এবং লোকদের ব্যাপারে মনে বিভিন্ন খটকা সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি। যার ফলে, গীবত ও পরনিন্দা এবং খারাপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। বাহ্যিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে অন্যদেরকে অভিযুক্ত করার প্রবণতা জাগে এবং এ জাতীয় মজলিশ থেকে মুসলমানদের প্রতি করণীয় দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হতে পারে। তাই নবী (সা) রাস্তায় বসার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে জানান যে, রাস্তায় না বসে তাদের উপায় নেই। কেননা, একমাত্র রাস্তাতেই তাদের মজলিশ অনুষ্ঠান সম্ভব। মজলিশের উপস্থিতি কম-বেশী যাই হোক না কেন। অধিকাংশের বাড়ী-ঘর ছিল অপ্রশস্ত। তাতে এ জাতীয় স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী বৈঠকের কোন সুযোগ নেই। তাই নবী (সা) তাদেরকে বৈঠকের আদব রক্ষা সাপেক্ষে এর অনুমতি দিয়েছেন। হাদীসে এ জাতীয় বৈঠকের ১৩টি আদবের কথা উল্লেখ আছে। ১. চোখ অবনত করা ২. কথা ও কাজে পথচারীদেরকে কষ্টদান থেকে বিরত থাকা ৩. পথচারীদের সালামের জবাব দেয়া ৪. সৎকাজের আদেশ ৫. অসৎ কাজের প্রতিরোধ ৬. হাঁচিদাতার জবাব দেয়া ৭. গাড়ী কিংবা সওয়ারীতে মাল উঠানোর বিষয়ে সহযোগিতা করা ৮. বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা ৯. পথিক মুসাফিরকে রাস্তা বাতলানো ১০. জালেমের হাত থেকে রক্ষার জন্য মজলুমের প্রতি সাহায্য ১১. আল্লাহর জিকর করা, যেন রাস্তা কাউকে ভুলিয়ে ব্যস্ত ও উদাসীন না রাখে ১২. সুন্দর কথা বলা, সাধারণতঃ এ সকল বৈঠকে শরীয়াহ নিষিদ্ধ বিষয়ে কথাবার্তা হয়। ১৩. সালামের প্রসার ঘটানো।

ইবনে হাজার আসকালানী এগুলোর সপক্ষে যে সকল হাদীস উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো : আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَنَابُدٌّ مِّنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ فَاِذَا اَبَيْتُمْ فَاعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوْا وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ غَضُّ الْبَصَرَ وَكَفُّ الْاَذٰى وَرَدُّ السَّلَامَ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

www.amarboi.org

'তোমরা রাস্তায় বসবে না। সাহাবায়ে কেরাম বলেন; হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের রাস্তায় না বসে উপায় নেই। আমরা সেখানে বসে আলাপ-আলোচনা করি। তিনি বলেন, যদি তোমরা তা থেকে বিরত থাকতে না পার, তাহলে রাস্তার অধিকার আদায় কর। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, রাস্তার অধিকার কি? তিনি উত্তর দেন, চোখ অবনত রাখা, কষ্ট দান থেকে বিরত থাকা, সালামের উত্তর দেয়া, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের প্রতিরোধ করা।' (বোখারী, মুসলিম)

আবু দাউদ আরও একটু বাড়িয়ে বলেছেন :

وَاِرْشَادُ ابْنِ السَّبِيْلِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ اِذَا حَمِدَ اللّٰهَ.

'পথিককে রাস্তা দেখানো। হাঁচিদাতা আলহামদুলিল্লাহ বললে তার জবাব দেয়া।'

সাঈদ বিন মনসুর আরো একটু যোগ করেছেন : اِغَاثَةُ الْمَلْهُوْفِ

'বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা'।

বাজ্জার যোগ করেছেন, وَالْاِعَانَةُ عَلَى الْحِمْلِ .

বোঝা উঠানোর বিষয়ে সাহায্য করা।'

তাবরানী যোগ করেছেন :

وَاَعِيْنُوا الْمَظْلُوْمَ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا.

'মজলুমকে সাহায্য কর এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর'।

আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে 'সুন্দর কথাবার্তা' অতিরিক্ত যোগ হয়েছে। সালামের প্রসার ঘটানোর বিষয়ে 'মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের অধিকার' পর্যায়ে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কেরামকে বলেছেন, রাস্তায় বসা ব্যক্তির জন্য পথচারীর অধিকার আদায় করতে হবে। আর সে অধিকারও অনেক। তাই ঘরে বসাই উত্তম। আমরা বুঝতে পারলাম, মুসলমানকে সর্বাবস্থায় নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং অন্যান্য মুসলমান ভাইয়ের সাথে ইতিবাচক হতে হবে। এ ক্ষেত্রে অবহেলা করলে কিংবা নেতিবাচক হলে কেয়ামতের দিন আল্লাহর হিসেব থেকে বাঁচা যাবে না।

উল্লেখিত হাদীসগুলোতে ইসলামের অন্যান্য বিধানের মতই অন্যের মনোভাব সম্মান ও আরাম বিবেচনার আগ্রহ ব্যক্ত হয়েছে। পাশাপাশি শরীয়তদাতা, চান না যে, রাস্তায় বসে থাকা ব্যক্তি কোন মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকুক এবং মহিলাকে

www.amarboi.org

হয়রান করুক। অনুরূপভাবে, তিনি এটাও চান না যে, পথিককে বৈষয়িক ও অপার্থিব বিষয়ে কষ্ট দেয়া হোক। যারা ফলের খোসা, চামড়া ও ময়লা রাস্তায় ফেলেন এবং পথচারীসহ রাস্তায় বসা লোকদেরকে কষ্ট দেন। তাদেরকে সতর্ক হতে হবে। শুধু তাই নয়, ইসলাম রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করার জন্য উৎসাহিত করে, যাতে করে লোকদের কষ্ট না হয়। বরং পথিকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো সদকাহ। হাদীসে এসেছে, নবী (সা) এক ব্যক্তিকে বেহেশতের সিল্ক কাপড়ে মুড়ে থাকতে দেখেছেন। সে দুনিয়ায় মুসলমানদের চলার পথ থেকে একটি গাছ সরিয়ে দিয়েছিল। ফলে সে উত্তম বিনিময় লাভ করেছে।

ইসলাম প্রত্যেক মুসলমানকে অন্য মুসলমানের আরাম-আয়েশের উপাদানে পরিণত করে এবং তাদের জন্য কষ্টদায়ক জিনিস দূর করতে নির্দেশ দেয়। ইসলাম কিছু সংখ্যক কষ্টদায়ক জিনিসের উল্লেখ করে তার কুফল বিস্তারিত বর্ণনা করেছে।

আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত। নবী (সা) এরশাদ করেছেন :

اِتَّقُوْا للاَّعِنَيْنِ قَالُوْا وَمَا للاَّعِنَانِ : قَالَ الَّذِىْ يَتَخَلَّى فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْ ظِلِّهِمْ.

'তোমরা মানুষের অভিশাপ উদ্রেককারী দু'টো বিষয় থেকে বেঁচে থাক। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন : সে দু'টো জিনিস কি? তিনি বলেন, তা হল মানুষের রাস্তায় কিংবা গাছের ছায়ায় পায়খানা করা।' (মুসলিম) পার্শ্ব রাস্তায় থুথু কিংবা নাকের শ্লেষ্মা নিক্ষেপ ও অনুরূপ। তাতে দু'টো কষ্ট রয়েছে। দেখার কষ্ট ও সংক্রামক রোগের বিস্তার।

অন্যের সাথে আলোচনার আদব

অন্যের সাথে আলাপের ব্যাপারে ইসলামের কিছু আদব ও নিয়ম-কানুন রয়েছে যা মেনে চলা কর্তব্য। এর ফলে, একজন মুসলমান আল্লাহর নির্ধারিত সীমানায় অবস্থান করবে। তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করবে এবং অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে পারবে। মানুষ কথা বলার সময় কতইনা পিচ্ছিল খায়! কতইনা তার সামাজিক বিচ্যুতি ঘটে! যা নিজের প্রাণ এবং সমাজের জন্য মারাত্মক বিপদ ডেকে আনে। জিহ্বার বিপদ সম্পর্কে জানার জন্য নবী (সা)-এর এ হাদীসটিই যথেষ্ট। তিনি বলেছেন :

www.amarboi.org

مَنْ يَضْمَنْ لِى مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

'যে ব্যক্তি আমাকে তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী অংশ (জিহবা) এবং দু'পায়ের মধ্যবর্তী অংশের (লজ্জাস্থান) নিশ্চয়তা দেবে, আমি তাকে বেহেশতের নিশ্চয়তা দেব। (বোখারী, তিরমিযী)

'নবী (সা) আরো বলেছেন, কোন সময় ব্যক্তি এমন সব কথা বলে যার মধ্যে এমন বিষয় থাকে যা তাকে পূর্ব থেকে পশ্চিমের দূরত্ব অপেক্ষা দূরতম দোজখে নিক্ষেপ করে।' (বোখারী, মুসলিম)

এ বিষয়ে সামাজিক আচরণের ১ম নীতিমালায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখন আমরা বিষয়টির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবো।

১. কথার লক্ষ্য হবে মঙ্গল ও কল্যাণ :

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পবিত্র কোরআন মজীদে বলেছেন :

لاَ خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا.

'তাদের অধিকাংশ শলা-পরামর্শ ভাল নয়। কিন্তু যে শলা-পরামর্শ দান-খয়রাত অথবা ভাল কাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনকল্পে করতো তা আলাদা। যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এ কাজ করে আমি তাকে বিরাট সওয়াব দান করবো।' (সূরা নিসা : ১১৪)

গোপন কথায় মানুষের কোন কল্যাণ নেই। হাঁ, যদি সদকাহ্ দান কিংবা শরীয়ত সমর্থিত ভাল জিনিস অথবা ঝগড়া-বিরোধের সমাধানের জন্য গোপন আলোচনা করা হয়, তাতে কল্যাণ থাকবে।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَسْكُتْ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে সে যেন কথা বললে ভাল কথা বলে, কিংবা চুপ করে থাকে।' (বোখারী, মুসলিম)

www.amarboi.org

'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তার উচিত বেহুদা জিনিসের বিষয়ে যেন সে মাথা না ঘামায় এবং বৈধ হলেও লক্ষ্যহীন কথা-বার্তা না বলে। যাতে কোন কল্যাণ নেই। সময়ের মূল্য বেহুদা কথা-বার্তা অপেক্ষা অনেক বেশী। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথাবার্তা কিংবা বেহুদা কথা-বার্তা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয়। তা নিষিদ্ধ হবার পক্ষে কারো বক্তব্য নেই। তবে এ দু'টো বিষয় ত্যাগ করা উত্তম। এ দু'টো বিষয় অপেক্ষা আল্লাহর জিকর কিংবা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ উত্তম। আল্লাহ মোমেনদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে বেহুদা কথা থেকে বিরত থাকা অন্যতম গুণ। তিনি বলেন :

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ.

'যারা বেহুদা কথা থেকে বিরত থাকে।' (সূরা আল-মোমেনুন : ৩)

যে কথায় আলোচনাকারীর বা অন্যের কল্যাণ থাকে সেটাই উপকারী কথা। যে কথার লক্ষ্য হল, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, সে আলোচনাকারীকে আল্লাহ এ জন্য সওয়াব দেন।

২. বাতিল সম্পর্কে আলোচনা থেকে দূরে থাকা :

এখানে বাতিল বলতে গুনাহ বুঝানো হয়েছে। যেমন, যৌন আবেদনমূলক নারী সংক্রান্ত আলোচনা। মদের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিকারী মদের আসরের বর্ণনা, ফাসেক ও গুনাহগার লোকদের মর্যাদা, কাজ-কারবার ও তাদের বিষয়ে প্রচারধর্মী আলোচনা, রাজা-বাদশাদের শক্তির দাপট ও মন্দ আদেশ এবং তাদের ঘৃণিত কাজ উল্লেখ করে আনন্দ উপভোগ করা ইত্যাদি। এগুলো সবই হারাম। তবে তাদের মন্দ কাজকে মন্দ হিসেবে প্রকাশ কিংবা তাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে আলোচনা বাতিল ও গুনাহর আলোচনার অংশ নয়।

ইমাম গাজালীর মতে, গুনাহ ও বাতিল কাজ অগণিত হওয়ায় সেগুলোর সুনির্দিষ্ট সংখ্যা বলা সম্ভব নয়। তাই আমরা এখানে সংক্ষেপে কিছু বিষয় আলোচনা করবো।

বেলাল বিন হারেস থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন : 'যে ব্যক্তি কোন সময় আল্লাহর সন্তোষ উদ্রেককারী এমন শব্দ উচ্চারণ করে যার মর্যাদা সম্পর্কে তার জানা নেই। আল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত এর দ্বারা তার জন্য নিজ সন্তুষ্টি লেখেন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টিকারী এমন শব্দ উচ্চারণ করে যার

www.amarboi.org

ক্ষতি সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। এর দ্বারা আল্লাহ্ কেয়ামত পর্যন্ত তার জন্য নিজ অসন্তোষ লেখেন।' (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী এটাকে হাসান সহীহ হাদীস বলেছেন)

আলকামা বলতেন : বেলাল বিন হারেসের বর্ণিত হাদীস আমাকে বহু কথা থেকে বারণ করে রেখেছে।

আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ বলেছেন : বাতিল ও পাপপূর্ণ আলোচনাকারী কেয়ামতের দিন সর্বাধিক গুনাহ্গার হবে।

সালমান বলেছেন : কেয়ামতের দিন সে ব্যক্তি সর্বাধিক গুনাহ্গার হবে, যে সর্বাধিক আল্লাহ্র নাফরমানীর আলোচনা করেছে।

৩. তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া থেকে দূরে থাকা :

তর্ক-বিতর্ক কিংবা ঝগড়ার উদ্দেশ্য হল, সত্যে উপনীত না হওয়ার ইচ্ছা এবং কোন অস্পষ্ট জিনিস সম্পর্কে জানার আগ্রহ না থাকা। বরং এর লক্ষ্য হল কেবল ঝগড়া করা অথবা অন্যকে অক্ষম করে দেয়া। কিংবা প্রসিদ্ধি লাভ ও অন্যকে বিরক্ত করা যা শরীয়তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মূলতঃ ঝগড়া ও বিতর্ককারীদের এটাই হল লক্ষণ এবং ঈমানী দুর্বলতা। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ اَنْ هَدَاهُمُ اللّٰهُ اِلاَّ اُوْتُوْا الْجَدَلَ.

'আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়কে হেদায়েত করার পর বিতর্ককারীরা ছাড়া অন্য কেউ গোমরাহ হয়নি।' (তিরমিযী, তিনি এটাকে সহীহ হাদীস বলেছেন)

আবু উমামা বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

اَنَا زَعِيْمَ بَيْتٍ فِىْ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمَرْاءَ وَاِنْ كَانَ مُحِقًّا.

'আমি বেহেশতের পরিবেষ্টিত একটি ঘরের নেতা হবো। সে ঘরে ঐ সকল লোক অবস্থান করবে যারা যথার্থ হওয়া সত্ত্বেও বিতর্ক ত্যাগ করে।' (আবু দাউদ-সনদ বিশুদ্ধ)

ইমাম মালেক বিন আনাস (রা) বলেন, 'বিতর্ক দ্বীনের কোন অংশ নয়।' তিনি আরো বলেছেন, 'বিতর্ক অন্তরকে কঠোর করে এবং বিদ্বেষের জন্ম দেয়'।

আবু দারদা (রা) বলেছেন, 'গুনাহ্গার হওয়ার জন্য বিতর্কই যথেষ্ট।'

হযরত ওমার বিন খাত্তাব (রা) বলেছেন, তিন জিনিসের জন্য জ্ঞান অর্জন করো

www.amarboi.org

না এবং তিন জিনিসের জন্য জ্ঞান অর্জন ছেড়ে দিও না। বিতর্ক, অহংকার ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করো না। পক্ষান্তরে, লজ্জা, জ্ঞান আহরণ না করা, বুজুর্গী কিংবা অজ্ঞতার উপর সন্তুষ্ট হয়ে জ্ঞান আহরণ ত্যাগ করো না।

ইমাম গাজালীর মতে, বিতর্কের সংজ্ঞা হল, অন্যের কথায় ত্রুটি ধরা, চাই তা শব্দ কিংবা অর্থের মধ্যে অথবা আলোচনাকারীর নিয়তের মধ্যেই হোক না কেন। বিতর্ক না করার অর্থ হল, ত্রুটি না ধরা ও আপত্তি না করা। আপনি কোন সত্য ও ঠিক কথা শুনলে তা বিশ্বাস করবেন। আর মিথ্যা বা বাতিল হলে এবং তা দ্বীন সম্পর্কিত না হলে চুপ থাকবেন।

বিতর্কের অন্য সংজ্ঞা হল অপরকে অপমান ও অক্ষম করা তার কথার সমালোচনা করে তাকে ছোট করা এবং তাকে অজ্ঞ ও বোকা বানানো। বিতর্কের কারণ হল, জ্ঞান ও মর্যাদার প্রকাশ ঘটানো এবং অন্যের ত্রুটি ধরে তার উপর আক্রমণ করা। এ দু'টো বিষয় মন্দ ও ধ্বংসাত্মক। বিতর্ক মাকরূহর সীমা অতিক্রমকারী। ঝগড়ার কারণে কোন মুসলমান কষ্ট পেলে সে গুনাহগার হবে। কোন ঝগড়া কিংবা বিতর্কই কষ্টদান ও রাগ উদ্রেক না করে পারে না। এটা সাধারণতঃ আকীদা ও মাজহাবের ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে দেখা দেয়। মুসলমানের উচিত, একই কেবলার অনুসারীর ব্যাপারে নিজ জিহ্বাকে সংযত রাখা।

বিতর্ক মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা এবং দ্বীনি বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে যদি বিতর্ককারী কেবল অন্য ভাইয়ের অক্ষমতা প্রকাশ, অজ্ঞতা তুলে ধরা কিংবা তার খারাপ আকীদা প্রকাশ করা ছাড়া অন্য কোন নিয়ত পোষণ না করে। আজকের যুগে এটা বেশী বেশী ঘটছে এবং দ্বীনের মূলনীতি ও ইসলামী মূল্যবোধের সীমানা সম্পর্কে অজ্ঞ যুবকরা এক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে। এ জাতীয় যুবকদেরকে তাদের কর্তারা নিজেদের ইলম-জ্ঞানের গরিমা দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে অন্যদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। এটা বিরাট বিপর্যয়, গোমরাহী ও বিরাট ফেতনা সৃষ্টি করে।

৪. কথা বার্তা ও মাসআলার বিষয়ে কৃত্রিমতা থেকে দূরে থাকা :

মুসলমানের কর্তব্য হল, কথা-বার্তায় যেন কৃত্রিমতা না থাকে। বিশুদ্ধ ভাষী না হওয়া সত্ত্বেও বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলার কৃত্রিম চেষ্টা করা ঠিক নয়। অন্যের সাথে আলোচনার সময় তাদের ভুল ধরার চেষ্টা করা উচিত নয়। বরং শরীয়ত তা নিষেধ করেছে। নিজের মধ্যে যে গুণ বা যোগ্যতা নেই তা নকল বা কৃত্রিমভাবে প্রদর্শন করা নিষেধ। অন্যের সাথে আলোচনায় কঠোর ভাষা ব্যবহার কিংবা

www.amarboi.org

কাউকে সংকীর্ণ করা ঠিক নয়। বিশেষ করে কেউ কিছু প্রশ্ন করলে কঠোরভাবে জবাব দেয়া কিংবা লোকদের কথায় আপত্তি করা ঠিক নয়। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

وَاِنَّ اَبْغَضَكُمْ اِلَىَّ وَاَبْعَدَكُمْ مِنِّىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْقِقُوْنَ ـ

'কেয়ামতের দিন তোমাদের সে ব্যক্তি আমার অধিকতর রোষানলে পড়বে ও আমার থেকে সর্বাধিক দূরে অবস্থান করবে যে অধিকতর কৃত্রিম কথা বলে। বড় বড় কথা বলে এবং মুখ ভর্তি সম্প্রসারিত কথা-বার্তা বলে ও অন্যদের উপর নিজের মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব প্রকাশ করে।' (তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন : اَلاَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ.

'সাবধান, সীমাতিরিক্ত কথা বলা ও কৃত্রিম কথা বলা ব্যক্তি ধ্বংস হয়েছে।' (মুসলিম)

ইবনে ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : نُهِيْنَا عَنِ التَّكَلُّفِ.

'আমাদেরকে কৃত্রিম কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।' (বোখারী)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَخَلَّلُوْنَ الْكَلاَمَ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ الْكَلاَ بِاَلْسِنَتِهَا.

'এমন একদিন আসবে যখন লোকেরা জিহ্বা দ্বারা মুখের ভেতর এতবেশী কথা বলবে যেমন গাভী নিজ জিহ্বা দ্বারা জাবর কাটে।' (আহমদ)

মুসলিম ওলামায়ে কেরাম অর্থহীন অতিরিক্ত প্রশ্ন অপছন্দ করতেন। তারা অক্ষম করা, অপমান করা কিংবা জ্ঞানের বাহাদুরী দেখানোর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করাকেও অপছন্দ করতেন। এর দ্বারা মুসলমানের কোন ফায়দা হয় না। বরং তা হারাম।

হাসান বসরী (র) বলেছেন : যারা নিকৃষ্ট বিষয় বা মাসআলাকে সাধারণ মুসলমানের বিষয় হিসেবে বাছাই করে, তারা আল্লাহর নিকৃষ্ট বান্দাহ।

ইমাম মালেক উল্লেখ করেছেন, 'এক ব্যক্তি ইমাম শা'বীকে বলল, আমি আপনার কাছ থেকে কিছু মাসআলা গোপন রেখেছি। তিনি উত্তরে বলেন, তুমি তা শয়তানের জন্য রেখে দাও। যখন তাকে পাবে তখন জিজ্ঞেস করবে।'

www.amarboi.org

৫. শরীয়ত ও প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপযুক্তভাবে সম্বোধন করা :

আমরা ইতিপূর্বে 'বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন অধ্যায়ে শরীয়ত ও প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। এখন একটি বিষয়ে সতর্ক করে দিতে চাই যে, বিনা প্রয়োজনে যেন ফাসেক, কাফের ও মুনাফিকের সম্মান করা না হয়। নবী (সা) তা থেকে নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে, কোন মুসলমানের মনে আঘাত দিয়ে কথা বলা যাবে না। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এ বিষয়ে নিষেধ করেছেন।

১ম বিষয়টির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

لاَ تَقُوْلُوْا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدًا فَانَّهُ اِنْ يَّكُنْ سَيِّدًا فَقَدْ اَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ .

'তোমরা মোনাফেকদেরকে সাইয়েদ বা কর্তা বলো না। যদি সে সাইয়েদ হয়। তাহলে, তোমরা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করবে।' (আবু দাউদ সনদ বিশুদ্ধ) অর্থাৎ মোনাফেক, ফাসেক ও কাফের আল্লাহর দুশমন। আল্লাহর দুশমনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন নাজায়েয। কেউ তা করলে সে আল্লাহর অসন্তোষের শিকার হবে। কেননা, সে যে অসম্মানের যোগ্য, তাকে সম্মান দিয়েছে।

২য় বিষয়টির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاَخِيْهِ يَاكَافِرُ فَقَدْ بَاءَبِهَا اَحَدُهُمَا فَاِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ.

'কেউ যদি তার ভাইকে কাফের বলে, তাহলে তা দু'জনের একজনের উপর এসে পড়বে। যাকে কাফের বলা হয়েছে, সে যদি কাফের হয় তাহলে তো ঠিকই আছে। অন্যথায় তা তার নিজের দিকে ফিরে আসবে।।' (বোখারী, মুসলিম)

আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছেন :

مَنْ دَعَا رَجُلاً بِكُفْرٍ اَوْ قَالَ عَدُوُّ اللّٰهِ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ اِلاَّ صَارَ عَلَيْهِ.

www.amarboi.org

'কেউ কাউকে কাফের কিংবা আল্লাহর দুশমন বললে যদি সে সেরূপ না হয়, তাহলে তা তার নিজের দিকেই ফিরে আসবে।' (বোখারী, মুসলিম)

অর্থাৎ যাকে ঐ কথা বলা হল, সে যদি সেরূপ না হয়, তাহলে যিনি বলেছেন, তিনি নিজেই কাফের কিংবা আল্লাহর দুশমন হয়ে যাবে।

এ জন্য ইমাম নববী বলেছেন, কোন মুসলমান অন্য কোন মুসলমানকে কাফের বলা কঠোর হারাম। এটা দ্বারা আমরা সে আলেম কিংবা মুসলমানদের বোকামী বুঝতে পারি। যারা অন্য মুসলমানকে কাফের বলে গালি দেয় এবং নিজেদেরকে জমীনের মাবুদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারা নিজেদের প্রবৃত্তি ও অজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ফয়সালা জারী করে এবং লোকদেরকে নিজেদের কাছ থেকে তাড়িয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, লোকদেরকে ইসলাম ও তাদের চরিত্র থেকেও দূরে সরিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা) কতইনা যথার্থ বলেছেন :

اِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ.

'লজ্জা না থাকলে যা ইচ্ছা করতে পার।'

এ আলোচনার ভিত্তিতে কোন বাদশাহকে শাহানশাহ বলা কঠোর হারাম। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এ গুণে ভূষিত হতে পারে না। তাই নবী (সা) বলেছেন :

اِنَّ اَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى رَجُلٌ تُسَمّٰى مَلِكَ الْاَمْلَاكِ.

'কোন ব্যক্তিকে শাহানশাহ বলা আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত।'

(বোখারী, মুসলিম)

৬. নিজের বা অন্যের প্রশংসা করার হুকুম :

নিজের প্রশংসা করা নিষিদ্ধ হবার পেছনে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত বিদ্যমান। আল্লাহ বলেন :

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى.

'অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনি ভাল জানেন কে তাকওয়ার অধিকারী?' (সূরা নাজম : ৩২)

www.amarboi.org

আত্মপ্রশংসা প্রায়ই গর্ব-অহংকারের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করেছেন। যদি নিজের পরিচয় দান কিংবা অস্পষ্ট কোন বিষয়কে সুস্পষ্ট করা, অথবা কোন অভিযোগ খণ্ডন করা কিংবা অন্য কোন বৈধ বিষয়ের উদ্দেশ্যে আত্মপ্রশংসা করার প্রয়োজন হয় তাহলে তা জায়েয আছে। (আল-আজকার-২৪৬ পৃঃ, ইমাম নববী)

মানুষের প্রশংসা ও গুণ-গরিমা দু'ধরনের। ভাল ও মন্দ। অন্যদের উপর নিজের গর্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব প্রকাশ করার লক্ষ্যে গুণ-গরিমা মন্দ। দ্বীনি স্বার্থে গুণ-গরিমা করা ভাল। বিশেষ করে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ, উপদেশ, মঙ্গলের পথপ্রদর্শন, শিক্ষকতা, শিষ্টাচার শিক্ষা, ওয়াজ-নসীহত করা, কাউকে স্মরণ করিয়ে দেয়া, দু'জনের মধ্যে আপোষ করা, কিংবা কোন মন্দ থেকে আত্মরক্ষাসহ ইত্যাদি কাজে প্রয়োজন হলে, আত্মপ্রশংসা জায়েয হবে। নিজের গুণাবলী তুলে ধরলে যদি তা অন্যদের কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য হবে বলে ধারণা হয় এবং কথার নির্ভরযোগ্যতা বাড়ে তাহলে, তা জায়েয হবে। একথা আমার কাছে ছাড়া অন্য কোথাও পাবে না, তাই তার হেফাজত কর,' ইত্যাদি বলা জায়েয। কোরআন ও হাদীসেও এ জাতীয় কথার বহু অস্তিত্ব রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, اَنَا النَّبِىُّ لاَ كَذِبْ 'আমি মিথ্যা নবী নই।' اَنَا سَيِّدُ وُلْدَ ادَمَ 'আমি বনি আদমের সর্দার।' اَنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الاَرْضُ 'আমিই প্রথম ব্যক্তি যে যমীন ফুঁড়ে বের হয়ে আসবে,' اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِاللّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ 'আমি তোমাদের অপেক্ষা সর্বাধিক জ্ঞানী ও মোত্তাকী।' اِنِّىْ اَبِيْتُ عِنْدَ رَبِّىْ 'আমি আমার প্রতিপালকের কাছে রাত যাপন করি।' ইত্যাদি।

হযরত ইউসুফ (আ) বলেছেন :

اِجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَائِنِ الاَرْضِ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ.

'আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডারের দায়িত্বশীল নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান।' (সূরা ইউসুফ : ৫৫)

হযরত শোয়াইব (আ) বলেছেন : سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ.

'তুমি (মূসা) আমাকে ইনশাআল্লাহ নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত পাবে।' (সূরা কাসাস : ২৭)

www.amarboi.org

হযরত ওসমানকে যখন অবরুদ্ধ করা হয় তখন তিনি বলেন :

اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَجَهَّزْتُهُمْ؟ اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ مَنِ اشْتَرَى بِئْرَ رُوْمَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَاشْتَرَيْتُهَا ؟ فَصَدَّقُوْهُ بِمَا قَالَ ـ

'তোমরা কি জান না, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে কঠোর পরিস্থিতিতে তাবুক যুদ্ধে সেনাবাহিনীকে সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করবে, তার জন্য বেহেশত; আমি তা করেছিলাম? তোমরা কি জান না, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে রুমা কূপ কিনে (মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেবে) তার জন্য বেহেশতের সুসংবাদ; আমি তা কিনেছিলাম। তারা তাঁর কথা বিশ্বাস করেছিল।' (বোখারী)

'কুফাবাসীরা সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের বিরুদ্ধে হযরত ওমারের কাছে অভিযোগ করেন যে, তিনি ভাল করে নামাজ পড়েন না। তখন সা'দ বলেন, আল্লাহর কসম! আমিই প্রথম আরব যে আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করেছি। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে জেহাদে যেতাম.....'। (বোখারী-মুসলিম)

হযরত আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সে আল্লাহর শপথ! যিনি বীজ ফাটিয়ে অংকুর বের করেন এবং যিনি আত্মা সৃষ্টি করেছেন; নবী (সা)-এর একটি অঙ্গীকার আমার কাছে রক্ষিত আছে। আর তা হল, আমাকে মোমেনরাই ভালবাসবে এবং মুনাফেকরাই আমার শত্রুতা করবে।' (মুসলিম)

আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত। ইবনু মাসউদ আমাদের কাছে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে ৭০ এর বেশী সূরা শিখেছি। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথীরা জানেন, আমি তাদের অপেক্ষা আল্লাহর কিতাব সর্বাধিক বেশী জানি; অথচ আমি তাদের উত্তম ব্যক্তি নই। আমার চাইতে কেউ অধিকতর জ্ঞানী সম্পর্কে সন্ধান পেলে আমি অবশ্যই তার কাছে যাবো।' (বোখারী, মুসলিম)

প্রয়োজনের মুহূর্তে আত্মপ্রশংসার আরও অনেক নজীর আছে।

কেউ অন্যের প্রশংসা করলে এবং তার ভাল গুণাবলী উল্লেখ করলে হয় সেটা সামনা সামনি হবে, না হয় তাঁর অনুপস্থিতিতে হবে। অনুপস্থিতিতে হলে কোন

www.amarboi.org

আপত্তি নেই। তবে প্রশংসাকারী যেন বেশী বাড়িয়ে প্রশংসা এবং মিথ্যার মধ্যে প্রবেশ না করে। মিথ্যার কারণে ঐ প্রশংসা নিষিদ্ধ হবে, প্রশংসার কারণে নয়। যে প্রশংসায় মিথ্যা নেই, সে প্রশংসা মোস্তাহাব হবে যদি তাতে কোন কল্যাণ থাকে এবং এর দ্বারা প্রশংসিত ব্যক্তির কোন ক্ষতি না হয়।

তবে কিছু হাদীস সামনা সামনি প্রশংসাকে জায়েয ও মোস্তাহাব বলে প্রমাণ করে। আর কিছু হাদীস তা নাজায়েয বলে ইঙ্গিত দেয়। ওলামায়ে কেরামের মতে, হাদীসগুলোর মধ্যকার বিরোধ দূর করার উপায় হল, প্রশংসিত ব্যক্তির মধ্যে যদি ঈমানের পরিপূর্ণতা ও মজবুত বিশ্বাস, আত্মশুদ্ধি ও পূর্ণ জ্ঞান থাকে, এর দ্বারা ফেতনায় পড়া ও ধোঁকা খাওয়ার আশংকা না থাকে এবং তার আত্মা বিভ্রান্তির শিকার না হয়, তাহলে তা হারাম বা মাকরূহ হবে না। এর কোনটার আশংকা থাকলে সে প্রশংসা কঠোর মাকরূহ হবে।

যে সকল হাদীসে প্রশংসা নিষেধ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি হাদীস হচ্ছে এরূপ :

মেকদাদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি হযরত ওসমানের প্রশংসা করতে থাকল। তারপর মেকদাদ (রা) দুই হাঁটুর উপর বসে প্রশংসাকারীর কপালে ছোট ছোট পাথরকুচি নিক্ষেপ করতে থাকলেন। ওসমান জিজ্ঞেস করেন, আপনার কি হল? তিনি বলেন, মহানবী (সা) বলেছেন :

اِذَا رَاَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِىْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ -

'তোমরা কোন প্রশংসাকারীকে কারো প্রশংসা করতে দেখলে তার মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে।' (মুসলিম)

আবু মূসা আশ'আরী থেকে বর্ণিত। নবী (সা) এক ব্যক্তিকে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করতে শুনলেন। সে প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করছিল। তখন তিনি বলেন, اَهْلَكْتُمْ اَوْقَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ 'তোমরা ধ্বংস করেছ (রাবীর সন্দেহ) কিংবা কেটে দিয়েছ ঐ ব্যক্তির পিঠ।' (বোখারী, মুসলিম)

আবু বাকরাহ থেকে বর্ণিত। নবী (সা)-এর কাছে এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির ভাল প্রশংসা করল। তখন নবী (সা) বলেন :

وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ يَقُوْلُهُ مِرَارًا، اِنْ كَانَ اَحَدُكُمْ

www.amarboi.org

مَادِحًا لَامُحَالَةَ فَلْيَقُلْ : اَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا اِنْ كَانَ يَرٰى اَنَّهُ كَذٰلِكَ وَحَسِيْبُهُ اللّٰهُ وَلَا يُزَكِّىْ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا ـ

'তোমার ধ্বংস, তুমি তোমার সাথীর ঘাড় কেটে দিয়েছ। তিনি একথা কয়েকবার বললেন। তারপর বলেন, যদি কারো প্রশংসা করতেই হয় এবং সেও যদি অনুরূপ হয়, তাহলে বলবে, 'আমার ধারণা এই' আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।' আল্লাহর উপর কারো পরিশুদ্ধি গাইতে নেই'। (বোখারী, মুসলিম)

প্রশংসা জায়েয হওয়ার পক্ষে অনেক হাদীস আছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীস হল :

আবু বকর (রা)-এর ইযার পায়ের ছোট গিরার নীচে পড়ে যাওয়ায় নবী করিম (সা) বলেছেন : 'আপনি গর্ব সহকারে কাপড় নীচে পরিধানকারীদের অন্তর্ভুক্ত নন।'

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'হে আবু বকর! আপনি কাঁদবেন না। আমার কাছে সাহচর্য ও মালের দিক থেকে সর্বাধিক নিরাপদ ব্যক্তি হচ্ছে আবু বকর। আমি আমার উম্মতের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধু বানালে আবু বকরকেই বন্ধু বানাতাম।'

অন্য এক হাদীসে এসেছে, 'আমি আশা করি আপনি (আবু বকর) সে ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবেন যাদেরকে বেহেশতের সকল দরজা দিয়ে প্রবেশের জন্য ডাকা হবে।'

এক হাদীসে এসেছে, 'হে ওহোদ পাহাড়! স্থির হও, তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও দু'জন শহীদ আছেন।' তখন ওহোদ পাহাড়ের উপর ছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা), আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রা)।

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত ওমারকে বলেন, 'হে ওমার! আপনি শয়তানের সাক্ষাত পান না। আপনি যে রাস্তা দিয়ে চলেন, শয়তান সে রাস্তা দিয়ে নয়, বরং ভিন্ন রাস্তা দিয়ে চলে।'

রাসূলুল্লাহ (সা) একজন ঘোষণাকারীকে বলেন, 'ওসমানের দরজা খোল এবং তাঁকে বেহেশতের সুসংবাদ দান কর।'

তিনি হযরত আলীকে লক্ষ্য করে বলেন, 'তুমি আমার, আমি তোমার।'

তিনি আলী (রা)কে লক্ষ্য করে আরো বলেন, 'তুমি কি তাতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার মর্যাদা আমার কাছে মূসা (আ)-এর কাছে হারুনের মর্যাদার অনুরূপ।'

www.amarboi.org

মহানবী (সা) হযরত বেলালকে বলেন, 'আমি বেহেশতে তোমার পায়ের জুতার আওয়াজ শুনেছি।'

তিনি উবাই বিন কা'বকে বলেন, 'হে আবুল মোনজের! তোমার জ্ঞানের জন্য শুভেচ্ছা।' এগুলো সবই বিশুদ্ধ এবং মশহুর হাদীস। সাহাবা, তাবেঈন, ইমাম ও ওলামায়ে কেরামের অসংখ্য প্রশংসার উল্লেখ আছে। (আল-আজকার : ২২৪ পৃঃ)

পথ চলার আদব

রাস্তায় চলার নিয়ম ও কর্তব্যের ব্যাপারে খুব কম লোকই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। রাস্তায় চলাচলকারী ব্যক্তির জন্য রাস্তায় বসে থাকা পূর্বোল্লেখিত লোকের যা করণীয় তাসহ আরো কিছু করণীয় আছে। সেগুলো হল :

১.২ চলার সময় বিনয় এবং যাদের সাথে সাক্ষাত হবে তাদেরকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে।

এ দু'টো বিষয়কে আল্লাহ কোরআনের এক আয়াতে এভাবে বর্ণনা করেছেন :

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا ـ

'আল্লাহ রহমানের বান্দাহ তারাই, যারা পৃথিবীতে নরমভাবে চলা ফেরা করে এবং মূর্খরা তাদের সাথে কথা বললে তারা উত্তরে বলে, সালাম ও শান্তি।'

(সূরা ফোরকান : ৬৩)

অর্থাৎ আল্লাহ রহমানের বান্দাহ বলতে সত্যিকার মোমেনদেরকে বুঝানো হয় যারা ইবাদতের মর্যাদায় ভূষিত। তাদের কতগুলো গুণ হচ্ছে, ১. তারা নরমভাবে চলা ফেরা করে। সে চলার মধ্যে রয়েছে প্রশান্তি, সম্মান ও বিনয়, যাতে কোন গর্ব-অহংকার নেই। ২. তারা অন্যদের অত্যাচার ও কষ্ট সহ্য করে নেয় এবং লোকদের সাথে কাজ-কারবারে সহজতা অবলম্বন করে। বোকা-বেকুফ লোকেরা তাদেরকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে কিছু বললে তারা জবাবে বলে, আমরা তোমাদের উপর শান্তি বর্ষণের দো'আ করি, আমরা তোমাদের সাথে মূর্খসুলভ আচরণ করি না কিংবা তোমাদের অনুরূপ আচরণ করি না। তাদের উদাহরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেছেন :

وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَانَبْتَغِى الْجَاهِلِيْنَ ـ

www.amarboi.org

'যখন তারা বাজে-বেহুদা কথাবার্তা শুনে, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, আমাদের জন্য আমাদের কাজ এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না।'

(সূরা কাসাস : ৫৫)

আল্লাহ মোমেনদেরকে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে সীমালংঘন না করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন :

وَلاَ تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً -

'জমীনের উপর গর্ব-অহংকার সহকারে চলো না। নিশ্চয়ই তুমি জমীন ভেদ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনও পর্বত সমান হতে পারবে না।' (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৭)

এ আয়াতে অহংকারীদের চলার প্রতি ধিক্কার দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, তুমি যতই তোমার বেহুদা মর্যাদা সম্পর্কে লোকদেরকে অবহিত করার জন্য সদর্পে জমীনে চল, কিন্তু তুমি তোমার দু'পা দিয়ে জমীনে ছিড় ধরাতে পারবে না। এটাই হচ্ছে তোমার দুর্বলতা ও অক্ষমতা। অনুরূপভাবে, গর্বসহকারে তুমি যতই তোমার রগ ফুলাও, গর্দান বাঁকা কর এবং মাথা উঁচিয়ে চল, তোমার উচ্চতা পাহাড় সমান হবে না। বরং তুমি তার তুলনায় একটা মূল্যহীন বিহঙ্গের মত।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا -

'যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ লুঙ্গী চেঁচিয়ে চলে, হাশরের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।' (বোখারী, মুসলিম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি সুন্দর কাপড় পরে চলে এবং খুশী বোধ করে, মাথা সিঁথি করে এবং হেলে-দুলে গর্বভরে চলে, যখন আল্লাহ তাকেসহ জমীন ধ্বসে দেবেন, তখন সে কেয়ামত পর্যন্ত জমীনের মধ্যে ডুবতে থাকবে।' (বোখারী, মুসলিম)

কোরআন এবং হাদীসে চলার সাথে গর্বকে যুক্ত করা হয়েছে। কেননা, চলার ও পরনের কাপড়ে গর্ব বেশী প্রকাশ পায়। অনুরূপভাবে, ব্যক্তির চলার সময় মানুষের সাথে লেন-দেন এবং বক্তব্যেও তা ফুটে উঠে। তাই মহান আল্লাহ

www.amarboi.org

রাব্বুল আলামীন নিজ বান্দাদেরকে দু'টো মন্দ জিনিস থেকে পরিচ্ছন্ন থাকে বলে সূরা ফোরকানের আয়াতে উল্লেখ করেছেন। সে মন্দ দু'টো হল, চলার এবং বলার গর্ব প্রকাশ থেকে বিরত থাকা।

৩. লোকদের জন্য বিরক্তিকর কিংবা ক্ষতিকর কিছু বহন না করা।

লোকদের কাছে ভীতিপ্রদ কোন অস্ত্র নিয়ে চলা উচিত নয়। যেমন, খাপমুক্ত তলোয়ার, পিস্তল, রাইফেল এবং মেশিনগান ইত্যাদি। মানুষ এগুলোকে ভয় পায় কিংবা যে কোন মুহূর্তে এগুলো থেকে গুলি বেরিয়ে পড়তে পারে। যার মধ্যে ক্ষতির আংশকা আছে তার উপাদানকে নিষিদ্ধ করা জরুরী। তাই নবী করিম (সা) মসজিদ, বাজার কিংবা গণ-জমায়েতের পাশ দিয়ে সশস্ত্র ব্যক্তিকে পথ অতিক্রমের সময় অস্ত্রের যে অংশ অন্যের ক্ষতির কারণ হতে পারে সে অংশ ধরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

আবু বারদাহ আবু মূসা থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : 'তোমাদের কেউ যদি তীর হাতে কোন মজলিশ কিংবা বাজার অতিক্রম করে তাহলে, সে যেন তীরের সুচালো হত্যাকারী লোহার অংশটুকুকে হাত দিয়ে ধরে রাখে। একথা তিনি তিনবার বলেন। আবু মূসা বলেন, আল্লাহর কসম, আমরা একে অপরের সামনে তা ঠিক করা ছাড়া দুনিয়া ত্যাগ করিনি।' (মুসলিম)

তীর বন্দুক বা ছুরি-বল্লম যাই হোক না কেন, যার খোলা অংশে অন্যের ক্ষতি সাধনের আশংকা রয়েছে, সে ক্ষতি থেকে অন্য মুসলমানদের নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি, ইসলাম কোন অস্ত্র দিয়ে অন্য মুসলমানের অন্তরে ভয়-সৃষ্টিকে হারাম করেছে। শয়তান হয়তো সে আশংকাযুক্ত অস্ত্রের মাধ্যমে অন্য ভাইয়ের ক্ষতি সাধন করতে পারে।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

مَنْ اَشَارَ اِلَى اَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَاِنْ كَانَ اَخَاهُ لاَبِيْهِ وَاُمِّهِ ـ

'যে ব্যক্তি নিজ ভাইকে লোহা দিয়ে ভয় দেখায়, সে তা থেকে বিরত হবার আগ পর্যন্ত ফেরেশতারা তার উপর অভিশাপ দিতে থাকে, যদিও সে তার আপন ভাই-ই হোক না কেন।' (মুসলিম)

www.amarboi.org

আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

لَايُشِيْرُ اَحَدُكُمْ اِلٰى اَخِيْهِ بِالسِّلَاحِ فَاِنَّهُ لَايَدْرِىْ اَحَدُكُم لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِىْ يَدِهِ فَيَقَعُ فِىْ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ.

'তোমাদের কেউ যেন নিজ ভাইয়ের প্রতি অস্ত্রের ইঙ্গিত না দেয়। তোমরা জান না, হতে পারে শয়তান তার হাত ধরবে অতঃপর সে জাহান্নামের গর্তে পড়বে।' (মুসলিম)

অর্থাৎ শয়তান ঐ অস্ত্র দিয়ে তার ভাইকে হত্যা করাতে পারে।

৪. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো।

রাস্তায় চলার সময় যদি পথ চলায় বাধা সৃষ্টিকারী কিংবা কষ্টদায়ক জিনিস দেখতে পায়, তাহলে, তা দূর করা মুস্তাহাব কিংবা তা দূর করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

انَّ شَجَرَةً كَانَتْ تُؤْذِى الْمُسْلِمِيْنَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَطَعَهَا فَدَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

'কোন ব্যক্তি যদি মুসলমানদের জন্য কোন কষ্টদায়ক গাছ দেখে তা কেটে ফেলে দেয়, সে বেহেশতে যাবে।' (মুসলিম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَاَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ـ

'কেউ পথ চলার সময় যদি রাস্তায় কাঁটাযুক্ত শাখা দেখে তা দূর করে, আল্লাহ এ জন্য তার মূল্য দেন ও তার গুনাহ মাফ করে দেন।' (মুসলিম)

আবু বারজাহ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বললাম, আমাকে উপকারী কিছু বিষয় শিক্ষা দিন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

www.amarboi.org

اِعْزِلْ الْاَذٰى عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

'মুসলমানের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরাও।' (মুসলিম)

ইসলাম যেখানে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানোর নির্দেশ দেয়, সেক্ষেত্রে সে নিজেই যেন অন্যের প্রতি কষ্টের কারণ না হয়। সে নিজে রাস্তায় কষ্টদায়ক জিনিস ফেলবে না, অন্যের গাড়ী চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়-এমনস্থানে বা এমনভাবে গাড়ী পার্ক করবে না। নারীদের ভীড়ের মধ্যে নিজে যাবে না, সাধারণ স্থান ও বাজারে নারীরা পুরুষের সাথে ভীড় জমাবে না এবং রাস্তায় উদ্বৃত্ত খাবার ফেলবে না। এ হচ্ছে, ইসলামের মহানুভবতা ও শ্রেষ্ঠত্ব।

৫. এক জুতা পরা মাকরূহ।

মহানবী (সা) এক জুতা বা মোজা পায়ে দিয়ে চলতে নিষেধ করেছেন। খালি পায়ে চলতে হলে দু'পা খালি রেখে চলতে হবে এবং এক পায়ে জুতা বা মোজা পরে চলা যাবে না। এতে চলার ভারসাম্য ও ইজ্জত বহাল থাকে এবং লোকদের হাসির খোরাকে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

لَايَمْشِ اَحَدُكُم فِىْ نَعْلٍ وَّاحِدَةٍ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيْعًا اَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيْعًا ـ

'তোমাদের কেউ যেন এক জুতায় না হাঁটে, হয় দুই জুতা পরবে আর না হয় উভয় জুতাই খুলে ফেলবে।' (বোখারী, মুসলিম)

৬. সঙ্গীসহ সফরে যাওয়ার ব্যাপারে মহানবীর উপদেশের প্রতি আগ্রহী হওয়া।

যত বেশী সম্ভব সফরসঙ্গী সংগ্রহের চেষ্টা করা উচিত। যাতে সফরের সহযোগীর সংখ্যা বেশী হয়। সংখ্যা তিন বা তার অধিক হলে একজনকে আমীর বানাতে হবে। যাতে করে তিনি বিনা কষ্টে সফরের কাজ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিতে পারেন। রাত্রে সাথীবিহীন অবস্থায় যেন একাকী না চলে। রাত্রে বিশ্রাম নিতে হলে রাস্তায় যেন বিশ্রাম না নেয় বা না ঘুমায়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

www.amarboi.org

اِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ.

'তিন ব্যক্তি সফরে বের হলে, একজনকে যেন আমীরে সফর বানিয়ে নেয়।' (হাদীসটির সনদ ভাল-আবু দাউদ)

মাওয়ারদী বলেছেন, এ আদেশ ওয়াজিব। আমীর ছাড়া তাদেরকে সফর থেকে বিরত রাখা উচিত।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'এক সফরযাত্রী শয়তান, দুই সফরযাত্রীও শয়তান, তিন সফরযাত্রী হচ্ছে কাফেলা।' (ভাল সনদ সহকারে আবু দাউদ, তিরিমিযী ও নাসাঈ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

لَوْ اَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُوْنَ مِنَ الْوَحْدَةِ مَا اَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ ـ

'লোকেরা রাত্রে সফরের ব্যাপারে যদি আমার মত জানত, তাহলে কোন সফরকারী রাত্রে একাকী সফর করত না।' (বোখারী)

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন :

وَاِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوْا الطَّرِيْقَ فَاِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ.

'তোমরা যদি কোথাও রাত যাপন কর, তাহলে রাস্তায় করো না। কেননা, তা হচ্ছে, পশুর চলার পথ ও হিংস্র প্রাণীর আশ্রয়স্থল।' (মুসলিম)

সফরে মানুষের চারিত্রিক গুণের বিকাশ ঘটে। তাই প্রত্যেকের উচিত, অন্য ভাইয়ের সাহায্য ও সেবা করা এবং সুষ্ঠুভাবে কাজ চালিয়ে নেয়া।

www.amarboi.org

দেখা-সাক্ষাতের নিয়ম-কানুন

সামাজিক জীবনের দাবী হল, পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা। আর এটা মানুষের প্রকৃতিও বটে। আল্লাহর দ্বীনও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে। দেখা-সাক্ষাতের কিছু আদব ও নিয়মাবলী আছে। এর কিছু আমরা অনুমতি গ্রহণ, সালাম, বৈঠকের আদব ও কথা-বার্তার আদব অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এখন অবশিষ্টাংশ আদব ও নিয়ম আলোচনা করবো :

১. নেক নিয়তে সাক্ষাত করা।

যেমন, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে তাদের সাথে দেখা সাক্ষাত, আত্মীয়তার অধিকার পূরণের উদ্দেশ্যে সাক্ষাত, প্রতিবেশীর অধিকার পূরণের নিমিত্তে সাক্ষাত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে যে কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করা। দ্বীনি কোন উদ্দেশ্য ছাড়া সাক্ষাত আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য হতে পারে না। যেমন, যার সাথে সাক্ষাত করা হবে তাকে আলেম অথবা নেক ভাই হতে হবে কিংবা কারো সাথে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ, কারো সাথে প্রয়োজন পূরণ, ঋণ আদায়, কারো অবস্থা জানা এবং তার প্রতি দায়িত্ব পালন বা কারো সাক্ষাতের জবাবী সাক্ষাতে যাওয়া ইত্যাদি। এগুলো সবই নেক নিয়ত যার জন্য সওয়াব পাওয়া যাবে। কেননা, তার এ সাক্ষাত আল্লাহর রাস্তায় এবং তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

مَنْ عَادَ مَرِيْضًا اَوْ زَارَ اَخًا لَهُ فِى اللّٰهِ نَادَاهُ مُنَادٍ بِاَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّاْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً.

'যে ব্যক্তি কোন রোগী কিংবা তার দ্বীনি ভাইকে দেখতে যায়, আসমান থেকে একজন আওয়াজদানকারী আওয়াজ দিয়ে বলেন, তোমার ও তোমার গন্তব্য স্থানের জন্য শুভ কামনা। তুমি বেহেশতে একটি ঘর তৈরি করেছ।'

(তিরমিযী, তিনি এটাকে হাসান বলেছেন)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اِنَّ رَجُلاً زَارَ اَخًا لَهُ فِىْ قَرْيَةٍ فَاَرْصَدَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا اَتٰى عَلَيْهِ قَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ :

www.amarboi.org

أُرِيْدُ أَخًا لِيْ فِيْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ : هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِّعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ : لاَ، غَيْرَ أَنِّيْ أَحْبَبْتُهُ فِي اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَ : فَإِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيْهِ -

'এক ব্যক্তি এক গ্রামে বসবাসকারী তার এক ভাইকে দেখতে গেল। আল্লাহ তায়ালা রাস্তায় মানুষের বেশে এক ফেরেশতাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। যখন লোকটি ফেরেশতার কাছে পৌঁছল, ফেরেশতা বলল, তুমি কোথায় যাচ্ছ? লোকটি বলল, আমি এ গ্রামে আমার এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করতে যাচ্ছি। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তার কাছে কোন কিছু পেতে যাবে? লোকটি বলল : না, আমি শুধু তাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালবাসি, সে জন্যই যাচ্ছি। তখন ফেরেশতা বলেন : আমি তোমার কাছে আল্লাহর দূত হিসেবে এসেছি। তুমি তাকে ভালবাসার কারণে আল্লাহও তোমাকে ভালবাসেন।' (মুসলিম)

২. যার সাথে সাক্ষাত করা হবে তার যেন কষ্ট না হয় সে জন্য উপযুক্ত সময় বাছাই করা।

এ বিবেচনার দাবী হল, উপযুক্ত সময়ে সাক্ষাত করা এবং যার সাথে সাক্ষাত করা হবে তিনি যদি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল হন, তাহলে, আগেই সময় চেয়ে সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করা। সাক্ষাতের সময় সমাজের প্রচলিত সময়ের বেশী না বসা, ঘরের জিনিসপত্র বেহুদা নাড়াচাড়া না করা এবং ঘরের জিনিসপত্র নষ্ট করতে পারে এমন কোন শিশুকে সাথে না নেয়া উচিত। এটা নাজায়েয। হাঁ, যদি ঐ ব্যক্তি মাফ করে তাহলে, তা ভিন্ন বিষয়। সাক্ষাতের সময় ঐ ব্যক্তির ব্যক্তিগত অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা না করা, খাদ্য ও পানীয়ের ব্যাপারে কষ্টদায়ক কোন জিনিস না চাওয়া, ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা ও তার ঘরের কোন জিনিসের ত্রুটি না ধরা বাঞ্ছনীয়। তবে যদি ঘরে কোন ছবি বা প্রতিকৃতি থাকে, অবশ্যই এর বিরোধিতা করতে হবে। যার সাথে সাক্ষাত করা হচ্ছে, যদি তার মনে খুশী ও আনন্দ সৃষ্টির প্রয়োজন থাকে তাহলে, তা করতে হবে। চেষ্টা করা উচিত মজলিশে কোন মাসআলা বর্ণনা, দো'আ, নেক লোকদের কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহর জিকরের চেষ্টা করতে হবে এবং তাকে এ কথা বুঝানো দরকার যে, তিনি নিজে তার যে কোন প্রয়োজন পূরণে সেবাদানে প্রস্তুত।

www.amarboi.org

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আদব ও অধিকার

শিক্ষা ও জ্ঞান আহরণের বিষয়টি মানব জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমান যুগে জ্ঞান আহরণের চাহিদা বেড়েছে এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে জ্ঞান বিস্তার লাভ করেছে। তাই জ্ঞানের মর্যাদা এবং জ্ঞান শিক্ষা ও শিক্ষাদান করার ফযীলত সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন আছে। মুসলমানের কি শিখা উচিত এবং তাদের একটি অংশের উপর কি দায়িত্ব অর্পিত হয়, সবার জন্য কি শিক্ষা গ্রহণ করা সুন্নাত, কোন জ্ঞানের চর্চা ও শিক্ষাদান ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত এবং কোনটি নয়, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর আকাঙ্খিত বিষয়গুলো কি ইত্যাদি আলোচনা করা দরকার, যেন জীবনে জ্ঞানের উঁচু মর্যাদা বহাল থাকে।

জ্ঞানের মর্যাদা

আল্লাহ্ বলেন :

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَاُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ.

'আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞাণীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই।' (সূরা আল ইমরান : ১৮)

দেখার বিষয় যে, আল্লাহ কিভাবে নিজের ব্যাপারে সূচনা করেছেন, তারপর ফেরেশতা এবং সবশেষে জ্ঞানীদের সাক্ষ্য উল্লেখ করেছেন। সম্মানের জন্য এটাই যথেষ্ট এবং উত্তম পদ্ধতি। আল্লাহ্ বলেন :

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ -

'আপনি বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা উভয়ে কি সমান?' (সূরা যুমার : ৯)

অর্থাৎ জ্ঞানী ও মূর্খ কখনও সমান মর্যাদার অধিকারী নয়। তিনি আরো বলেন :

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.

'একমাত্র জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করেন।' (সূরা ফাতির : ২৮)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

www.amarboi.org

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ.

'আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।' (বোখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنٰى رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِىْ.

'ইবাদতকারীর (সাধারণ লোকের) উপর জ্ঞানীর মর্যাদার উদাহরণ হল, যেমন আমার মর্যাদা নিম্নতম সাহাবীর উপর।' (তিরমিযী)

বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রা) কামিলকে বলেন, হে কামিল! জ্ঞান সম্পদের চাইতে উত্তম। জ্ঞান তোমার হেফাজত করে আর তুমি হেফাজত কর সম্পদের। জ্ঞান হচ্ছে, বিচারক আর সম্পদ হচ্ছে যার উপর রায় দেয়া হয়। খরচ করলে সম্পদ কমে যায় এবং জ্ঞান বিতরণ করলে তা বেড়ে যায়।

আলী (রা) আরো বলেন, জ্ঞানী ব্যক্তি রোজাদার, নামাজী ও মুজাহিদ থেকে উত্তম। আলেম ব্যক্তির মৃত্যুতে সৃষ্ট শূন্যতা ইসলামের পরবর্তী কোন আলেম ছাড়া পূরণ করা সম্ভব নয়।

ইবনে মোবারককে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, লোক বলতে কাদেরকে বুঝায়? তিনি বলেন, জ্ঞানী লোকেরা! তারপর জিজ্ঞেস করা হয়, বাদশাহ্ বলতে কাদেরকে বুঝায়? তিনি বলেন, আল্লাহর পথে কঠোর পরিশ্রমী-দুনিয়া বিমুখ। তাঁকে আরো জিজ্ঞেস করা হয়, কারা নিম্ন ও হীন লোক? তিনি বলেন, যারা দ্বীনের মোকাবিলায় দুনিয়া খায়।

হাসান বসরী (রা) বলেন, আলেম ও জ্ঞানীর কালিকে শহীদের রক্তের সাথে ওজন করলে জ্ঞানীর কালির ওজনের পাল্লা ভারী হবে।

ইবনে মাসউদ বলেন, উঠিয়ে নেয়ার আগে তোমাদের উচিত জ্ঞান অন্বেষণ করা। আলেমের মৃত্যুতে জ্ঞানকে তুলে নেয়া হয়। যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, আলেমের মর্যাদা দেখে আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গকারী শহীদগণ আগ্রহ প্রকাশ করবেন যেন আল্লাহ্ তাদেরকে আলেম হিসেবে পুনরুত্থান বা হাশর করেন। কেউ আলেম হিসেবে জন্ম নেয় না। বরং শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই আলেম হতে হয়।

ইবনে আব্বাস বলেন, আমার কাছে, রাতের কিছু অংশে জ্ঞান চর্চা, সারা রাত্রির ইবাদত অপেক্ষা প্রিয়তর।

www.amarboi.org

জ্ঞানীর মর্যাদা ও সওয়াব

আল্লাহ বলেন :

فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ -

'মোমেনদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হল না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং ফিরে এসে স্বজাতিকে ভয় দেখায়, যেন তারা (অকল্যাণ থেকে) বাঁচতে পারে।' (সূরা তাওবা : ১২২)

আল্লাহ আরো বলেন : فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ.

'তোমরা যদি না জান, তবে যারা স্মরণ রাখে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর।
(সূরা আম্বিয়া : ৭)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ -

'যে ব্যক্তি জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে রাস্তায় চলে, আল্লাহ তাকে বেহেশতের পথে নিয়ে যান।' (মুসলিম) তিনি আরো বলেন :

اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ.

'নিশ্চয়ই ফেরেশতারা শিক্ষার্থীর কাজের প্রতি সন্তুষ্টিস্বরূপ নিজ পাখা বিছিয়ে দেন।'

হযরত আবু দারদা (রা) বলেন :

لاَنْ اَتَعَلَّمَ مَسْأَلَةً اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ -

'আমি একটি মাসআলা শিখাকে পুরো রাত নামাজ পড়া অপেক্ষা প্রিয়তর মনে করি।'

তিনি আরো বলেন, 'হয় জ্ঞানী হও, কিংবা ছাত্র হও, অথবা শ্রোতা হও, চতুর্থ কিছু হলে ধ্বংস হবে।'

ইমাম শাফেঈ (র) বলেছেন, 'জ্ঞান অন্বেষণ নফল নামাজ অপেক্ষা উত্তম।'

www.amarboi.org

জ্ঞানের হুকুম ও সওয়াব

আল্লাহ্ বলেন :

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهُ -

'আর আল্লাহ্ যখন আহলে কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না।' (সূরা আলে-ইমরান : ১৮৭)

এ আয়াত শিক্ষাদান করাকে ফরজ করেছে। আল্লাহ্ আরো বলেন :

وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -

'নিশ্চয়ই তাদের একটি দল জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করে।' (সূরা বাকারা : ১৪৬)

এ আয়াত কেউ জিজ্ঞেস করলে কিংবা মানুষের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তা (জ্ঞান) প্রকাশ না করাকে হারাম করেছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَكَتَمَهُ اَلْجَمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ.

'যে ব্যক্তি জ্ঞান আহরণ করে তা গোপন রাখে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন।' (আবু দাউদ, তিরমিযী-হাদীস হাসান)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَاَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَاَرْضِهِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِىْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتِ فِى الْبَحْرِ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতা, আসমানের ও জমীনের অধিবাসীরা, এমনকি গর্তের পিঁপড়া এবং সাগরের মাছ পর্যন্ত মানুষকে ভাল ও কল্যাণকর বিষয়ে শিক্ষা দানকারী শিক্ষকের জন্য রহমত ও মাগফেরাতের দো'আ করেন।' (তিরমিযী এটাকে হাসান হাদীস বলেছেন)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

www.amarboi.org

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ.

'আদম সন্তান মরে গেলে তিন আমল ব্যতীত তার অন্য সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। তিন আমল হচ্ছে, ১. সদকায়ে জারিয়াহ, ২. উপকারী জ্ঞান এবং ৩. নেক সন্তান যে মা-বাপের জন্য দো'আ করে।' (বোখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

'যে ব্যক্তি কোন নেক কাজের পথ দেখায়, তার জন্য আমলকারী ব্যক্তির অনুরূপ সওয়াব রয়েছে।' (মুসলিম)

হাসান বসরী (রা) বলেছেন, 'আলেম-ওলামা ও জ্ঞানী-গুণীরা না থাকলে মানুষ পশুর মত হয়ে যেত।'

কেউ কেউ বলেছেন, ওলামা ও জ্ঞানীরা হচ্ছেন যুগের প্রদীপ। প্রত্যেক আলেম সে যুগের বাতি এবং সে যুগের লোকেরা তাঁর কাছ থেকে আলো সংগ্রহ করে।

শিক্ষার্থীর আদব ও আকাঙ্ক্ষিত বিষয়

ছাত্র অর্থ যে নিজের অজ্ঞতা দূর করতে, বঞ্চনা ও গোমরাহীর পর্দা উন্মোচন করতে, জীবন ও জগতের প্রকাশিত ও গোপন রহস্য গবেষণা করতে এবং সৌভাগ্য, মুক্তি ও সাফল্যের কারণ জানতে আগ্রহী। সে নিজে উম্মাহর সেবার জন্য এবং অন্যকে দুর্ভাগ্য, গোমরাহী ও হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে প্রস্তুত। সে বুদ্ধির আলো, হৃদয়ের উজ্জ্বলতার অন্বেষণ, নিজের কথা ও কাজের নিরাপত্তা, আত্মশুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জন, উম্মাহর মর্যাদাকে বুলন্দ করা, উম্মাহর সভ্যতার মিনারকে সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত করা এবং মানবতার উপকারিতা, মুক্তি ও দয়ার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে। তাই তার কাছে এমন কিছু আকাঙ্ক্ষিত বিষয় আছে, যা সে চেষ্টা করলে অর্জন করতে পারবে, নিজেও উপকৃত হবে এবং অন্যদেরকেও উপকৃত করবে। এখন আমরা সাধ্যমত বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করবো।

www.amarboi.org

১. আল্লাহর জন্য সৎ ও একনিষ্ঠ নিয়ত হতে হবে :

মানুষ দ্বীনি কিংবা দুনিয়াবী জ্ঞান- যেটাই অর্জন করুক না কেন, কিংবা উভয় জ্ঞান একই সাথেই অর্জন করুক, তাতে জীবনের বিরাট অংশ ব্যয় হয়ে যায়, কঠোর অধ্যাবসায় ও সাধনা করতে হয়, বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয় এবং শরীরের উপর অত্যাচার চালাতে হয়। যদি আল্লাহর সন্তোষ ও একনিষ্ঠতা ছাড়া এ সময় ও শ্রম অতিবাহিত হয়, তাহলে, শিক্ষার্থীর জীবনে এর চাইতে বড় ক্ষতি কিংবা এর চাইতে বড় বোকামী ও অজ্ঞতা আর কি হতে পারে? যদি শিক্ষার্থী নিজ দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে এবং জ্ঞান অন্বেষণে আল্লাহর সন্তোষের পথ জানতে পারে, তাহলে সে বিশাল সওয়াব এবং দুনিয়া ও আখেরাতে বহু উঁচু মর্যাদা লাভ করবে।

আল্লাহর সন্তোষ লাভের উত্তম পদ্ধতি হল, মানুষ যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই জ্ঞান আহরণ করে, দ্বীনের ব্যাপারে শিরক-বেদআত এবং প্রচার, পদবী ও স্বার্থ থেকে দূরে থাকে। যদি দ্বীনি জ্ঞান অর্জনকারীর মাধ্যমে দুনিয়া পাওয়ার ইচ্ছা করে, তাহলে তা এবং দুনিয়াবী জ্ঞান অর্জনকারীর মাধ্যমে দুনিয়া পাওয়ার ইচ্ছা করে, তাহলে তাও তার জন্য বিরাট বিপর্যয়। আর যদি দুনিয়াবী জ্ঞান অর্জনকারীর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি, মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ ও মর্যাদা উন্নত করতে এবং সমাজের ও ব্যক্তির সেবা করার নিয়ত করে, তাহলে, সে আল্লাহর কাছে নিজের হিস্সা পাবে এবং জ্ঞান অন্বেষণে ব্যয়িত সময়ের ক্ষতি পূরণ হবে। আমরা এতক্ষণ যা বললাম তার পক্ষে দলীলগুলো হচ্ছে–

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَايَتَعَلَّمُهُ اِلاَّ لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তোষ লাভ করা যায় এমন (দ্বীনি) জ্ঞান শুধু দুনিয়া লাভ করার উদ্দেশ্যে শিখে, সে কেয়ামতের দিন বেহেশতের ঘ্রাণও পাবে না।' (আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান, হাকেম)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি, হাশরের দিন ১ম যে ব্যক্তির ফয়সালা হবে, তিনি হবেন শহীদ। তাকে আনা হবে এবং তাকে আল্লাহর নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে তা বুঝতে পারবে, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি সেগুলোর বিষয়ে কি আমল করেছ?

www.amarboi.org

সে বলবে : 'আমি আপনার রাস্তায় লড়াই করে শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি।' আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি এ জন্য লড়াই করেছ যেন লোকেরা তোমাকে বীর-বাহাদুর বলে। তারপর তাকে দোজখে নিক্ষেপ করার হুকুম দেয়া হবে।

তারপর সে ব্যক্তির হিসেব হবে যে নিজে জ্ঞান শিখেছে এবং অন্যদেরকেও শিক্ষা দিয়েছে এবং কোরআন পড়েছে। তাকে আনা হবে এবং নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। সে নেয়ামত সম্পর্কে বুঝতে পারবে। তাকে ঐ সকল নেয়ামতের বিষয়ে তার আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। সে বলবে, আমি জ্ঞান শিখেছি, শিক্ষা দিয়েছি এবং আমি আপনার উদ্দেশ্যে কোরআন তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি এ জন্য কোরআন শিখেছ যেন লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। তারপর তাকে উপুড় করে দোজখে নিক্ষেপ করার হুকুম দেয়া হবে।

এরপর সে ব্যক্তির বিচার হবে আল্লাহ যাকে অর্থ-সম্পদ দান করেছেন। তাকে আনা হবে এবং নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে তা বুঝতে পারবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। এগুলোতে তার আমল কি ছিল। সে জবাব দেবে, আমি আপনার পছন্দনীয় কোন পথে অর্থ ব্যয় করা থেকে বিরত থাকিনি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তোমাকে যেন লোকেরা দাতা বলে, সে জন্য তুমি তা করেছ। তারপর তাকে মুখের উপর উপুড় করে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।' (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوٰى .

'সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়ত করেছে।' (বোখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে কিছু কথা বলছি। তোমরা তা ভাল করে মনে রাখবে। দুনিয়ায় চার ধরনের লোক আছে। ১. এক বান্দাহকে আল্লাহ সম্পদ ও জ্ঞান দান করেছেন। সে এগুলোতে তাকওয়া অনুসরণ করে। আত্মীয়ের অধিকার পূরণ করে এবং তাতে আল্লাহর কি অধিকার তা জানে। তার মর্যাদা সর্বোত্তম। ২. আরেক ব্যক্তিকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন। কিন্তু সম্পদ দেননি। সে সত্য নিয়তে বলে : যদি আমার অর্থ-সম্পদ থাকত। তাহলে আমি অমুকের মত আমল করতাম। সে তার নিয়ত মাফিক পাবে এবং এ দু'জনের বিনিময় সমান হবে। ৩. এক ব্যক্তিকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন। কিন্তু জ্ঞান দেননি। সে জ্ঞান ব্যতীতই যথেচ্ছা নিজ সম্পদ খরচ করে। এ বিষয়ে তার রবকে

www.amarboi.org

ভয় করে না। আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে না এবং তাতে আল্লাহর অধিকার কি তা জানে না। সে হচ্ছে নিকৃষ্টতম মর্যাদার অধিকারী। ৪. আর এক বান্দাহকে আল্লাহ জ্ঞান ও সম্পদ কিছুই দেননি। সে বলে, যদি আমার অর্থ সম্পদ থাকত তাহলে, সেগুলো অমুকের মত খরচ করতাম। তার নিয়ত অনুযায়ীই তার মর্যাদা হবে। উভয়ের পাপ সমান হবে।' (আহমদ, তিরমিযী)

এ একটা হাদীসই জ্ঞানের মর্যাদার বিষয়ে যথেষ্ট। এছাড়াও সকল কাজে নেক নিয়তের মর্যাদা এবং খারাপ সকল নিয়তের দুর্ভাগ্য সম্পর্কেও হাদীসটি যথেষ্ট। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন।

আমাদের বুঝতে হবে কোরআন ও হাদীসে উল্লেখিত 'ইলম' বলতে বুঝায়, কোরআন, সুন্নাহ ও শরীয়তের ইলম। অনুরূপভাবে, 'ওলামা' বলতে বুঝায় কোরআন, সুন্নাহ, আল্লাহর হুকুম ও তাঁর দ্বীনের শরীয়তের আলেম-ওলামা। তারা যদি আমল করেন। তাহলে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এমন আলেমদের প্রশংসাই করেছেন।

২. শিক্ষকের অধিকার জেনে তা পূরণ করা :

যে শিক্ষার্থী তার ওস্তাদের অধিকার জেনে তা পূরণ করে সে আকাঙ্ক্ষিত মর্যাদা লাভ করবে। আল্লাহ তাকে বরকত দেবেন। ফলে সে অর্জিত জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হবে এবং সর্বদা তার জ্ঞান ও হেদায়েত বাড়তে থাকবে। সে আরো বুঝতে পারবে তারও শিক্ষকের মধ্যে পিতার মত কিংবা আরো বেশী সম্পর্ক রয়েছে। পিতা শুধু দেহের প্রতিপালন করে। ওস্তাদ করে আত্মা ও বিবেকের প্রতিপালন। তিনি ছাত্রের জীবনের সকল রুদ্ধ পথ খুঁজে দেন। নিজের জ্ঞানের সারাংশ এবং বহু কষ্ট ও পরিশ্রমলব্ধ চিন্তা ও নীতিমালার রস পান করান।

ছাত্রের উচিত, ওস্তাদের সামনে বিনীত হওয়া। নিজের সকল বিষয়ে শিক্ষকের হাতে লাগাম তুলে দেয়া। তাঁর পরামর্শ মেনে চলা। তাঁর সেবার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা। তাঁর সাহায্যে দ্রুত এগিয়ে আসা এবং তাঁর সম্মানে ও শ্রদ্ধায় সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা।

ইমাম শা'বী বলেন, যায়েদ বিন সাবেত (রা) এক লোকের জানাযার নামাজ পড়েন। সওয়ার হওয়ার জন্য তাঁর কাছে খচ্চর আনা হল। তখন ইবনু আব্বাস এগিয়ে আসেন এবং খচ্চরের লাগাম ধরেন। যায়েদ বিন সাবেত (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূলের চাচাত ভাই! ছেড়ে দিন। ইবনু আব্বাস বলেন; রাসূলুল্লাহ (সা) বড় আলেমদের ব্যাপারে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তখন যায়েদ বিন সাবেত তাঁর হাতে চুমু খান এবং বলেন; নবীর পরিবারের সাথে এরূপ করার জন্যও মহানবী (সা) আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। (তাবরানী, হাকেম)

www.amarboi.org

ছাত্রের জানা উচিত, ওস্তাদ নিজের অভিজ্ঞতা, অধ্যয়ন ও ছাত্রের কল্যাণকামী হওয়ার কারণে উপদেশ দেয়ার যোগ্যতা রাখেন এবং অন্যের তুলনায় অধিকতর উপকারী চিকিৎসা দানে সক্ষম। ওস্তাদ যখনই ছাত্রকে কোন মত বা পথ অনুসরণের আহবান জানান, তখনই তার অনুসরণ করা উচিত এবং নিজের মতামত ত্যাগ করা কর্তব্য। ওস্তাদের ভুল নিজের বিশুদ্ধতার চাইতে উত্তম।

প্রত্যেক ছাত্রের খেয়াল করা উচিত, জ্ঞানের প্রয়োজনে মুসা (আ) হযরত খিদির (আ)-এর সাথে কি ধরনের আদব প্রদর্শন করেছেন। হযরত খিদির (আ) শর্ত আরোপ করেছিলেন। তিনি নিজ কাজের হেকমত বর্ণনা না করা পর্যন্ত মূসা (আ) যেন তাঁকে সে বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা না করেন। তিনি ধৈর্য এবং খিদির (আ)-এর আদেশ অমান্য না করার শর্ত ও আরোপ করেছিলেন। মূসা (আ) এ সকল শর্ত কবুল করে নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে কোরআনে বর্ণিত হয়েছে; 'মূসা (আ) বললেন, আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করবো না। তিনি বললেন, যদি আপনি আমার অনুসরণ করেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না। যে পর্যন্ত না আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি।' (সূরা কাহাফ : ৬৯-৭০)

ইমাম গাজালী বলেছেন, যে ছাত্র শিক্ষকের মত ছাড়া নিজে কোন মত পোষণ করে তাকে ব্যর্থ বলে বিচার করতে হবে।

ছাত্রের উচিত শিক্ষকের অনুমতি ছাড়া কোন প্রশ্ন না করা। ছাত্র যা জানে বা জানে না শিক্ষক তার চাইতে আরো বেশী জানেন। তাই ছাত্রের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে বিষয়গুলোর খাপ খাওয়ানো উচিত।

হযরত আলী (রা) বলেছেন, আলেমের প্রতি অধিক প্রশ্ন করা ঠিক নয়। যেন জওয়াব দানে তার কষ্ট না হয়। তিনি অলসতা করলে তার সাথে উত্তর দানের বিষয়ে পিড়াপিড়ি করা উচিত নয়। তিনি উঠে দাঁড়ালে তাকে বসানোর জন্য কাপড় টেনে ধরা ঠিক নয়। তার কোন গোপনীয়তা প্রকাশ করা যাবে না। তার কাছে কারো নিন্দা ও গীবত করা যাবে না। তাঁর দোষ-ক্রটি তালাশ করা যাবে না এবং ভুল হয়ে গেলেও ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে তা দেখতে হবে। ছাত্রের উচিত শিক্ষকের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করা। যে পর্যন্ত না তিনি আল্লাহর আদেশ মানেন। তাঁর সামনে বসতে হবে। তাঁর কোন খেদমতের প্রয়োজন হলে সবার আগে তা পূরণের চেষ্টা করবে এবং এরূপ বলা যাবে না যে, অমুক আপনার কথার বিপরীত মত পোষণ করেন। (কানজুদ দাকায়েক-৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৪২)

www.amarboi.org

আমাদের ধারণা, পাঠক বুঝতে পারবেন যে, বর্তমান যুগে শিক্ষকের সাথে ছাত্রের দুঃসাহস ও দুর্ব্যবহার কোন পর্যায়ে পৌছেছে। ঐ ব্যবহার খুবই কঠোর এবং আদব ও উত্তম ব্যবহারের পরিপন্থী। আত্মীয় কিংবা খারাপ সঙ্গীরা তাদেরকে অনুরূপ করার জন্য উৎসাহিত করে। আপনি দেখবেন, শিক্ষকেরা ছাত্রের তোষামোদ করে এবং তাদের ও পরিবার এবং উম্মাহর জন্য ক্ষতিকর বহু আবদার রক্ষা করে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের দোষও তেমন একটা নেই। স্কুল-মাদ্রাসা রাষ্ট্র কিংবা সমাজের অন্য কেউ তার প্রতি সমর্থন জানায় না। অথচ বর্তমান যুগে শিক্ষকতার চাকুরী সর্বাধিক কষ্টকর। স্কুলের ভেতর ও বাইরে তার সকল সময় এর পেছনে ব্যয় হয়ে যায়। শিক্ষকই হলেন উম্মাহর মধ্যে উত্তম চরিত্রের বীজ বপনকারী। উত্তম প্রতিপালনকারী এবং বিদ্যা-বুদ্ধির আলো প্রজ্জ্বলনকারী। অন্য কেউ তার এ ভূমিকা পালন করে না। সকল শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও শিল্পী প্রথমে শিক্ষকেরই সৃষ্টি। তাই প্রখ্যাত কবি শওকী বলেছেন :

'শিক্ষকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর-
শিক্ষক তো রাসূলের মর্যাদার কাছাকাছি।'

শিক্ষকদের ব্যাপারে উদাসীনতা দুর্বল প্রজন্ম তৈরী, বিধ্বস্ত আবেগ, দ্বিধা বিভক্ত চিন্তাধারা এবং লক্ষ্যহীনতা পর্যন্ত পৌছিয়ে দিতে বাধ্য।

৩. প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা :

সরকার যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাস তৈরী করে তাহলে, এ বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেয়া উচিত। আর যদি ছাত্রের বিষয় নির্ধারণে স্বাধীনতা থাকে, তাহলে তাকে বুঝতে হবে জীবন সীমিত। যতই চেষ্টা করুক, সকল জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই ছাত্রের উচিত প্রথমে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা। তারপর প্রত্যেক বিষয় থেকে নিজের লক্ষ্য পূরণে সহায়ক বিদ্যাসহ বিষয়বস্তু ও বিভিন্ন দিক শিখা উচিত। তারপর দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বাধিক উপকারী জ্ঞানগুলো শিখবে। জেনে রাখা দরকার যে, যা আমল করা ওয়াজিব তা শিখাও ওয়াজিব। আর যা আমল করা সুন্নত তা শিখাও সুন্নত।

প্রত্যেক বিদ্যা নিজ বিষয়বস্তু অনুযায়ী মর্যাদার অধিকারী। যেমন, মহাশূন্য বিজ্ঞান, পার্থিব পরিবর্তন বিদ্যা, জীব বিদ্যা, কোরআন ও সুন্নাহ আল্লাহর গুণাবলী জেনে তাঁর পূর্ণতার কাছে বিনয় এবং তাঁর শরীয়তের আইন-কানুন মানার বিদ্যা ইত্যাদি।

এগুলোর মধ্যে সে বিদ্যা সর্বোত্তম যা মানুষকে তার রব সম্পর্কে এবং মোহাম্মাদ (সা)-এর উপর প্রেরিত দ্বীন ও শরীয়ত সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। তিনি

www.amarboi.org

সকল সৃষ্টিকে তাঁর শরীয়ত মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন এবং এর উপর আমলকে দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্যের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ছাত্রের উচিত, ভালভাবে শিখার আগ পর্যন্ত এক বিদ্যা থেকে আরেক বিদ্যায় স্থানান্তরিত না হওয়া। এতে করে তার ভিত্তি ও গঠন মজবুত হবে এবং পদক্ষেপগুলো হবে সমন্বিত ও উপকারী।

৪. বাস্তবে কার্যকর করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা :

জ্ঞানকে জ্ঞানের জন্যই আহরণ করা হয়। কেননা জ্ঞানের মর্যাদা উন্নত। প্রত্যেকেই জ্ঞানী হতে চায় এবং অজ্ঞতা থেকে মুক্তি চায়। জ্ঞান-বিজ্ঞান সহজতর হওয়ার কারণে মনুষ্যত্ব পরিপক্ক হয় এবং সবাই জ্ঞান আহরণ করতে আগ্রহী হয়। প্রত্যেকেই জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে চায়।

এটা পরিষ্কার থাকা দরকার যে, বিদ্যাকে বাস্তবে কার্যকর না করলে মানব জীবনে এর কোন প্রভাব অবশিষ্ট থাকে না। এমতাবস্থায় জ্ঞানী ব্যক্তি দু'বার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথমতঃ বিদ্যা শিখার সময়টুকুকে নষ্ট করেছে। যেহেতু সে নিজে তা কার্যকর করেনি। দ্বিতীয়তঃ এ বিদ্যা দিয়ে উম্মাহর কোন সাহায্য-সহযোগিতা ও উত্থান হয়নি এবং উম্মাহকে রক্ষা করেনি।

কেউ যদি ইসলামী শরীয়াহ শিখে এবং সে অনুযায়ী আমল না করে। তাহলে তিনি আল্লাহর গযব ও অসন্তোষের সম্মুখীন হবেন।

আল্লাহ বলেছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ -

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা কর না তা কেন বল? তোমরা যা কর না তা বলা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অসন্তোষজনক ব্যাপার।' (সূরা ছফ : ২, ৩)

আর যদি জ্ঞান দুনিয়াবী হয় এবং এর প্রতি উম্মাহর প্রয়োজন থাকে। তখন তিনি অবহেলা করলে উম্মাহর ক্ষতির দায়-দায়িত্ব তাকে বহন করতে হবে। কেননা, তিনি উম্মাহর এ ক্ষতি দূর করার সামর্থ রাখতেন।

মূলকথা হল, আমল ও বাস্তবায়ন ছাড়া জ্ঞানের কোন মূল্য নেই। ছাত্রদের উচিত, তারা যেন আমলবিহীন আলেম না হন। কেননা, এর ফলে নিজেও উপকৃত হয় না এবং অন্যদের উপকারও করা যায় না।

www.amarboi.org

ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের কর্তব্য

শিক্ষকের উপর বিরাট দায়িত্ব। কেননা, তাদের কর্তব্য হল, যুবকদের জ্ঞান ও বিবেক তৈরী এবং আল্লাহর মর্জি মোতাবেক তাদের চিন্তাধারা গঠন করা। এ পদ্ধতিই তাদের নিজেদের এবং উম্মাহর জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে উপকারী।

অভিভাবকরা যখন তাদের সন্তানদেরকে স্কুল-মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান, তখন তারা নিজেদের কলিজার টুকরাগুলোকেই শিক্ষকদের হাতে আমানত হিসেবে সোপর্দ করেন। শিক্ষকরা ভাল করেই জানেন, তারা যে প্রজন্মকে তৈরী করছেন তারাই উম্মাহর নেতৃত্বের লাগাম ধরবে এবং ভবিষ্যতে জাতিকে নেতৃত্ব দেবে। শিক্ষকরা যদি তাদের দায়িত্বের অংশ হিসেবে ছাত্রদেরকে উপযুক্ত পাঠ ও প্রশিক্ষণ দেন তাহলে, তারা উম্মাহর গর্বকারী প্রজন্মই তৈরী করলেন। আর যদি তারা উদাসীনতা প্রদর্শন করেন। তাহলে তারা আমানতের খেয়ানত করেন। উম্মতকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন এবং বিরাট গুনাহগার হন।

শিক্ষাবিদগণ শিক্ষকদের জন্য নিম্নের কিছু নীতিমালা তৈরী করেছেন এবং সেগুলোর প্রতি গুরুত্ব প্রদান ও আমল করার আহ্বান জানিয়েছেন।

১. ছাত্রদের প্রতি দয়া ও ভালবাসা :

ছাত্রের উপর শিক্ষকের অধিকার হল পুত্রের উপর পিতার অধিকারের মত। তাই শিক্ষকের উপর ছাত্রের অধিকার হল পিতার উপর সন্তানের অধিকারের ন্যায়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ -

'আমি তোমাদের কাছে পিতার কাছে পুত্রের মর্যাদার অনুরূপ।' (আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ।) তাই শিক্ষকের কর্তব্য হল ছাত্রদেরকে দোজখের এবং আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচানোর নিয়ত করা। তারপর তাদের চিন্তা, আত্মা ও বিবেকের সঠিক প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা। তাদেরকে নিজেদের এবং উম্মাহর জন্য উপকারী করে তৈরী করতে হবে। তিনি তাদেরকে অজ্ঞতা থেকে রক্ষার জন্য আগ্রহী হবেন এবং তাদেরকে মন্দ চরিত্র ও খারাপ অভ্যাস এমনভাবে বাঁচানোর জন্য উৎসাহিত হবেন যেমন করে নিজের সন্তানের ব্যাপারে হয়ে থাকেন।

শিক্ষকের জানা উচিত, উম্মাহর সন্তানরা তার ঘাড়ে আমানত। তাদের সম্পর্কে তাকে হাশরের দিন জিজ্ঞেস করা হবে। তিনি যদি তাদের জন্য নিজের সন্তানের

www.amarboi.org

অনুরূপ উপদেশ, চেষ্টা ও ভাল শিক্ষা দিয়ে থাকেন, তাহলে মুক্তি পাবেন। নতুবা দুনিয়া এবং আখেরাতে তার জন্য রয়েছে ধ্বংস। কেননা, উদাসীন ওস্তাদ নিজের জ্ঞান, ছাত্র ও উম্মাহকে ধ্বংসের অপরাধে অপরাধী।

আল্লাহ বলেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمَانَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

'হে মুমিনগণ! তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তোমাদের আমানতের খেয়ানত করো না।' (আনফাল : ২৭)

স্নেহ দয়ার পদ্ধতি সর্বোত্তম শিক্ষা পদ্ধতি। ছাত্রের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা, মায়া-মমতা এবং তার প্রতি চরম আগ্রহ প্রদর্শন করা ও উত্তম পদ্ধতিরই অংশ। প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকার জানা উচিত, প্রথম শিক্ষক হলেন, মহানবী (সা)। মহান আল্লাহ তাঁর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ ـ

'তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী। মোমেনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।' (তাওবা : ১২৮)

দয়া-মায়ার পদ্ধতির ব্যাপারে শিক্ষকের কর্তব্যের কথা উল্লেখ করে ইমাম গাজালী (র) লিখেছেন : শিক্ষক হচ্ছে দয়ালু এবং ছাত্রের কল্যাণকামী। পরকালের ইলম সম্পর্কিত শিক্ষক কিংবা পরকালের নিয়তে দুনিয়াবী জ্ঞানদানকারী শিক্ষকই সর্বাধিক কল্যাণকারী। তিনি যেন শুধু দুনিয়ার নিয়ত করেই বসে না থাকেন। কেননা এটা হলে তা হবে ধ্বংস আর ধ্বংস। (এহইয়া উলুমুদ্দিন)

২. ছাত্রের প্রতি উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয়ের ব্যাখ্যা :

শিক্ষকের উচিত ছাত্রের জন্য প্রয়োজনীয় কোন উপদেশ বাদ না দেয়া। তিনি যা বর্তমানে শিক্ষা দিচ্ছেন এবং যা ভবিষ্যতে শিক্ষা দেবেন ছাত্রকে সে বিষয়ে পথ নির্দেশ দেবেন। শিক্ষা গ্রহণের পদ্ধতিও বাতলাবেন এবং ধৈর্যের পদ্ধতিও। তাকে স্বল্প সময়ে বেশী উপকৃত হবার জন্য সহায়ক বই পুস্তকের নামগুলো বলে দেবেন

www.amarboi.org

এবং আগের ওলামায়ে কেরাম সম্পর্কে ভাল ধারণা দেবেন। যারা উম্মাহর জন্য বিরাট শিক্ষা সেবা আঞ্জাম দিয়ে গেছেন।

শিক্ষকের উচিত ঐ ভুল না করা যা কিছু সংখ্যক হিংসুক, অসুস্থ মানসিকতা সম্পন্ন এবং বিশুদ্ধভাবে কোন বিষয়কে বুঝতে অক্ষম শিক্ষক করে থাকেন। তারা ছাত্রদেরকে উম্মাহর পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী আলেমদের প্রতি বিদ্বেষী করে তোলেন এবং তাদেরকে কাফের ও মুসলিম মিল্লাত বহির্ভূত বলে অভিহিত করেন। এর মাধ্যমে তারা গোটা উম্মাহকে গোমরাহ করেন। এ জাতীয় শিক্ষকেরা তাদের অনুসারীদের মনে ঘৃণার বীজ বপন করেন। আল্লাহর বান্দাহদের প্রতি নিজেদের অন্তরকে বিদ্বেষী করেন এবং মুসলমান ও তাদের ইমামদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করেন। তারা নিজ অনুসারীদেরকে ধ্বংসের উপকরণ, দ্বীনের ক্ষতি এবং মুসলিম ওলামায়ে কেরাম যা গড়ে গেছেন তাকে নস্যাত করার হাতিয়ারে পরিণত করেন। এরূপ এক ব্যক্তির বক্তৃতা আমি শুনেছি। তিনি চার ইমামের অনুসারীদের উপর অভিশাপ ও লা'নত দিয়েছেন। তিনি চার মাজহাবকে ৪টি দ্বীন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি আরও দাবী করেছেন। ঐ ইমামগণ হারামকে হালাল করেছেন। তিনি বলেন, আপনি যদি কোন হারাম জিনিস সম্পর্কে সমস্যায় পড়েন তাহলে নিয়ে আসুন, ফেকার কিতাব থেকে তাকে জায়েয করার ফতোয়া বের করে দেবো। তাদের মুখ থেকে যে কথা বেরিয়েছে তা কতই না মন্দ। তারা এ সব মিথ্যা বলছে।

শিক্ষকের উচিত ছাত্রদেরকে মতবিরোধপূর্ণ বিষয় থেকে দূরে রাখা এবং তাদেরকে মুসলমানের মধ্যে অনৈক্য, মতবিরোধ সৃষ্টি এবং অন্যের দোষ-ক্রটি তালাশ থেকে দূরে রাখা। তাদেরকে অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও জিহ্বার নির্মলতায় অভ্যস্ত করাতে হবে। তাদের খারাপ চরিত্রের বিরুদ্ধে প্রথমে ইঙ্গিতে এবং তাতে কাজ না হলে পরে প্রকাশ্যে শাসন করতে হবে। স্নেহ-দয়ার মাধ্যমে কাজ হলে এ পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে। আর তাতে কাজ না হলে কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে।

৩. শিক্ষককে ছাত্রদের জন্য দৃষ্টান্ত হতে হবে :

শিক্ষকের একথা জানা দরকার যে, ছাত্রের চোখ তার প্রতি নিবদ্ধ থাকবে। তারা তাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবে। তারা তার প্রতিটি কথা ও কাজকে সঠিক ও অনুসরণযোগ্য বিবেচনা করবে। তাই শিক্ষকের উচিত, চলনে-বলনে, লেন-দেনে ও আচার-ব্যবহারে যথাসাধ্য উত্তম ব্যক্তি হওয়া। ছাত্রের অন্তরে কথার চাইতে অনুকরণের মাধ্যমে অসম্ভব জিনিসের বীজ লাগানো সম্ভব। তাই প্রবাদ আছে, 'একজনের কাজ কি হাজারের উপর প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু হাজার জনের

www.amarboi.org

কথায় একজনের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করে না।' বিশেষ করে আমলবিহীন কথা হলে। যে শিক্ষক পড়ার সময় নামাজের কথা বলেন ও এর বিধান বর্ণনা করে, তারপর তাকে নামাজের সময় মসজিদে পাওয়া না গেলে তিনি ছাত্রের সামনে মন্দ উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হবেন।

যে শিক্ষিকা ইজ্জত-সম্মান ও ইসলামী পোষাকের পক্ষে কথা বলেন, তিনি নিজে যদি শরীরের উপর কিংবা নিচের অংশের সতর খোলা রাখেন। তাহলে তিনিও ছাত্রীদের সামনে মন্দ উদাহরণ হবেন। আমরা দেখতে পাই, এ জাতীয় শিক্ষক-শিক্ষিকারা যখন ইসলামী শিক্ষা দান করেন, তখন এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অথচ আল্লাহ্ এ জাতীয় লোকদের উপর অসন্তুষ্ট যারা নিজেরা যা বলে তা করে না। এ বিষয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তিনি যেন আমাদেরকে অন্যদের জন্য মন্দ দৃষ্টান্ত না করেন।

৪. উপযোগিতার বিবেচনা :

শিক্ষকের উচিত ছাত্রদের বিবেক ও জ্ঞানের পরিমাণ জানা। প্রত্যেকের প্রস্তুতি ও যোগ্যতা জানা এবং ঘর ও সমাজে যে সব বিষয় দ্বারা তারা প্রভাবিত হয় সেগুলো জেনে ছাত্রের সাথে বিজ্ঞ চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করা। যা উচিত তা ছাত্রকে দেয়া এবং যার প্রতি ছাত্রের ঝোঁক বেশী কিংবা যে জিনিসের প্রয়োজন সর্বাধিক। অথবা যা সংশোধন করা প্রয়োজন তার সংশোধন এবং তাকে উপযুক্ত জ্ঞান দান করার বিষয়ে বিবেচনা করতে হবে।

ছাত্র যা গ্রহণ করবে না কিংবা যা বুঝে না অথবা যা তার জন্য ক্ষতিকর তা শিক্ষা না দেয়া উচিত। তাই মহানবী (সা) বলেছেন :

نَحْنُ مَعَاشِرَ الْاَنْبِيَاءِ اُمِرْنَا اَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ.

'আমরা যারা আম্বিয়া আমাদেরকে হুকুম করা হয়েছে, আমরা যেন লোকদের মান নির্ধারণ করে সেভাবে আচরণ করি।' (আবু বকর বিন শেখাইয়ের, আবু দাউদও অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন)

শিক্ষক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে পারদর্শী হবেন। উপকারী বিষয় সম্পর্কে বিজ্ঞ হবেন এবং শিক্ষাদানের বিষয়ে অভিজ্ঞ হবেন। এটাই স্বাভাবিক। তিনি হবেন লক্ষ্যের দিক থেকে আল্লাহর অনুসারী, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক থেকে ইসলামী। তিনি আল্লাহভীরু-মোত্তাকী হবেন এবং যা বলেন ও করেন এর লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন।

www.amarboi.org

দ্বীনি শিক্ষক ছাত্রকে প্রথমে বিশুদ্ধ আকীদা শিক্ষা দেবেন। তারপর ফরজ-ওয়াজিব এবং সবশেষে সুন্নত-নফল ইত্যাদি শিক্ষা দেবেন। এভাবে তিনি প্রথমে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দেবেন।

৫. মন্দ আলেম হওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকা :

আমরা আল্লাহর কাছে মন্দ আলেম থেকে পানাহ চাই। তাদের উদাহরণ হল জালেম শাসকদের মত। তারা উম্মাহর ব্যাধি, দুর্ভাগ্য ও বিভ্রান্তির কারণ। তারা হচ্ছে মরিচিকা, তৃষ্ণার্তরা যাকে পানি মনে করে পান করতে গিয়ে কিছু পায় না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : 'আমি তোমাদের বিষয়ে দাজ্জাল থেকেও অধিকতর বিপজ্জনক লোক সম্পর্কে ভীত। জিজ্ঞেস করা হল, সেটা কি? তিনি বলেন, বিভ্রান্ত ইমামগণ।' (আহমদ-এর সনদ ভাল)

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন :

لاَ تَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوْا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلِتُمَارُوْا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلِتَصْرِفُوْا بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْكُمْ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَهُوَ فِى النَّارِ ـ

'তোমরা ওলামাদের উপর গর্বের জন্য, বোকা লোকদের সাথে ঝগড়ার জন্য অথবা তোমাদের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ইলম শিক্ষা করো না। যে এরূপ করবে সে দোজখে যাবে।' (ইবনে মাজাহ, সনদ সহীহ)

মন্দ ওলামা ইলম দ্বারা আমল থেকে বিরত থাকে। তারা কথায় আলেম, আমলের বেলায় মূর্খ। তারা আল্লাহকে ভয় করে না। লোকেরা তাদের মধ্যে দুনিয়ার প্রতি প্রীতি ও আখেরাত থেকে দূরে সরানোকারী বিষয় ছাড়া আর কিছু দেখে না। তাদের মজলিশ আল্লাহর ভীতিশূন্য, কথা-বার্তায় আল্লাহর জিকর নেই। ঘরগুলোতে দ্বীনের উপলব্ধি ও আমল না থাকায় তা যেন ফাসেক গুনাহগারের ঘর। তারা দ্বীনের স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে শাসক ও ধনীদের পেছনে ঘুরঘুর করে। আল্লাহর উদ্দেশ্যে কখনও খারাপ কাজে অসন্তুষ্ট হয় না যদিও সকল মুসলমান গোমরাহ হয়ে যাক না কেন তারা দুনিয়ার স্বার্থ ও সুবিধা লাভের পেছনে হন্যে হয়ে বেড়ায়। দ্বীনকে দুনিয়া লাভের মোকাবিলায় বিক্রি করে। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করুন।

www.amarboi.org

লোকদের মধ্যে সন্ধি-সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা

নিজের দলীয় লোকদের মধ্যকার বিরোধ ও ঝগড়া অপেক্ষা মানুষের জন্য মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অধিকতর ক্ষতিকর জিনিস দ্বিতীয়টি নেই। তাই ইসলাম মুসলমানদের মধ্যকার মতবিরোধের কারণ দূর করে তাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টিকল্পে বিদ্বেষ দূর করতে আগ্রহী। বিরোধ মুসলমানের জন্য খুব বেশী ক্ষতিকর যা জীবনকে জাহান্নাম বানিয়ে দেয়।

যে বান্দাহগণ জেনে-বুঝে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রেখে জীবন যাপন করে, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে তাদের চাইতে অপেক্ষাকৃত সুন্দর উত্তম ও সফল জীবন আর কারো হতে পারে না। আমি আল্লাহর ঐ সকল মুসলমান বান্দাহদেরকে দেখেছি যারা হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করে। তাদের অন্তরে ঘুণে ধরেছে। জীবন বিষন্ন হয়েছে এবং তারা অন্য মুসলমানের নিন্দা ও গালি-গালাজ অব্যাহত রাখায় ৪টি অপরাধে পতিত হয়েছে। ১. তারা অন্য মুসলমান ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষের কারণে গুণাহগার হয়েছে। আল্লাহ ঐ বিদ্বেষ পোষণের কোন অনুমতি দেননি। ২. তারা বিনা কারণে ঘৃণা, হিংসা ও ক্রোধের মধ্যে জীবন যাপন করেছে। ৩. তারা অন্যদের উপর জুলুম করেছে এবং এমন গুনাহর মধ্যে পড়েছে যে, তার অন্যান্য সকল ইবাদত-আনুগত্য তা মিটাতে সক্ষম নয়। ৪. তারা আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে বিরত রেখেছে এবং এমন অনড় বধির পাথরের ভূমিকা পালন করেছে যা নিজের সংখ্যালঘু অনুসারীকে অন্যান্য মুসলিম ভাইদের থেকে উপকৃত হতে বাধা দিয়েছে। আশ্চর্য যে, তারা কাফের, কমুনিষ্ট, দ্বীনের দুশমন ও ফাসেক ধনীদের প্রতিরোধের পরিবর্তে তাদের নিকটবর্তী হয়। অথচ তারা কেবল ভাল মুসলমানেরই প্রতিরোধ করে। এটাই তাদের নেফাক, মিথ্যা, গোমরাহী এবং তাদের সরদারদের ভ্রান্তির বড় প্রমাণ। তাদের একটিই কাজ। সেটা হল, মুসলমানদের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করা। তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা ও দোষারোপ করা। এ কারণে তাদের বহু অনুসারী তাদেরকে ত্যাগ করেছে এবং ভাল লোকের বিরুদ্ধে গীবত, মিথ্যা, গাল-মন্দ ও হিংসা-বিদ্বেষের নোংরামী থেকে দূরে সরে গেছে। মুসলমানদের উচিত, আল্লাহর নির্দেশিত সমঝোতা সৃষ্টির জন্য কাজ করা এবং বিরোধ-বিচ্ছেদের কারণগুলো সাধ্যমত দূর করার চেষ্টা করা।

আল্লাহ মানুষের মধ্যে সমঝোতার কাজকে সর্বোত্তম আমল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন,

www.amarboi.org

لَاخَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

'তাদের অধিকাংশ শলা-পরামর্শ ভাল নয়। কিন্তু যে শলা-পরামর্শ, দান-খয়রাত করতে কিংবা সৎ কাজ করতে অথবা মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনকল্পে করতো তা স্বতন্ত্র। যে এ কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আমি তাকে বিরাট সওয়াব দান করবো।' (সূরা নিসা : ১১৪)

মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন বা সমঝোতা প্রতিষ্ঠা বলতে বুঝায়, তাদের মধ্যকার বিরোধ-বিসম্বাদ ও বিবাদ দূর করা।

আল্লাহ্ বলেন :

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

'তোমরা আল্লাহকে ভয় করে তাদের আদেশ-নিষেধ মেনে চল। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। যদি তোমরা মোমেন হও।' (সূরা আনফাল : ১)

আল্লাহ্ বলেন :

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ـ

'মোমেনগণ একে অপরের ভাই। তোমাদের ভাইদের মধ্যে সন্ধি-সমঝোতা কর।' (সূরা হুজুরাত : ১০)

আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوْا بَلٰى، قَالَ : اِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَاِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِىَ الْحَالِقَةُ ـ

'আমি কি তোমাদেরকে রোজা, নামাজ ও সদকার মর্যাদা থেকেও উৎকৃষ্ট

www.amarboi.org

মর্যাদার কথা বলবো না? তাঁরা বলেন, 'হাঁ'। তিনি বলেন, পরস্পরের মধ্যে সন্ধি সমঝোতা প্রতিষ্ঠা কর। কেননা, নিজেদের মধ্যে গোলযোগ মারাত্মক ধ্বংসাত্মক।' (আবু দাউদ, তিরমিযী এটাকে সহীহ হাদীস বলেছেন)

মধ্যস্থতাকারী ও আপোষ-রফাকারী ব্যক্তির জন্য মিথ্যা বলাও জায়েয আছে। যদি মিথ্যা না বললে আপোষের আর কোন পথ বাকী না থাকে।

হাদীসে এসেছে–

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِىْ خَيْرًا اَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا.

'সেই ব্যক্তি মিথ্যুক নয় যে লোকদের মধ্যে সন্ধি সমঝোতা সৃষ্টি করে এবং সমঝোতার উদ্দেশ্যে কথা হস্তান্তর করে কিংবা ভাল কথা বলে।' (বোখারী, মুসলিম)

কথা ও কাজে কৌতুক বা হাসি-ঠাট্টা করা

রাসূলুল্লাহ (সা) হাসি-ঠাট্টা করেছেন বলে প্রমাণ আছে। তবে তিনি সত্য কথা বলেই হাসি-ঠাট্টা করতেন। অনুরূপভাবে, সাহাবায়ে কেরামও হাসি-ঠাট্টা বা কৌতুক করতেন এবং তাকে খারাপ জানতেন না। তারা কখনও কথা-বার্তায় এবং কখনও কাজ-কর্মে কৌতুক করতেন। নিম্নের কিছু উদাহরণ দ্বারা বুঝা যাবে মুসলিম সমাজে কি পরিমাণ ক্ষমা ও গ্রহণ যোগ্যতার অবকাশ রয়েছে।

আনাস বিন মালেক থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী করিম (সা)-এর কাছে এসে সফরের জন্য একটি সওয়ারী চান। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

اِنَّا حَامِلُوْكَ عَلٰى وَلَدِ نَاقَةٍ، فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، مَا اَصْنَعُ بِوَلَدِ نَاقَةٍ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَهَلْ تَلِدُ الْاِبِلُ اِلاَّ النُّوْقَ؟

'আমি তোমাকে একটি উটের বাচ্চা দেব। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উটের বাচ্চা দিয়ে কি করবো? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তর দেন; সকল উটই তো জন্মগতভাবে বাচ্চা হয়ে জন্মগ্রহণ করে।' (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী এটাকে সহীহ হাদীস বলেছেন)

www.amarboi.org

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেন; 'হে দুই কান বিশিষ্ট ব্যক্তি! তিরমিযী বলেছেন, আবু উসামার মতে নবী করিম (সা) তাঁকে ঠাট্টা করেছেন। (আবু দাউদ, শামায়েলে তিরমিযী)

আনাস থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি গ্রাম থেকে আসল। তার নাম যাহের। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি গ্রামের উপহার পেশ করলেন। তিনি চলে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে প্রস্তুত করে দিয়ে বলেন; যাহের হচ্ছে, আমাদের গ্রাম, আর আমরা হলাম শহরবাসী।' (আহমদ)

বর্ণিত আছে, এক ছিল বিশ্রী ব্যক্তি যাকে রাসূলুল্লাহ (সা) ভাল বাসতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কাছে আসেন। সে তখন নিজের দ্রব্য বিক্রী করছিল। তিনি তাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেন। লোকটি তাঁকে দেখতে পায়নি। লোকটি বলল, আমাকে ছাড়ুন, কে আপনি? পাশ ফিরে নবী (সা)কে চিনতে পারল। তার পিঠ নবী করিমের বুকের সাথে লাগায় তিনি আরো ভাল করে ঘেঁষে দাড়ান। নবী (সা) বলতে লাগলেন; এ দাসকে কে কিনবে? সে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম, আমাকে নিলে লোকসান হবে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : 'তুমি আল্লাহর কাছে লোকসানজনক নও। রাবীর সন্দেহ যে, তিনি হয়তো বলেছেন, তুমি আল্লাহর কাছে বেশী মূল্যবান।' (আহমদ, হাদীসের রাবীরা বোখারী ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক নির্ভরযোগ্য)

ইমাম বোখারী (র) তাঁর 'আল আদবুল মোফরাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম খরবুজা নিক্ষেপ করতেন। যখন তা ঠিকমত পড়ত, তখন তাদেরকে বীর পুরুষ বিবেচণা করা হত।

উম্মে সালমা থেকে বর্ণিত। আবু বকর (রা) নোআইমান ও সুয়াইবাত বিন হারমালাকে সাথে নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বোসারীর দিকে রওনা হলেন। তারা দু'জন ছিলেন বদরী সাহাবী। সোয়াইবাত সফরের সম্বলের কাছে ছিলেন। নোআইমান তাঁকে খাবার দিতে বলেন। সোয়াইবাত বলেন, আবু বকর (রা) আসলে দেবো। নোআইমান ছিলেন কৌতুকপ্রিয়। তিনি একদল সওয়ারীর কাছে গেলেন এবং বলেন, আমার কাছ থেকে একজন সক্রিয় শক্তিশালী আরবী দাস কিনবেন? তারা বলেন, 'হাঁ'। তিনি বলেন, সে দুই জিহবা বিশিষ্ট। সম্ভবতঃ সে এটাও বলবে যে, আমি স্বাধীন। (দাস নই) আপনারা যদি এ কারণে তাকে ছেড়ে দেন তাহলে, আমার ধ্বংস। তারা বলেন; না, আমরা তাকে কিনবো। তারা তাকে ১০টি যুবতী উষ্ট্রীর পরিবর্তে কিনে নিল। তিনি উষ্ট্রীগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে

www.amarboi.org

আসেন এবং বলেন, এই সে দাস। সোয়াইবাত বলেন; সে মিথ্যাবাদী। আমি দাস নই, আমি স্বাধীন। তারা বলেন, তোমার সম্পর্কে আমরা জানি। এ বলে তারা তাঁর গলায় রশি লাগিয়ে নিয়ে যেতে থাকল। তখন আবু বকর (রা) আসেন এবং তাঁকে এ ঘটনাটি বলা হল। তিনি এবং তাঁর সাথীরা ঐ লোকদের কাছে যান এবং উষ্ট্রীগুলো ফেরত দিয়ে তাঁকে ফেরত নিয়ে আসেন। তারপর নবী করিম (সা)কে বিষয়টি অবহিত করা হলে তিনি এবং তাঁর নিকট উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম হেঁসে উঠলেন।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধের মর্যাদা ও গুরুত্ব

সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের প্রতিরোধ এমন দুই ফরজ যা মুসলিম সমাজকে ধ্বংসকারী রোগ-ব্যাধি ও পাপ থেকে রক্ষা করে। ঐ সকল ব্যাধি ও পাপ সমাজের ভিত্তি মূলের কুঠারাঘাত হানে এবং পরিণামে ধ্বংস ও ক্ষতি ডেকে আনে।

কোরআনুল করিম অতীতের এমন বহু জাতির কথা উল্লেখ করেছে যারা নফসের দাসত্ব, প্রবৃত্তির গোলামী এবং গুনাহর অনুসারী ছিল। তারা এ সকল অপকর্ম থেকে দূরে থাকেনি। গুনাহর কারণে তারা হিংস্র পশুর মত হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাদের অস্তিত্ব নির্মূল করার সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন এবং স্বল্প সংখ্যক মোমেনকে আল্লাহর প্রতি ঈমানের ভিত্তিতে নূতন যুগের সূচনার সুযোগ দিয়েছেন। তারা পবিত্রতা ও নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ বলেন :

فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْبِهٖ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَّمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ.

‘আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারো প্রতি পাঠিয়েছি পাথর সহ প্রচন্ড বাতাস। কাউকে পেয়েছে বজ্রপাত, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি যুলুম করার ছিলেন না। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে।

(সূরা আনকাবূত : ৪০)

www.amarboi.org

পবিত্র কোরআন এবং হাদীস সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধের বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে বক্তব্য পেশ করেছে। আল্লাহ বলেন :

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"তোমাদের মধ্যে একদল লোক এমন থাকা দরকার যারা মানুষকে মঙ্গলের দিকে ডাকবে। সৎকাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর তারাই হবে সফলকাম।" (সূরা আল-ইমরান : ১০৪)

এ আয়াতে ১. কাজটি যে ফরজ তার প্রমাণ রয়েছে। এখানে 'থাকা দরকার' শব্দটি ফরজের অর্থবোধক। ২. আয়াতে সাফল্যকে এর সাথে নির্ভরশীল করে দেয়া হয়েছে। কেননা. 'তারাই হবে সফলকাম' বাক্য দ্বারা বুঝা যায় সাফল্য কেবল তাদের জন্যই। অর্থাৎ যারা মঙ্গলের দিকে দাওয়াত দেবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজের প্রতিরোধ করবে, তারাই সফল হবে। ৩. এ কাজ ফরজে কেফায়াহ বলে জানা গেল। কিছু সংখ্যক লোক কাজটি আঞ্জাম দিলে অন্যদের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। তবে শর্ত হল, কিছু সংখ্যক লোক যেন সকল গুনাহগার এবং ফরজ লংঘনকারী পর্যন্ত পৌছেন। ফরজের দায়িত্ব মুক্ত হওয়ার জন্য সাথের লোকদেরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধের দায়িত্ব পালনের জন্য বলাটাও ফরজ। অনেকেই মনে করেন, অমুক যেহেতু এ কাজ করছে, এটাই যথেষ্ট। যদিও তার আওয়াজ সবার কাছে না পৌছে থাকে, এটা কিন্তু ভুল। অনুরূপভাবে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধের ফরজ দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবার জন্য যে এ কাজ করে তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যেন সে লোকদের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়।

এ ব্যাপারে কারো সমালোচনা ও নিন্দার তোয়াক্কা করবে না। যদি সৎকাজের আদেশকারী এবং মন্দ কাজের প্রতিরোধকারী শুধুমাত্র বক্তা হন, কিংবা ভাড়া করা বক্তা হন, কিংবা শিক্ষক হন, লোকদের পাপে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে তার কোন মাথা ব্যথা নেই। তাদের ফরজ লংঘনের বিষয়ে তার কোন আপত্তি নেই এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিসকে ভয় করেন। তাহলে তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নন এবং তাকে সৎকাজের আদেশ দানকারী এবং মন্দ কাজের প্রতিরোধকারী হিসেবে ধরা যাবে না। উম্মাহর উচিত তাকে ঐ দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া। এ কাজের উপযোগী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ কার্যকর করার মত লোক খুঁজে

www.amarboi.org

বের করতে হবে। ৪. যারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ করে আল্লাহর কাছে তাদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ বলেন :

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ.

'মোমেনগণ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজের প্রতিরোধ করে এবং নামাজ কায়েম করে।' (সূরা তাওবা :৭১)

এগুলো হচ্ছে, মোমেনদের গুণাবলী। যাদের এ গুণ নেই, তারা এ আয়াতে বর্ণিত উন্নত মোমেনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আল্লাহ বলেন :

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ -

'তোমরা হলে সর্বোত্তম জাতি। যাদের সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের প্রতিরোধের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনবে।' (আলে ইমরান : ১১০)

এ আয়াতে 'আমল বিল মারুফ এবং নাহয়ি আনিল মোনকার' সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের প্রতিরোধের মর্যাদা বর্ণনা করে বলেছেন, এর মাধ্যমে মুসলমানরা সর্বোত্তম উম্মায় পরিণত হয়েছে।

আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের মধ্যে সাহায্যের যোগ্য ব্যক্তিদের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন :

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ، الَّذِيْنَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاٰتَوُا الزَّكَاةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ -

'আল্লাহর দ্বীনি কাজে যারা সাহায্য করে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান। তাদেরকেই যদি জমীনে

www.amarboi.org

ক্ষমতা দেয়া হয়, তাহলে তারা নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎকাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজের প্রতিরোধ করে। সকল কাজের পরিণতি তো আল্লাহর জন্যই।' (হজ্ব : ৪০-৪১)

আল্লাহ বনি ইসরাঈলের উপর অভিশাপের ব্যাপারে তাদের নবীদের জবানীতে বলেন :

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ، كَانُوْا لَايَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ـ

'বনি ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়ম তনয় ঈসার মুখে অভিশাপ দেয়া হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা এবং সীমালংঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজের নিষেধ করত না। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল। (আল মায়েদাহ : ৭৮-৭৯)

আবু বকর (রা) খোতবায় বলেন, হে লোকেরা! তোমরা এ আয়াতটি পড়েছ :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ـ

'হে মোমিনগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা যখন সৎপথে রয়েছ। তখন কেউ গোমরাহ হলে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই।' (সূরা মায়েদাহ : ১০৫) তোমরা এ আয়াতের অর্থকে ভিন্নভাবে গ্রহণ করেছ। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি :

اِذَا رَاَى النَّاسُ الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوْهُ اَوْشَكَ اَنْ يَّعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ ـ

'লোকেরা মন্দ ও খারাপ কাজ দেখার পর যদি তার প্রতিরোধ না করে শীঘ্রই আল্লাহ তাদের সবাইকে আজাব দেবেন।' (আসহাবুস সুনান; তিরমিযী এটাকে হাসান, সহীহ হাদীস বলেছেন)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন; 'আল্লাহ বান্দাহকে প্রশ্ন করবেন এবং এ কথাও জিজ্ঞেস

www.amarboi.org

করবেন, দুনিয়ায় মন্দ কাজ দেখা সত্ত্বেও কোন জিনিস তোমাকে তার বিরোধিতা থেকে বিরত রেখেছে? যদি আল্লাহ্ বান্দাহকে এর দলীল ও জওয়াব শিক্ষা দেন তখন বান্দাহ উত্তর দেবে। 'হে রব! আমি আপনার প্রতি আশাবাদী এবং লোকদের প্রতি ভীত ছিলাম।' (ইবনু মাজাহ-সনদ ভাল)

আবু সা'লাবা খাশানী থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)কে নিম্নোক্ত আয়াতের তফসীর জিজ্ঞেস করেছিলেন; 'তোমরা যখন সৎপথে রয়েছ তখন কেউ গোমরাহ হলে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই।' (মায়েদা : ১০৫)

রাসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলেন :

يَا اَبَا ثَعْلَبَةَ : مُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَاذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهُوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَاعْجَابَ كُلِّ ذِىْ رَأْىٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَّ، اِنَّ مِنْ وَّرَائِكُمْ فِتَنًا كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ لِلْمُتَمَسِّكِ فِيْهَا بِمِثْلِ الَّذِىْ اَنْتُمْ عَلَيْهِ اَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ، قِيْلَ مِنْهُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : لاَ، بَلْ مِنْكُمْ لاِنَّكُمْ تَجِدُوْنَ عَلَى الْخَيْرِ اَعْوَانًا ـ

'হে আবু সা'লাবা! লোকদেরকে সৎকাজের আদেশ কর, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখ। তুমি যদি দেখ কৃপণের আনুগত্য করা হচ্ছে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হচ্ছে, দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেকে নিজের মতের প্রতি অগ্রাধিকার দিচ্ছে, তখন তুমি নিজের বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং লোকদেরকে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে দেবে। তোমাদের পরে রাত্রের অন্ধকারের মত ফেতনা দেখা দেবে। তখন তোমাদের ন্যায় সত্যের অনুসারী ব্যক্তি তোমাদের মধ্য থেকে ৫০ জনের সওয়াব পাবে। প্রশ্ন করা হল, তাদের মধ্য থেকে নয় কি? তিনি জওয়াব দেন 'না'। বরং তোমাদের মধ্য থেকে। কেননা, তোমরা কল্যাণের বিষয়ে সহযোগী পেয়ে থাক।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি :

www.amarboi.org

مَنْ رَاَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ ـ

'তোমাদের কেউ যদি অন্যায় দেখে তাহলে তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করবে। না পারলে জিহবা দিয়ে বিরোধিতা করবে। তাও না পারলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে। আর এটা হচ্ছে দুর্বলতম ঈমান।' (মুসলিম, তিরমিযী)

আবু আবদুল্লাহ তারেক বিন শিহাব বাজালী আহমাসী থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী করিম (সা)কে জিজ্ঞেস করল; কোন জেহাদ উত্তম? তিনি বলেন,

كَلِمَةُ حَقٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ـ

'জালেম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জেহাদ।' (নাসাঈ-সনদ সহীহ। এটা মোনজেরীর মন্তব্য)

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَرَجُلٌ قَامَ اِلٰى اِمَامٍ جَائِرٍ فَاَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ ـ

'সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ হলেন, হযরত হামজাহ বিন আবদুল মোত্তালিব এবং সে ব্যক্তি যে জালেম নেতার কাছে গিয়ে তাকে সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজের প্রতিরোধ করায় তাকে হত্যা করা হয়।' (তিরমিযী, হাকেম-সনদ বিশুদ্ধ)

ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

مَامِنْ نَبِىٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ فِىْ اُمَّةٍ قَبْلِىْ اِلاَّ كَانَ لَهٗ مِنْ اُمَّتِهٖ حَوَارِيُّوْنَ وَاَصْحَابُ يَأْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهٖ وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهٖ، ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفُ يَقُوْلُوْنَ مَالاَ يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَالاَ يُؤْمَرُوْنَ، فَمَنْ جَهَدَهُمْ بِيَدِهٖ فَهُوَمُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، لَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ ـ

www.amarboi.org

'আমার আগের উম্মতগুলোর প্রতি আল্লাহ্ এমন কোন নবী পাঠাননি যাদের কোন বিশেষ সাথী সঙ্গী ছিলেন না। তারা নবীর সুন্নত আঁকড়ে ধরতেন এবং তাঁর আদেশ মেনে চলতেন। তারপর এমন লোকের আবির্ভাব হল, যারা নিজেদের কথার বিপরীত কাজ করে এবং যা করার জন্য আদেশ করা হয়নি– তা করে। তাদের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি হাত দিয়ে জেহাদ করে সে মোমেন। যে মুখ দিয়ে জেহাদ করে সে মোমেন এবং যে অন্তর দিয়ে জেহাদ করে, সে মোমেন, অন্তর দিয়ে জেহাদের নীচে সরিষার বীচি পরিমাণ ঈমানও নেই।' (মুসলিম)

ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اِنَّ اَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُوْلُ : يَاهٰذَا اتَّقِ اللّٰهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعْ فَانَّهُ لاَ يَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ وَهُوَ عَلٰى حَالِهٖ فَلاَ يَمْنَعُهُ ذٰلِكَ اَنْ يَكُوْنَ اَكِيْلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَقَعِيْدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوْا ذٰلِكَ ضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهُم بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ : كَلاَّ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلٰى يَدِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا.

'বনি ইসরাঈলের মধ্যে প্রথম যে ত্রুটি অনুপ্রবেশ করেছিল। তা হল, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময় বলত : আল্লাহকে ভয় কর এবং তুমি যে মন্দ কাজ করছ তা ত্যাগ কর। এটা তোমার জন্য নাজায়েয। তারপরের দিন তার সাথে মন্দ কাজরত অবস্থায় দেখা হওয়া সত্ত্বেও তা তার পানাহারের সাথী ও সহপাঠি হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেনি। যখন তারা এরূপ শুরু করল, তখন আল্লাহ্ তাদের পরস্পরের অন্তরের উপর গযব বর্ষণ করলেন। এরপর নবী করিম (সা) বলেন; 'কখনও নয়। তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ দেবে, মন্দ কাজের প্রতিরোধ করবে, জালেমের হাত স্তব্ধ করে দেবে এবং তাকে সত্যের দিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালাবে।' (আবু দাউদ, তিরমিযী এটাকে হাসান হাদীস বলেছেন)

হযরত হুজায়ফা (রা) কে জীবিত হওয়া সত্ত্বেও মৃত ব্যক্তিকে– এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তর দেন।

www.amarboi.org

اَلَّذِىْ لاَيُنْكِرُ الْمُنْكَرَ بِيَدِهٖ وَلاَ بِلِسَانِهٖ وَلاَ بِقَلْبِهٖ.

'যে ব্যক্তি হাত, মুখ ও অন্তর দিয়ে অন্যায়-অসত্যের প্রতিরোধ করে না। সে হচ্ছে জীবিত হওয়া সত্ত্বেও মৃত।' তিনি বলেন, 'এমন যুগ আসবে যখন লোকের কাছে সৎকাজের আদেশকারী এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধকারী মোমেন অপেক্ষা মৃত গাধা অধিকতর প্রিয় হবে। অর্থাৎ তখন সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধকারী নিজেরাই মন্দ হবে।

সৎকাজের আদেশ দানকারী এবং অন্যায়ের প্রতিরোধকারীর শর্ত

যিনি সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করবেন তাকে ১. বালেগ হতে হবে। বালেগ না হলে তার উপর এ কাজ ফরজ হয় না। তবে বালেগ না হলেও সে যদি বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী হয়, তাহলে তার এ কাজ করা জায়েয আছে।

২. মোমেন মুসলমান হতে হবে। অন্যায়ের প্রতিরোধ হচ্ছে দ্বীনের সাহায্য। দ্বীনের সাহায্য মোমেন ছাড়া হতে পারে না। মোমেনের উপর কাফেরের শক্তি প্রয়োগ খাটে না। এ দু'টো সর্বসম্মত শর্ত। আরও দু'টো শর্ত মতবিরোধপূর্ণ। ৩. ন্যায়পরায়ণতা ৪. শাসক ও নেতার অনুমতি। এক দলের মতে ন্যায়পরায়ণতা এর জন্য শর্ত। ফাসেক ও গুনাহ্গার ব্যক্তির সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধের অধিকার নেই। এ মতের বিরুদ্ধে কোন দলিল প্রমাণ নেই। কেননা, সৎকাজের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ অন্যান্য ফরজের মতই দু'টো ফরজ। অন্যগুলো আঞ্জাম দেয়ার উপর তা আঞ্জাম দেয়া নির্ভরশীল নয়। যেমন, যাকাত আদায়ের উপর নামাজের বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল নয় কিংবা রোজা ও হজ্জের উপরও নয়। এতটুকু বলা যায় যে, ফাসেকের কথার মূল্য ও প্রভাব কম পড়বে কিংবা আদৌ পড়বে না। সে নিজেই ফাসেকীর জন্য নিন্দিত। তা সত্ত্বেও সে সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায়ের প্রতিরোধের দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়। বিচিত্র নয় কখনও তার মত অন্যান্য ফাসেকের কাছে তার সৎকাজের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধের বিরাট প্রভাব পড়তে পারে। যদি সে তাদের সামনে নিজের গুনাহ্ স্বীকার করে, নিজের ত্রুটি ঘোষণা করে, অন্যদের প্রতি তার পাপ কাজের অনুসরণ না করার আহ্বান জানায় এবং যদি সে এমন প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়, যার কথা লোকেরা শুনে। এ জাতীয় ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অধিকতর উপকারী হতে পারে। আমরা এরূপ অনেক ঘটনাই দেখেছি। আল্লাহ ফাসেকদের মাধ্যমেও এ দ্বীনের সাহায্য করে থাকেন।

www.amarboi.org

সত্য কথা হল, ফাসেকেরও এ কাজ করার অধিকার আছে এবং তা করা উচিত। নবীগণ ব্যতীত আর কেউ ক্রটি বিচ্যুতি মুক্ত নয়। সাঈদ বিন যোবায়ের বলেছেন, 'যদি সে সৎকাজের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ না করে তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে, যার কোন গুনাহ নেই সে ছাড়া আর কেউ এ কাজ করতে পারে না।' ইমাম মালেক সাঈদ বিন যোবায়েরের এ মন্তব্যে আশ্চর্য হয়েছে। শাসক ও নেতার অনুমতিকে এক দল শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এর ফলাফলের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা অনুমতি ছাড়া তা কোন ব্যক্তি বা সমষ্টির জন্য জায়েয মনে করেন না। রাফেজী সম্প্রদায় আরো বাড়িয়ে বলেছেন যে, নিষ্পাপ শাসক বা ঈমানের আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ জায়েয নেই। খাঁটি ইসলামী শাসক ও নেতা না থাকার কারণে এ শর্ত সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা, যদি এ কাজকে অনুরূপ শাসকের উপর নির্ভরশীল করা হয় তাহলে, দ্বীন বরবাদ হয়ে যাবে এবং ইসলামের নিদর্শনগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তখন ইসলামের বিকৃত রূপ প্রকাশিত হবে এবং কুফরী, বেহায়াপনার প্রকাশ ঘটবে ও উম্মাহর ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে। কুফরী এবং ভ্রান্ত মতবাদগুলোর মজবুত শিকড় গজাবে। ইসলাম চিরতরে বিদায় নেবে। এ মতের পক্ষে কোরআন ও হাদীসে কোন প্রমাণ নেই। তারা যদি বর্তমান যুগে বাস করত, তাহলে তারা তাদের বক্তব্যের মারাত্মক পরিণতি টের পেত এবং এর মাধ্যমে যে ইসলাম বিদায় নিত, তা বুঝতে পারত।

'হাসবাহ' এবং 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের মধ্যে যেন কোন সংশয়-সন্দেহ না থাকে। হাসবা হচ্ছে ইমাম বা শাসকের অনুমতি সাপেক্ষে দায়িত্বশীল নিজের দায়িত্ব পালন করেন। হাসবার দায়িত্বপ্রাপ্ত মোহতাসেব, ইসলামী সরকারের পক্ষ থেকে বিচারপতির কাজের কাছাকাছি দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। তিনি পাপীদেরকে সংশোধন করেন এবং তাদেরকে বেত্রাঘাত কিংবা আটক করার মাধ্যমে শাস্তি দেন। অনুরূপভাবে, তিনি বাজার তদারক করেন এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যায় প্রতিহত করেন। পুলিশ তার অধীন থাকে এবং তিনি যা বলেন তা বাস্তবায়ন করে। এটা সৎকাজের আদেশ দানকারী এবং অন্যায়ের প্রতিরোধকারী থেকে ভিন্ন। ইমাম মাওয়ারদী এ দু'টোর মধ্যে নিম্নোক্ত নয়টি পার্থক্য করেছেন :

১. মোহতাসেবের উপর সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ ফরজে আইন। কেননা, তিনি এ কাজের জন্যই নিযুক্ত হয়েছেন। অন্যদের জন্য ফরজে কেফায়াহ। তারা হলেন স্বেচ্ছাসেবক।

www.amarboi.org

২. লোকেরা মোহতাসেবের কাছে জুলুমের অভিযোগ দায়ের করে যেন তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকের কাছে কেউ অভিযোগ পেশ করে না।

৩. মোহতাসেবের এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া তার কর্তব্যের অংশ এবং তাতে উদাসীনতা প্রদর্শন জায়েয নেই। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকের ব্যাপারটি এরূপ নয়।

৪. কেউ সাহায্য চাইলে মোহতাসেবের সাড়া দেয়া জরুরী। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকের জন্য তা জরুরী নয়। কেননা, তার কাজের জেরপূর্বক সাহায্যের সুযোগ নেই, কিন্তু মোহতাসেবের তা আছে।

৫. মোহতাসেবকে প্রকাশ্য অন্যায় কাজ খুঁজে বের করতে হয় যেন তিনি এর প্রতিরোধ করতে পারেন। কিন্তু সেচ্ছাসেবকের বিষয়টি ভিন্নতর।

৬. তিনি পুলিশসহ অন্যদের সাহায্য নিতে পারেন যেন অধিকতর শক্তিমত্তার সাথে নিজ দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারেন। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকের জন্য তা সম্ভব নয়।

৭. তিনি শরীয়তের দণ্ডবিধি ব্যতীত অন্যায়ের শাস্তি কার্যকর এবং অপরাধীকে সংশোধন করতে পারেন যা অন্যদের পক্ষে সম্ভব নয়।

৮. তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতা নিতে পারবেন। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবক তা পারেন না।

৯. তিনি সামাজিক রীতি-পদ্ধতিতে নিজ রায় দ্বারা ইজতিহাদ করতে পারেন, শরীয়তের মধ্যে নয়। যেমন, বাজারে বসার জায়গা, দোকানদারের দোকানের স্থান নির্ধারণ এবং মুসলমানের জন্য ক্ষতিকর বিষয়ের প্রতিরোধ করতে পারেন। কিন্তু অন্যদের জন্য উপদেশ ও পরামর্শ দান ব্যতীত অন্য কিছু সম্ভব নয়। (আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ : ২৪০ পৃঃ)

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীসগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে, আল্লাহ্ কিছু লোককে ক্ষমতা দেন এবং অন্য কিছুকে উপদেশ, সাহায্য, সহযোগিতা, সৎকাজের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধের দায়িত্ব দেন। তিনি জালেম সরকারের সামনে সত্য কথা বলাকে উৎসাহিত করেন। যদিও এর ফলশ্রুতিস্বরূপ তাকে হত্যা করা হোক না কেন। যদি জালেমের অনুমতির উপর বিষয়টি নির্ভরশীল হয়, তাহলে, জালেম-ফাসেকরা কখনও সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায়ের প্রতিরোধের অনুমতি দেবে না। কেননা, এর ফলে প্রজা সাধারণ

www.amarboi.org

জালেম সরকারের বিরুদ্ধে চলে যাবে। তাহলে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ নস্যাত হয়ে যাবে। ইসলাম অচল হয়ে যাবে এবং কুফরী মুসলিম দেশ ও যুবক-যুবতীদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী হবে। কিছু লোকের একাজ সত্ত্বেও যেখানে কুফরীর প্রভাব কার্যকর, সেখানে যদি তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়, তাহলে কি উপায় হবে? তখন ইসলাম পুরো হারিয়ে যাবে। প্রশ্ন আসতে পারে, দ্বীন শিক্ষা, ছেলে-মেয়েদের প্রতিপালন এবং উপদেশই কি কেবল সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজের প্রতিরোধের অন্তর্ভুক্ত? এ জাতীয় প্রশ্ন তাদের যুগে চললেও বর্তমানে চলবে না। বর্তমানে দ্বীন, নবীদের যুগের মত নূতন করে পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। ধনী এবং শাসকরা ব্যতীত কেউ দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না। অবশ্য দ্বীনের দুশমনেরা তো যুদ্ধ করবেই। তাই আল্লাহর দিকে দাওয়াত, সৎকাজের আদেশ, মন্দের প্রতিরোধ এবং উপদেশ অব্যাহত রাখতে হবে যেন উম্মাহ বিপদ সম্পর্কে সজাগ থাকে এবং শাসকরা রাজী থাক বা না থাক, তাদেরকে ঘুম থেকে জাগাতে হবে।

ইবনু মোফলেহ বলেছেন, সৎকাজের আদেশ ও মন্দের প্রতিরোধ যার জন্য সুনির্দিষ্ট নয়, তার জন্য ফরজে কেফায়াহ। এতে শাসক, শাসিত, জ্ঞানী-মূর্খ, ন্যায়পরায়ণ ও ফাসেক এবং রাষ্ট্রের প্রধানের অনুমতি থাক বা না থাক, সবই সমান। মানুষের উচিত মন্দের প্রতিরোধে কল্যাণের জন্য সাহায্য করা। ওলামায়ে কেরামের যে বিষয়ে জ্ঞান রয়েছে, সে বিষয়ে তারা মন্দের প্রতিরোধ করবেন। ওলামায়ে কেরাম ছাড়া অন্যরা হুকুম ও বিধান জানে না এবং কোন জিনিসের হালাল-হারামের প্রমাণ ওলামায়ে ছাড়া অন্যরা দিতেও পারে না, তাই এ কাজটি আলেমদের জন্যই প্রযোজ্য। তিনি বলেন, ফরজ লংঘন করলে কিংবা হারাম কাজ করলে তা প্রতিহত করা ফরজ। নফল-মোস্তাহাব ছেড়ে দিলে তার বিরোধিতা করা মোস্তাহাব। তিনি বলেন, সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিরোধিতা হাত, তারপর জিহবা এবং সবশেষে অন্তর দিয়ে করতে হবে। হাদীসে এরূপই এসেছে।

মারওয়াজী বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ আহমদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করলাম, সৎকাজের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ কিভাবে করতে হবে? তিনি বলেন, হাত, জিহবা ও অন্তর দিয়ে। আর অন্তরের বিরোধিতা হচ্ছে সর্বনিম্ন পর্যায়ের ঈমানের পরিচায়ক। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হাত দিয়ে কিভাবে? তিনি উত্তর দেন, হাত দিয়ে পৃথক করে দেবে। আমি আবু আবদুল্লাহকে ঝগড়ারত বালকদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম তিনি তাদেরকে পৃথক করে দিলেন। অন্য এক

www.amarboi.org

বর্ণনায় এসেছে, হাত দিয়ে বিরোধিতার মধ্যে তলোয়ার কিংবা অন্য কোন অস্ত্রের ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত নেই। ইবনুল জাওযী বলেছেন : তলোয়ার কিংবা অস্ত্র ছাড়াই প্রয়োজন হলে হাত ও পা দিয়ে মারা যাবে।

ইবনুল জাওযীর বক্তব্য তাঁর যুগের জন্য উপযোগী। বর্তমান যুগের অবস্থা ভিন্ন। হাঁ, যদি আত্মীয়-স্বজন হয় তারা এবং যাদের কাছ থেকে ফেতনার আশংকা নেই, তাদের প্রতি হাত দিয়ে বিরোধিতা করা যাবে। এ ব্যাপারে সামনে আরো বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

৫. সামর্থ্য : হাদীসের মধ্যেই এ শর্তের উল্লেখ আছে। এর অর্থ-এ নয় যে, অক্ষম ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে না। তাকে অন্তর দিয়ে হলেও ঘৃণা করতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবাসে সে গুনাহকেও অপছন্দ করবে এবং প্রতিহত করবে। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, তোমরা হাত দিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। যদি তা না পার, তাহলে তাদের সামনে তোমার ঘৃণাবোধ প্রকাশ কর।

সামর্থ্যের মধ্যে জ্ঞানের সামর্থ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ জন্য কোন যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন নেই। তবে এজন্য খুব বেশী জ্ঞানেরও প্রয়োজন নেই। দ্বীনের জরুরী বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানই যথেষ্ট, এর যুক্তি প্রমাণ জানা জরুরী নয়। যেমন, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার এবং আত্মীয়তার অধিকার ফরজ এটুকু জানলেই হবে। অনুরূপভাবে, হত্যা, সুদ, চুরি, যেনা যে হারাম এতটুকু জানাই যথেষ্ট।

সামর্থ্যের মধ্যে বাহ্যিক ক্ষমতাও অন্তর্ভুক্ত আছে। যেখানে কথা বলা দরকার, সেখানে কথা বলার ক্ষমতা থাকতে হবে এবং যেখানে সম্ভব সেখান থেকে অন্যায় দূর করতে হবে। যেমন, মদ ফেলে দেয়া, চোর ধরা, লড়াইকারীদেরকে পৃথক করে দেয়া, শাস্তিদানের ক্ষমতা থাকলে শাস্তি দিতে হবে। পিতা হলে সন্তানকে, স্বামী হলে স্ত্রীকে, মনিব হলে গোলামকে, প্রভু হলে চাকরকে শাস্তি দিতে পারেন। এরূপ আরো যাদের ক্ষমতা আছে তারা অধীনস্থদের উপর নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। যদি তাদেরকে মার দেয়া কিংবা আটক রাখার প্রয়োজন পড়ে, তারা তাও করতে পারেন।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ করতে গিয়ে যদি কোন বিপদ আসে, তা বরদাশত করার যোগ্যতাও সামর্থ্যের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তিনি যদি জানেন যে, সৎকাজের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করলে কোন লাভ তো

www.amarboi.org

হবেই না, বরং তার মার খাওয়ার আশংকা রয়েছে, তখন তার উপর তা করা ফরজ নয়।

তার উচিত হবে, অন্যায়ের স্থানে হাজির না হওয়া। বিশেষ জরুরী হলেই কেবল তিনি সেখানে যাবেন। যেমন, বাজার, হাসপাতাল, রাস্তাঘাটে চলা, ইত্যাদি। কেননা, এগুলো সব উলঙ্গ-অর্ধোলঙ্গ মহিলাতে পূর্ণ। তা সত্ত্বেও মানুষকে সেগুলোতে যেতে হয়। তিনি তখনও পর্যন্ত দেশ ত্যাগ করতে পারবেন না, যতক্ষণ না, তাকে অন্যায়, জুলুম ও নিষিদ্ধ কাজ করতে বাধ্য করা হয়। হিজরত তখন ওয়াজিব হয়, যে দেশে গেলে তাকে অন্যায় করতে ব্যাধ করা হবে না।

তিনি যদি জানেন যে, তার কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্যায় দূর হবে এবং কোন ক্ষতি হবে না। তখন মন্দ কাজের প্রতিরোধ ফরজ।

তিনি যদি জানেন যে, তার কোন ক্ষতি হবে না, তবে তার কথা কেউ মানবে না, এমতাবস্থায় কিছু লোকের মতে অন্যায়ের বিরোধিতা করা ফরজ নয়। কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহর কাছে দায়িত্বমুক্ত হওয়ার জন্য অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে হবে। তাছাড়া অপরাধীকে তার গুনাহ্ জানিয়ে দেয়া জরুরী।

তিনি যদি জানেন যে, ক্ষতি হলেও অন্যায় দূর হবে, তখন অন্যায়ের প্রতিরোধ করা মোস্তাহাব, ফরজ নয়। এর সর্বোত্তম প্রমাণ হল এ হাদীস :

'জালেম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।' তবে শর্ত হল, ক্ষতি শুধু তারই হবে, অন্য কারো নয়। যদি সে ক্ষতি তার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়, তাহলে তার ঐ মন্দের প্রতিরোধ জায়েয হবে না। অনুরূপভাবে কোন অন্যায়ের প্রতিরোধ করলে যদি তা আরো বৃহত্তর অন্যায়ের কিংবা সমপরিমাণ অন্যায়ের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে, তাহলে, সে অন্যায়ের প্রতিরোধ করা জায়েয হবে না। যেমন, কাউকে মদ পান করতে নিষেধ করলে যদি সে দ্বীনকে গালিগালাজ করে, কিংবা অমুক লোকের গীবত করতে নিষেধ করায় যদি আরেক লোকের গীবত শুরু করে।

উপরোল্লিখিত 'জানেন' শব্দ দ্বারা মজবুত ধারণা, কিংবা 'দৃঢ়ভাবে জানা' বুঝানো হয়েছে।

ওলামায়ে কেরাম একটি বিষয়ে মতভেদ পোষণ করেছেন, যদি কারো এ মজবুত ধারণা হয় যে, অন্যায়ের প্রতিরোধ করলে তার ক্ষতি হবে না এবং কোন উপকারও হবে না, তবে উপকারের সম্ভাবনা আছে, তখন কি তার উপর অন্যায়ের প্রতিরোধ করা ফরজ? অগ্রাধিকারযোগ্য মত হল, অন্যায়ের প্রতিরোধ ফরজ, কেননা, তা করাই মূল বিষয়, না করাটা মূল বিষয় নয়।

www.amarboi.org

সৎকাজের আদেশ দানকারী ও অন্যায়ের প্রতিরোধকারীর পর্যায়ভিত্তিক করণীয়।

সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায়ের প্রতিরোধের কতগুলো পর্যায় রয়েছে। বিচক্ষণতার জন্য এ বিষয়গুলো জানা দরকার।

১. বিষয়টি পরিচিত করানো।

ক্রটি ও অন্যায়কারীকে তার ক্রটির বিষয়ে শরীয়তের হুকুম সম্পর্কে জানানো এবং অন্যায়কারীকে তার অন্যায় সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম এবং করণীয় সম্পর্কে জানাতে হবে। বহুলোক বহু বিষয়ে শরীয়তের হুকুম জানে না। যদি জানত, তাহলে, তারা তা করত না। এর উদাহরণ হল, যে ব্যক্তি নামাজের রুকু-সাজদা, কেরাআত এবং অজু ভাল করে জানে না, উচিত হবে, তাকে নরম ও ভদ্রভাবে বুঝানো। সে যে মূর্খ-অজ্ঞ তা প্রকাশ করা যাবে না। কোন ব্যক্তি বিরাট মূর্খ হওয়া সত্ত্বেও তাকে মূর্খ বলাটা পছন্দ করবে না। যদি সে এমনভাবে তা জানে যা কষ্টদায়ক, তাহলে তা হবে হারাম। সুন্নাত লংঘনের বিরোধিতাকারী অনেক লোক, বেশ কিছু হারাম কাজে জড়িয়ে পড়েন। এর উদাহরণ হচ্ছে, অন্যকে ঘৃণা করা, অহমিকাবোধ, অন্য মুসলমান ভাইকে কষ্ট দেয়া এবং নিন্দা করা। এগুলো হচ্ছে, কবীরা গুনাহ। অথচ তারা একটি সুন্নাতের আমলের দাবী জানাচ্ছেন, ফরজের নয়। এমনকি ফরজ হলেও তারা যা করছেন তা জায়েয হবে না। যে ব্যক্তি অন্যায় দিয়ে অন্যায়ের প্রতিরোধ করে, তার উদাহরণ হল, প্রস্রাব দিয়ে রক্ত পরিষ্কার করা এবং মহিলাকে চুমু দেয়ার মাধ্যমে তার প্রতি দৃষ্টি না দেয়ার নির্দেশ পালন।

২. ওয়াজ-নসীহত।

অন্যায়ের প্রতিরোধকারী যদি জানেন যে, কেউ অন্যায় করছে, তাহলে তার উচিত হল, ঐ ব্যক্তিকে ওয়াজ-নসীহত করা, আল্লাহর ভয়, তাঁর শাস্তি, সাক্ষাত ও হিসাব-নিকাশের ভয় দেখানো এবং অন্যায় সম্পর্কে আল্লাহর হুঁশিয়ারী স্মরণ করিয়ে দেয়া। ওয়াজকারীর জানা উচিত, তার ওয়াজের উদ্দেশ্য যেন অন্যকে মূর্খ বানিয়ে অপমানের চেষ্টা না হয় এবং নিজের বিদ্যা-বুদ্ধির গর্ব কিংবা বুজুর্গীর প্রকাশ না হয়। এর দ্বারা ওয়াজকারী নিজে ধ্বংস হবে এবং এর উদাহরণ হবে এমন, যেন নিজেকে ইচ্ছাকৃত আগুনে জ্বালিয়ে অন্যকে আগুন থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা।

www.amarboi.org

৩. মন্দ এবং কঠোর বাক্য উচ্চারণ করা।

যখন নরম কথা দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধ করা সম্ভব না হয় এবং অন্যায়কারীর অন্যায়ের উপর টিকে থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় কিংবা ওয়াজ-নসীহতকারীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয় তখনই কেবল মন্দ ও কঠোর বাক্য উচ্চারণ করা যেতে পারে। যেমন, ইবরাহীম (আ) নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিলেন :

أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ.

'উহ! তোমাদের এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের উপাস্যদের জন্য আফসুস। তোমরা কি বুঝ না? (সূরা আম্বিয়া : ৬৭)

এখানে মন্দ কথা দ্বারা অশ্লীল বাক্য বিনিময় উদ্দেশ্য নয়। বরং সাধারণ মন্দ কথা দ্বারা শাঁসিয়ে দেয়া দরকার। যেমন, হে বোকা! ফাসেক! মূর্খ! বেকুফ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা। প্রয়োজন হলে এবং আগের পর্যায়গুলো দ্বারা কাজ না হলে, কেবলমাত্র এ পর্যায়ের প্রয়োগ হতে পারে। কঠোরতা প্রয়োগ করলেও কথার সত্যবাদিতা থাকতে হবে। ঢালাওভাবে বলা যাবে না। তার থেকে পৃথক হওয়ার পর তার অনুপস্থিতিতে কোন কথা বলা যাবে না যদি না সে প্রকাশ্য অন্যায় করে। শুধুমাত্র তার অন্যায়ের প্রচার করা যাবে। অন্য কিছু নয়। এ মর্মে নিন্দা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪. হাত দিয়ে প্রতিরোধ করা।

এর উদাহরণ হল, অন্যায়ের উপায়-উপকরণ ভেঙ্গে দেয়া, মদ ফেলে দেয়া, প্রতিকৃতি ভেঙ্গে ফেলা এবং মসজিদ থেকে যার উপর গোসল ফরজ তাকে বের করে দেয়া ইত্যাদি। এক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু করা যাবে না। যেমন, নীচে পড়ে থাকা প্রতিকৃতি ভাঙ্গা, যার উপর গোসল ফরজ তাকে লাথি মেরে কিংবা কান চেপে ধরে বের করে দেয়া ইত্যাদি কাজ করা যাবে না। এ কাজ এবং আগের কাজগুলো কেবল তখন করা যাবে যখন মানুষ এর চাইতে কঠোরতর বিপদ ঘটে যাওয়ার আশংকামুক্ত থাকবে এবং পরিস্থিতি অনুরূপ করার অনুকূল হবে। যদি অবস্থা এর বিপরীত হয় এবং অন্যায়কারীর পক্ষ থেকে ক্ষতির আশংকা থাকে, কিংবা যদি অন্যায়কারীর পক্ষ সমর্থনকারী পুলিশের কাছে অন্যায় বিরোধী সত্যপন্থী, মুসলমানের বিরুদ্ধে অভিযোগের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে উপরে বর্ণিত কাজগুলো করা যাবে না।

www.amarboi.org

ভীতি প্রদর্শনের অন্যান্য পর্যায়গুলো যেমন, শাসকের কাছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ, অন্যায়কারীর সংশোধন, তাকে হাত দিয়ে মারা ইত্যাদি মোহতাসেবের কাজ, সৎকাজের আদেশকারী এবং মন্দ কাজের প্রতিরোধকারীর নয়। এ বিষয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি। তবে পিতা সন্তানকে, স্বামী স্ত্রীকে এবং মনিব গোলামকে মারা এর ব্যতিক্রম। আরও ব্যতিক্রম হল, সে ব্যক্তিকে মারা যে মানুষের সামনে দিয়ে ব্যভিচার করার জন্য কোন স্ত্রীলোককে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, চোরের চুরির সময় কেউ তাকে পাকড়াও করেছে, কিন্তু চোর পাকড়াওকারী ব্যক্তিকে মারছে, কোন ছিনতাইকারী জোরপূর্বক কারো পোশাক বা জিনিস ছিনিয়ে নিচ্ছে এবং ছিনতাইকৃত ব্যক্তি অন্য লোকের সাহায্য ছাড়া তা প্রতিহত করতে পারছে না কিংবা মার দিতে পারছে না। এমতাবস্থায় জুলুম ও অন্যায় প্রতিহত করার স্বার্থে মারা কাঙ্ক্ষিত বিষয়।

অস্ত্র ও দলবলের সহযোগিতা গ্রহণ

অন্যায় দূর করার জন্য এ পর্যায়টির উল্লেখ করা সমীচিন নয়। নেতা ও শাসকের অনুমতি ছাড়া তা করা জায়েয কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে। এটা বর্তমান যুগে আমাদের সমাজে বিরাট ফেতনা যার পরিণতি অত্যন্ত মারাত্মক। সন্তানের প্রতি পিতা, স্ত্রীর প্রতি স্বামী এবং গোলামের প্রতি মনিব তা ব্যবহার করতে পারে না, তাদের সাথে উপরে বর্ণিত অন্যান্য পদ্ধতিগুলোর প্রয়োগ প্রযোজ্য।

সৎকাজের আদেশকারী এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধকারীর গুণ

উপরে এ জাতীয় কিছু গুণ-বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হয়েছে। এখন আমরা সংক্ষেপে সেগুলো উৎস সহ আলোচনা করবো। সেগুলোর উৎস তিনটি :

১. জ্ঞান

যিনি সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করবেন তিনি সৎকাজ ও অন্যায়ের হুকুম ও দলীল-প্রমাণ সম্পর্কে অবহিত হবেন এবং ঐ সম্পর্কে মতৈক্য ও মতভেদ সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল হবেন। যে ব্যক্তি ইলম-জ্ঞান ছাড়া সৎকাজের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করে, সে সংশোধনের চাইতে কয়েকগুণ ক্ষতি করে।

২. পরহেযগারী

পরহেযগারী মানুষকে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করতে উদ্বুদ্ধ করে। সৎকাজের আদেশ ও অন্যয়ের প্রতিরোধে কোন বাড়াবাড়ি, আত্ম প্রবঞ্চনা, আগ্রাসন ও বিনা কারণে কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে বাঁচায় এবং আল্লাহর সীমানার ভেতর দাঁড়

www.amarboi.org

করায়। তিনি যদি বুঝতে পারেন যে, তা আলেমদের মতবিরোধপূর্ণ বিষয়, তাহলে তিনি অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে যাবেন না। অনুরূপভাবে, কেউ সুন্নত লংঘন করলে কিংবা মাকরূহ কাজ করলে তার পেছনেও লাগা যাবে না। বরং সুন্দর ও নরমভাবে, ভাল ভাষায় এবং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তাকে বুঝাতে হবে। আপনি যাদেরকে লোকদের কষ্ট দিতে, ভ্রুকুঞ্চিত করতে, গালি দিতে, নিন্দা করতে এবং মোস্তাহাব কিংবা বিরোধপূর্ণ বিষয়ে নামাজের কাতারে সংকীর্ণ করতে দেখবেন তারা হল বোকা, মূর্খ, আত্মপ্রবঞ্চিত ও লোকদেরকে দূরে সরানোকারী লোক। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের থেকে পানাহ দিন এবং হেদায়েত দান করুন।

৩. নেক চরিত্র

এটা হল এ বিষয়ের ভিত্তি। খারাপ চরিত্রের লোক উপকারের চাইতে অপকার বেশী করেন। নেক চরিত্র ছাড়া পরহেজগারী ও সূক্ষ্মভাবে আল্লাহর সীমানায় দাঁড় করাতে পারবে না। তার সাথে কামনা-বাসনা এবং ক্রোধ দমনও জরুরী। তা না হয়, সে নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

مَنْ اَمَرَ بِمَعْرُوْفٍ فَلْيَكُنْ اَمْرُهُ بِمَعْرُوْفٍ .

'যে নেক কাজের আদেশ করবে, তার আদেশ যেন নেক হয়।' (বায়হাকী)

সৎকাজের আদেশকারী এবং অন্যায়ের প্রতিরোধকারীর উচিত, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিয়ত পরিশুদ্ধ করা এবং লোকদের থেকে নিজের উপকার লাভের আশা না করা। আল্লাহর উপর ভরসা করে তাদের ক্ষতি দূর করার চেষ্টা চালানো।

ফরজ প্রতিরোধের শর্তাবলী

যে অন্যায়ের প্রতিরোধ ফরজ তার জন্য ৪টি শর্ত আছে।

১ম শর্ত : ছোট গুনাহ হোক বা বড় গুনাহ হোক, শরীয়ত যেটাকে হারাম করেছে, তারই প্রতিরোধ করতে হবে। এটা জরুরী নয় যে, অন্যায়টি কবীরা গুনাহর পর্যায়ের হবে। যেমন, রাস্তায় সতর খোলা, অমুহরাম মহিলার সাথে নির্জনে অবস্থান এবং অমুহরাম স্ত্রীলোকের প্রতি তাকিয়ে থাকা-এগুলো সগীরা গুনাহ হলেও তার প্রতিরোধ করা ফরজ। কেননা, সকল গুনাহই উম্মাহর জন্য ধ্বংসাত্মক, দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহর আজাবের কারণ হবে।

www.amarboi.org

২য় শর্ত : অন্যায়টির অস্তিত্ব বর্তমান থাকা চাই। যেমন, কাউকে মদ পান করতে দেখা, স্ত্রীলোককে উত্তেজিত করা, ইচ্ছাকৃতভাবে ভীড় জমানো, প্রকাশ্যে কাউকে অন্যায়ের ঘোষণা করতে দেখা ইত্যাদি। এমতাবস্থায় প্রতিরোধ করা ফরজ। অর্থাৎ অন্যায় প্রকাশিত হবার অবস্থায় প্রতিরোধ করতে হবে। যে ব্যক্তি অন্যায় করে অবসর হয়েছে, কিন্তু তা আর স্মরণ করছে না, কাউকে অন্যায়ের প্রতি উৎসাহ দেয়ার উদ্দেশ্যে কথা বলছে না, ঘোষণা দিচ্ছে না এবং এ নিয়ে অহংকারও করছে না, তখন তার অন্যায়ের প্রতিরোধ করা যাবে না। হতে পারে সে তওবা করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। যদি সে অন্যায়ের প্রতি উৎসাহিত করে, নিজে তা ঘোষণা করে কিংবা এ নিয়ে গর্ববোধ করে, তখন তা অন্যায় কাজ ছাড়াও অতিরিক্ত আরেকটি অন্যায়। এমতাবস্থায় এ অন্যায়ের প্রতিরোধ করা ফরজ।

৩য় শর্ত : অন্যায়কারীর পেছনে গোয়েন্দাগিরী ছাড়াই তার অন্যায়টি প্রকাশমান হতে হবে। যে ব্যক্তি নিজ প্রভুর অন্যায় করে তাকে নিজ ঘরে লুকিয়ে রেখেছে এবং দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, তার সম্পর্কে গোপন খবর নেয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা, আল্লাহ গোয়েন্দাগিরী করতে নিষেধ করেছেন। এমনকি অন্যায় জানার জন্য বিনা অনুমতিতে তার ঘরে প্রবেশ করাও জায়েয নেই। হ্যাঁ, যদি ঘরের মধ্যেও অন্যায়টি এমনভাবে প্রকাশমান যে, বাইরের যে কোন লোক তা দেখে বুঝতে পারে, তখন তা জানার জন্য ঘরে প্রবেশ করা জায়েয আছে। এর উদাহরণ হল, নেশাখোরদের চিরাচরিত শোরগোল ও উচ্চবাচ্য ইত্যাদি। কেননা, আল্লাহ যা গোপন রেখেছেন, তা আমাদেরকেও গোপন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা সে অন্যায়ের প্রতিরোধ করবো যে আমাদের জন্য তার চেহারা উন্মুক্ত করে দিয়েছে কিংবা যে কোন উপায়ে কিংবা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে আমরা যে অন্যায়টি বুঝতে পেরেছি।

৪র্থ শর্ত : অন্যায়টি গবেষণা ও ইজতিহাদ ব্যতিরেকেই জানা যাবে এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই পরিস্কার বাক্য দ্বারা বুঝা যাবে। কিছু আলেমের দৃষ্টিতে যা অন্যায়, যদি তা অন্য আলেমদের দৃষ্টিতে অন্যায় না হয়, তাহলে, সে অন্যায়ের প্রতিরোধ ফরজ নয়। কেননা, প্রত্যেকেরই উপযুক্ত যুক্তি-প্রমাণ আছে। হ্যাঁ, যদি উপযুক্ত দলীল-প্রমাণ না থাকে, তখন সে অন্যায়ের প্রতিরোধ ফরজ। এটা হচ্ছে, মাওয়ারদী, গাজালী, ইবনুল জাওযী ও ইবনু হাম্বল প্রমুখের মত। এতে অবশ্য ভিন্নমতও রয়েছে।

www.amarboi.org

আল্লামা মাকদেসী বলেছেন, শেখ মহিউদ্দীন নববী বলেছেন, বিরোধপূর্ণ বিষয়ের প্রতিরোধ করা যাবে না। তবে যদি উপদেশের সুরে মতবিরোধ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নরমভাবে অনুরোধ জানায়, সেটা উত্তম। মোহাককেক বলেছেন, এটাই ইমামও নববীর বক্তব্য। সকল মাজহাবের ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাখ্যার বিষয়ে একমত।

আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমিয়া মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে যা বলেছেন, তার সারমর্ম হল, যদি বিরোধপূর্ণ হুকুমটি সুন্নাহ কিংবা পুরাতন ইজমার বিপরীত হয়, তাহলে অন্যায়ের প্রতিরোধ ফরজ। অনুরূপভাবে, এ হুকুমের উপর আমলকারীকেও প্রতিরোধ করতে হবে। যদি উক্ত মাসআলায় হাদীস কিংবা ইজমা না থাকে এবং তাতে ইজতিহাদের সুযোগ থাকে, তাহলে অন্যায় বিরোধী মাজহাব ও রায়ের প্রতিরোধ করা যাবে না। বিরোধিতাকারী ব্যক্তি অনুসারীই হোক কিংবা মুজতাহিদই হোক, তাতে কোন পার্থক্য হবে না। তারপর তিনি বলেন, যে মাসআলায় দলীল-প্রমাণ আছে, কোন বিরোধিতাকারী নেই এবং যা ইজতিহাদেরও মাসআলা নয়। তার বিরোধিতাকারীর প্রতিরোধ তো করতেই হবে। ইজতিহাদ তাতে করতে হয়, যাতে প্রকাশ্য দলীল-প্রমাণ নেই, বিরোধিতাকারীও নেই এবং নেই অন্য কোন সম্ভাবনা।

অন্যায়ের প্রতিরোধে ওলামায়ে কেরামের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা

বর্ণিত আছে, একবার হযরত মুয়াবিয়া (রা) বেতন বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তখন আবু মোসলেম খাওলানী তাঁকে উদ্দেশ্য করে মসজিদে দাঁড়িয়ে বলেন, 'হে মুয়াবিয়া! এটা তোমার কিংবা তোমার বাপ-মায়ের সম্পদ নয়। মুয়াবিয়া (রা) ক্রোধান্বিত হন। তিনি মিম্বার থেকে নেমে পড়েন এবং বলেন, আপনারা অপেক্ষা করুন। তিনি তাদের কাছ থেকে কিছু সময় অনুপস্থিত থাকেন। গোসল শেষে তারপর আবার তাদের কাছে ফিরে আসেন। তিনি বলেন, আবু মোসলেম আমাকে এমন ভাষায় কথা বলেছে, তাতে আমি ভীষণ রেগে গেছি। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি :

اَلْغَضَبُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالشَّيْطَانُ مِنَ النَّارِ وَاِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَغْتَسِلْ.

'রাগ শয়তানের সৃষ্ট। শয়তান আগুনের সৃষ্ট। পানি দিয়ে আগুন নিভাতে হয়। তোমাদের কেউ রাগ করলে সে যেন গোসল করে।' (আবু দাউদ)

www.amarboi.org

আমি গোসল করে এসেছি। আবু মোসলেম সত্য বলেছে, এ সম্পদ আমার বা আমার বাপের পোদ্দারী নয়। আপনারা আসুন এবং বেতন নিয়ে যান।'

আল্লামা ইরাকী বলেছেন, এঘটনার কিছু বর্ণনাকারীকে আমি চিনি না। ঘটনাটি আবু নাঈমের 'হুলিয়া' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

আসমায়ী' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আ'তা বিন আবি রেবাহ উমাইয়া খলীফা আবুদল মালেক বিন মারওয়ানের দরবারে প্রবেশ করলেন। আবদুল মালেক খাটের উপর বসা ছিলেন। তার চারপাশে ছিলেন গণ্যমান্য লোকেরা। তিনি তার খেলাফত আমলে যখন মক্কায় হজ্জ করতে আসেন সেটা তখনকার ঘটনা। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁকে নিজের খাটে বসালেন। আবদুল মালেক তার সামনে বসলেন। আবদুল মালেক জিজ্ঞেস করেন, হে আবু মোহাম্মদ! (আতা বিন আবি রেবাহ) আপনার কি প্রয়োজন? তিনি বলেন, হে আমীরুল মুমেনীন! আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হারাম শরীফে আল্লাহকে ভয় করুন এবং এ হারামের আবাদ করুন। মোহাজির ও আনসারদের সন্তানের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। আপনি এ মজলিশে তাদেরকে নিয়েই বসেছেন। দুর্গের রক্ষীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। তারা মুসলমানদের অপ্রতিরোধ্য ঘাঁটি। আপনি মুসলমানদের খোঁজ-খবর নিন। কেননা, আপনি একাই তাদের বিষয়ে দায়িত্বশীল। আপনাকে তাদের জবাবদিহি করতে হবে। যারা আপনার দরজায় আছে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে দরজা বন্ধ করবেন না। খলীফা উত্তর দেন, ঠিক আছে, আমি এগুলো করবো। তারপর তিনি উঠে দাঁড়ান। আবদুল মালেক তাঁকে ধরেন এবং বলেন, হে আবু মোহাম্মদ! এতক্ষণ তো আপনি অন্যের জন্য বললেন। আমরা তা বাস্তবায়নের ফয়সালা করেছি। কিন্তু আপনার প্রয়োজন কি? তিনি উত্তরে বলেন, সৃষ্টের কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই। তারপর তিনি বেরিয়ে পড়েন, আবদুল মালেক বলেন, তোমার পিতার শপথ! এটাই সম্মান।

একবার ইবনু আবু শোমাইলা খলিফা আবুদল মালেক বিন মারওয়ানের দরবারে প্রবেশ করেন। খলীফা বলেন, আপনার কথা বলুন। তিনি খলীফার উদ্দেশ্যে বলেন, মানুষ কিয়ামতের দিন কিয়ামতের তিক্ততা ও কঠোরতা এবং মন্দ ফলাফল থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবে না। শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি রক্ষা পাবে যে আল্লাহর অসন্তোষ থেকে বেরিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করেছে। আবদুল মালেক কেঁদে দেন এবং বলেন, 'আমি যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন এ কথাগুলোকে আমি আমার জীবনের লক্ষ্য হিসেবে স্মরণ করবো।'

www.amarboi.org

সুফিয়ান সাওরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিনায় আমাকে খলীফা আবু জা'ফর মনসুরের দরবারে প্রবেশ করানো হল। খলীফা বলেন, আপনার প্রয়োজন তুলে ধরুন। আমি বললাম, 'আল্লাহকে ভয়-করুন, অন্যায়-জুলুমে জমীন ভরে গেছে।' খলীফা মাথা নীচু করেন। এবার মাথা উঁচু করে বলেন, 'আপনার প্রয়োজন তুলে ধরুন।' আমি বললাম, আপনি আনসার ও মোহাজিরদের তলোয়ারের বদৌলতে আজ এ মর্যাদা লাভ করেছেন। অথচ, আজ তাদের সন্তানেরা অনাহারে মারা যাচ্ছে। আল্লাহকে ভয় করুন এবং তাদের অধিকার দিয়ে দিন। তিনি মাথা নীচু করেন। পুনরায় মাথা উঁচু করে বলেন, আপনার প্রয়োজন তুলে ধরুন। আমি বললাম, ওমার বিন খাত্তাব (রা) হজ্জ করেছেন। তিনি কোষাধ্যক্ষকে জিজ্ঞেস করেন, কত খরচ করেছ? কোষাধ্যক্ষ জবাবে বলেন, ১১-১৯ দিরহাম। অথচ আজ আমি এখানে এত সম্পদ দেখছি যে, উটের পক্ষেও তা বহন করা সম্ভব নয়।' একথা বলে তিনি বেরিয়ে যান।

একবার ওমার বিন আবদুল আযীয খলীফা সোলাইমান বিন আবদুল মালেকের সাথে দাঁড়ানো ছিলেন। সোলাইমান বজ্রপাতের আওয়াজ শুনে ভয় পেয়ে যান এবং সওয়ারীর পিঠে আসনের সাথে বুক লাগিয়ে নীচু হয়ে যান। ওমার বিন আবদুল আযীয বলেন, এটা তো তাঁর রহমতের আওয়াজ। তাঁর গযবের আওয়াজ শুনলে আপনার অবস্থা কি হবে? সোলায়মান লোকদের দিকে তাকান এবং বলেন, এত লোক কেন? ওমার বিন আবুদল আযীয বলেন, তারা আপনার প্রতিপক্ষ। সোলায়মান বলেন, আল্লাহ তোমাকে তাদের পরীক্ষায় ফেলুক।

আল্লাহ খলীফা ওমার বিন আবদুল আযীযকে মুসলমানদের আমীর বানিয়ে সত্যিই পরীক্ষা করেন। তিনি কতই না উত্তম আমীর এবং খলীফা ছিলেন।

অন্যায়ের প্রতিরোধে ওলামায়ে কেরামের নম্রতা ও বিজ্ঞতা

আব্বাসী খলীফা মামুন কঠোর ভাষায় ওয়াজকারী এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেন, হে পুরুষ! নরম ভাষায় কথা বল। আল্লাহ তোমার চাইতে উত্তম এক ব্যক্তিকে আমার চাইতে অধিকতর এক মন্দ ব্যক্তির কাছে পাঠান এবং তাঁকে নরম ভাষায় কথা বলার আদেশ দিয়ে বলেন,

فَقُوْلاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى.

'তোমরা উভয়ে (মূসা ও হারুন) ফেরাউনের কাছে নরমভাবে কথা বল। হতে পারে সে শিক্ষা গ্রহণ কিংবা ভয় করবে।' (সূরা তোহা : ৪৪)

www.amarboi.org

আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। এক যুবক নবী করীম (সা)-এর কাছে এসে যেনার অনুমতি চাইল। লোকেরা তার বিরুদ্ধে শোরগোল করে উঠল। নবী (সা) বলেন, তাকে আমার কাছে আসতে দাও।' সে কাছে আসল এবং নবী (সা)-এর সামনে বসল। নবী (সা) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি তা তোমার মায়ের জন্য পছন্দ করবে? সে বলল, 'না, আল্লাহ্ আমাকে আপনার প্রতি উৎসর্গকারী বানাক।' তিনি বলেন, অনুরূপ লোকেরাও নিজেদের মায়ের জন্য তা পছন্দ করবে না। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি তা তোমার মেয়ের জন্য পছন্দ করবে? সে বলল, 'না'। আল্লাহ্ আমাকে আপনার উপর উৎসর্গকারী বানাক। তিনি বলেন, অনুরূপ লোকেরাও তা নিজেদের মেয়েদের জন্য পছন্দ করবে না। তিনি আরও জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি তা তোমার বোনের জন্য পছন্দ করবে? ইবনে আওফ ফুফু এবং খালার সম্পর্কেও একই প্রশ্নের উল্লেখ করেছেন। সে প্রত্যেক বার 'না' বলেছে এবং 'আল্লাহ্ আমাকে আপনার প্রতি উৎসর্গকারী বানাক।' এ দো'আ করেছে। আর নবী (সা)ও বলেছেন, অনুরূপ লোকেরাও তা পছন্দ করবে না। তারপর উভয় বর্ণনাকারী (আবু উমামা ও ইবনু আওফ) বলেন, নবী (সা) তার বুকের মধ্যে নিজ হাত মোবারক রাখেন এবং এ দো'আ করেন,

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبَهُ وَاغْفِرْ ذَنْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ.

'হে আল্লাহ্! আপনি তার অন্তরকে পবিত্র করুন, গুনাহ মাফ করুন এবং তার লজ্জাস্থানকে হেফাজত ও সুরক্ষিত করুন।' তারপর তার অন্তরে যেনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট জিনিস অন্য কিছু ছিল না।' (আহমদ; ইরাকী বলেছেন এর সনদ ভাল এবং বর্ণনাকারীরা বিশুদ্ধ।' অবৈধ যৌন উত্তেজনা কমানোর জন্য যে কেউ এখনও এ দো'আ পড়তে পারে।)

ফোদাইল বিন আয়াদ (রা)কে বলা হল, সুফিয়ান বিন ওয়াইনাহ বাদশাহর পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। তখন ফোদাইল বলেন, তিনি যা গ্রহণ করেছেন তা তাঁর অধিকার অপেক্ষা কম। তারপর তিনি তার সাথে একাকী কথা বলেন এবং তাকে তিরস্কার করেন। এরপর সুফিয়ান বলেন,' হে আবু আলী! আমরা যদিও নেক লোক নই, তথাপি, নেক লোকদেরকে ভালবাসি।'

হাম্মাদ বিন সালামাহ্ বলেন, সেলা বিন ওসাইমের কাছ দিয়ে এক ব্যক্তি ইজার চেঁচিয়ে যাচ্ছিল। তার সাথীরা লোকটিকে কঠোরভাবে সমালোচনা করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, ছাড়, আমি একাই যথেষ্ট। তারপর তিনি বলেন, হে ভাতিজা! তোমার কাছে আমার একটা প্রয়োজন আছে। লোকটি বলল, হে চাচা!

www.amarboi.org

আপনার কি প্রয়োজন? সেলা বলেন, আমার ইচ্ছা যে তুমি তোমার ইজারটি উপরে তুলে পরবে। সে সম্মানসূচক 'হাঁ' বলে ইজার উপরে তুলে পরল। সেলা নিজ সাথীদেরকে বলেন, তোমরা তাকে গালমন্দ করলে সে 'না' বলত এবং সম্মানতো দূরে থাক, উল্টো তোমাদেরকে গালি দিত।

মোহাম্মদ বিন যাকারিয়া গালাবী বলেছেন, আমি এক রাত আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ বিন আয়েশাকে দেখলাম। তিনি মাগরেবের নামাজ শেষে মসজিদ থেকে ঘরের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন। তিনি রাস্তায় কোরাইশ বংশের এক বালককে মাতাল অবস্থায় দেখতে পেলেন। সে এক মহিলাকে ধরে টানা-হেঁচড়া করছে। মহিলাটি চীৎকার দিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করছিল। লোকেরা বালকটিকে মার দিচ্ছিল। ইবনু আয়েশা তাকে দেখে চিনতে পারলেন। তিনি লোকদেরকে বলেন, তোমরা আমার ভাতিজাকে ছেড়ে দাও। তারপর তিনি বলেন, হে ভাতিজা! এদিকে আস। বালকটি লজ্জা পেল। সে তাঁর কাছে গেল। তিনি তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বলেন আমার সাথে চল। বালকটি তার সাথে বাড়ী পর্যন্ত গেল, তিনি তাকে ঘরে ঢুকিয়ে অন্য একটি বালককে বললেন, সে তোমার কাছে রাতে থাকবে। তার জ্ঞান ফিরে আসলে যা ঘটেছে তাকে তা বলবে এবং আমার সাথে সাক্ষাত ব্যতীত তাকে যেতে দেবে না। তার জ্ঞান ফিরে আসলে অন্য বালকটি তাকে ঘটনাটি বলল। সে লজ্জা পেল, কাঁদল এবং চলে যেতে চাইল। অন্য বালকটি বলল, তোমাকে আমার চাচার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে আদেশ করা হয়েছে। সে ইবনু আয়েশার কাছে প্রবেশ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি লজ্জাবোধ করছ না? তোমার বংশ মর্যাদার জন্য কি লজ্জা হয় না? তুমি জাননা, তোমার পিতা কে? আল্লাহকে ভয় কর এবং তুমি যার মধ্যে আছ, তা থেকে দূরে থাক। বালকটি মাথা নত করে থাকল। পরে মাথা উপরে তুলে বলল, আমি আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, তিনি আমাকে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করবেন, আমি আর কখনও মদ পান করবো না। আমি আল্লাহর কাছে তওবা করছি। তিনি তার মাথায় চুমু দেন আর বলেন, হে বালক! তুমি খুব ভাল কাজ করেছ। বালকটি পরে ঐ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিল এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীস লিখত। এটা নম্রতার কারণেই হয়েছে।

www.amarboi.org

বিশেষ ভ্রাতৃত্ব

আমরা ইতিপূর্বে মুসলিম ভাইয়ের সাধারণ অধিকার দলীল-প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মুসলমান হিসেবে আরেক মুসলমানের উপর কি কি অধিকার ফরজ, সে বিষয়েই আলোচনা হয়েছে। তাছাড়াও আমরা মুসলমানের সাথে কিংবা অমুসলমানের সাথে সম্পর্কের কারণে সাধারণ অধিকারের অতিরিক্ত অধিকার সম্পর্কেও আলোচনা করেছি।

এখন আমরা মুসলমান মুসলমানের ভাই হিসেবে বিশেষ সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা করবো। যদি এক মুসলমানের সাথে অন্য মুসলমানের আল্লাহর ভালবাসা এবং তাঁর রাস্তায়ও সন্তুষ্টির লক্ষ্যে মিত্রতা থাকে, এমনকি আল্লাহর পথের সুনির্দিষ্ট কোন বিশেষ লক্ষ্য নাও থাকে, তবুও তাদের মধ্যে ঐ বিশেষ অধিকার অব্যাহত থাকবে। আমরা বইয়ের শুরুতে একে আল্লাহর পথে সাহচর্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছি। আল্লাহর পথের দু'জন সঙ্গী, আল্লাহর পথের দু'ভাই, দু'বোন, দু'স্ত্রী অথবা পিতা-পুত্র কিংবা মা, ছেলে ও মেয়ে। একে অপরকে ভালবাসার কারণ সৌন্দর্য, স্বার্থ, দয়া, নম্রতা, সাহায্য-সহানুভূতি ও অর্থ দান নয়, বরং আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালবেসেছে। অর্থাৎ উভয়েই উভয়কে ভালবেসেছে। কেননা, অন্যজন ও মোমেন যিনি আল্লাহকে সন্তুষ্ট এবং নিজ গুণাহকে ভয় করেন, যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)কে ভালবাসেন, তাঁর আনুগত্য করেন, বেদআত করেন না এবং আল্লাহর দ্বীনের প্রতি পূর্ণ অনুগত।

আপনি হয়তো আপনার কোন দ্বীনি ভাইকে ভালবাসেন, কিন্তু তাকে সাহচর্য দেন না। হয় সে আপনার থেকে দূরে কিংবা যে কোন কারণেই হোক, তাকে সাহচর্য দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। হতে পারে তার চরিত্র আপনার চরিত্রের সাথে পূর্ণ খাপ খায় না।

অনুরূপভাবে অভ্যাসের কিংবা প্রকৃতিগত পার্থক্য এবং শরীয়তের হস্তক্ষেপ নেই এমন প্রথা অবলম্বন করার মিল না হওয়ার কারণে সাহচর্য গড়ে উঠেনি। আপনি যত লোককে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসবেন তত লোককে সাথী বানানো সম্ভব নয়।

আপনি যদি কখনো কোন দ্বীনি ভাইকে ভালবাসেন এবং তার অনুভূতি, মনোভাব, দুঃখ-কষ্ট ও আশায়-প্রত্যাশায় অংশ গ্রহণ করেন এবং যদি প্রকৃতি ও চরিত্রের মিল পাওয়া যায় তাহলে সে ভালবাসা আল্লাহর পথের সাহচর্য উদ্ভূত। আপনাদের প্রত্যেকেই অপর সাথীর সাথে সাক্ষাত ও বসার ব্যাপারে আগ্রহী হবেন,

www.amarboi.org

দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদে কষ্ট ছাড়া ধৈর্য ধরা যাবে না। আপনাদের প্রত্যেকেই ঈমান বৃদ্ধি, মনের প্রশান্তি এবং যখনই সাক্ষাত হবে তখনই আল্লাহর উদ্দেশ্যে অধিকতর আগ্রহ সহকারে অভ্যর্থনা জানাবেন। এ জাতীয় আগ্রহ ততই বাড়বে, যত বাড়বে ইসলামী চরিত্রের মিল, খোদায়ী স্পিরিট, আল্লাহর কাজে উত্তম অগ্রসরতা, তাঁর প্রতি প্রচণ্ড ভয়, রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নতের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ, এর উপর আ'মল করা, আল্লাহর দ্বীনের অভিমান এবং দ্বীনের প্রতিরক্ষায় সত্যবাদিতা।

যখনই এগুলোতে মিল কম হবে, সাহচর্য ও ভালবাসাও কমতে থাকবে। আল্লাহ সাহাবায়ে কেরামের অন্তরকে ঈমানের আলোতে আলোকিত করেছিলেন, রূহানী ঔজ্জ্বল্য দান করেছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি নজীরবিহীন ভালবাসা দিয়েছিলেন। ফলে, তাদের মধ্যে অপূর্ব স্নেহ-ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :

وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

'আল্লাহ তাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। আপনি যদি জমীনে যা সম্পদ আছে, সব কিছুও খরচ করতেন তথাপি তাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ। (সূরা আনফাল : ৬৩)

আল্লাহর নিম্নোক্ত কথার প্রতি দৃষ্টি দানকারী ব্যক্তি বুঝতে পারবেন যে, আল্লাহ প্রথমে মনে ভালবাসা সৃষ্টির কথা এবং পরে এর উপর ভ্রাতৃত্বের কথা বলেছেন।

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا ـ

'তোমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা শত্রু ছিলে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে দিলেন, তোমরা তাঁর নেয়ামতের ফলে ভাই হয়ে গেলে।' (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

এ আয়াতে আল্লাহ ভালবাসা সৃষ্টিকে নিজের কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি ভ্রাতৃত্বের ব্যাপারে একথা বলেননি। এর দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সত্য, একনিষ্ঠা এবং আল্লাহর ভালবাসার উপর নির্ভরশীল ভালবাসার অনিবার্য ফসল

www.amarboi.org

হল ভ্রাতৃত্ব। একথা বলতে পারা যায় যে, মুসলমানের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টির কারণ হল সত্য ঈমান, এখলাস এবং প্রবৃত্তি ও নফসের খাহেশের দাসত্ব থেকে দূরে থাকা। অনুরূপভাবে, যে কোন শত্রুতার পেছনে, নফসের খাহেশ এবং ঈমানী দুর্বলতাই প্রধান কারণ, যতক্ষণ না শত্রুতা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর উদ্দেশ্যে শরীয়ত সম্মত হয়।

উভয়ের মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য, তাঁর কিতাব ও রাসূলুল্লাহর সুন্নত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মন-মানসিকতা সহকারে যতবেশী অনুসৃত হবে, ততবেশী আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা বাড়বে। যদি ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব না বাড়ে তাহলে, আল্লাহর সাথে উভয়ের বাহ্যিক অবস্থার সত্যতা যথেষ্ট নয়। বরং উভয়ের কিংবা একজনের অন্তরে রোগ-ব্যাধি আছে।

তাই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اَلْمُؤْمِنُ اِلْفٌ مَأْلُوْفٌ وَلاَ خَيْرَ فِيْمَنْ لاَ يَأْلَفُ وَلاَ يُؤْلَفُ.

'মোমেন হচ্ছে ভালবাসার পাত্র। সে ব্যক্তির মধ্যে কল্যাণ নেই, যে ভালবাসে না বা অন্যের ভালবাসা পায় না।' (আহমাদ, তাবরানী, হাকেম)

এটা মোমেনের সূক্ষ্ম গুণ। যদি মোমেন ব্যক্তি অন্যান্য খাঁটি মোমেনদেরকে ভালবাসেন এবং তারাও তাকে ভালবাসেন, তাহলে সেই হল সত্যিকার ঈমানদার যার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তা না হলে, তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রত্যেক মোমেনের উচিত, নিজের নফসের দিকে তাকানো।

যেহেতু আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাহচর্য নির্ভর করে আল্লাহর রাস্তায় তাঁর সন্তোষের জন্য ভালবাসার উপর। আর সাহচর্য হল ইসলামের শক্তি এবং আল্লাহর আনুগত্যের উপর ভিত্তিশীল ও তাঁর দ্বীনের প্রকাশ। তাই আল্লাহ পরস্পর ভালবাসাকারী বন্ধুদের মর্যাদা সিদ্দিকের মর্যাদার নিকটবর্তী করেছেন। ঐ মর্যাদা কতইনা উত্তম।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلاَلِى؟ اَلْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لاَظِلَّ اِلاَّظِلِّىْ-

www.amarboi.org

'আল্লাহ হাশরের দিন বলবেন; আজ আমার মর্যাদার উদ্দেশ্যে ভালবাসাকারীরা কোথায়? যেদিন আমার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। আমি আজ তাদেরকে ছায়া দান করবো।' (মুসলিম)

ওবায়দা বিন সামেত থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে নিজ রব থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি :

حَقَّتْ مُحَبَّتِى لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ وَحَقَّتْ مُحَبَّتِى لِلْمُتَوَاصِلِيْنَ فِىْ وَحَقَّتْ مَحَبَّتِىْ لِلْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ وَحَقَّتْ مَحَبَّتِىْ لِلْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ.

'আমার ভালবাসা পরস্পর ভালবাসাকারীদের জন্য সুনিশ্চিত হয়েছে। আমার ভালবাসা আমার উদ্দেশ্যে যোগাযোগকারীদের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার ভালবাসা আমার উদ্দেশ্যে সাক্ষাতকারীদের জন্য অবধারিত হয়েছে এবং আমার ভালবাসা আমার উদ্দেশ্যে ব্যয়কারীদের জন্য অবধারিত হয়েছে।' (মোনজেরী বলেন, ইমাম আহমদ সহীহ সনদ সহকারে তা বর্ণনা করেছেন)

মুআ'জ বিন জাবাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি :

اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِىْ جَلاَلِىْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِّنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ-

'আমার মর্যাদার উদ্দেশ্যে ভালবাসাকারীদের জন্য নূরের মিম্বর রয়েছে। সে কারণে নবী এবং শহীদরাও ঈর্ষা পোষণ করবেন।' (তিরমিযী-হাদীস হাসান সহীহ)

আবু মালেক আশআ'রী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : হে লোকেরা! তোমরা শোন ও বুঝার চেষ্টা কর। জেনে রাখ, আল্লাহর কিছু বান্দাহ আছেন, যারা নবী ও শহীদ নন। কিন্তু নবী ও শহীদরা আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা ও নৈকট্য দেখে তা লাভের জন্য ঈর্ষান্বিত হবেন। এক প্রান্ত থেকে একজন বেদুইন লোকদেরকে হাতে সরিয়ে সামনে এসে নবী করিমকে (সা) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! নবীও নন, শহীদও নন। অথচ নবী ও শহীদগণ আল্লাহর কাছে তাদের নৈকট্য ও মজলিশ দেখে ঈর্ষান্বিত হবেন? আপনি আমাদেরকে তাদের বর্ণনা দিন। বেদুইনের কথায় নবী করিম (সা)-এর চেহারা মোবারকে হাসি ফুটে

www.amarboi.org

উঠল। তিনি বলেন, তারা অপরিচিত লোক, কিন্তু দ্বীনদার। তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরস্পরকে পরিচ্ছন্নভাবে ভালবেসেছে। আল্লাহ তাদেরকে কেয়ামতের দিন নূরের তৈরী মিম্বার দেবেন। তারা তাতে বসবেন। তাদের চেহারা আলোকোজ্জ্বল হবে ও কাপড় আলোকিত হবে। লোকেরা ঐ দিন ভীত সন্ত্রস্ত হলেও তারা ভীত সন্ত্রস্ত হবেন না। তারা হবেন আল্লাহর অলী, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা পেরেশানও হবেন না।' (আহমদ, আবু ইয়া'লী-সনদ ভাল; হাকেম-সনদ সহীহ)

হযরত আলী (রা) বলেছেন : 'তোমাদের ভাইদের দায়িত্ব পালন কর। তারা দুনিয়া ও আখেরাতের সম্বল। তুমি কি দোজখীদের কথা শুনবে না? তারা বলবে:

فَمَا لَنَا شَافِعِيْنَ وَلاَ صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ .

'আমাদের কোন সুপারিশকারী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুও নেই।'

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেন, যদি কোন বান্দাহ মসজিদে হারামের হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝে ৭০ বছর ইবাদত করে, তথাপি আল্লাহ তাকে, সে যাদেরকে ভালবেসেছে তাদের সাথে হাশর করাবেন। যদি সে মন্দ লোকদেরকে ভালবেসে থাকে, তাদের সাথেই তার হাশর হবে। আর যদি নেক লোকদেরকে ভালবেসে থাকে, তাহলে তাদের সাথেই তার হাশর হবে।

ইবনুস সাম্মাক মৃত্যুর সময় বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! আমি যখন পাপ করেছি তখন আপনি তা জানতেন। কিন্তু যারা আপনার আনুগত্য ও ইবাদত করত আমি তাদেরকে ভালবাসতাম।'

ওলামায়ে কেরাম বন্ধুর কিছু শর্ত উল্লেখ করেছেন। বন্ধু বুদ্ধিমান, নেক চরিত্রবান হতে হবে এবং অন্যায়কারী ও ফাসেক নয়। বেদআ'তী নয় এবং দুনিয়ার প্রতি লোভী নয়। সত্য কথা বা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসে ও বন্ধু বানায়। তার জন্য এসব শর্তের প্রয়োজন নেই। কেননা, সে যদি খারাপ লোককে ভাই-বন্ধু বানায় তাহলে সে ভ্রাতৃত্ব আল্লাহর উদ্দেশ্যে হবে না। কেননা, তারা আল্লাহ থেকে দূরে অবস্থান করে। তাহলে, কেমন করে সে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভাই বানায়?

বিশেষ ভ্রাতৃত্বের অধিকার

বিশেষ ভ্রাতৃত্ব বলতে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে যে ভ্রাতৃত্বকে বুঝায় তার বিশেষ কিছু অধিকার আছে। শর্ত হল, ঐ ভ্রাতৃত্ব এবং তার লক্ষ্য অর্জিত

www.amarboi.org

হওয়া। যদি না হয়, তাহলে ঐ ভ্রাতৃত্ব অর্থহীন। এর কোন ভাল প্রভাব বা ফলাফল নেই। ওলামায়ে কেরামের মতে, ভ্রাতৃত্ব হচ্ছে, দুই ব্যক্তির মধ্যে বন্ধন যেন রশি দ্বারা গিট দেয়া হয়েছে। যদি উভয়ে চুক্তি ও অঙ্গীকারবদ্ধ হয়, তাহলে ভ্রাতৃত্ব হবে একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি। এখন আমরা বিশেষ অধিকারগুলো আলোচনা করবো।

১. অর্থের অধিকার

যদি দুই ভাইয়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের চুক্তি হয় এবং উভয়ে উভয়ের সম্পদের প্রতি আগ্রহী হয় কিংবা একে অপরকে বিদেশীর মত আচরণ করে। যেমন, খাওয়ানোর মোকাবিলায় খাওয়ানো এবং উপহারের বিনিময়ে উপহার দেয়, তাহলে দুই ভাইয়ের মধ্যে এ আচরণ খুবই খারাপ এবং তা হল, ব্যবসায়ী আচরণ। আপনি জানেন, যখন মহানবী (সা) মোহাজের ও আনসারের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন, তখন ঐ ভ্রাতৃত্বের কারণে মোহাজির আনসারীর ওয়ারিশ হন এবং হুকুম রহিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।

যখন রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুর রহমান বিন আ'ওফ এবং সা'দ বিন রবী'র মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করে দেন। আবদুর রহমান বিন আ'ওফ তাকে নিজ সম্পদ ও স্ত্রী উৎসর্গ করে বলেছিলেন, আল্লাহ্ আপনাকে এ সম্পদ ও স্ত্রীর মধ্যে বরকত দিন। সা'দ বিন রবী আবদুর রহমান বিন আ'ওফকে বলেছিলেন : আপনি আমার অর্ধেক মাল নিন। আমার দুই স্ত্রী আছে। আপনি তাদের একজনকে নির্ধারণ করুন। আমি তাকে তালাক দিয়ে দেবো। আপনি বিয়ে করবেন।

যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য করতে চায়। নিম্নতম পর্যায় হল, যদি সে অভাবী হয়, তাহলে নিজ সন্তানের প্রয়োজন পূরণের মত সাহায্য করে তা ফেরত না চাওয়া। আর উচ্চতর পর্যায় হল সাহাবায়ে কেরামের মত নিজের নফসের উপর তাদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়া। তাদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি নাজিল হয়েছে।

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.

'তারা নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও নিজেদের উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয়।' (সূরা হাশর : ৯)

যে ব্যক্তি অন্য ভাইদের প্রতি বদান্যতা করে না এবং সন্তুষ্টচিত্তে দান করে না কিংবা সওয়াবের আশা করে না, সে ব্যক্তি আমাদের আলোচ্য দ্বীনি ভাই হিসেবে

www.amarboi.org

বিবেচিত হতে পারে না। যে ভাই আপনার ঘরে ঢুকে অকৃত্রিমভাবে যা ইচ্ছা তা চাওয়ার সাহস করতে পারে, সে ভাইয়ের ঘরে ঢুকে যদি আপনি তাকে কৃপণ, কৃত্রিম এবং আপনার আচরণে বিরক্ত ও কৃতিমতা বোধ করতে দেখেন, তাহলে তিনি বলেন, ভ্রাতৃত্বের হাতিয়ারের আবরণে দুনিয়াদার, আপনার দ্বীনি ভাই নয়। আপনি তাকে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বিষয়ে আবদুল্লাহ বিন ওমারের বক্তব্যের সাথে তুলনা করুন। তিনি বলেছেন, এক সাহাবীর কাছে একটি ভেড়ার মাথা উপহার পাঠানো হল, তিনি বলেন, আমার অমুক ভাইয়ের এটার প্রয়োজন আমার চাইতে বেশী। তিনি তা তার কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি আবার অন্য আরেকজনের কাছে পাঠান। এভাবে একজন আরেকজনের কাছে পাঠাতে থাকলেন। ৭ ব্যক্তির হাতে যাওয়ার পর তা আবার ১ম ব্যক্তির কাছে ফেরত আসল।

বর্ণিত আছে, মাসরুকের উপর বড় অংকের ঋণ ছিল। তার ভাই খায়সামারও ঋণ ছিল। মাসরুক খায়সামার ঋণ পরিশোধ করে দেন। খায়সামা তা জানে না। এদিকে, খায়সামাও মাসরুকের ঋণ পরিশোধ করে দেন। মাসরুক তা জানে না। আবু সোলায়মান দারানী বলেন, যদি গোটা দুনিয়া আমার হত এবং আমি তা আমার ভাইয়ের মুখে তুলে দিতে পারতাম, তবুও আমি সেটাকে কম মনে করতাম।

আল্লাহ ইতিপূর্বে উল্লেখিত বন্ধুর খাবার বিনা অনুমতিতে অন্য বন্ধুর জন্য জায়েয করেছেন। আল্লাহ বলেন :

اَوْ مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْصَدِيْقِكُمْ -

'তোমরা যে ঘরের চাবির মালিক কিংবা তোমাদের বন্ধুর ঘর।' (সূরা নূর : ৬১)

আলী বিন হোসাইন এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন। তোমরা কি কখনও তোমার বন্ধুর পকেটে কিংবা থলের মধ্যে যা ইচ্ছা তা গ্রহণের জন্য হাত ঢুকিয়েছ? তিনি বলেন, 'না'। আলী বলেন, 'তাহলে তোমরা ভাই নও।'

২. জান দিয়ে সাহায্য করা

অন্য ভাইয়ের প্রয়োজনের কথা জানতে পারা মাত্রই তার খেদমতের জন্য নিজের নফসকে পেশ করে দেয়া। এর কতগুলো পর্যায় আছে। নিম্নতম পর্যায় হল : অপর ভাই সাহায্য চাওয়া মাত্রই হাসি-খুশী ও প্রশস্ততা সহকারে সাহায্য করা। মধ্যম পর্যায় হল : তার প্রয়োজনকে নিজ প্রয়োজনের মত ভাবা, তার অবস্থা

www.amarboi.org

জানা যেমন করে নিজের অবস্থা জানার চেষ্টা করা হয় এবং চাওয়া ব্যতীতই নিজ পরিবার-পরিজনের অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সর্বোচ্চ পর্যায় হল : নিজের নফস এবং পরিবারের প্রয়োজনের উপর ঐ ভাইয়ের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়া। জান দিয়ে যেমন কোরবানী হয়, তেমনি মাল দিয়েও হয়।

কেউ বলেছেন, তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে প্রয়োজন পূরণের আহ্বান জানানোর পর যদি সে প্রয়োজন পূরণ না করে, তাকে দ্বিতীয় বার স্মরণ করিয়ে দাও। হতে পারে সে ভুলে গেছে। যদি সে এবারও পূরণ না করে, তাহলে তার উপর তাকবীর পাঠ কর।

ইবনে শুবারমাহ এক ভাইয়ের বড় ধরনের প্রয়োজন পূরণ করেন। সে তাঁর জন্য উপহার নিয়ে আসল। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এটা কি? তিনি জবাবে বলেন, আপনি আমার যে উপকার করেছেন, সে জন্য। তিনি বলেন, তুমি তোমার অর্থ নিয়ে যাও, আল্লাহ তোমাকে সুস্থ করুন। তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে কোন কিছু চাইলে সে যদি তা না দেয়, তাহলে নামাজের অজু কর এবং তাকে মৃত মনে করে তার উপর চারবার তাকবীর পাঠ কর।

অতীতের বুজুর্গদের মধ্যে এমন লোকও আছেন, যে তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুর পর ৪০ বছর তার পরিবার ও সন্তানের খোঁজ-খবর নিয়েছেন। তাদের প্রয়োজন পূরণ করেছেন। প্রতিদিন তাদের বাড়ী যেতেন। নিজ সম্পদ থেকে তাদেরকে সাহায্য করতেন। যেন তারা তাদের পিতাকে হারায়নি।

৩. জিহ্বার অধিকার

ভাইয়ের গোপন বিষয় প্রকাশ করবে না। তার দোষ-ত্রুটি প্রচার করবে না। তার ও সন্তানের জন্য ভাল শব্দ-বাক্য উচ্চারণ করবে। তাদেরকে কথা দিয়ে সন্তুষ্ট রাখবে। তাদের বিরুদ্ধে কেউ গীবত করলে তা রোধ করবে। তাদের ত্রুটি ঢেকে রাখবে। তাদের পাদস্খলন ক্ষমা করবে ও বন্ধু কিংবা দুশমনের সামনে তা আলোচনা করবে না। তার আত্মীয়, পরিবার, সন্তান ও বন্ধু-বান্ধবের বদনাম করবে না। তার কাছে তার বিরুদ্ধে কারো মন্দ কথা পৌঁছাবে না। যদি মন্দ কথাটি সত্য হয়, তাহলে তাকে জানানো ছাড়াই উপদেশ দেবে এবং প্রয়োজন হলে জানাবে। সে আপনার অধিকারে ত্রুটি করলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন এবং তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করবেন না। তাকে তিরস্কার করবেন না। কবি বলেছেন; 'এমন কে আছে যে কখনও অন্যায় করেনি বা এমন কে আছে যে কেবল ভাল করেছে?'

www.amarboi.org

ইবনু মোবারক বলেছেন, মোমেনগণ অপারগতা দেখেন আর মুনাফেকরা দেখে ক্রটি। ভাইয়ের সাথে ঝগড়া-বিবাদ না করা উত্তম। সে যা জানো না, তাকে তা জিজ্ঞেস করা যাবে না। তাকে প্রশ্ন করে কষ্ট দেয়া যাবে না।

মুখ দিয়ে ভাইয়ের প্রতি ভালবাসার প্রকাশ ঘটাতে হবে। কথা দ্বারা বুঝাতে হবে, তিনি যা অপছন্দ করেন আপনিও তা অপছন্দ করেন এবং যা দ্বারা কষ্ট পান, আপনিও তাতে কষ্ট পান। এ বিষয়ে সবার উর্ধ্বে মহানবীর (সা) নিম্নোক্ত বাণীকে স্মরণ করতে হবে :

اِذَا اَحَبَّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ ـ

'তোমাদের কেউ নিজ ভাইকে ভালবাসলে তাকে সংবাদ দেবে।' (আবু দাউদ, তিরমিযী এটাকে হাসান-সহীহ বলেছেন)

আপনি তার কাছে সর্বাধিক প্রিয় নামে তাকে ডাকবেন, তার নিম্নতম সেবার জন্য আপনি তার শুকরিয়া আদায় করবেন এবং সে যাদের কাছে তার প্রশংসা চায় সেখানে তার প্রশংসা করবেন।

আপনি তাকে আখেরাত সম্পর্কে আপনার জ্ঞানের সাথে শরীক করুন। আল্লাহর জিকর ও ইবাদতে সাহায্য করুন। জীবিত ও মৃত অবস্থায় তার উপস্থিতিতে কিংবা অনুপস্থিতিতে তার জন্য দো'আ করুন। তার জন্য দো'আ আপনার জন্য বাস্তবে প্রতিফলিত হবে। এ মর্মে মহানবী (সা) বলেছেন :

اِذَا دَعَا الرَّجُلُ لاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَ الْمَلَكُ : وَلَكَ مِثْلُ ذٰلِكَ.

'কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের পেছনে দোআ' করলে ফেরেশতারা বলেন, তোমার জন্যও অনুরূপ হোক।' (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন :

دَعْوَةُ الاَخِ لاَخِيْهِ فِى الْغَيْبِ لاَتُرَدُّ ـ

'কোন ভাইয়ের পেছনে তার জন্য দো'আ প্রত্যাখ্যান করা হয় না।' (মুসলিম)

উপরোক্ত অধিকারগুলোর সারাংশ হল, দুই ভাইয়ের প্রত্যেকের বুঝা উচিত, তিনি নিজের জন্য যা পছন্দ করেন, তার ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করবেন। এটাই হচ্ছে মৌলিক পার্থক্যকারী বিষয়। যদি কেউ কারো সাথে সাহচর্যের ও মিত্রতার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে কিংবা খোদায়ী স্পিরিটসহকারে বাস করে এবং দ্বীনের সঠিক বুঝ-সমঝ থাকে তাহলে, ভাইয়ের অধিকার বলতে কোন কিছুই উল্লেখের

www.amarboi.org

প্রয়োজন নেই। যখনই আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোন ভাই পাওয়া যায়, সেটাকেই চোখ ও কান বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু আফসুস! বর্তমান বস্তুবাদী জগতে এরূপ ভাই পাওয়া মুশকিল। কেননা, দ্বীনি ইলম ও আমল দুর্লভ হয়ে গেছে। তাই এরূপ ভ্রাতৃত্বও দুর্লভ হয়ে গেছে। যে দিন এ জাতীয় ভাই পাওয়া যাবে, সেদিন তাদের সামনে কোন জালেম দাঁড়াতে পারবে না। কেননা, তারা হবে পরিষ্কার আত্মা, উজ্জ্বল হৃদয় ও পরিচ্ছন্ন রূহের মালিক। তারা আল্লাহওয়ালা। তারা অন্যান্য লোকদের মত দুনিয়ায় বাস করে না এবং আজকের ভোগবাদী ও বস্তুবাদীদের মত তারা খাহেশ ও দুনিয়ার সৌন্দর্যের কাছে আত্মসমর্পণকারী নন। এমন হলে তারা দুনিয়ায় আবার ইসলামের উজ্জ্বল চেহারা ফিরিয়ে আনতে পারবেন এবং এমন শক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন যা কারো ইচ্ছা-আগ্রহের কাছে নতি স্বীকার করবে না। এভাবেই সফল ও বিশুদ্ধ ইসলামী কার্যক্রম চালু হতে পারে।

আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিদ্বেষ

প্রত্যেক মুসলমান যখন আল্লাহর উদ্দেশ্যে অন্যকে ভালবাসে তখন আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিদ্বেষভাবও পোষণ করে। যিনি আল্লাহর সন্তুষ্টিকে নিজের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং ক্রোধকেও ভয় করেন। তিনি সে কাজে সন্তুষ্ট হতে পারেন না, যে কাজে আল্লাহর গজবের উদ্রেক হয়। তার পক্ষে আল্লাহর ক্রোধ সৃষ্টিকারী মজলিশে বসা এবং তাদের সাহচর্য লাভ ও তাদের সাথে বাস করাও সম্ভব নয়। যে কারণে কাউকে ভালবাসা ঠিক সে কারণে অন্যের প্রতি ক্রোধও প্রকাশ করতে হয়। কেউ যদি আল্লাহর অনুগত হওয়ার কারণে কাউকে ভালবাসে, সে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমান ব্যক্তিকে ঘৃণা করতে বাধ্য।

আপনি যদি প্রশ্ন করেন, প্রত্যেক মুসলমানের ইসলামের অর্থ হল ইবাদত ও আনুগত্য। তাহলে, আমি ইসলাম সহকারে কি করে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতে পারি? এর উত্তর হল, আপনি তাকে তার ইসলামের জন্য ভালবাসেন এবং গুনাহর জন্য ঘৃণা করবেন। তবে, আপনি তার সাথে কাফেরের সাথে সম্পর্কের তুলনায় ভিন্ন সম্পর্ক রক্ষা করবেন। আপনি যাদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করবেন তাদের অবস্থা বিভিন্ন প্রকার। তাদের গুনাহর অবস্থাভেদে তাদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবেরও বিভিন্নতা থাকবে। বিদ্বেষের প্রকারভেদ হচ্ছে :

www.amarboi.org

প্রথম পর্যায় : কুফরী

কাফের যদি মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহলে সে হত্যা ও বন্দী হওয়ার যোগ্য। এর নীচে আর কোন অবমাননা হতে পারে না। তবে সন্ধি কিংবা যুদ্ধ বিরতি চুক্তির কারণে জিম্মি লড়াই করে না। তাদেরকে কষ্ট দেয়া জায়েয নেই। কিন্তু তাদেরকে ভালবাসা কিংবা মুসলমানের আভ্যন্তরীণ খবর জানার মত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহ বলেন :

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْعَشِيْرَتَهُمْ اُوْلٰئِكَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ .

'যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না। যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। আল্লাহ তাদের অন্তরে ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তি যুগিয়েছেন অদৃশ্য সত্তা দ্বারা।'

(সূরা মোজাদালা : ২২)

আল্লাহ আরো বলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَاجَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ.

'হে মোমেনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে, তা অস্বীকার করেছে। (সূরা মোমতাহেনা : ১)

আল্লাহ আরো বলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ، لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا، وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِىْ وَمَا صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ـ

www.amarboi.org

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা মোমেন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অকল্যাণ সাধনে কোন ত্রুটি করে না। তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতা প্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে তা আরো জঘন্যতর।' (সূরা আলে ইমরান : ১১৮)

আল্লাহ্ বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اَوْلِيَاءَ، بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

'হে মোমেনগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ্ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।'

(সূরা মায়েদাহ : ৫১)

প্রত্যেক মুসলমানের বুঝা উচিত। তার বন্ধুত্ব, সাহায্য, ইসলামী রাষ্ট্রের গোপনীয়তা, সাহায্য ও অভিমান শুধু মুসলমানদের সাথে হতে হবে। অমুসলমানের সাথে নয়। কেননা, মুসলমানের উপর কাফেরের সাহায্য কামনাকারী মুসলমান হতে পারে না। এরূপ করলে সে দুনিয়ায় হত্যার শাস্তির যোগ্য এবং পরকালে চিরস্থায়ী দোজখী হবে। সে যদি ইসলামের দুশমনদেরকে ভালবাসে এবং মুসলমানদেরকে অপছন্দ করে, কাফেরদের সাথে হাসি-খুশী এবং মুসলমানদের সাথে ভ্রুকুঁচকানী ও মন্দ সামাজিকতা প্রদর্শন করে। তাহলে, সে সত্যিকার অর্থেই মোমেন নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন,

وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ.

'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।' (সূরা মায়েদাহ : ৫১)

কাফেরের কিছু গুণ পছন্দ করা আর কাফেরকে ভালবাসার মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। তাদের ওয়াদা পূরণ, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও সাম্যসহ বিভিন্ন গুণাবলীর প্রতি ভালবাসায় কোন দোষ নেই। নবী করীম (সা) জাহেলিয়াতের কিছু গুণাবলীর প্রশংসা করেছেন। তিনি আদী বিন হাতেমের দানশীলতার প্রশংসা

www.amarboi.org

করেছেন। কিন্তু কোন কাফেরকে কোন মুসলমানের মন খুলে ভালবাসা জায়েয নেই। কেননা, কাফেরের কুফরী সর্বাধিক কঠোর গুণাহ। কাফেরের প্রতি বিদ্বেষের জন্য তার কুফরীই যথেষ্ট। একজন মুসলমানকে বুঝতে হবে ইসলাম মুসলমানকে ইহুদী ও খৃষ্টান মহিলা বিয়ে করার এবং তার সৌন্দর্য ও চরিত্রকে ভালবাসার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু তার বিকৃত ধর্মকে ভালবাসার কোন অনুমতিই দেয়নি। যদি সে তার ধর্মকে ভালবাসে, তাহলে কাফের হয়ে যাবে।

আজ আপনার বুঝা দরকার বর্তমান মুসলমানদের অবস্থা। বিশেষ করে মুসলিম শাসকদের অবস্থা। তাদের অধিকাংশই কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তাদেরকে মুসলমানদের উপর প্রাধান্য দিয়েছে। তারা তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছে এবং তাদের প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা পেশ করেছে। আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানের পর মুরতাদ হওয়া থেকে পানাহ দিন।

দ্বিতীয় পর্যায় : বেদ'আতের প্রতি আহ্বানকারী

যদি বেদ'আত এমন হয় যা কুফরী পর্যন্ত নিয়ে যায়। তাহলে, বিষয়টি জিম্মীর চাইতেও কঠিন। তা যেন প্রসার লাভ না করে। সে জন্য কঠোর হতে হবে। উদাহরণ হচ্ছে, আল্লাহ কারো মধ্যে প্রবেশ করা সংক্রান্ত আকীদা, আল্লাহ বড় জিনিস সম্পর্কে যেভাবে জানেন, ছোট জিনিস সম্পর্কে সেভাবে জানেন না। আল্লাহর দ্বীনের কিছু কিছু জিনিস বর্তমান যুগের জন্য উপযোগী নয়। আল্লাহর শরীর মানুষের শরীরের মত কিংবা বাস্তব জগতের কোন কিছুর মত তাকে বিশেষিত করা ইত্যাদি।

যদি বেদআ'ত এমন হয় যা কুফরী পর্যন্ত পৌঁছায় না। তাহলে, তার বিষয়টি আল্লাহ ও তার মধ্যে অবশ্যই কাফেরের তুলনায় হালকা হবে। কিন্তু তার প্রতি কাফেরের চাইতেও বেশী ঘৃণা ও প্রতিরোধ করতে হবে। কেননা, কাফেরের মন্দ তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কেননা, মুসলমানেরা জানে সে কাফের। তাই তারা তার কথার প্রতি গুরুত্ব দেবে না। তার প্রতি তাদের ভূমিকা হবে সুনির্দিষ্ট। কিন্তু যে বেদআ'তকারী আকীদাগত বেদআ'তের দিকে আহ্বান জানায় এবং ধারণা করে যে, সে যার দিকে আহ্বান জানাচ্ছে তা যথার্থ। সেটা হল মানবতার জন্য গোমরাহীর কারণ এবং তার ক্ষতি অন্যদের পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে। তাই তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশ করা, শত্রুতা প্রদর্শন করা, বয়কট করা, ঘৃণা করা, বেদআ'তের বিরুদ্ধে মন্দ বলা এবং লোকদেরকে তা থেকে দূরে সরানো জরুরী।

www.amarboi.org

যে সকল আকীদাগত বেদআ'ত কুফরী পর্যন্ত পৌছায় না, যেমন, আখেরাতে আল্লাহর দীদার, কবর আজাব বা নেয়ামতকে অস্বীকার করা, ঈসা (আ)-এর পুনঃআগমন এবং শেষ জামানায় লোকদের উপর তাঁর শাসন, কবরবাসী নবী ও অলী মানুষের উপকার, অপকার করতে পারে। তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া যায় ও দো'আ করা যায়। তাদের কাছে প্রয়োজন তুলে ধরা বৈধ। চার মাজহাব ৪টি পৃথক ধর্ম যা মুসলমানদেরকে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে, চার ইমামকে লা'নত দেয়া জায়েয, ৪ ইমামরা হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করেছে, আমাদের কাছে হারাম বিষয় এনে দাও, আমি ফেকার কিতাব থেকে তাকে হালাল করে দেয়ার ফতোয়া বের করে দেবো ইত্যাদি। তাদের ব্যাপারে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাক্য প্রযোজ্য :

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلاَّ كَذِبًا.

'তাদের মুখ থেকে নির্গত মিথ্যা বাক্য খুবই বড় গুনাহ।' আল্লাহ আমাদেরকে খারাপ উপলব্ধি, মন্দ আ'কীদা এবং কৃষ্ণ ঘৃণা থেকে রক্ষা করুন।

তৃতীয় পর্যায় : সাধারণ বেদ'আতী

যে ব্যক্তি বেদ'আতকে গুণাহ বলে জানে, কিন্তু সে বেদ'আতের দিকে মানুষকে আহ্বান জানানোর শক্তি রাখে না এবং তাকে কেউ অনুসরণ করার আশংকাও করে না, এ বিষয়টি অপেক্ষাকৃত সহজ। তার বেদআ'তের খারাপ পরিণতি নিজ নফসের মধ্যেই সীমিত থাকবে। আমাদের জন্য উত্তম হল, এ বিষয়ে তাকে কঠোরভাবে মন্দ না বলা। তার সাথে নরমভাবে আচরণ করতে হবে এবং তার জ্ঞান ও বুদ্ধির মাত্রা অনুযায়ী আসল বিষয়টি তাকে বুঝাতে হবে। এক্ষেত্রে তার সাথে ভদ্র আচরণ কাম্য। মানুষের মন দ্রুত পরিবর্তনশীল। যদি উপদেশ উপকারী না হয় এবং যদি তার থেকে বিরত থাকলে তা তার বেদআ'তের প্রতিরোধে সহায়ক হয়, তাহলে বিরত থাকা মজবুত মোস্তাহাব। যদি বিরত থাকলেও কোন উপকার না হয়, তথাপি বিরত থাকা উত্তম। বেদআতী যদি জানে যে, লোকেরা তাকে বেদ'আতের কারণে ত্যাগ করে না তাহলে, সে বেদআ'তের বিষয়ে কথা বলতে আরো বেশী সাহস পাবে। তখন ঐ বেদ'আত মানুষের মধ্যে প্রসার লাভ করতে পারে এবং লোকেরাও ঐ বেদআ'তে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে।

চতুর্থ পর্যায় : পাপী, আকীদাগত পাপী নয়

এ বিষয়টি আগের পর্যায়গুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। গুনাহর প্রভাব একটা থেকে আরেকটা কঠোরতর হয়ে থাকে। সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী গুণাহ হচ্ছে,

www.amarboi.org

যা দ্বারা মানুষের ক্ষতি হয়। যেমন, জুলুম, লুণ্ঠন, মিথা সাক্ষ্য দান, ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ আত্মসাত করা, দ্বীনি আলেমদের অসম্মান করা, মাতা-পিতার নাফরমানী করা, নিন্দা করা, চোগলখুরী করা, যাদু এবং সতী মহিলাদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া ইত্যাদি। যদি তাদেরকে নিষেধ করলে কোন লাভ না হয়। তাহলে, তাদের থেকে বিরত থাকা, তাদের সাথে না মিশা এবং তাদের সাথে লেন-দেন না করা উত্তম। মানুষকে কষ্ট দান খুবই বড় গুণাহ এবং উম্মাহর জন্য ধ্বংসাত্মক। যখনই কোন মুসলমানকে হেয় করা হবে তখনই সে সওয়াব পাবে যদি তাকে আল্লাহর সন্তোষ লাভের মোকাবিলায় হেয় করা হয়ে থাকে।

যদি গুণাহ ধ্বংস ও নষ্টের কারণ হয়, উম্মাহর জন্য ক্ষতিকর হয় এবং লোকদেরকে গুনায় পতিত করার আশংকা থাকে, তাহলে তার সাথে ঐ রকম ব্যবহার করতে হবে যা আগের পর্যায়ের লোকদের সাথে করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, মদ প্রস্তুতকারক, বেশ্যাখানার মালিক, নাচ-গানের থিয়েটার ও ষ্টেডিয়ামের মধ্যে যেখানে অশ্লীল কাজ সংঘটিত হয় সেগুলোর মালিক কিংবা মন যেখানে অশ্লীল ও অন্যায় কাজের দিকে ধাবিত হয়। মদের বার, উলঙ্গ ও বেহায়াপনার ছবি তোলার জন্য ষ্টুডিও প্রতিষ্ঠাকারীরা উম্মাহর জন্য মন্দ কাজের শীর্ষে রয়েছে। তাদের মত ঐ সব লোকও রয়েছে যারা গুণাহ ও মন্দ কাজের পক্ষে আইন প্রণয়ন করে। যেমন সুদ, মদ, যেনা-ব্যভিচার, উলঙ্গপনাসহ আল্লাহর শরীয়ত বিরোধী আইন তৈরীকারী লোক। তাদেরকে বয়কট করতে হবে। তাদের প্রতি ভ্রুকুঞ্চন করতে হবে এবং তাদের মন্দ কাজের জন্য কটুক্তি করতে হবে। তাদের অন্যায় ও পাপাচারের স্থানে প্রবেশ জায়েয নেই। তাদের প্রতি সালাম দেয়া যাবে না এবং আগে বর্ণিত পর্যায়ের লোকদের মত তাদের সালামেরও উত্তর দেয়া যাবে না।

যে ব্যক্তি নিজে একাকীই গুণাহ করে, অন্যের প্রতি গুণাহ বা অন্যায়কে ছড়িয়ে দেয় না। অন্য কাউকে এর দিকে ডাকে না। নিজে অন্যের পাপের কারণ হয় না ইত্যাদি লোকের হুকুম কিছুটা শিথিল। যদিও তারা অন্যায় অব্যাহত রেখেছে। যেমন, মদখোর, উলঙ্গ স্ত্রী লোকের সাথে মিশুক ব্যক্তি, যাকাত অনাদায়ী ব্যক্তি ইত্যাদি উপরোল্লিখিত দুই পর্যায়ের লোকের জন্য এ হুকুম। যদি কোন মুসলমান অন্যায়কারীর মজলিশে বসা অবস্থায় কোন অন্যায় হয় তাহলে, তাকে অন্যায় করতে নিষেধ করবে এবং ঐ জাতীয় মজলিশে বসা জায়েয নেই। এটা ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাওয়া উত্তম। এর ব্যতিক্রম হল, যদি মিশলে তাদের সংশোধনের সম্ভাবনা থাকে।

www.amarboi.org

বহু ওলামায়ে কেরাম সকল কবীরা গুনাহকারীকে বয়কট করার কথা বলেছেন। সেই কবীরা গুনাহ আকীদাগতই হোক বা শুধু পাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হোক এবং তা বান্দার বা পাপীর নিজের জন্য জুলুম হোক এবং চাই তা কাজের গুনাহ অবস্থায় বা ভিন্ন অবস্থায় হোক– সর্বাবস্থায় বয়কট করা জরুরী। নিম্নোক্ত আয়াত হচ্ছে তাদের প্রমাণ :

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ.

'যখন আপনি তাদেরকে আমার আয়াতসমূহে ছিদ্রান্বেষণ করতে দেখেন, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত হয়।'

(সূরা আনআম : ৬৮)

এ আয়াতের নিষেধাজ্ঞা গুনাহ করার সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে সবাই একমত। এরপর ইবনুল আরবী বলেন, কবীরা গুনাহকারীদের সাথে বসা যে নিষিদ্ধ এ আয়াত তার প্রমাণ। ইবনু খোয়েজ মিনদাদ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতের ছিদ্রান্বেষণ করে তার মজলিশ ত্যাগ করতে হবে, সে ব্যক্তি মোমেনই হোক আর কাফেরই হোক। তিনি বলেন, আমাদের সাথীরাও কাফের এবং বেদআ'তীদের আসর ত্যাগ করার কথা বলেছেন। আপনি তাদের ভালবাসার আশা পোষণ করবেন না এবং তাদের কথাবার্তা ও বিতর্ক শুনবেন না।

আল্লামা মোজাহিদ উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, এর অর্থ হল, যারা কোরআনের বিষয়ে অন্যায় ও বেহুদা কথা বলে।

তাবারী আবু জাফর মোহাম্মদ বিন আলী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ঝগড়াকারীদের মজলিশে বসবেন না। তারা হল, আল্লাহর আয়াতে ছিদ্র অন্বেষণকারী। তারা সলফে সালেহীনের যুগে যে সব বিষয় ছিল না, ঝগড়ার প্রতি ভালবাসার কারণে সে সব বিষয়ে মতবিরোধ করে। আল্লাহ বলেন :

وَلاَ تَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُوْنَ.

'আর জালেমদের প্রতি ঝুঁকবেন না। নচেত আপনাদেরকেও আগুনে ধরবে। আর আল্লাহ্ ছাড়া আপনাদের কোন বন্ধু নেই। অতএব কোথাও সাহায্য পাবেন না।' (সূরা হূদ : ১১৩)

www.amarboi.org

আল্লামা আলুসী 'ঝুঁকবেন না' এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'সামান্যতম ঝুঁকবেন না।' জালেম বলতে মোশরেকদেরকে বুঝানো হয়েছে। ইবনু জারীর তা বর্ণনা করেছেন। তিনি ঝুঁকে যাওয়াকে 'ভালবাসা সহকারে অন্তরের ঝুঁকে যাওয়া' বুঝিয়েছেন। কেউ কেউ যে কোন জালেমের প্রতি না ঝোঁকার বিষয়ে এটাকে সাধারণ নির্দেশ মনে করেছেন। তাহলে আয়াতের নিষেধাজ্ঞা জালেমদের সাথে আপোষকামিতা, শক্তি থাকা অবস্থায় তাদেরকে প্রতিরোধ না করা, তাদের সুন্দর স্মরণ এবং শরীয়তসম্মত কোন কারণ ছাড়া তাদের মজলিশে বসাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। অনুরূপভাবে তাদের সম্মানে দাঁড়ানোও নিষিদ্ধ।

আয়াতের ২য় কঠোর তাফসীরটি হচ্ছে এই যে, যদি ঝুঁকে যাওয়া দ্বারা দোজখের আগুন স্পর্শ করার মত অবস্থা হয় তাহলে, যারা জুলুমের মধ্যে ষোল আনা দৃঢ়ভাবে ঝুঁকে গেছে, তাদের সাথীরা অবশ্যই ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে। যাদের অন্তর তাদেরকে খুশী করার জন্য পেরেশান। নিজেদের ফায়দা লাভের জন্য সওয়ারী নিয়ে সর্বদা প্রস্তুত। তাদের অনুসরণে সদা তৎপর, তাদের অজ্ঞতা ও বোকামীতে নিয়মিত অংশ গ্রহণকারী এবং তাদের অস্থায়ী ধন-সম্পদের প্রতি ঈর্ষাকাতর। অথচ তারা এর তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম।

এ জাতীয় জালেম লোককে তারা ব্যতীত যারা তাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে ঐ দলে শামিল করা উচিত যার বিষয়ে বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তি সুফিয়ানকে বলল, আমি জালেমদের জন্য কাপড় সেলাই করি। আমি কি তাদের সহযোগী হিসেবে বিবেচিত? তিনি বলেন, তুমি তাদেরই দলভুক্ত। যে তোমার কাছে সুঁই বিক্রি করেছে সে তাদের সহযোগী।

যোহরী বাদশাহর সাথে সাক্ষাতের সময় তার এক শুভাকাঙ্ক্ষীকে উত্তম উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন : আল্লাহ্ আমাকে এবং তোমাকে ফেতনা থেকে রক্ষা করুন। তুমি আজ এমন এক অবস্থায় এসে পৌছেছ, যে তোমাকে চিনে, সে তোমার জন্য দো'আ এবং দয়া করবে। তুমি আজ বৃদ্ধ হয়েছ। আল্লাহর নেয়ামতসমূহ তোমাকে ভারী করে তুলেছে। তুমি আল্লাহর কিতাব এবং নবী করীম (সা)-এর হাদীসের জ্ঞানের ভারে ভারী হয়ে গেছ। আল্লাহ কি ওলামাদের কাছ থেকে নিম্নোক্ত প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেননি? لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ

'তোমরা অবশ্যই তা লোকদের কাছে বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না। জেনে রাখ, তুমি যে ছোট ভুলটি করেছ, তাহল তুমি জালেমের পাশবিকতাকে ভালবেসেছ এবং যে অধিকার আদায় করে না ও কোন অন্যায়কে ত্যাগ করে না, তুমি তার কাছে গিয়ে গোমরাহীর রাস্তাকে সহজতর করেছ। তুমি যখন তাদের

www.amarboi.org

কাছে গিয়েছ তারা তোমাকে নিজেদের বাতিলের কলের চাকা বানিয়েছে, তাদের বিপদের জন্য তোমাকে পুল বানিয়েছে, গোমরাহীর শীর্ষে আরোহণের জন্য সিঁড়ি বানিয়েছে, তোমাকে দিয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় প্রবেশ করাবে এবং অজ্ঞ-মূর্খদের মন শিকার করবে। তারা কত সহজেই না তোমার ধ্বংসকে আবাদীর ছদ্মাবরণে ঢেকে দিয়েছে। তারা তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছে এবং তোমার দ্বীনদারীকে নষ্ট করেছে! তুমি যে নিম্নের আয়াতের শামিল নও তা কে বিশ্বাস করবে? আল্লাহ্ বলেন :

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوْا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا -

'অতঃপর তাদের পরে আসল অপদার্থ লোকেরা, তারা নামাজ নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হল।' (সূরা মরিয়ম : ৫৯)

উপরে যা আলোচনা করা হল, তা দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ্র আজাব থেকে মুক্তি এবং দ্বীন ও রবের প্রতি ব্যক্তির করণীয় সম্পর্কে যথেষ্ট।

যে ব্যক্তি বনি ইসরাইলের উপর সৎকাজের আদেশ এবং মন্দের প্রতিরোধ সম্পর্কে অভিশাপ সংক্রান্ত হাদীস পড়েছে সে বুঝতে পারবে, ফাসেকদের সাথে মিশাও তাদেরকে সহজভাবে গ্রহণ করা মানে তাদেরকে অন্যায় ও গুনাহ্র কাজে উৎসাহ যোগানো এবং তাদেরকে লজ্জিত হতে না দেয়া। বরং তারা গোমরাহীর মধ্যে ডুবে আছে এবং আরো বেশী করে গোমরাহী করছে। ঘোষণা দিয়ে করছে এবং সকল অন্যায়ের পক্ষে সাফাই গেয়ে বেড়াচ্ছে। তারা মোমেনদেরকে কষ্ট দিচ্ছে, ঘৃণা করছে এবং তাদেরকে মন্দ নামে ডাকছে। যদি খাঁটি মুসলমান আল্লাহকে দিয়ে ইজ্জত লাভ করে, মোমেনদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং অপরাধীদের থেকে দূরে থাকে, তাহলে এতসব কিছু ঘটত না। আফসুস! মুসলমানরা যদি নিজেদের করণীয় বুঝতে পারত! ইমাম আহমদ (রা) বলেছেন, 'কাফের, ফাসেক, বেদআতী এবং বেদআতের দিকে আহ্বানকারীকে ত্যাগ করা ফরজ। এটা সে ব্যক্তির জন্য যে এর জবাব দিতে অক্ষম। কিংবা ধোঁকা বা ক্ষতির আশংকা করছে। কেউ কেউ বলেছেন, কোন শর্ত ছাড়াই তাদেরকে ত্যাগ করা ফরজ। ইবনু আকীলের দৃঢ় মত এটাই। তিনি বলেন, যদি তুমি কোন যুগের লোকের ইসলাম সম্পর্কে তাদের অবস্থান জানতে চাও, তাহলে মসজিদে তাদের ভীড়ের প্রতি কিংবা তাদের বাগাড়ম্বরতার প্রতি নয়, বরং শরীয়তের দুশমনদের দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মিল ও সামঞ্জস্য আছে কিনা, তা দেখ।

www.amarboi.org

ইবনু তামীম বলেছেন, কাফের বেদআ'তী, ফাসেক ও প্রকাশ্যে গুনাহকারীদেরকে বয়কট করা ফরজে কেফায়াহ। (আল-আদাবুশ শরীয়াহ : ১ম খন্ড, ২৬৮ পৃঃ)

তবে, কোন বিষয়কে ভালভাবে জানার চেষ্টা করা জরুরী। যেমন, কেউ ফাসেক-জালেম কিনা কিংবা সে যা করছে ও বলছে তা কুফর ও ফাসেকী পর্যন্ত নিয়ে যায় কিনা অথবা উপদেশ দেয়ার পর সে ঠিক হয়নি– এ মর্মে নিশ্চিত হতে হবে। শুধু ধারণার ভিত্তিতে এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া কারো সম্পর্কে খারাপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ শরীয়তে নিষিদ্ধ ও অন্যায়।

শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া কাউকে ত্যাগ করার হুকুম

ভাল আমল ও আকীদার অনুসারী কোন মুসলমানকে ত্যাগ করা কোন কোন আলেমের দৃষ্টিতে মাকরূহ। বরং সহীহ হাদীসের দৃষ্টিতে তিন দিনের বেশী কাউকে ত্যাগ করা হারাম। নবী (সা) বলেছেন :

فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ -

'যে ব্যক্তি তিন দিনের উপর কাউকে ত্যাগ করে মারা যায়, সে জাহান্নামে যাবে।' (আবু দাউদ)

আবু আইউব আনসারী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هٰذَا وَيَعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ.

'এক মুসলমান আরেক মুসলমানকে তিন দিনের বেশী ত্যাগ করা জায়েয নেই। দুইজনের সাক্ষাত হওয়া সত্ত্বেও একজন আরেকজনকে ত্যাগ করে। দুইজনের মধ্যে প্রথমে সালাম দানকারী ব্যক্তি উত্তম।' (বোখারী, মুসলিম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ فِىْ كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيْسٍ فَيَغْفِرُ اللّٰهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيَقُوْلُ : اُتْرُكُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا.

www.amarboi.org

'প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবারে মানুষের আমল আল্লাহর কাছে পেশ করা হয়। আল্লাহ তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করেনি– এমন সকল ব্যক্তিকে মাফ করেন। তবে সে ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম যে দুই ভাইয়ের মধ্যে শত্রুতা আছে। আল্লাহ বলেন, আপোষ করা পর্যন্ত তাদের আমল রেখে দাও।' (মুসলিম)

নবী (সা) বলেছেন :

مَنْ هَجَرَ اَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ.

'যে ব্যক্তি নিজ ভাইকে এক বছর ত্যাগ করে, সে যেন তাকে হত্যা করল।' (ইমাম নববী বলেছেন, আবু দাউদ এ হাদীসটি বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।)

আবু দাউদ বলেছেন, যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ত্যাগ করে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। অর্থাৎ গুনাহ নেই। আমরা সালামের অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

আপনি আজকাল মুসলমানদের সমাজে শরীয়তসম্মত বৈধ কোন কারণ ছাড়াই একে অপরকে ত্যাগ করছে বলে দেখতে পাবেন। কেননা, মানুষের কামনা-বাসনাই তাদেরকে পরিচালিত করছে। তাই দেখা যায়, ত্যাগকারীদের অধিকাংশই নিজ ভাইকে ত্যাগ করছে এবং দ্বীনের দুশমনদের এবং দুনিয়াদারদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করছে। তাদের শরীর মালিশ করছে এবং তাদের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা দুশমনের গোপনীয়তা রক্ষা করছে এবং মুনাফিকও প্রকাশ্য গুনাহগার ফাসেকদের গোপনীয়তা সংরক্ষণ করছে। পক্ষান্তরে সে ভাল ও ন্যায়পরায়ণ মুসলমান ভাইয়ের বিরুদ্ধে খারাপ ধারণা করছে এবং ছিদ্রান্বেষণ ও গোয়েন্দাগিরির পেছনে দৌড়াচ্ছে। যে ব্যাধি শাসকদেরকে পেয়ে বসেছে, সে ব্যাধি ইসলামের দাবীদারকেও ধরেছে। আপনি একথা বুঝতে হলে বিভিন্ন ইসলামপন্থী দলের কাছে যান এবং তাদেরকে পরস্পর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন একদল আরেকদলের বিরুদ্ধে কত সীমাহীন অভিযোগ করে। কিছু কিছু দলের অন্য দলকে ধ্বংস করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। এ জন্য মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরীর আশ্রয় এবং কুফরী ও ফাসেকীর ফতোয়া দেয়। মনে হয় যেন তারা খৃষ্টান, কম্যুনিষ্ট কিংবা ইহুদী। অথচ তারা ইহুদী-খৃষ্টান ও কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে এতটুকুন ক্ষ্যাপাও নয়।

www.amarboi.org

মুসলিম দেশের অমুসলমানদের অন্যায় কাজের প্রতিরোধ

অমুসলমানরা মুসলমানের দেশে আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত আক্রমণ থেকে রক্ষার বিনিময়ে কর দিয়ে জিম্মী হিসেবে বাস করে। মুসলিম সরকারকে তাদের জীবনের নিরাপত্তা দিতে হয়। তারা যদি কোন অন্যায় কাজ করে তাহলে সে অন্যায়ের প্রতিরোধের বিষয়ে শরীয়তের কিছু হুকুম হল নিম্নরূপ :

১. জিম্মীরা যদি এমন কাজ করে যা তাদের কাছে নিষিদ্ধ। কিন্তু আমাদের কাছে নিষিদ্ধ নয়, তাহলে আমরা তার বিরোধিতা করবো না। তারা যা করছে আমরা তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবো না। তারা তা গোপনে বা প্রকাশ্যেই করুক না কেন। আল্লাহ্ তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে লড়াই করতে নিষেধ করেছেন যতক্ষণ না তারা জিযিয়া কর আদায় করতে থাকবে। এ পদ্ধতির মূল কথা হল, মুসলমানের কর্তৃত্ব বহাল থাকা। এমতাবস্থায় তাতো বহাল আছেই।

২. আমাদের কাছে হারাম– যদি এমন কাজ করে, যদি তাতে মুসলমানদের ক্ষতি হয় তাহলে তাদেরকে তা নিষেধ করতে হবে। যেমন, তারা কোন মুসলিম নারীকে বিয়ে করতে, সুদী কারবার করতে, তাদের মহিলাদেরকে উলঙ্গ রাখা, মদ্যপান, শূকর খাওয়া, প্রকাশ্য ক্রুশ ব্যবহার, উত্তেজনা সৃষ্টিকারী উপায়ে বাঁশী বাজানো এবং রমজানে প্রকাশ্যে খানা খাওয়া ইত্যাদি কাজ করতে চায়, তাহলে তা নিষেধ করতে হবে। যদি তারা তাদের মুহরাম আত্মীয়াকে বিয়ে করতে চায়, তাহলে দুই শর্তের ভিত্তিতে তাদেরকে নিষেধ করবো না।

ক. তারা আমাদের কাছে বিচার নিয়ে আসবে না।

খ. এটা তাদের কাছে জায়েয হতে হবে।

৩. তাদের কাজ যদি আমাদের এবং তাদের উভয়ের কাছে নিষিদ্ধ হয় এবং তারাও যদি বিশ্বাস করে যে তা হারাম, তাহলে আমরা তাদেরকে তা করতে নিষেধ করবো। কেননা, তা অন্যায় প্রতিরোধের ভেতর শামিল।

৪. তারা যদি চুক্তিপত্রে নিষিদ্ধ কোন কাজ করে বসে আমাদেরকে তার প্রতিরোধ করতে হবে। এ ব্যাপারে নীতি হল, নিম্নের আয়াত :

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ، اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ -

www.amarboi.org

'আল্লাহ তোমাদেরকে সে সকল লোকদের সাথে সদাচরণ ও ইনসাফ করতে বারণ করেন না, যারা তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দেয়নি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন।' (সূরা মোমতাহিনা : ৮)

তাদের সাথে ইনসাফ করা, বেচা-কেনা করা, উঠা-বসা, দেখা-সাক্ষাত করা ও রোগী দেখার মত বৈধ কাজগুলো এ শর্তে জায়েয যে, এগুলোর অভ্যাস করা যাবে না। আমাদের উপর তাদেরকে দুঃসাহসী বানানো যাবে না। আমাদের উপস্থিতিতে কোন মন্দ কাজে আমরা সম্মতি দিতে পারবো না এবং আমাদের দ্বীনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। প্রমাণ আছে যে, মহানবী (সা) কাফেরদের উপহার গ্রহণ করেছেন, তাদের কাছে বক্তৃতা করেছেন, লেন-দেন করেছেন, তাদের রোগী দেখতে গিয়েছেন এবং তাদের কাছ থেকে কর্জ নিয়েছেন ইত্যাদি। আমরা এ বিষয়ে আলোচনা দীর্ঘ করবো না।

আল্লাহর বাণী বুলন্দ করার স্বার্থে জেহাদী ভ্রাতৃত্ব

ইসলামের সাধারণ ভ্রাতৃত্বের মধ্যে এ বিষয়টি শামিল। অনুরূপ, 'আল্লাহর পথে ভ্রাতৃত্ব'ও এ বিষয়টিকে শামিল করে। আমি বিষয়টির নিজ গুরুত্ব এবং বর্তমান যুগে এর বিশেষ গুরুত্বের কারণে এর জন্য পৃথক অধ্যায় রচনা করেছি। কেননা, আজকের যুগে বহু লোক তা নিয়ে ব্যস্ত এবং তাদের ভুলও প্রচুর। বহু যুবক এ বিষয়ে বিভ্রান্ত ও ধোঁকা খেয়েছে এবং বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অসীম জটিলতা দেখা দিয়েছে। ইসলামী শাসক ও সরকারের অবর্তমানে ইসলামের শৌর্য-বীর্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বহু ইসলামী দল আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তাদের অধিকাংশই নিজেদের নিয়ত পূরণে সত্যতার পরিচয় দিয়েছে। এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য অনেকে জেল-জুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। কেউ পালিয়ে গেছে, কেউ চাকুরীচ্যুত হয়েছে এবং মানুষের তৈরী রিজকের উৎস বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও ঐ সকল দল জেহাদ ও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, ঐক্যবদ্ধ এবং বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। যুবক-বৃদ্ধ ও নারী-পুরুষ আবাল বৃদ্ধ বণিতাকে ইসলামের মৌলিক নীতিমালার আলোকে গড়ে তোলা হচ্ছে।

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে এ লক্ষ্যে দু'টো প্রধান দল কাজ করে যাচ্ছে। আরব বিশ্বে 'ইখওয়ানুল মোসলেমুন' আর ভারত উপমহাদেশে 'জামায়াতে ইসলামী।' আমি এ অধ্যায়ে আল্লাহর বাণী বুলন্দ করার লক্ষ্যে আল্লাহর পথে জেহাদের অনুসারী এ জাতীয় ইসলামী তৎপরতার প্রধান নীতিগুলো আলোচনা করবো।

www.amarboi.org

আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের বাস্তবায়ন ছাড়া আল্লাহর বাণী বুলন্দ হতে পারে না। যেখানেই এ জাতীয় ইসলামী দলের অস্তিত্ব থাকবে, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হল, সাধ্যানুযায়ী তাদের কল্যাণ কামনা করে উপদেশ দেয়া ও সাহায্য-সমর্থন করা। ইসলামী দল বা দলের কিছু সদস্য যদি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে তাহলে, তাদের জন্য সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ প্রযোজ্য। যেমনটি যে কোন সাধারণ মুসলমানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়ে থাকে। যদি তারা সংশোধনের প্রতি সাড়া না দেয়, তাহলে তাদের বিষয়ে করণীয় পরিষ্কার। এগুলো আগে আলোচিত হয়েছে। আমরা এর পুনরাবৃত্তি করবো না। 'ইসলামের সাধারণ ভ্রাতৃত্বের' অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এখন আমরা এ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করবো।

১. উদ্দেশ্য-লক্ষ্য নির্ধারণ

যে কোন দল বা সমষ্টি আল্লাহর পথে জেহাদ ও তাঁর বাণী বুলন্দ করার সঠিক নিয়ত রাখে, তাদের কাছে এটা সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, তারা ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, দ্বীনের হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধার এবং অন্যান্য মানব রচিত মতাদর্শের উপর দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করবেন। অর্থাৎ সংগঠিত লোকেরা কোরআন ও সুন্নাহকে বুঝে আমল করবে। এ কারণে তারা মহানবী (সা), খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তাদের অনুসারীদের স্থলাভিষিক্ত।

২. ব্যাপক ও গভীর উপলব্ধি

আপনি বিষয়টি বুঝার জন্য এ বইয়ের প্রথমে পড়তে পারেন। তথাপি আমি এখানে আকাঙ্ক্ষিত বিষয়টি সংক্ষেপে বলবো। যিনি বা যারা কোরআন, সুন্নাহ ও মুসলমানদের ইজমার ভিত্তিতে ইসলামকে কায়েম করতে চায় তারা হয়তো যা বলছেন, দাওয়াত দিচ্ছেন ও জেহাদ করছেন, তা বুঝেন কিংবা বুঝেন না। যদি তারা বুঝে ও জেনে থাকেন, তাহলে ইলম সহকারে বলেন, দাওয়াত দেন এবং জেহাদ করেন। আর যদি না বুঝে থাকেন, অজ্ঞ হন, তাহলে তারা গুনাহ করেন এবং অন্ধ অনুসারী হিসেবে অন্যের কথাকে তোতা পাখীর মত আওড়ান, নিজে আমল করেন না। যেহেতু তিনি নিজেই জানেন না। তিনি অন্ধের মত লোকদেরকে ডাকেন, দেখে-শুনে নয় এবং সুস্পষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে জেহাদ করেন না। এ জাতীয় লোকেরা বিপদাপদের সম্মুখীন হলে কিংবা কোন গোমরাহকারী লোক তাদের সাথে আলোচনা করলে তাদেরকে অজ্ঞ-মূর্খ পেয়ে তারা সহজেই বিভ্রান্ত ও সন্দেহপরায়ণ করে তুলতে এবং তাদেরকে পেছনের গোমরাহীর দিকে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। বহু জায়গায় ঘটেছেও তাই। অনেকে

www.amarboi.org

নিজ পায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলেও এ জাতীয় হাস্যকর মন্তব্য করেন : আমার নেতা বা দল প্রধান এরূপ বলেছেন, আমাদের ভাইয়েরা এরূপ বলেন। 'আল্লাহ এ কথা বলেছেন কিংবা আল্লাহর রাসূল বলেছেন'। তারা না অতীতে সংস্কার করতে পেরেছে, আর না ভবিষ্যতে পারবে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে। একটা মাত্র পর্যায়েই কেবল দ্বীন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আর সে পর্যায়টি হল কোন দ্বীনি জামায়াতের পদক্ষেপ তথা আল্লাহর পথে জেহাদ।

যারা ঐ সকল লোকদের অজ্ঞতাসহকারে বাঁচার বিষয়ে সন্তুষ্ট, যারা সাধারণ মানুষের মতই ইসলামকে সাদাসিধে বুঝে এবং না বুঝে দলীয় শ্লোগান উচ্চারণ করে। তারাই দলকে প্রথম দিন থেকেই কবর দেয়ার জন্য দায়ী। এ বিষয়ের প্রমাণ সুস্পষ্ট। মহানবী (সা)-এর হাতে দাওয়াতী কার্যক্রম আল্লাহর অহী ছাড়া এক কদমও অগ্রসর হয়নি। নবী (সা) ইলম ব্যতীত এক পাও অগ্রসর হননি। আমরা যদি মহানবীর পদ্ধতি অবলম্বন করি তাহলে সফল হবো। আর যদি কামনা-বাসনা, কুপ্রবৃত্তি ও অজ্ঞতার অনুসরণ করি তাহলে ধ্বংস হবো। আমরা মহানবীর পথে চললে আল্লাহকে সন্তুষ্টকারী পর্যায়ে পৌঁছবো। আর যদি তাদের পথে চলি, যারা সাধারণ মানুষের চাইতে হযরত মোহাম্মদ (সা) সম্পর্কে বেশী কিছু জানে না। তাহলে পথভ্রষ্ট হবো এবং তাদের অনুসারীতে পরিণত হবো।

আশ্চর্য ও আফসুসের বিষয় হল, কিছু দলের অবস্থাতো এই যে, তাদের নেতা ও অনুসারী কেউ দ্বীনকে ভাল করে জানে না। কিংবা তারা নিজেদের আগ্রহ ও পছন্দ মোতাবেক ইসলামকে সাজিয়েছে। আপনি তাদেরকে দেখতে পাবেন, হয় সুন্নাহকে অনুসরণের নামে কোরআনকে ছেড়ে দিয়েছে এবং নিজেদের জন্য এক নির্দিষ্ট অর্থ গ্রহণ করেছে, ইসলামে যার কোন ভিত্তি নেই। অথবা দেখবেন যে, সুন্নাহকে বাদ দিয়েছে এবং কোরআনকে অবলম্বনের নামে কোরআনের সাথে তাই করছে, যা হাদীসের সাথে করেছে। কিংবা দেখতে পাবেন, তাদের অনুসারীরা মুসলিম আলেম ও ইমামদের উপর অভিশাপ দিচ্ছে। সাহাবা ও তাবেঈদের কথা ও দ্বীনি জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করছে এবং নিজেদের উত্তম বুঝ ও হেদায়েতের যথার্থতার দাবী করছে। অথবা দেখতে পাবেন, দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে মূর্খ লোকেরা যারা নিজেদের খাহেশ মোতাবেক কর্মীদের কাছে নির্দেশ পাঠায় যেন অজ্ঞ নেতৃবৃন্দের নিয়ন্ত্রণ ও গোমরাহী চলতে থাকে। তাই তারা নিজেদের মধ্যে আলেমের অস্তিত্বকে অপছন্দ করে। কেননা, আলেমরাই পারে তাদের ভ্রান্তি ও গোমরাহী ধরে দিতে ও প্রকাশ করতে। আপনি হয়তো একদলের মধ্যেই এ সকল জিনিস কিংবা অধিকাংশ জিনিস দেখতে পাবেন।

www.amarboi.org

আমি যদি কোন সাধারণ মুসলমানকে প্রশ্ন করি, অজু শিখা ছাড়া কি অজু করা যাবে? এর উত্তর হবে 'না'। একই প্রশ্নোত্তর নামাজ, রোজা ও যাকাতসহ অন্যান্য বিষয়েও প্রযোজ্য।

যদি ব্যাপারটি এরূপই হয়, তাহলে কি করে একটি দল জেহাদের প্রস্তুতি নিতে পারে। অথচ জেহাদ সম্পর্কে দলটির কোন জ্ঞান নেই। শুধু সাধারণ মানুষের মত ভাষাভাষা জ্ঞান আছে? ঐ দলের প্রশ্নের উত্তর অনুরূপই হবে। কিন্তু এটাও কি সম্ভব যে, দলের প্রত্যেক সদস্য পূর্ণ ইসলাম সম্পর্কে জানবে? উত্তর হল, দলের সদস্যদেরকে করণীয় কাজের ইলম অর্জন করা জরুরী। যা আমল করবে, সে সম্পর্কে হাদীস জানবে এবং নেতৃবৃন্দের উচিত ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গভীরভাবে জানা। তাদেরকে দ্বীনের মূলনীতি ও শাখা সম্পর্কে জানতে হবে যেন তারা লোকদের কাছে তা পেশ করতে ও দাওয়াত দিতে পারে এবং ঈমান ও ইলমের সাথে জেহাদ করতে পারে। তাদেরকে অন্ধ অনুকরণ করলে চলবে না এবং তোতা পাখীর মত কোন কিছু না বুঝে বুলি আওড়ানোও চলবে না। এ কথাই আল্লাহ বলেছেন :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ -

'আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সমীচীন নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং ভয় প্রদর্শন করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে? (সূরা তাওবা : ১২২)

আপনি যদি আল্লাহর কিতাবে এই উম্মাহ বা দল সৃষ্টির বিষয়ে আয়াতগুলো পড়েন, তাহলে, এ বিষয়ে বুঝার জন্য লম্বা আলোচনার দরকার হবে না। আল্লাহ মুসলিম উম্মাহ সৃষ্টির বিষয়ে মহানবীর কার্যক্রম উল্লেখ করে বলেন :

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ -

www.amarboi.org

'তিনি সে সত্তা যিনি অজ্ঞ লোকদের প্রতি তাদের মধ্য থেকেই রাসূল পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের কাছে কোরআনের আয়াত পাঠ করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন। তোমরা এর আগে প্রকাশ্য গোমরাহ ছিলে।' (সূরা জুমআহ : ২)

এটাই হল পদ্ধতি যে তাবলীগ ও দাওয়াতের উদ্দেশ্যে কোরআন পাঠ করেন, গড়ে তোলার জন্য বিশুদ্ধ করেন এবং ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ন সহকারে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন।

কোন দলের জন্য ইসলামের কিছু দিক গ্রহণ করা এবং অন্যান্য দিক বর্জন করা জায়েয নেই। তাহলে তারা হবে কোরআনের কিছু অংশের প্রতি বিশ্বাসী এবং অন্য অংশের প্রতি অবিশ্বাসী। যারা জেহাদ ও লড়াইর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এবং জেহাদ যে মূলনীতি ও শাখাসমূহের জন্য ফরজ করা হয়েছে তা ত্যাগ করে, তারা প্রকাশ্য গোমরাহ্।

যারা গোটা জিন্দেগী কেবল আ'কীদার কথা বলেন, এ বিষয়টি ছাড়া আর কোন কথা বলেন না এবং ইসলামের অন্যান্য দিকগুলোকে উপেক্ষা করেন, তাদেরকে নফসের দাস এবং মুসলমানের মধ্যে সংশয় সৃষ্টিকারী হিসেবে গণ্য করা যায়। যারা কেবল ইসলামী শাসকের কথা বলেন এবং ইসলামের অন্যান্য দিকগুলোকে উপেক্ষা করেন, এরপর যদি ইসলামী শাসক পাওয়া যায়ও তথাপি তা তাদের জন্য এবং লোকদের জন্য ফেতনা ছাড়া কিছু হবে না। কেননা, তারা আমলের শক্তি থাকা সত্ত্বেও ইসলামকে বিকল করে দিয়েছে।

মূলকথা হল, ইসলাম কারো ব্যক্তিগত খামার নয়, কারো মালিকানাধীন বিষয় নয় এবং কোন দলের একমাত্র দখলকৃত জিনিস নয় যে, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে চলবে ও করবে। আল্লাহ এটাকে কোন সৃষ্টজীবের স্বেচ্ছাচারের জন্য তৈরী করেননি। এমনকি মোহাম্মদ (সা)-এর জন্যও নয়। কি করে তা হতে পারে যেখানে আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল করেছেন?

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا۔

'আপনি আপনার কাছে আপনার রবের কাছে থেকে প্রেরিত অহীর অনুসরণ করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে অবহিত।' (সূরা আহযাব : ২)

www.amarboi.org

আল্লাহ আরো বলেন :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ ـ

'অতঃপর আমরা আপনাকে রেখেছি দ্বীনের এক বিশেষ শরীয়তের উপর। অতএব, আপনি এর অনুসরণ করুন এবং যারা জানে না সে মূর্খদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না।' (সূরা জাসিয়া : ১৮)

আমি পাঠককে হাসানুল বান্না এবং সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর পদ্ধতি অনুসরণের আহ্বান জানাই। উল্লেখিত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এ দু'জনের পদ্ধতিই সর্বোত্তম।

৩. ইসলামী অনুশাসনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুসরণ

আল্লাহর আজাব থেকে মুক্তি লাভের জন্য এ বিষয়টি জরুরী। গুনাহ ব্যক্তি ও দলকে ধ্বংস করে। নেতা ও কর্মীকে দুর্ভাগা করে এবং ইসলামী দলকে মানুষের হাসির খোরাক বানায়। কোন দলের কর্মীরা যদি ইসলামী অনুশাসনের আমল না করে, ফরজ–ওয়াজিবগুলো পালন না করে এবং হারাম কাজ থেকে দূরে না থাকে, তাহলে সেটি হচ্ছে গোমরাহ ও নষ্ট দল। আল্লাহ ঐ দলের প্রতি করুণা না করুন এবং এর কোন মূল্য প্রতিষ্ঠিত না করুন, সে দলটি ইসলামী দল হওয়ার যোগ্য নয়। এটা শুধুমাত্র একটা দল। মানুষ ঐ দলের প্রতি কি চিন্তা করবে যে দল আল্লাহর পথে জেহাদের জন্য মানুষকে আহ্বান জানায়, অথচ দলীয় কর্মীরা মদ পান করে, সুদ খায়, চুক্তি করে, তাদের স্ত্রীরা উলঙ্গ বের হয়, তাদের ছেলে-মেয়েরা নামাজ-রোজা করে না এবং ইসলাম সম্পর্কে কম–বেশ কিছুই জানে না।

আমার উদ্দেশ্য এ নয় যে, ইসলামী দল সম্পূর্ণ পাপী ও গুনাহগার কিংবা আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতাকারী মুক্ত হবে। এটা মানব সমাজের সাধারণ নিয়ম নয়। ইসলাম এ বিষয়টাকেও বিবেচনা করেছে। আমার লক্ষ্য হল, দলীয় সদস্যদের অভ্যাস যেন সাধারণত বা অধিকাংশ সময় গুনাহ কিংবা ইসলামকে উপহাস করা না হয়। এমনকি দলের সম্মতিসহ অল্প গুনাহও যেন না হয়। এ বিষয়ে 'অন্যায়ের প্রতিরোধ অধ্যায়ে দলীল প্রমাণ আলোচনা করা হয়েছে।

তবে সর্বাধিক সতর্ক থাকতে হবে নেতৃবৃন্দ যেন তাদের প্রতিপালকের নাফরমানী না করে এবং দ্বীনের ব্যাপারে নিজে কিংবা তাদের পরিবারে কোন শিথিলতা

www.amarboi.org

প্রদর্শন না করে। এরূপ হলে তাদেরকে তাড়িয়ে আল্লাহভীরু অন্য লোককে আনতে হবে যারা তাঁর দ্বীনের জন্য কাজ করবে। ইসলামী দলকে বুঝতে হবে আল্লাহ সাহায্য ও মদদ দেবেন এবং বরকত দান করবেন তাঁর প্রতি কর্মীদের আনুগত্য ও নৈকট্যের উপর ভিত্তি করে। তারা আল্লাহর যত নিকটবর্তী হবে। সাহায্যও তত তাড়াতাড়ি আসবে। এর উল্টো হলে ফলাফলও বিপরীত হবে।

দলের সদস্যদের খালি ইসলাম মানাই যথেষ্ট নয়, বরং ইসলামী দল হিসেবে তার যা করণীয় তা করতে হবে। যিনি ইমাম হাসানুল বান্নার 'দাওয়াহ ও দাঈ' পুস্তিকা কিংবা মোহাম্মদ শাওকী যাকী লিখিত 'ইখওয়ানুল মুসলিমুন ও মিসরীয় সমাজ' বইটি পড়েছেন। তিনি বুঝতে পারবেন কিভাবে দলটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং ১৯৫৪ সন থেকে আজ পর্যন্ত সামর্থ অনুযায়ী কিভাবে চেষ্টা–তদবীর চালিয়ে যাচ্ছে।

দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝার জন্য দাঈ তৈরীর উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এছাড়াও যাকাত সংগ্রহ ও বন্টন, দুঃস্থদের সেবা, বঞ্চিতদের প্রতি সহানুভূতি, মুসলমানদের প্রয়োজন পূরণ এবং কর্মকর্তাদের কাছে তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য সুপারিশ করাসহ দলের যোগ্যতা প্রমাণের লক্ষ্যে সমাজ কল্যাণ সংস্থা গড়ে তোলার দরকার রয়েছে। সফল ইসলামী দলের জন্য ইসলামী অর্থনীতির নমুনা প্রদর্শনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা মৌলিক প্রয়োজন।

এটা এ শর্তে যে, দলের সেবা সকল মুসলমানের জন্য হতে হবে। সম্ভব হলে অমুসলমানের জন্যও। এ সকল সেবা যেন দলের সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। এর ফলে তা দলকে গণবিচ্ছিন্ন করে দেবে। অন্যদেরকে ক্রোধান্বিত করবে এবং ইসলামকে বুঝা ও বাস্তবায়ন এবং মুসলমানদের প্রতি দয়া ও যত্নের ব্যর্থতা তুলে ধরবে।

৪. নেতা নির্বাচন

দলের নেতা নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দল হচ্ছে, নেতা ও কর্মীদের প্রতিচ্ছবি। ইসলামে নেতা নির্বাচনের বিষয়ে মূলনীতি হল লক্ষ্যের প্রতি নজর রাখা। যদি সফরের উদ্দেশ্যে নেতা নির্বাচিত করা হয়। তার কাজ হবে সফরের প্রয়োজন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিবেচনা ও সাহচর্য। যদি আমীরে হজ্জ বানানো হয়, তখন যে হজ্জ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখে তাকে নেতা বানাতে হবে। অনুরূপভাবে,

www.amarboi.org

অর্থনীতি সম্পর্কে ভাল জ্ঞান যার আছে, তাকে কোন অর্থনৈতিক দলের নেতা বানাতে হবে। মানুষ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত বিষয়ে যোগ্যতম, অভিজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচন করতে অত্যন্ত আগ্রহী।

বর্তমান যুগে আপনি দেখতে পাবেন, সরকারগুলো মৌলিক জ্ঞানকে যথেষ্ট মনে করে না। পরিচালক, কর্মকর্তা ও নেতৃবৃন্দকে তৈরী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সেশনের ব্যবস্থা করে। লোকেরা একে দুনিয়ার সংশোধনের জন্য যথার্থ এবং বিজ্ঞ কাজ মনে করে। যদি দ্বীনি বিষয়গুলো দুনিয়াবী বিষয়গুলোর মত চলত, তাহলে দুনিয়াবী বিষয়ের মত দ্বীনি বিষয়গুলোও ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু বিপরীতটাই সত্য। ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচনের বিষয়ে বেপরোয়া মনোভাব, এলোপাতাড়ি দৃষ্টিভঙ্গী, দলীয় ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ কাজ করে। আপনি দেখবেন, ইসলামী দলগুলো ইসলামী আকীদা ও শরীয়াহ্ কায়েম করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। কিন্তু নেতৃবৃন্দ ইসলামকে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা বেশী বুঝে না। আপনি দেখতে পাবেন, ইসলামী নেতৃত্ব সে অনুযায়ী গড়ে উঠেনি, যে অনুযায়ী দল গড়ে উঠেছে। কি করে দলটি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ নেতৃত্বের মাধ্যমে নিজ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে?

আমাদের জন্য কি রাসূলুল্লাহ (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদার জায়গায় এমন লোককে নেতা বানানো জায়েয, যে কিসে নামাজ বাতিল হয়, যাকাতের খাতগুলো কি, শাসনের মূলনীতি, দাওয়াতের কৌশল এবং ইসলামী শরীয়ার প্রবেশ ও প্রস্থান পথ সম্পর্কে অজ্ঞ?

ইসলামই একমাত্র বিষয় যা নিয়ে যে কেউ ছিনিমিনি খেলে, অজ্ঞ লোক হাতে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাখে, এমন ব্যক্তি দলের নেতৃত্ব দেয় যে, মনে-প্রাণে এর জন্য চিন্তা করে না। পারিবারিক বৈঠকে কিংবা মাসিক ও বার্ষিক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে বক্তৃতা ছাড়া তা নিয়ে চিন্তা করার সময় তার নেই। আমি নিজে এমন শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দকে দেখেছি যাদের ইসলাম এবং মহানবী (সা) ও সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানও নেই। তারা জ্ঞান সম্পর্কিত এবং দাওয়াতের মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করাকে অপছন্দ করে। তারা ইসলামী আন্দোলনের পথে ক্ষতিকর নিজেদের ত্রুটি সম্পর্কে, ইসলামী ফেকাহ ও তার বাস্তবায়ন সম্পর্কে এবং ইসলামের যে সব ক্ষেত্রে তাদের অজ্ঞতা ও চিন্তার পশ্চাদপদতা রয়েছে সে

www.amarboi.org

সম্পর্কে আলোচনা করতে অপছন্দ করে। তাই দেখি তারা আলেমদেরকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং অন্ধ-মূর্খ ভক্তদেরকে কাছে টানে। দ্বীন সম্পর্কে বিজ্ঞ লোকদেরকে তাড়িয়ে অজ্ঞ লোকদেরকে নিকটে টেনে আনে। তাই অধিকাংশ ইসলামী দল আজ পর্যন্ত ইসলামের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কিংবা কুফর ও বাতিল মতবাদের মোকাবিলার জন্য লোকদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে নিজেরা কোন পথ তৈরী করতে পারেনি।

যদি এ সকল ক্ষেত্রে ইসলাম ফয়সালাকারী হতো, তাহলে এ সকল গণ্ডগোল দেখা যেত না এবং নেতৃত্ব অনুপযুক্ত লোকের হাতে যেত না। কোরআন ও সুন্নাহর দিকে তাকালে নেতৃত্বের জন্য কি জিনিস জরুরী তা জানা যাবে।

বনি ইসরাঈল আল্লাহর কাছে নিজেদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একজন নেতার জন্য প্রার্থনা জানান। আল্লাহ তাদের জন্য একজন নেতা নিযুক্ত করলেন। নেতা ধনী-না হওয়ায় তারা আপত্তি তোলেন। তখন আল্লাহ জবাব দেন, সে যোগ্য, জীবিত লোকদের মধ্যে যুদ্ধবিদ্যায় সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী এবং শারীরিক দিক থেকে সকলের চাইতে শক্তিশালী।

আল্লাহ বলেন, 'আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন–নিশ্চয়ই আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের উপর। অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদের অধিকার বেশী। আর সে সম্পদের দিক দিয়েও স্বচ্ছল নয়। নবী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তাকেই রাজ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা। আর আল্লাহ হলেন অনুগ্রহদানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত।' (সূরা বাকারা : ২৪৭)

হযরত মোহাম্মদ (সা) যে যে কাজের যোগ্য তাকে সে কাজের জন্য নিয়োগ করতেন। বর্ণিত আছে, অনুপযুক্ত লোকের প্রতি দায়িত্ব অর্পণ খেয়ানত।

হযরত ইউসুফ (আ) যখন মিসরবাসীদের আসন্ন অর্থনৈতিক সংকট বুঝতে পারলেন তখন বাদশাহকে বলেন, 'আমাকে দেশের ধনভাণ্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানী।' (সূরা ইউসুফ : ৫৫)

আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'তোমরা আমীর হওয়ার জন্য আগ্রহী হবে এবং তা পরকালে তোমাদের লজ্জার কারণ হবে।'

(বোখারী, মুসলিম)

www.amarboi.org

নেতৃত্ব চাওয়াকে প্রকাশ্যে নিষেধ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে নেতৃত্বের জন্য প্রার্থী হওয়া এবং অন্যদের পরিবর্তে তাকে নেতা নির্বাচনের জন্য প্রচারণা চালানোও নিষিদ্ধ।

আবদুর রহমান বিন সামুরা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'হে আবদুর রহমান বিন সামুরাহ! তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নেবে না। যদি চাওয়া ছাড়া তা দেয়া হয়, তাহলে তুমি সাহায্য পাবে। আর যদি চেয়ে নাও, তাহলে এটা তোমার উপর চেপে বসল।' (বোখারী, মুসলিম)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞেস করল, কেয়ামত কবে হবে? তিনি বলেন, যখন আমানতের অসদ্ব্যবহার হবে, তখন কেয়ামতের জন্য অপেক্ষা করবে। সে প্রশ্ন করল, আমানতের অসদ্ব্যবহার মানে কি? তিনি বলেন, যখন অযোগ্য লোকের হাতে নেতৃত্ব দেয়া হবে, তখন কেয়ামতের সময় হবে।' (বোখারী)

সকলের বুঝা উচিত, ইসলাম গভীর জ্ঞানের উপর ভিত্তিশীল এবং মহান লক্ষ্যে পৌছার জন্য মহান কাজ ।

ইসলামী দল মুসলিম উম্মাহর বীজ যা মানব দলের নেতৃত্ব সৃষ্টি করবে। ইসলামী দল যদি সত্যিকার অর্থে সর্বাঙ্গীন হয়, তাহলে সেটাই হবে ইসলামী দল। নেতৃবৃন্দের ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা দলকে অর্থহীন করে তুলবে। যারা দলীয় কিংবা জাহেলিয়াতের বর্ণ প্রথার দৃষ্টিভঙ্গীতে দলকে পরিচালনা করে তারা নিজেদের এবং দলের জন্য নিজেরাই কবর তৈরী করে।

৫. সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও মাধ্যম

ইসলামের নামে যে দল পরিচয় দিতে চায় এবং লোকদেরকে দলের সমর্থক বানাতে চায়, তাদের কর্তব্য হল, তারা কি করতে চায় তা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা। তারা ঘোষণা করবে তারা ইসলামের নামে এই এই করবে।

কিছু কিছু ইসলামী দল আছে, যাদের লক্ষ্য হলো, তারা কোন দেশে ফকীর-মিসকীন, ইয়াতীম-বিধবাকে সাহায্য করবে। আরও কিছু দল আছে, যাদের লক্ষ্য হলো মৃতের দাফন-কাফন, তাদের পরিবারের যত্ন নেয়া। অন্য ইসলামী দলের লক্ষ্য হলো, কোরআন পড়া এবং লোকদেরকে আল্লাহর জিকরের জন্য একত্রিত করা ইত্যাদি।

আরেক ইসলামী দলের লক্ষ্য হলো, আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করার জন্য কাজ

www.amarboi.org

করা ও জেহাদ করা। তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করে এবং দ্বীন ও শরীয়তকে কায়েম করার মাধ্যমে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনের সকল দিকে আল্লাহর বাণীকে নিয়ন্ত্রণকারী বানাতে চায়।

ইসলামী দলের ফরজ আমানত হল, লোকদের কাছে দলীয় নীতি ঘোষণা করা এবং লোকদেরকে এদিকে ডাকা যতক্ষণ পর্যন্ত পরিস্থিতি দলীয় নীতি ঘোষণার অনুকূল থাকে। মূলনীতি ঘোষণার পর দলের লক্ষ্যের ব্যাপারে আর কোন গোপনীয়তা থাকবে না।

দলকে লক্ষ্যে পৌছার মাধ্যম ঘোষণা করতে হবে এবং সে মাধ্যমকেও ইসলামী হতে হবে। তা না হয়, দলটি কখনও নিজ লক্ষ্যে পৌছতে পারবে না। অনৈসলামী মাধ্যম দ্বীন থেকে বিচ্যুতি এবং গুনাহ। আল্লাহ গুনাহগার ও ফাসেকদেরকে সাহায্য করবেন না। যদিও তারা দ্বীনের সাহায্য ও দ্বীন প্রতিষ্ঠাকে নিজেদের লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করুক না কেন। অনৈসলামী মাধ্যম ইসলামী লক্ষ্যকে ধ্বংস করে দেবে। নচেত, এটা কি করে ধারণা করা যায় যে, দরিদ্রকে সাহায্যকারী সংস্থার মাধ্যম হলো, সম্পদ চুরি, সুদ গ্রহণ ও ফকীর-মিসকীনের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত সম্পদ থেকে আত্মসাত করা কিংবা মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্যে গঠিত সংস্থার লক্ষ্য যদি হয় জোরপূর্বক কিংবা মিথ্যা উপায়ে মালিকের কাছ থেকে জমি আত্মসাত করা।

তাহলে, ইসলামী লক্ষ্যে পৌছার জন্য ইসলামী মাধ্যম জরুরী। যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে লক্ষ্যের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ কামনা করে। সে ব্যক্তি মাধ্যমের ব্যাপারে আল্লাহর নাফরমানী করতে পারে না।

মাধ্যম ইসলামী হলে তা ঘোষণা করা ফরজ। যা ইসলাম যাকে লুকানো অপরাধ। যে দল আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করার লক্ষ্য ঘোষণা করেছে, সে দল মাধ্যমের ব্যাপারে আল্লাহর বাণীকে গোপন রাখতে পারে না। এতে করে বিষয়গুলো লোকদের সামনে পরিষ্কার হবে, দলটি কোন দিকে ডাকছে, তারা তা বুঝতে পারবে। তারা দলের লক্ষ্য ও মাধ্যমকে ইসলামের জীবন্ত ছবি হিসেবে দেখে ভালবাসবে। এর সাথে অন্তর্ভুক্ত হবে, প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করবে। ইসলামী লক্ষ্যই হোক আর মাধ্যমই হোক, তা প্রকাশ করা ফরজ এবং গোপন করা কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী খেয়ানত ও গোমরাহী।

ইসলাম কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় যে, নিজ কৃষি খামার, চাকর-বাকর ও কর্মচারীদের সাথে যা ইচ্ছা তা ব্যবহার করা যাবে বরং তা হচ্ছে, আল্লাহর এমন

www.amarboi.org

দ্বীন, যার প্রকাশ আদিষ্ট তা প্রকাশ এবং যার প্রকাশ নিষিদ্ধ কিংবা যা গোপন করা মোবাহ, তা আমরা গোপন করি। যার যে সময় প্রকৃত প্রয়োজন দেখা দেয় এবং শরীয়ত যে ব্যাপারে আদেশ দেয় ঠিক সেভাবে আমাদেরকে কাজ করতে হবে।

যে ব্যক্তি শরয়ী লক্ষ্যকে শরয়ী মাধ্যম দ্বারা অর্জন করতে চায়, তার জন্য শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া কোন কিছু প্রকাশ ও গোপন করা উচিত নয়।

নীতিমালা ও আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য আছে। যে নীতিমালা বাস্তবায়নের কথা বলা হচ্ছে, তা সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হবে। আর তা বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলনের কর্মসূচীর ব্যাপারে ব্যক্তির স্বাধীনতা রয়েছে। যেমন মসজিদে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে দু'ধরনের রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায়। প্রকাশ্য রাস্তায় মানুষ দেখতে পাবে কিংবা অপ্রকাশ্য রাস্তায়-মানুষ দেখতে পাবে না কিংবা কোন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রকাশ্যে দিনে-দুপুরে যাওয়া অথবা এমন স্থানে সাক্ষাত করা যে অন্য কেউ জানতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহর (সা) আমলে এক পর্যায়ে আন্দোলন গোপন ছিল, কিন্তু দাওয়াত ছিল প্রকাশ্য। কোরাইশগণ দাওয়াত সম্পর্কে ভাল করে জানত বলেই গোপন অবস্থায় তারা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, সাদ বিন আবি ওয়াককাস এবং বেলাল (রা)কে নির্যাতন করে। সাহাবায়ে কেরাম গোপনে দারুল আরকামে একত্রিত হত, নামাজ পড়ত ও কোরআন তেলাওয়াত করত। এটা ছিল একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ। আজকের যুগে, ইসলামের দাওয়াত দিলে নির্যাতন করা হয় না। নির্যাতন করা হয় ইসলামী রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থা কয়েমের কথা বললে। তাই এ যুগে দাওয়াতকে গোপন করার প্রশ্ন উঠে না। দাওয়াত গোপন রাখার অর্থ হল ইসলামকে প্রকাশ না করা। আমাদের জানা দরকার, গোটা বিশ্বে কোরআনের দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়ার জন্য যাদের উদ্দেশ্যে কোরআন নাজিল হয়েছিল, তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ। আর গোটা বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলামকে জয়যুক্ত করার জন্য আকাবায় শপথ গ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭২ জন।

দাওয়াতকে গোপন রাখা অপরাধ এবং একমাত্র কাপুরুষ ছাড়া তাতে কেউ সম্মত থাকতে পারে না। এক্ষেত্রে আমাদেরকে হাসানুল বান্না, ফারগালী, আবদুল কাদের আওদাহ ও সাইয়্যেদ কুতুবের ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে। যারা দ্বীনের দাওয়াতের জেহাদে অংশগ্রহণ করে না তাদের পক্ষে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের জেহাদ শোভা পায় না।

www.amarboi.org

৬. চোখ খুলে অনুসরণ করা

আমরা জানি, কোরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে, আল্লাহর বিধান। যে ব্যক্তি এ দুই বিধান অনুযায়ী আমল করে, সে হকপন্থী, অন্যথায় সে বাতিলপন্থী।

কোন সমস্যা দেখা দিলে কিংবা যে সকল ক্ষেত্রে তাদের ধারণা হতো যে, তিনি যা আদেশ করেছেন, তার বিপরীত করছেন, সে সকল ক্ষেত্রে তারা নবী (সা) কে প্রশ্ন করতেন। একবার তিনি মৃতের জন্য কাঁদতে নিষেধ করে নিজেই যখন কেঁদেছেন, তখন তাঁরা প্রশ্ন করেন। তিনি জবাব দেন, আওয়াজ দিয়ে কাঁদা নিষিদ্ধ, শব্দহীন কান্না নিষিদ্ধ নয়। অনুরূপভাবে, খোলাফায়ে রাশেদা মিম্বারে দাঁড়িয়ে খোতবা দেয়ার সময় জনগণ তাদেরকে প্রশ্ন করেছেন। এক মহিলা দেন-মোহরের বিষয়ে এবং অন্য এক বেদুঈন দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ার বিরুদ্ধে হযরত ওমারকে প্রশ্ন করেন। অনুরূপভাবে, তাঁরা অন্যান্য খলীফাদেরকেও প্রশ্ন করেছেন।

তাই কোন দলের নেতার ইসলামের বুঝ-জ্ঞান ব্যতীত এবং ছোট ও বড় বিষয়ে তার সমালোচনা ছাড়া নেতা হিসেবে কাজ করা জায়েয নেই। অনুরূপভাবে, অনুসারীদের জন্যও নেতার অন্ধ অনুকরণ জায়েয নেই। তাদেরকে নিশ্চিত হতে হবে, নেতার কাজগুলো ইসলাম সম্মত হচ্ছে কিনা। একথাই আল্লাহ কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ করেছেন :

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ -

'আপনি বলুন, এটাই আমার পথ, আমি এবং আমার অনুসারীরা দেখে-শুনেই আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই।' (সূরা ইউসুফ : ১০৮)

সর্বনিকৃষ্ট অনুসারী হল, মূর্খ অনুসারী, যাদেরকে তাদের নেতৃবৃন্দ যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে পরিচালিত করেন। তাদেরকে তারা কোন সময় ধ্বংসের উপত্যকায় নিক্ষেপ করেন, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না।

যারা এ হাদীসটি পড়েন :

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ -

"স্রষ্টার নাফরমানীতে সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই" তারাই মূলতঃ হেদায়েত ও খোলা চোখ নীতির অনুসারী। তারা চোখ বন্ধ করে অন্ধ অনুসরণ করে না।

www.amarboi.org

দলীয় প্রধান কর্মীদেরকে দলের বাইরে অন্য কারো কথা শুনতে দেয় না, ওলামায়ে কেরামের দরসের মধ্যে হাজির হতে ও ইসলামী বই পড়তে নিষেধ করে এবং অনুসারীরা মূর্খের মত তাদের কথা শুনে। এভাবে কর্মীরা মূর্খ নেতৃবৃন্দের কারাগারে বন্দী। তারা এটাকেই ইসলাম মনে করে। ফলে, অবিভক্ত ইসলাম বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং লোকেরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে অপরাধী হচ্ছে, ইসলামপন্থী নেতৃবৃন্দ। আল্লাহ যথার্থই বলেছেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَيْءٍ.

'যারা নিজেদের দ্বীনকে বিভক্ত করে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, আপনি তাদের কোন বিষয়েই নেই।' (সূরা আনআম : ১৫৯)

সর্বোত্তম নেতা হল, যিনি অনুসারীদেরকে যুক্তি-বুদ্ধির উপরে পরিচালিত ও প্রশিক্ষণ দেন। নবী (সা) সাহাবায়ে কেরামকে অনুরূপ প্রশিক্ষণই দিয়েছিলেন। নেতার পর, অসুখ কিংবা সফরের কারণে তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে দলকে পরিচালিত করতে পারেন।

৭. বাইয়াত ও আনুগত্য

ইসলামপন্থী দলের সদস্যরা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও লক্ষ্যে পৌছার মাধ্যম গ্রহণের পর সকল ক্ষেত্রে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে মানা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে শক্তিশালী একটা বন্ধন থাকা জরুরী। কোন সময় সেটি সম্পূর্ণ দলের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে কিংবা আল্লাহর রাস্তায় ভ্রাতৃত্বের আকারে বিদ্যমান থাকতে পারে। তা সত্ত্বেও দলীয় সদস্যরা বাইয়াতের মাধ্যমে আরো ঘনিষ্ট হবে। দলের প্রধানের প্রতি বাইয়াত গ্রহণ করতে হবে। শুনা ও আনুগত্য করা এবং লক্ষ্যে পৌছার জন্য সাধ্যমত জরুরী কাজগুলো আঞ্জাম দেয়ার জন্য বাইয়াত গ্রহণ করতে হবে এবং ইসলাম বিরোধী কোন কাজের বাইয়াত ও আনুগত্য করা যাবে না। বাইয়াতের পর শুনা ও আনুগত্য ওয়াজিব হয়ে যায় এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তির উপরও নিজ দায়িত্ব পালন ওয়াজিব হয়। তিনি দায়িত্ব ঠিকমত পালন না করলে খেয়ানত ও গাদ্দারীর দায়ে গুনাহগার হবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّ رَاعٍ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবে।' (বোখারী, মুসলিম)

www.amarboi.org

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বাইয়াতের বহু ঘটনা বর্ণিত আছে। কেউ কেউ তাঁর কাছে ইসলামের বাইয়াত নেন এবং সূরা মোমতাহিনায় বর্ণিত মহিলাদের বাইয়াতের পর পুরুষরাও বাইয়াত গ্রহণ করেন। দেড় হাজার সাহাবায়ে কেরাম হুদায়বিয়ায় তাঁর হাতে বাইয়াত নেন। বাইয়াত সাধারণ ও বিশেষ-এ দু'ধরনের। তাঁর কাছে মক্কা বিজয়ের দিন অনেক নারী-পুরুষ বাইয়াত নিয়েছে। তিনি হিজরতের সময় মদীনায় প্রবেশকালে তাঁর কাছে বহু সংখ্যক নারী-পুরুষ বাইয়াত গ্রহণ করেছে।

বাইয়াত পূরণ করা ওয়াজিব এবং বিশ্বাসঘাতকতা হারাম। বাইয়াত গ্রহণকারী দলীয় প্রধানের প্রতি বাইয়াত থেকে মুক্তির জন্য আবেদন জানাতে পারে।

পাঠকবৃন্দ! আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল আপনাদের সামনে ইসলামের সামাজিক আচরণের উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি তুলে ধরবো। আমি এ বিষয়গুলোকে বিভিন্ন ইসলামী গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত দেখে ভেবেছি, এগুলো বর্তমান যুগের স্পিরিট এবং পাঠকের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে না। আমার আশংকা ছিল, এগুলোকে আমি সন্তোষজনক আকারে পেশ করতে সক্ষম হবো কিনা, আমি জানি সামাজিক আচরণ বহু এবং গুরুত্বপূর্ণ। তাকে কোরআন ও হাদীসের আলোকে নির্ভরযোগ্য উপায়ে পেশ করা চাট্টিখানি কথা নয়। তা সত্ত্বেও আমি আমার প্রত্যাশা পূরণের জন্য চেষ্টা করেছি। আমি আপনাদের সামনে ইসলামের সামাজিক আচরণের সুসংবাদ পর্যায়ক্রমিক আলোচনা পেশ করেছি এবং আপনাদেরকে উন্নত মানব সভ্যতার ভিত্তিগুলোর সামনে দাঁড় করিয়েছি। আমি ইসলামের মহত্ব ও সৌন্দর্যের আলোকে সামাজিক আইনের আঙ্গিনায় পরিভ্রমণ করেছি এবং আমি দ্বীনের প্রতি নিজেদের অজ্ঞতার কারণে জুলুম, অনৈসলামী ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হওয়ার কারণে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চনা এবং আল্লাহ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে সৃষ্ট লাঞ্চনার প্রেক্ষিতে ক্রটি অনুভব করি।

আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, ইসলামের সামাজিক আচরণ বইটি পড়ার পর আমার ক্রটির জন্য ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহর কাছে আমার জন্য প্রার্থনা করবেন, আমার ভুলগুলো সংশোধন করবেন। আল্লাহ ততক্ষণ বান্দাহর সাহায্য করেন, যতক্ষণ বান্দাহ বান্দার সাহায্য করে। আল্লাহ সর্বোত্তম প্রভু ও সাহায্যকারী। ■

www.amarboi.org

www.amarboi.org

লেখকের রচিত ও অনূদিত অন্যান্য বই

বিশ্ব প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত–

১. **ইসলামের সামাজিক আচরণ** : পরিবেশনায় আহসান পাবলিকেশন-এটি একটি মৌলিক গ্রন্থ এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিশ্বকোষ হিসেবে বিবেচিত। সামাজিক আচরণ জানার জন্য এটি অনন্য ও অপরিহার্য বই। এতে সমাজ জীবনের পরিচিত বিষয়গুলোর গভীর ও বিস্তারিত আলোচনাসহ দুর্লভ দৃষ্টান্তসমূহ স্থান পেয়েছে।

২. **রমযানের তিরিশ শিক্ষা** : পরিবেশনায়- আহসান পাবলিকেশন, বইটি রমযান মাসের জন্য অনুপম হাতিয়ার। এতে রমযানের সাথে সংশ্লিষ্ট ৩০টি বিষয়ের ব্যাপক আলোচনাসহ পরিবর্ধিত সংস্করণে বহু নূতন তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। রোযা ২১টি রোগের চিকিৎসার বর্ণনাও দেয়া হয়েছে।

৩. **সাহিত্যের ইসলামী রূপরেখা** : সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা উৎকৃষ্ট ইবাদত। তবে শর্ত হল, এর ইসলামীকরণ করতে হবে। এ বইতে সে প্রক্রিয়া এবং অপসাহিত্য-সংস্কৃতির বুদ্ধিবৃত্তিক মোকাবেলার সার্থক ও বাস্তব পথ নির্দেশ রয়েছে।

৪. **ফুল যদি ঝরে যায় বরফ যদি গলে যায়** : এ বইতে সময়ের গুরুত্ব ও সদ্ব্যবহার সম্পর্কে ৪০ জন মনীষির মহামূল্যবান বক্তব্য এবং সময়ের সদ্ব্যবহারের প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে।

৫. **জিন ও শয়তানের ইতিকথা** : এ বইতে জিন জগতের রহস্য, শয়তানের ৪৯ প্রকার ওয়াসওয়াসা, পরিবার ও ঘরকে জিন ও শয়তান মুক্ত রাখা এবং জিন-ভূত তাড়ানোর প্রচলিত শিরক ও বিদআতী পদ্ধতির পরিবর্তে কোরআন ও হাদীসের নির্ভেজাল ইসলামী পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. **ইসলামে যাদু ও চোখ লাগার প্রতিকার** : সমাজে যাদুগ্রস্ত ও চোখলাগা রোগী অসংখ্য। বহুলোক তা বুঝে না বলে এর উপযুক্ত চিকিৎসা করতে পারে না। এ বইতে শিরক ও বিদআত মুক্ত প্রতিকার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

৭. **রাসূলুল্লাহর (সা) নামায ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ** : নাসেরুদ্দিন আলবানী ও এ এন এম সিরাজুল ইসলাম রচিত বইটিতে মহানবীর (সা) নামায পদ্ধতির সঠিক বর্ণনা এবং নামায ও অযু-গোসলের প্রচলিত দেড় শতাধিক ভুল সংশোধন করা হয়েছে। অন্য দু'টো প্রকাশনী থেকে পাঠক প্রতারণার কৌশল হিসেবে এর নকল বেরিয়েছে। সাবধান!

৮. **বিশ্ব ভালবাসা দিবস (ভ্যালেন্টাইন ডে)** : এ বইতে রয়েছে ভালবাসা দিবসের তাৎপর্য এবং ভ্যালেন্টাইন কে বা কি? মুসলমানরা কি এ দিবসটি পালন করতে পারে?

আহসান পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত–

৯. **কালেমা শাহাদাতের হাকীকত** : আতিয়্যা মুহাম্মদ সাঈদ রচিত মূল গ্রন্থটিতে কালেমায়ে শাহাদাত-এর হাকীকত বর্ণনা করা হয়েছে।

১০. **ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা** : মূল গ্রন্থটির রচয়িতা বাংলাদেশস্থ সউদী আরবের প্রথম রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আবদুল হামীদ আল খতিব।

www.amarboi.org

আধুনিক প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত–

১১. **ভাল মৃত্যুর উপায় :** নতুন করে প্রায় দ্বিগুন পরিবর্ধিত ও বহু নতুন তথ্য সমৃদ্ধ সংস্করণটি আপনার পারলৌকিক জীবনের সাফল্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

১২. **যে যুবক-যুবতীর সাথে ফেরেশতা হাত মিলায় :** এ বইতে যৌবনের উৎস ও মূল্যায়ন, আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত কুরআন ও হাদীসের আলোকে যুবকর্মীদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক আলোচনা করা হয়েছে।

১৩. **ইসলামে মসজিদের ভূমিকা :** এ বইতে মসজিদে হারাম, মসজিদে নবওয়ী এবং মসজিদে আকসাসহ সাহাবায়ে কেরামের প্রতিষ্ঠিত মসজিদসমূহের ঐতিহাসিক ভূমিকা

১৪. **কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস :** (মূল- জামীল যাইনু) ঈমানের অনেক বিষয়ে আমাদের ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস ত্রুটিযুক্ত। এ বইতে তা বিশুদ্ধকরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

১৫. **খৃস্টান ধর্মতত্ত্ব ও ইসলাম :** মূল– আহমদ দীদাত। (৫টি পুস্তিকার সমষ্টি) এ বইতে খৃস্টানদের ভ্রান্তিগুলো ক্ষুরধার যুক্তির মাধ্যমে দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

১৬. **ঈসা (আ) বান্দাহ না প্রভু?** মূল- ড. তকী উদ্দিন, এ বইতেও ঈসা (আ) সম্পর্কে খৃস্টানদের বিভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা করা হয়েছে।

১৭. ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মীয়তা।

১৮. ইসলামের দৃষ্টিতে এইডস্ রোগের উৎস ও প্রতিকার।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার থেকে প্রকাশিত–

১৯. **মক্কা শরীফের ইতিকথা :** এ বইতে যমযম কূপের রহস্য, মক্কার ইতিহাস, কাবা শরীফ, মসজিদে হারাম, হারাম সীমান্ত ও এতে নিষিদ্ধ কাজসমূহ, মক্কার ঐতিহাসিক মসজিদ ও পাহাড়সমূহের বর্ণনা এবং হজ্জ ও হজ্জের প্রায় শ'খানেক ভুল সংশোধন করা হয়েছে।

২০. **মদীনা শরীফের ইতিকথা :** বইটিতে মদীনার ইতিহাস, মসজিদে নবওয়ীর বর্ণনা ও ফযীলত, নবী (সা) এবং দু'সাথীর কবর, মদীনার ঐতিহাসিক মসজিদ ঘর-কূপ ও পাহাড়সমূহের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। হাজীদের জন্য বই দুটো অপরিহার্য সাথী।

২১. **আল আকসা মসজিদের ইতিকথা :** এ বইয়ে মসজিদে আকসা, গম্বুজে সাখরা মে'রাজ এবং মসজিদটি ধ্বংসের ব্যাপারে ইহুদীদের চক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রফেসর্স পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত–

২২. জামাতে নামযের গুরুত্ব।

২৩. ইসলামের দৃষ্টিতে ধূমপান ও গান-বাজনা।

www.amarboi.org

I S B N 984-32-0906-0